অনন্ত সিংহ

গণ এণ্ড কোম্পানী : শিবালয় : বড়দা এভিনিউ
পাঃ গড়িয়া, ২৪ পরগণা। টেলিফোন: ৪৬-৫৮৭০

সেন এণ্ড কোম্পানীর পক্ষ হইতে
শ্রীযুক্ত গোপাল দাশগুপ্ত কর্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম প্রকাশ
১লা জুলাই, ১৯৫৯

প্রচ্ছদ
শ্রীমলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান
জে. এন. ঘোস এণ্ড সনস্
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড,
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর: শ্রীরাধেশ্যাম সাহা
ক্যালকাটা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩/১, হায়াৎ খাঁন লেন,
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

শত শহীদের বেদীমূলে ভারতের সুদীর্ঘ স্বাধীনতা-যুদ্ধের রক্তক্ষরা ইতিহাস রচিত। এই ইতিহাসের যে ক'টি রক্তরঞ্জিত পাতার সঙ্গে আমি প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত, সেক'টি নিয়েই আমার এই অধ্যায়টি রচনার প্রয়াস। ভাবীকালের আপোষহীণ বিপ্লবী তরুণ-তরুণীদের উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি উৎসর্গ করে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

অনন্ত সিংহ

ভূমিকা

বন্ধুবর শ্রীঅনন্ত সিংহের বই "অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম" সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। অতি আনন্দের কথা, বইখানি বাংলাদেশের সকল স্তরের ও সকল বয়সের নরনারীর সমাদর লাভ করেছে এবং শ্রীঅনন্তও নিঃসন্দেহে দেশপ্রেমিকের কর্তব্য পালন করেছেন।

গত ত্রিশ দশকের চট্টগ্রামের যুব-বিদ্রোহ সম্পর্কে শ্রীঅনন্ত সিংহের দ্বিতীয় সুবৃহৎ পুস্তক—"চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ"। পুস্তকটির এই প্রথম খণ্ডে অনন্তলাল সেই বিদ্রোহের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন।

সেই সময়কার চট্টগ্রাম বিদ্রোহের যা মূল কর্মসূচী ছিল তা এককথায় বলা যায় "প্রোগ্রাম অব্ ডেথ্"—অর্থাৎ মরণের কর্মসূচী। কেবলমাত্র মৃত্যুবরণ করাই কিন্তু এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য ছিল না; উদ্দেশ্য ছিল মৃত্যু উপেক্ষা করে সুদৃঢ় পদক্ষেপে লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যাওয়া—আর পেছনে ফেরা নয়। সেই সময়ে ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে যে প্রগাঢ় রাজনৈতিক বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছিল তারই পটভূমিকায় চট্টগ্রামের তরুণেরা জাতির মুক্তি অর্জনের পথে যে সীমাবদ্ধ অগ্রগতি এবং সাম্রাজ্যবাদীর শাসন চূর্ণ করে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে হলেও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করেছিল, সে সংকল্প কাজে পরিণত করবার উদ্যোগ নিলে ঐ সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী অনেকের পক্ষেই মৃত্যু এড়িয়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

অথচ পেছনের দরজা খুলে রেখে, অর্থাৎ পশ্চাদপসরণের সুযোগ রেখে, এগিয়ে গেলে চরম সংকটের সময় পরিপূর্ণভাবে দায়িত্ব পালন করা অপেক্ষা অপসরণের এবং প্রাণরক্ষার আগ্রহই প্রবল হয়ে ওঠে। প্রাণী মাত্রেরই বোধ হয় এই আকাঙ্খা একান্ত স্বাভাবিক।

তাই সেদিন চট্টগ্রামের বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃবর্গ এই সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন যে, অন্ততপক্ষে মাতৃভূমির একটা অতি ক্ষুদ্র অংশকেও (চট্টগ্রাম জলাকে) সাম্রাজ্যবাদের অশুভ নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত করতে হবে এবং ভারতীয় জনগণের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করে সেই সরকারকে যতদিন সম্ভব রক্ষা করতে হ:

কোন সন্দেহ ছিল না যে, একমাত্র প্রভূত পরিমাণ প্রাণের বিনিময়েই এই মুক্তি, স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা এবং (স্বল্পকালের জন্য হলেও) স্বাধীনতা রক্ষা।

কার্যক্ষেত্রে, নিষ্করুণ সশস্ত্র সংঘর্ষের ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে পশ্চাদপসরণের কথাই বার বার মনে হবে এবং তদুপযোগী যুক্তিও সেই সময়ে অকাট্য বলে প্রতিভাত হয়ে উঠবে। জীবনাশঙ্কার মুহূর্তে মনে দুর্বলতা দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। সেই সময়ে পরিপূর্ণভাবে কর্তব্য পালনের জন্য শেষ অবধি অচঞ্চলভাবে চেষ্টা করে যাওয়া অপেক্ষা ভবিষ্যতে অধিকতর সুযোগের আশায় বর্তমানের কর্মসূচী স্থগিত রেখে পশ্চাদপসরণের যুক্তিই শক্তিশালী হয়ে দেখা দেয়।

সেইজন্যই যুব-বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দ এক কথায় বিদ্রোহের যে কর্মসূচী স্থির করেছিলেন, তা ছিল মরণের কর্মসূচী এবং সুনিশ্চিত মৃত্যুবরণ করবার পূর্বে চট্টগ্রামকে মুক্ত ও স্বাধীন করা। এর মধ্যে আর পেছনে ফেরবার বা ঐ কর্মসূচী অপূর্ণ রাখবার কোন সুযোগই ছিল না।

১৯৩০ সালেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল—এই বিরাট বিশাল ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র এক কোণে অতি সাময়িকভাবে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটালেও বাস্তবে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে যথার্থভাবে কতটুকু দুর্বল করা যাবে এবং তার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সম্ভাবনা কতটুকু এগিয়ে যাবে? জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম কি তার ফলে দুর্বার হয়ে উঠে সাম্রাজ্যবাদকে বিদায় গ্রহণে বাধ্য করতে সক্ষম হবে?

সেদিন কিন্তু বিপ্লবীদের কাছে এ প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয়নি। সাম্রাজ্যবাদের শক্তি সম্পর্কে এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভারতের তৎকালীন মুক্তি-সংগ্রামের সামর্থ্য সম্পর্কে বিপ্লবীদের মনে কোন ভ্রান্ত ধারণা ছিলনা। বহু প্রচেষ্টা, বহু বিক্রম এবং বহু ত্যাগ স্বীকারের পরেই জাতির মুক্তি প্রচেষ্টা সফল হয়ে ওঠে—এটা সাধারণ কথা এবং ইতিহাসের এই শিক্ষা কারও অজানা ছিলনা। অথচ স্বাধীনতাকামী জনগণের যে অংশ রাজনৈতিক লক্ষ্য অপেক্ষা পন্থার উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন, তাঁরা সেদিন চট্টগ্রামের মুক্তি-যুদ্ধকে শুধু সুস্পষ্ট ভাষায় নিন্দাই করেন নি—ক্ষুদ্র চট্টগ্রামে বৃটিশ শাসনকে আঘাত দিয়ে বিরাট ভারতবর্ষকে মুক্ত করবার প্রচেষ্টা বালকোচিত বলে চট্টগ্রাম বিদ্রোহকে জনমনে লঘু প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছিলেন।

ভারতবর্ষের একখণ্ডের অতিক্ষুদ্র একটি জেলা চট্টগ্রামকে যদি অনেকদিন ধরেও স্বাধীন করে রাখা যায়, তবু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে মারাত্মকভাবে দুর্বল করা যাবেনা, অথবা কেবলমাত্র সেই জন্যই ভারতের মুক্তি সংগ্রাম অচিরেই দুর্বার হয়ে উঠবে না—বিদ্রোহীদের মনে সেদিন এসম্বন্ধে কোন ভুল ধারণা ছিলনা। সেদিনও তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সাম্রাজ্যবাদ কখনও স্বেচ্ছায় ক্ষমতা

ত্যাগ করে না এবং আপোষ আলোচনার পথে যে স্বাধীনতার পত্তন হয়, সে স্বাধীনতার আমলে ব্যাপকতম জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন কল্যান ও সমৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত হয়ে ওঠে না। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসক হিংসা ও পশুবলের সাহায্যে দেশের ব্যাপকতম জনসাধারণের ইচ্ছা আকাঙ্খা ও মুক্তি প্রয়াসকে নিষ্ঠুর হাতে দমন করেই আপন অপশাসন প্রতিষ্ঠিত রাখে। আবেদন নিবেদন অথবা অতিশয় যুক্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনার দ্বারা সাম্রাজ্যবাদের মূল নীতির পরিবর্তন করা কখনই সম্ভব নয়। সর্বকালে এই কথাই অতি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, সাম্রাজ্যবাদ কেবলমাত্র একটি ভাষাই বোঝে—সে ভাষা অতীতে ছিল জর্জ ওয়াসিংটনের ভাষা আর বর্তমানকালে ভিয়েতনামের জনসাধারণের ভাষা। আমাদের দেশের পন্থবিলাসী মুখর স্বাধীনতাকামীরা বিংশ দশক থেকে সর্বতোভাবে সতত এই চেষ্টাই করেছেন যেন ভারতের স্বাধীনতাকামী জনসাধারণ ঐ ভাষায় আত্মপ্রকাশ না করে।

বিপ্লবপন্থীদের উদ্দেশ্য ও উদ্যোগ ছিল ভারতের জনগণ বিপ্লব পন্থায় ও বিপ্লব প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠুক। একথাও অতি সত্য যে, কিছু সংখ্যক ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার ফলেই কোন দেশে বিপ্লব সংঘটিত হয় না। বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যাপকতম দেশবাসী প্রতিষ্ঠিত শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শাসক সম্প্রদায়কে পর্যুদস্ত করে তুলতে পারলেই বিপ্লব সফল হয়। শাসকশ্রেণীকে পর্যুদস্ত করে দেশের জনগণের পক্ষে ক্ষমতা দখল করা তখনই সম্ভব, যখন ঐ গণ-বিদ্রোহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিকল্পিত হয় এবং ঐ বিদ্রোহের পশ্চাতে সশস্ত্র সমর্থক থাকে। একথা বলাই বাহুল্য যে, সশস্ত্র সমর্থন মানেই সুদৃঢ় নেতৃত্ব। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যুগে ভারতের বিপ্লবপন্থীরা দেশের জনসাধারণকে এই বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে বহুক্ষেত্রে অতুলনীয় বিক্রম দেখিয়েছেন ও চরম ত্যাগ স্বীকার করেছেন। চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল এবং আরও বহু পূর্বগামী শহীদদের মনে এমন কোনই মোহ ছিল না যে, তাঁদের প্রাণদানের ফলে আশু জাতীয় মুক্তিলাভের সম্ভাবনা উজ্জল হয়ে উঠবে। তবুও ঐ সকল প্রাতঃস্মরণীয় শহীদেরা এই উদ্দেশ্যেই হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করেছেন যে, তাঁদের প্রাণদানের ভিতর দিয়েই দেশের অগণিত জনসাধারণ নূতন প্রেরণা, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, নূতন জীবনলাভ করে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবে।

সেদিনের চট্টগ্রাম বিদ্রোহের লক্ষ্যও ঠিক এইই ছিল। ক্ষুদ্র চট্টগ্রামে সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধীদের বিদ্রোহের যে স্ফুলিঙ্গ আত্মপ্রকাশ করবে, তা সাম্রাজ্যবাদের অনায়াস প্রয়াসে স্বল্পকালের মধ্যে নিষ্প্রভ ও নির্বাপিত হয়ে গেলেও হয়ত অদূর ভবিষ্যতে সেই উত্তাপ দেশব্যাপী ঘনীভূত বিক্ষোভকে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের শক্তি যোগাবে।

চট্টগ্রামের তরুণ বিদ্রোহীদের সেই লক্ষ্য বোধ হয় ব্যর্থ হয় নি। পরাধীন দেশের মুক্তি-সংগ্রাম সাধারণতঃ কখনই প্রথম আঘাতে জয়লাভ করে না, জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম অপরিহার্যরূপে কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করে যায়। চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিদ্রোহও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐরূপ একটি স্তরের ভিত্তিস্থাপন করে গিয়েছে।

তৃতীয় দশকের প্রাক্কালে সাম্রাজ্যবাদ ভারতের জনগণের ক্ষোভ ও মুক্তি পিপাসার তীব্রতা সঠিকভাবে বুঝতে পারে নি। ক্ষয়িষ্ণু পতনোন্মুখ শাসকশ্রেণীর পক্ষে এই ভুলই স্বাভাবিক। বিদ্রোহীদের আচমকা আক্রমণেই চট্টগ্রামে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সৌধ তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ল।

তারপরে শহরের উপকণ্ঠে জালালাবাদ পাহাড়ে বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী ফৌজের সশস্ত্র সংঘর্ষ ও ভীত মনোবলহীন স্থানীয় শাসকদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী ফৌজের পরাজয় ও পশ্চাদপসরণ।

যুব অভ্যুত্থান ও জালালাবাদের সংঘর্ষ—মাঝে চার দিনের ব্যবধান। অনেক ভুলত্রুটি, সমর বিজ্ঞান সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের অভাব, যুদ্ধক্ষেত্রের অনভিজ্ঞতা, বহু অভাবনীয় ঘটনা ও দুর্ঘটনার পরিণতিতেই জালালাবাদের পাহাড়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী ফৌজের ঐ সংঘর্ষ ঘটে, নতুবা পরিকল্পনা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরূপ।

তা সত্ত্বেও সেইযুগের পরিস্থিতি, জালালাবাদের সংঘর্ষ ও তার ফলাফলের গুরুত্ব কম নয়। অসংগঠিত, সামরিক জ্ঞানে অনভিজ্ঞ, উপেক্ষনীয় তুচ্ছ একদল (crowd) মুক্তিযোদ্ধার নিকট সজ্জিত ও সর্বতোভাবে প্রস্তুত সাম্রাজ্যবাদের সেনাবাহিনীর প্রশস্ত দিবালোকে পরাজয় ও পশ্চাদপসরণের গুরুত্ব সেদিন কম ছিল না। সাম্রাজ্যবাদ ঐ ঘটনাকে লঘু করে দেখাবার চেষ্টা করলেও সেই পরাজয়ের গুরুত্ব সেদিন উপেক্ষণীয় মনে করে নি, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সশস্ত্র সংঘর্ষের ফলে দ্বাদশজন দেশপ্রেমিক বিদ্রোহী তরুণের প্রাণদান সেদিন আমাদের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের পক্ষেও তুচ্ছ ছিল না।

উপযুক্ত প্রস্তুতির দ্বারা কোন একটি স্থানে সাম্রাজ্যবাদের শাসনব্যবস্থা অবসান করা অসম্ভব নয়, সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটিয়া ফৌজকে পরাজিত করা সম্ভব, সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে সাময়িকভাবে অন্তত ছত্রভঙ্গ করাও সম্ভব—ভারতের এবং বিশেষভাবে বাংলার তরুণ-তরুণীরা এই সম্ভাব্যতার নূতন প্রেরণায় জেগে উঠল। আরম্ভ হ'ল সারা বাংলায় রক্তের হোলি খেলা, দেশ প্রেমিকদের মধ্যে প্রাণদানের প্রতিযোগিতা। ভারতবর্ষে এবং বিশেষভাবে বাংলার কোথাও কোথাও সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা ও তাদের ঘনিষ্ঠ অনুচরেরা নিজেদের জীবন আর নিরাপদ মনে করল না।

পরাধীন নিপীড়িত জাতি বা জাতির কোন অংশ যে সময়ে আত্মসম্বিত ফিরে পেয়ে জেগে ওঠে, সে সময় সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থা আর নিরাপদ থাকে না এবং

অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা ও তাদের ঘনিষ্ঠ অনুচরেরাও নিরাপদ বোধ করে না—এই স্বাভাবিক।

সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ভারতীয় গুণমুগ্ধেরা ভারতের বিপ্লবী মুক্তি সংগ্রামকে ঢালাওভাবে সন্ত্রাসবাদ বলে জনমনে হেয় করবার চেষ্টা করেছে এবং প্রচার করেছে। ১৯১৩-১৪ সালে রাসবিহারী বসু সমগ্র দেশে দ্বিতীয় সিপাহী-বিদ্রোহের যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, ১৯১৪-১৫ সালে যতীন মুখার্জী বিদেশী অস্ত্রের সাহায্যে সারাদেশে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের যে প্রচেষ্টা করেছিলেন, ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামে বিদ্রোহী তরুণেরা সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান করে যে স্বাধীন সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেছিল ও প্রাণের বিনিময়ে তা রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিল—তা কি সব "সন্ত্রাসবাদী" কর্মসূচীর পরিণতি? আমাদের দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস যারা লিখছেন, তাঁরা এই সব ঘটনাকে কি যুক্তিসঙ্গত ভাবে সত্যি সত্যি পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন?

জালালাবাদ যুদ্ধের পর একটি অধ্যায়ের অবসান হ'ল—সূচনার সমাপ্তি। তারপর বিদ্রোহীরা নূতন পরিস্থিতি অনুযায়ী নূতন রণকৌশল গ্রহণ করেছিল—আর সম্মুখ সংঘর্ষ নয়, 'গেরিলা যুদ্ধের' কৌশলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে সতত নিরন্তর এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে অতর্কিত আঘাতে জর্জরিত কর, আহত কর, পঙ্গু কর।

তারপর চললো দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে তরুণ বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর সশস্ত্র লুকোচুরি খেলা। কখনও কোথাও সাম্রাজ্যবাদ নাজেহাল হয়েছে, আবার কখনও কোথাও বিদ্রোহীরা পরাজিত ও বিনষ্ট হয়েছে।

ফিরিঙ্গিবাজার, কালারপোল, ধলঘাট, পাহাড়তলী, গৈরলা, গহিরা প্রভৃতি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা। স্বকীয়ভাবে এই সব ঘটনার প্রত্যেকটি সর্বভারতীয় পটভূমিকায় প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ না হলেও এই সমস্ত ঘটনায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁরা অতুলনীয় দেশপ্রেম, অভূতপূর্ব সাহস ও বীরত্ব এবং আদর্শ আত্মত্যাগের যে প্রদীপ্ত উদাহরণ স্থাপন করে গিয়েছেন তা আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের গৌরব এবং শ্লাঘার ইতিহাস।

সশস্ত্র সংঘর্ষে মারাত্মকভাবে আহত এবং মুমূর্ষু দেবুকে যখন জিজ্ঞেস করা হ'ল—"সাম্রাজ্যবাদী ফৌজের অধিনায়ক বড়সাহেবের (কর্নেল ডালাস স্মিথ) কাছে তোমার কিছু বলবার আছে কি?"—তখন দেবু প্রদীপের শেষ শিখার মত মুহূর্তে প্রজ্জলিত হয়ে ক্ষীণ স্বরে চীৎকার করে উঠল—"আমার রিভলভারটা কই?"—এবং সুতীব্র উত্তেজনায় উঠে বসবার ব্যর্থ প্রয়াসে সেই মুহূর্তেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

কালারপোল খণ্ডযুদ্ধের শেষ জীবিত বিদ্রোহী নেতা মনোরঞ্জনকে সাম্রাজ্যবাদী ফৌজের পক্ষ থেকে ডেকে বলা হয়েছিল, "মনোরঞ্জন অস্ত্র ফেলে দাও, তোমার

জীবন বাঁচবে", উত্তরে মনোরঞ্জন চীৎকার করে বলেছিল, "মনোরঞ্জন আত্মসমর্পণ করতে জানে না", বলেই মুখের ভিতর রিভলভারের নল ঢুকিয়ে সাম্রাজ্যবাদের অশুচি স্পর্শ এড়িয়ে আমাদেব জাতীয় পরাধীনতার প্রায়শ্চিত্ত করে গেছে।

বন্ধুবর অনন্ত এই সমস্ত ঘটনার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন দেশবাসীর অবগতির জন্য এবং বিশেষভাবে বর্তমান যুগেব তরুণ-তরুণীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য। যে দেশপ্রেম জাতির মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য মৃত্যুকে উপেক্ষা করে হাসিমুখে প্রাণদানে অনুপ্রাণিত করে, অনন্ত সিংহের লেখা বিগত যুগের বাস্তব কাহিনী পড়ে আমাদের দেশের তরুণ তরুণীদেব একটি অংশও যদি সেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে তাহলেই এই লেখা সার্থক। দেবু, মনোরঞ্জন, স্বদেশ, রজত, অমবেন্দ্র, রামকৃষ্ণ, শৈলেশ এবং আবও অনেকে দেশকে ভালবেসে যে শৌয বীর্য ও চরম আত্মত্যাগ দেখিয়ে গেছেন আমাদের দেশের তথা জাতীয় মুক্তিকামী সকল দেশের যুব-শক্তির কাছেই তা অনুকরনীয আদর্শ।

বন্ধু অনন্তলাল তাঁর সুবৃহৎ পুস্তকে যা লিখেছেন তার ভেতর কোথাও এতটুকু কল্পিত কাহিনী নেই। অতি নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি প্রত্যেকটি ঘটনাকে যথাযথভাবে এবং যথার্থভাবে বিবৃত করবাব চেষ্টা করেছেন। কোথাও অতিশয়োক্তি করেন নি বা কোন ঘটনার গুরুত্ব বা পরিধি হ্রাস অথবা বৃদ্ধি করবার চেষ্টা কবেন নি। কোন ঘটনাকে রোমঞ্চকর বা নাটকীয় করে প্রতিভাত করবার চেষ্টায বর্ণনাব ভিতর কোন প্রক্ষিপ্ত বিষয়ের অবতারণাও করেন নি। অথচ বাস্তবে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যা অনন্তলালেব সুযোগ্য লেখনীর মুখে যথাযথভাবে প্রকাশ পেয়ে বহু কল্পিত রোমাঞ্চকর কাহিনী অপেক্ষা অধিক রোমহর্ষক বলে মনে হবে।

অবশ্যই অনন্তলালের লেখা সংক্ষিপ্ত এবং শুষ্ক ঐতিহাসিক বর্ণনা হয়নি। শুষ্ক ঐতিহাসিক বর্ণনা সাধারণতঃ পাঠকের হৃদয়স্পর্শ করে না; মানুষের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে না। ঐতিহাসিক বর্ণনা মুখস্থ করে পরীক্ষা পাশ করবার সুবিধা হয়। অনন্ত সে চেষ্টা করেন নি। তিনি নিজে ঐ সকল ঘটনার অনেকগুলির স্রষ্টা ছিলেন, এবং তাঁর বিবৃত বহু ঘটনায় নিজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলেই তাঁর প্রতিটি বর্ণনার ভিতর উচ্ছ্বাস, আবেগ, অনুরাগ, ঘৃণা, ক্ষোভ ও বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তাঁর মানসিক আবেগ কোন ঘটনার বাস্তব বিষয়বস্তুকে আদৌ বিকৃত করতে পারে নি।

আমার বিশ্বাস আমাদের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের একটি ঘটনার এই সুবিস্তারিত বিবরণ আমাদের দেশের জনসাধারণের এবং বিশেষ করে বর্তমান যুগের তরুণ-তরুণীদের হৃদয়গ্রাহী হবে।

মুখবন্ধ

১৯৫৯ সালে পুরো একটি বছর ধরে ইংরেজী দৈনিক হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে—"Chittagong Heroes Fight for Freedom" শিরোনামায় আমি চট্টগ্রামের যুবকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কাহিনী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছিলাম। "চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ" (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থটিতে সেই একই কাহিনী ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখের শুভ প্রভাত হতে আরম্ভ করে ধারাবাহিক ঘটনাবলীর সন্নিবেশে রচিত।

মাস্টারদার ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার সশস্ত্র বিদ্রোহের সার্বিক অধ্যায়টি প্রধানতঃ দুইটি বিশেষ স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তর প্রস্তুতি পর্ব, আর সেই পটভূমিকারই দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রত্যক্ষ আক্রমণ ও সংঘর্ষের ইতিকথা।

প্রথম স্তরের সাংগঠনিক প্রস্তুতি পর্বের ঘটনাবহুল বর্ণনা সম্বলিত "অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম" (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থটি বিনোদয় লাইব্রেরী, প্রাইভেট লিমিটেড্ কর্তৃক ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। "অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম" বইটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের পাণ্ডুলিপি বহু মূল্যবান সরকারী দলিল ও তথ্যাদির সমাবেশে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে, বন্ধু-বান্ধবদের সহৃদয় সহযোগিতায় রচিত হচ্ছে।

"চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ" গ্রন্থটিও তিন খণ্ডে প্রকাশিত হবে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও যুদ্ধের ধারাবাহিক ইতিহাস এই প্রথম খণ্ডে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

"অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম" গ্রন্থটি সূর্য সেনের (মাস্টারদা) নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের উৎপত্তি ও সাংগঠনিক বিষয়বস্তু সম্বন্ধে, অর্থাৎ, চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিদ্রোহের সার্বিক অধ্যায়ের প্রথম স্তরের সীমিত গণ্ডিতে রচিত।

চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বিতীয় স্তরের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও একান্ত বাস্তব ঘটনাবলীর ভিত্তিতে "চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ" পুস্তকটি লেখা হয়েছে। তবু আমার মনে হয় বিষয়-বস্তু ভিন্ন হলেও সমগ্র বিদ্রোহ পর্বটি দু'টি স্তরে ভাগ করে লেখার দরুণ, প্রথম স্তরের "অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম" বইটি পড়ে পাঠকবর্গ যদি "যুব-বিদ্রোহ" গ্রন্থটি অনুসরণ করেন তবে লেখকের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করা হবে।

যুব-বিদ্রোহ প্রথম খণ্ড, যে দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত হয়েছে পাঠকবর্গকে তা জানানো প্রয়োজন। বিগত সুদীর্ঘ বছরের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী অধ্যায়ের সঙ্গে বর্তমানের তরুণ-তরুণীদের প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকার কথা নয়। অগ্নি-

[এগার]

যুগের সেই ইতিহাস বর্তমানে বিভিন্ন ইতিহাসের পাতা হতে উদ্ধার করে তবেই তাদের জানতে হবে। সাধারণ জ্ঞান দিয়ে আমার মনে হয়েছে সেই যুগের একটি বাস্তব চিত্র যদি বর্তমানের তরুণ-তরুণীদের মানসচক্ষের সামনে তুলে ধরতে পারি তবেই তারা বিপ্লবী যুগের প্রতি আকৃষ্ট হবে।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে বৈপ্লবিক যুগের ঘটনার সমন্বয়ে ইতিহাস লেখা যায়। সেইরূপ ইতিহাস অনেক আছে। ভারতে ইংরেজ শাসন ও সাংবিধানিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবী যুগের ধারাবাহিক বিবরণসহ ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তা কখনই অস্বীকার করা যায় না।

Rowlett Committee Report অনুসরণ করে কেবল সন তারিখ, ঘটনাস্থল, নিহত ব্যক্তি বা রাজনৈতিক ডাকাতি এবং কে বন্দী হ'ল বা মামলায় কার কত বছরের জন্য কারাদণ্ড বা প্রাণদণ্ড হ'ল, সেইরূপ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে সারা ভারতের বৈপ্লবিক যুগের ইতিহাস রচনার বহু প্রচেষ্টা হয়েছে। এইরূপ বিশেষ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্নিযুগের ইতিহাস রচিত হয়েছে। এইপ্রকার প্রতিটি ইতিহাসই তার নিজ সীমাতে আবদ্ধ এবং সেই সীমিত গণ্ডিতে সেগুলি সফলতাও অর্জন করেছে।

পাঠ্যপুস্তক ধরনের ইতিহাস সাধারণভাবে ইতিহাসের ছাত্রদেরই বিশেষ প্রয়োজন। এইরূপ ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমার দ্বিমত না থাকলেও মনে হয় সকল শ্রেণীর ও সকল বয়সের ছেলেমেয়েদের অগ্নিযুগের ইতিহাস জানার জন্য আগ্রহান্বিত করে তুলতে হলে, তাদের জন্য বিগত অগ্নিযুগের ইতিহাস এমন প্রাণবন্ত করে রচনা করা দরকার যাতে তারা স্বাধীনতা যুগের বিবরণ পড়তে উদ্‌গ্রীব ও চঞ্চল হয়ে ওঠে।

উপন্যাস ইতিহাস নয়। বাস্তব ঘটনার সঠিক স্পষ্ট বর্ণনা—অতিরঞ্জিত বা বিকৃত করে পরিবেশিত না হলে তাকে ইতিহাস বলে স্বীকার করতে হবে। উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এইরূপ বর্ণনামূলক ইতিহাসকে উপন্যাস আখ্যা দিয়ে কেউ কেউ হয়ত আত্মতুষ্টি লাভ করতে পারেন। কিন্তু তাতে শুধু ব্যক্তিগত চরিত্রের রিক্ততাই প্রকাশিত হয়।

মহান বিপ্লবীদের চরম আত্মত্যাগ, অপূর্ব বীরত্ব, প্রখর বুদ্ধি ও চাতুর্য এবং শত শত দরদী স্বদেশ-প্রেমিকের বিপদ উপেক্ষা করেও সক্রিয় সাহায্যদানের ইতিহাস যদি কোন সবল হস্তের লেখনীতে রচিত হয় তবে বাস্তবতার ভিত্তিতে তা যে কোন উপন্যাসকেই ম্লান করে দিতে পারে।

আমি উপন্যাস লিখিনি বা উপন্যাসের মত করেও লিখতে চাই নি। বাস্তবতার ভিত্তিতে সত্য ঘটনার বিস্তারিত তথ্যমূলক বর্ণনা দিয়ে সে যুগের বাস্তব চিত্রই আঁকতে চেষ্টা করেছি মাত্র। কোন সমালোচক যদি উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে

অগ্নিযুগের এই অধ্যায়ের ঐতিহাসিক বর্ণনার মধ্যে বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে উপন্যাস আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেন, তবে তাঁদের আত্মপ্রবঞ্চনার আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ কার নেতৃত্বে বা কাদের সংঘবদ্ধ শক্তির দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল সেই ঐতিহাসিক তথ্য অবিস্মরণীয় নেতা সূর্য সেনের (মাস্টারদার) নাম বহন করে আনবে তা সত্য। কিন্তু তার চেয়েও প্রয়োজনীয় সত্য, মাস্টারদার নেতৃত্বের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বৈপ্লবিক সংগঠনের বৈশিষ্ট্য। "যুব-বিদ্রোহ"—১ম খণ্ড রচনার সময় সেই বৈশিষ্ট্যের দিকেই আমি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছি। সেই যুগে সূর্য সেন বিপ্লবের বিভিন্ন স্তর পর্যালোচনা করে Co-relation of class forces সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ধারণা বা শ্রেণী সংগ্রামের গতিপথ বিশ্লেষণ করে বৈপ্লবিক সংগঠন অথবা বৈপ্লবিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তা আমি বলছি না। সেই যুগে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়-স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সত্যাগ্রহ সংগ্রাম এক বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। তারও বহু পূর্ব থেকেই সীমিত দৃষ্টিভঙ্গীর গণ্ডিতে ভারতের বিপ্লবী যুব-সমাজ প্রধানতঃ সন্ত্রাস ও বিভীষিকার সৃষ্টি করেই ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটাতে চেয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বৈপ্লবিক কার্যকলাপের মূল্যবান অতীত অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করেই চট্টগ্রামে মাস্টারদার নেতৃত্বে নতুন চেতনা নিয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিনীর চট্টগ্রাম শাখা গড়ে উঠেছিল। আমি সেই বৈশিষ্ট্যের কথাই মাত্র বলছি। হঠাৎ একটি সুযোগ এসে গেল আর চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ ঘটে গেল—তা মোটেই নয়! বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা ও নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতি থেকে শিক্ষা নিয়ে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিয়ে মাস্টারদা যদি তাঁর নিজস্ব বিশেষ ধারায় সংগঠন পরিচালিত না করতেন তবে অন্য যে কোন বিপ্লবী নেতাই থাকুন না কেন, বৃটিশ সরকার চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহকেও অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিত।

আমাদের সংগঠনের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল—

(১) যে বয়সে লোকেরা সাধারণতঃ সংসারের প্রলোভনে আসক্ত হয়ে পড়ে—বিপ্লবীদলে সেই বয়সের লোকেদের গ্রহণ করার দিকে লক্ষ্য না রেখে অল্পবয়সের তরুণদের নিয়েই সংগঠনের গোড়াপত্তন করা স্থির হয়।

(২) স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মসূচীতে দু'টি পথ, তারমধ্যে একটি স্থির করতে হবে—হয় চরকা নয় তো রিভলভার। মাস্টারদা রিভলভারের কর্মসূচী গ্রহণ করাই শ্রেয় মনে করেছেন।

(৩) সশস্ত্র সংগ্রামের কর্মসূচী যখন সংক্ষিপ্ত না হয়ে পারেনা, তখন বিপ্লবী যুবকদের সংশয়ের মধ্যে রেখে সময় অতিবাহিত করার নীতি বর্জন করে Target period দুই বৎসর স্থির করা হয়। কারণ, বহু বছর ধরে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখবে অথচ

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হতে বিচ্ছিন্ন থাকবে, তা সম্ভব নয়। বাস্তব কর্মসূচীর অভাবে—সেইরূপ বৈপ্লবিক সংঘের অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়ে যায়। বছরের পর বছর অযথা সময় অতিবাহিত করার অন্তর্নিহিত দুর্বলতার উপলব্ধি ছিল বলেই মাস্টারদার নেতৃত্বে যুব-বিদ্রোহের প্রস্তুতি ও অভ্যুত্থানের কর্মসূচীর সময় নির্দ্ধারিত হয় দুই বৎসর।

(৩) বৈপ্লবিক প্রস্তুতির জন্য অর্থের প্রয়োজন। রাজনৈতিক ডাকাতি দ্বারা সে প্রয়োজন মেটানো আমাদের অযৌক্তিক মনে হয়েছে। কারণ, ডাকাতির পর পুলিসের হাঙ্গামা মেটাতে যে পরিমাণ সময় ও শক্তিক্ষয় অনিবার্য তাতে মূল কর্মসূচীই ব্যাহত হয়ে পড়ে। তাই রাজনৈতিক ডাকাতির পরিবর্তে আমরা অভিভাবকদের অজান্তে নিজেদের বাড়ি থেকেই অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছিলাম।

(৫) সংগঠনে পুলিসের চর ও বিশ্বাসঘাতক যাতে কোনমতেই অনুপ্রবেশ করতে না পারে তার জন্য মনোনয়ন পদ্ধতি অত্যন্ত কড়া ছিল। আমাদের শ্লোগান ছিল—দলের মধ্যে একজন অবিশ্বাসীর প্রবেশ অপেক্ষা একশ জন বিশ্বাসী যুবককেও বাদ দেওয়া শ্রেয়। তা'ছাড়া বয়সের কোন্ সীমা পর্যন্ত তরুণেরা সাধারণতঃ সাংসারিক প্রলোভনের উর্দ্ধে থাকে, তা প্রথম থেকেই স্থির করে নেওয়া হয়েছিল।

(৬) গোপনে সর্বক্ষণ পুলিসের গতিবিধির উপর নজর রাখা ও কর্তৃপক্ষকে সম্পূর্ণ ভাবে বিভ্রান্ত করার ব্যবস্থা ছিল। অর্থাৎ, আমরা গোয়েন্দাদের ওপরেও গোয়েন্দাগিরি করতাম।

(৮) সশস্ত্র আক্রমণে অংশ গ্রহণ করতে হলে যেরূপ বৈপ্লবিক মনোবলের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন তার সম্যক্ উপলব্ধি থাকার দরুণ প্রত্যেকের সামনে "মৃত্যু কর্মসূচী" (death programme) রেখে বিশেষ ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। টেবিলে বসে বই পড়েই সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদল তৈরি করা সম্ভব নয়। তাই তরুণদের সঙ্গে পাহাড়ে, জঙ্গলে, মাঠে-ময়দানে নানান বিপদসঙ্কুল কাজে অংশ গ্রহণ করে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

(৯) আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছিলাম, ভুল করেছিলাম কিনা জানি না তবে বাস্তব সত্য এই যে, যুব-বিদ্রোহের প্রথম পর্যায়ে অংশগ্রহণে কোন বিপ্লবী তরুণীকে মনোনীত করা হয়নি। তাঁরা অক্ষম বলে যে তাঁদের বাদ দেওয়া হয়েছিল তা নয়—প্রস্তুতির পথে সংগঠনে নানা বিপর্যয় ঘটার আশঙ্কা থেকেই প্রথম পর্যায়ের সাফল্যের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রথম সারিতে অংশ গ্রহণ করার মত উপযুক্ত করে বোনেদের আমরা শিক্ষা দিইনি।

উপরে লিখিত সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য ও বাস্তবতার ভিত্তিতেই "যুব-বিদ্রোহ" প্রথম খণ্ড লিখতে চেষ্টা করেছি।

ভারতের বিপ্লবী ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, বিগত যুগে গোপন ইন্দো-জার্মান বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র, মেভারিক জাহাজে বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী, প্রভৃতি ব্যাপারে বিপ্লবীরা মহামূল্যের বিনিময়ে নিদারুণ ভয়াবহ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণেব কষ্টিপাথরে মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য যাচাই করে বুঝতে হবে। সামান্য কয়েকটি অস্ত্র নিয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজনমাত্র বিপ্লবীর পক্ষে বিশাল সৈন্য-বাহিনী দ্বাবা সুরক্ষিত শত্রুব অস্ত্রাগার দখল করার একটি সক্রিয় পরিকল্পনা মাস্টারদার নেতৃত্বেই যে সম্ভব হয়েছে, তার বিশেষ দিকটি আমার লেখায় যেন উপেক্ষিত না হয় তার জন্য যত্নবান হতে চেষ্টা করেছি।

আজ প্রায় আটত্রিশ বছর পরে এই মূল বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলতে গেলে, তখনকার বৃটিশ সরকারের প্রচণ্ড শক্তির সম্যক্ উপলব্ধি থাকাও যেমন দরকার, ঠিক তেমনি আবার চট্টগ্রাম বন্দর শহরটিব ভৌগলিক অবস্থান ও তার সামরিক গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত না থাকলেও এই বিশ্লেষণের সঠিক মূল্যায়ণ সম্ভব নয়।

সেই সময়, যুব-বিদ্রোহ বাস্তবে সংঘটিত হওয়ার পূর্বে, যাঁরাই শুনতেন বারোটা রিভলভাব ও পাখী শিকাবের ছ'সাতটি ছর্‌বা বন্দুক নিয়ে মাত্র কয়েকজন বিপ্লবী যুবক চট্টগ্রাম শহর দখল করে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠনের পবিকল্পনা করেছে, তখন তাঁরা সকলেই এইরূপ "চিন্তা"-কে পাগলের প্রলাপ, অর্বাচীনের ক্ষ্যাপামি এবং স্বপ্ন-বিলাসীর বিলাস বলে উপহাস করতেন। কিন্তু এই "অবাস্তব চিন্তাই" কাজে পরিণত হবেছিল। মাস্টাবদার নেতৃত্বেব মূল বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্যের দরুণই ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিনীর চট্টগ্রাম শাখা ভাবতে পেবেছিল ঝটিকাবেগে অতর্কিত আক্রমণে প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী বৃটিশের অস্ত্রাগারগুলি ও শহরটি দখল কবে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার ঘোষণা করা যায়, এবং কেবলমাত্র "চিন্তা" কবেই তারা ক্ষান্ত হয়নি—বাস্তবেও তা সংঘটিত করেছিল।

যুব-বিদ্রোহের প্রথম পর্যায়ে শত্রুপক্ষের প্রধান প্রধান ঘাঁটিগুলি আক্রমণ ও দখল নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্তু শত্রুপক্ষ অতি সামান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই শক্তি সমাবেশ করে অভাবনীয় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আমাদের প্রতি-আক্রমণ করেছে। শত্রুপক্ষের প্রতি-আক্রমণ যদিও সন্দেহাতীত ভাবে বিফল হয়েছে তবুও সাময়িক মানসিক দুর্বলতা ও অনভিজ্ঞতাবশতঃ আমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ি। প্রবল শত্রুর সাহস, সামরিক অভিজ্ঞতা ও তৎপরতার বিষয় উহ্য রেখে বা ক্ষুণ্ণ করে এক তরফা বিপ্লবীদের জয়গান গাওয়া ইতিহাসকে কেবল যে বিকৃত করে তা নয়—তার চেয়েও বেশী নিজেদের দৈন্য প্রকাশ করে! তাই নিজেদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা গোপন করে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পরাজয়কে

অতিরিক্ত করে প্রকাশ করা বিপ্লবী মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করবে ভেবে আমি বর্ণনায় সমতা রাখতে যত্নবান হয়েছি। কিন্তু সরকারী স্বীকারোক্তিতে ঐতিহাসিক জালালাবাদ যুদ্ধে বিপ্লবীদের যে গৌরবোজ্জল জয়ের ভূমিকা এবং শত্রুপক্ষের অসংখ্য সৈন্য সমাবেশের পরেও তাদের শোচনীয় পরাজয়ের যে নির্ভুল সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে, তার বর্ণনা দিয়ে জালালাবাদ যুদ্ধের বাস্তব মূল্যায়ণ করতে পরান্মুখ হইনি। স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে জালালাবাদ যুদ্ধ এক অমর গাথা হিসাবে বিরাজ করছে।

যুব-বিদ্রোহের পরিকল্পনা, আয়োজন ও অভ্যুত্থান কেবল চট্টগ্রামেই সীমাবদ্ধ রইল কেন, সেই সম্বন্ধে বাঙ্গলা ও ভারতে নানা জনের ও নানা বিপ্লবী দলের প্রশ্ন রয়েছে। সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করেছি। কেন আমরা একটি জেলাতেও সফল যুব-অভ্যুত্থান সম্ভব করে তুলতে চেয়েছিলাম এবং মাত্র সেই পরিপ্রেক্ষিতেই কেবল চট্টগ্রামেই যে সক্রিয়ভাবে যুব-বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলাম, তার বাস্তব কারণ ও বিশ্লেষণী যুক্তি দিয়ে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি।

বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল ও সংস্থা এবং বিভিন্ন বিপ্লবীদলের চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় জানবার বিশেষ কৌতূহল ছিল। যেমন— যুব-বিদ্রোহের পরিকল্পনাটি প্রথম কে দিল? পুলিসকে বিভ্রান্ত করাব উদ্দেশ্যে রাজদ্রোহী আইন (Sedition Law) ভঙ্গ করার মিথ্যা প্রচার পত্র দেওয়ার বুদ্ধিটি কার? A.F.I. আর্মারির দুর্ভেদ্য লৌহকপাট মোটরের সাহায্যে ভাঙ্গার অভিনব উপায়টি কে আবিষ্কার করেছিল?

অতি রঞ্জিত গল্পের সঙ্গে এই সমস্ত পরিকল্পনা ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশলের প্রসংশনীয় গৌরব যা আমার প্রাপ্য নয় তাও আমার নামের সঙ্গে জড়িত ছিল। সেই গৌরবের প্রকৃত অধিকারী যেন তার নায্য অংশ হতে বঞ্চিত না হয়, আমার লেখায় সেজন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। বর্তমানে ব্যক্তিগত কারণে অনেকের সঙ্গে অনেক অমিল থাকা সত্ত্বেও সেই যুগে তাদের অবদান সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে আমার লেখায় যাতে কোন কার্পন্য প্রকাশ না পায় সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন নিয়েছি। এ বিষয়ে সফল হ'তে পেরেছি কিনা তা পাঠকবর্গের বিচার্য।

ভারতের ত্রিশ বত্রিশ বছরের বৈপ্লবিক ইতিহাস পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনের পর সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের ভারত ত্যাগে বাধ্য করবার জন্য ব্যক্তিগত সন্ত্রাস সৃষ্টির পরিবর্তে আমরা যুব-বিদ্রোহের পরিকল্পনা গ্রহণ করি। স্বাধীনতা যুদ্ধে এইরূপ কর্মসূচী ও পরিকল্পনার ঐতিহাসিক দাবি ছিল। ১৯৩০ সালে সেই বিপ্লবী দায়িত্ব চট্টগ্রামের যুবকদের উপর ন্যস্ত হ'ল। ব্যক্তিগত সন্ত্রাস সৃষ্টির পরিবর্তে সামান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘবদ্ধ আক্রমণ চালিয়ে শহর দখল করা যে সম্ভব, সেইরূপ বাস্তব নজীর সৃষ্টি করার মধ্যে বৈপ্লবিক

কৌশলের অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সীমিত সফলতার মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের বাস্তব ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়।

গান্ধীজীর অহিংস-নীতি ও মতবাদের সঙ্গে বিপ্লবীদের মূলতঃ প্রভেদ ছিল। আমরা গান্ধীজীর অহিংস-নীতির আড়ালে থেকে ভারতব্যাপী সংগ্রামের প্রস্তুতি ও প্রাথমিক স্তরের অহিংস সত্যাগ্রহ পর্যন্ত রণনীতির সফল প্রয়োগকে বাস্তবতার কষ্টি-পাথরে যাচাই করে নির্ভুল সত্য বলে স্বীকার করি। কিন্তু ভারতব্যাপী জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রাম অহিংস সত্যাগ্রহের গণ্ডিতে সুরু হলেও তা কখনও অহিংস নীতিব অবাস্তব পরিকল্পনার মধ্যে নিবদ্ধ থাকতে পারে না। তাই বাস্তব ক্ষেত্রে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন প্রতিবারই হিংসাত্মক গণবিক্ষোভে ও গণসংগ্রামে পরিণত হয়েছে। এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা গান্ধীজী কখনও উপলব্ধি করেছিলেন কিনা সেই গবেষণা না করেও খুব সহজেই বলা যায় যে, বিপ্লবী নেতারা অন্তত সেই বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে অহিংসা নীতিকে creed হিসাবে গ্রহণ না করে policy (কৌশল) হিসাবে অনুসরণ করাই শ্রেয় মনে করেন।

তাই প্রবীণ বিপ্লবী নেতাদের 'বিরুদ্ধে' আমার লেখার মধ্যে পুঞ্জিত অভিমান ও অভিযোগ প্রকাশ পেয়েছে। তারা অহিংস গণসংগ্রামের শেষ পরিণতি সশস্ত্র ও হিংসাত্মক গণসংগ্রামেব সুযোগ নেওবার জন্য গোপন সশস্ত্র বিপ্লবী-বাহিনী গঠন করেন নি কেন? গণআন্দোলন যখন গণবিক্ষোভে পরিণত হয়, তখন গোপন বিপ্লবী shock troops (ঝটিকা বাহিনী) যদি প্রথম পর্যায়ের অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে সরকারী অস্ত্রাগার প্রভৃতি দখল করে Quit India সংগ্রামের সময় জনগণের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে স্বাধীনতার যুদ্ধকে পরিচালিত করতো, তবে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস অন্যরূপ পরিগ্রহ করতো!

রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের ভয়াবহ রূপটি গান্ধীজী এবং গান্ধীবাদী নেতারা হৃদয়ঙ্গম করে ইংরেজ সরকারের চাইতেও অধিকতর আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। গান্ধীজীর মতবাদের সঙ্গে আমাদের মূলগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও গান্ধীজীর ভারতব্যাপী অহিংস আন্দোলনের বাস্তব ভূমিকা পৃথিবীর ইতিহাসে এক অমূল্য সম্পদ, তা স্বীকার করতে আমরা কখনও কুণ্ঠাবোধ করি নি। তাই গান্ধীবাদী দেশনেতারা আত্মতুষ্টির জন্য যখন ধারাবাহিক বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস ও অবদানের সত্যকে সযত্নে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা পোষণ করেন, তখন তাঁদের মনের দীনতার সমালোচনা করতে ইতস্তত করি নি।

যুব-বিদ্রোহের এই অধ্যায়টি লিখতে গিয়ে এই সব মতবাদ ও বিভিন্ন দলের সাংগঠনিক ব্যাপার নিয়ে থিসিস্ লেখার ইচ্ছে আমার নেই। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘাতের সত্য কাহিনী লেখাই আমার উদ্দেশ্য। তবে আক্রমণ, সংঘাত,

ও যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণমূলক ইতিহাস লিখতে গিয়ে আমি যে দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করেছি, এই লেখাতে পাঠকবর্গ আমার মনের সেই চিন্তাধারার ইঙ্গিতই পাবেন। আমার আর একটি বিশেষ বক্তব্য আছে। কারো কারো মতে—'অতীত ইতিহাস কেবলমাত্র অতীতের গণ্ডিতে থাকাই বাঞ্ছনীয়; লেখকের অভিমত comment, টিকা-টিপ্পনী কেন ইতিহাসের বিষয়বস্তু হবে? যাঁরা কেবল নিছক ঘটনার পরিবেশনের মধ্যেই ইতিহাসকে নিবদ্ধ রেখে অতীতের ঘটনাটি জেনেই সন্তুষ্ট, তাঁদের এইরূপ মনোবাসনার যৌক্তিকতা আমি বুঝি। কিন্তু যাঁরা অতীত ইতিহাস কেবল জানার খাতিরে না জেনে কালের গতির পরিবর্তনের সঙ্গে মিলিয়ে গবেষণা করে ভবিষ্যতের প্রয়োজনে চট্টগ্রাম-যুব-বিদ্রোহের স্বরূপটি বুঝতে চান, তাঁদের জন্য কেবলমাত্র গল্পটা যথেষ্ট নয় বলেই আমার মনে হয়। যুব-বিদ্রোহের ঘটনাবহুল ও বিস্তারিত বর্ণনামূলক ইতিহাস লিখেই আমি সন্তুষ্ট নই। আমি যুব-বিদ্রোহকে কিভাবে দেখেছি এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার নিজস্ব বিশ্লেষণ ও POSITIVE মত প্রকাশ করা কর্তব্য মনে করি। রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র হতে বহুদূরে নিজেকে আবদ্ধ রেখে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করলে যে হাস্যাস্পদ হতে হয়, সেই উপলব্ধি আমার আছে। তবু কোন্ অধিকারে আমার POSITIVE অভিমতগুলি মাঝে মাঝে ব্যক্ত করেছি—এ প্রশ্ন আসা খুবই সাভাবিক।

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে আমি সচেতন। 'প্যারি কম্যুন', মস্কো ইন্সারেক্শান্, অক্টোবর রিভলিউশান, সাংহাই আপরাইজিং প্রভৃতির ইতিহাস বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী নেতাদের লেখার মাধ্যমে পাওয়া যায়। সেই পরি-প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম-যুব-বিদ্রোহকে তুলনামূলকভাবে উপস্থাপন করার মত ধৃষ্টতা আমার নেই। পৃথিবীর বহু বিপ্লবী অভ্যুত্থানের ইতিহাসের ভিত্তিতে চট্টগ্রাম-যুব-বিদ্রোহের সীমিত বৈশিষ্ট্য বুঝতে চেষ্টা করেছি এবং যখন যুব-বিদ্রোহের ইতিহাস লেখার ভার আমার উপর এসে পড়লো, তখন মাঝে মাঝে সেইরূপ চিন্তাধারাগুলিই আমার মন্তব্য আকারে দেখা দিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক মন্তব্য প্রকাশের অধিকার যখন গ্রহণ করেছি, তখন দায়িত্ব অবহেলা করার শক্তি আমার কোথায়?

অগ্নিযুগের বিশেষ একটি অধ্যায়ের সঙ্গে আমি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলাম। ইতিহাস যে ভাবে লেখা আমি প্রয়োজন বলে মনে করি, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি ইতিহাস রচিত হয় তবে আমার মতে তা একজনের কাজ নয়। যাঁরা বিপ্লবীযুগে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদেরই তা লিখতে হবে। সেই দিক থেকে বিচার করলে আমার লেখা এই ইতিহাস অত্যন্ত সীমাবদ্ধ—যেটুকু নির্ভুল ভাবে আমার নিজের জানা আছে—মাত্র সেটুকু! অকপটে স্বীকার করছি এই অধ্যায়টিও আমার লেখার কথা নয়।

মামলা চলাকালে জেল হাজতে যখন ফাঁসির হুকুম শোনার প্রতীক্ষায় দিন গুনছিলাম, তখন 'The Sword' শিরোনামায় একটি ইংরেজী কবিতা লিখেছিলাম। আমার বক্তব্য ছিল—'অসির প্রাধান্য'। তারপর আন্দামান সেলুলার জেলের অভ্যন্তরে—দ্বীপান্তরে নির্বাসিত আমাদের চব্বিশজনের প্রথম দলটি একটি সভায় মিলিত হয়। সেই সভাতে আমাকেও একটি বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। সেই বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'মসী অপেক্ষা অসির প্রাধান্য'—'শত্রু বিনাশের পূর্বে আমার অসি কোনমতেই কোষবদ্ধ হতে পাবে না… !' কিন্তু সেই আমিই যে এই ভাবে অগ্নিযুগের বিস্তারিত ইতিহাস লিখবে—আমার জীবনে এও এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা! আমার পরিবর্তে আমার বন্ধু শ্রীগণেশ ঘোষ অগ্নিযুগের এই অধ্যায়টি রচনার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলে পাঠকবর্গ আরো অনেক বেশি উপকৃত হতেন বলেই আমার বিশ্বাস।

আমার নিকটতম ভাইবোনেরা ও শুভাকাঙ্খীরা অগ্নিযুগের এই বিশেষ অধ্যায়টি লেখবার জন্য সব সময় যদি আমাকে তাগাদা ও উৎসাহ না দিতেন তবে এই লেখার কাজ আমাকে দিয়ে কোনদিনই সম্ভব হ'ত না। তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহবাণী ও জরুরী চাহিদাই আমাকে যুব-বিদ্রোহ বইটি লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তার জন্য এঁদের কাছে আমি চিরঋণী। আরো একজনের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই—এই বিশেষ অধ্যায়টি বাঙ্গলায় লিখতে তিনিই আমাকে বাধ্য করেছেন। তাঁরই অনুরোধে সব সঙ্কোচ কাটিয়ে এই আমার প্রথম বাঙ্গলা লেখা। এঁরা সকলেই আমার নিকটতম স্নেহের পাত্র-পাত্রী। এঁরা চান না—আর আমিও চাই না—আনুষ্ঠানিকভাবে এঁদের নাম করে কৃতজ্ঞতাস্বীকারে পরস্পরের গভীর সম্পর্কের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করি।

মহাজাতিসদন এই পুস্তকের কলেবর পূর্ণ করবার জন্য শহীদদের ব্লক দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন—তার জন্য তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার বন্ধু শ্রীযুত পরেশচন্দ্র মৈত্র এই পুস্তকটি সত্বর প্রকাশিত হওয়ার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করেছেন, তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

এই বইটির প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের সর্বসত্ব মেসার্স সেন এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক সংরক্ষিত।

আমার নিতান্ত আপনজন ও সুহৃদ শ্রীযুক্ত গোপাল দাসগুপ্ত নিঃস্বার্থ ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে না এলে "যুব-বিদ্রোহ" গ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রন ও প্রকাশনা এত অল্প সময়ের মধ্যে কোন মতেই সম্ভব হ'ত না। এই জন্য আমি তাঁর কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

অনন্ত সিংহ

"...'Insurrection is an art just as is war or any other form of art. It is subject to certain rules, the non-observant of which leads to the ruin of the Party, which is to blame for neglecting them. These rules, being logical deductions from the nature of these parties and from the circumstances with which one has to deal in such a case are so simple that the short experience of 1848 had made the Germans pretty well-acquented with them. Firstly, never play with insurrection if there is no determination to drive it to the bitter end (literally to face all the consequences of this play). An Insurrection is an equation with very indefinite magnitude, the value of which may change everyday. The forces to be opposed have all the advantages of organisations, discipline and traditional authority' (Marx has in mind the most difficult case of insurrection against a firmly established old power, against an army that had not yet decayed under the influence of the revolution and the vaciliating policy of the Government).

'If the rebels can not bring greater forces to bear against their antagonists, they will be smashed and destroyed. Secondly, the insurrection once started, it is necessary to act with the utmost determination and to pass over to the offensive. The defensive is the death of (every) armed rising, it perishes before it has measured forces with the enemy. The antagonists must be surprised while their soldiers are still scattered, and new successes, however small, must be attained daily ; the moral ascendency given by the first success of the rising must be kept up. One must rally to the side of the insurrection the vaciliating elements, which always look out for the safer side. Force your enemies to retreat before they can collect their forces against you. In one word, according to the words of Danton—the Greatest Master of Revolutionary Policy yet known—'Audasity, Audasity, and yet Audasity'."

Revolution and Counter Revolution

German Edition—*Marx.*

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের মহানায়ক সূর্য সেন।

যুব-বিদ্রোহের ৪ বৎসর পরে বন্দী হন ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯৩৪ সালে ১২ই ডিসেম্বর চট্টগ্রাম জেলে তাঁর ফাঁসী হয়।

শহীদ অমরেন্দ্র নন্দী।
২৪.৪.৩০ তারিখে ফিরিঙ্গী-বাজারে সশস্ত্র পুলিশ ফৌজের সহিত যুদ্ধে আত্মসমর্পনের পরিবর্তে স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন করেন।

শহীদ ত্রিপুরা সেন।
২২. ৪. ৩০. তারিখে জালালাবাদ পাহাড়ে বৃটিশ ফৌজের সহিত সম্মুখ-সমরে নিহত হন।

১৮ই এপ্রিল—১৯৩০ সাল—ভোর সাড়ে পাঁচটা।

নির্দেশ অনুযায়ী ভারতের গণতন্ত্রবাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার চৌষট্টিজন বিপ্লবী সৈনিক শয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়ল। এখনও পূব আকাশ লাল করে সূর্য ওঠে নি। আজ কেবল আকাশ লাল করেই সূর্য উঠবে না, চট্টগ্রামের মাটিও বৃটিশ শত্রুর রক্তে রাঙা হয়ে উঠবে। বিপ্লবীরা আজ বুকের তাজা রক্তে দেশমাতৃকার পূজার অর্ঘ্য সাজাবে। তারা আজ নবারুণ ভাস্করের প্রতি প্রণাম জানিয়ে অন্তরে মৃত্যুপণ প্রতিজ্ঞার অমোঘ বাণী ধ্বনিত করে তুলবে।

পূর্বাকাশে ভাস্কর দীপ্যমান হ'ল। দৃঢ়সংকল্প চৌষট্টিজন নওজোয়ান আকাশের দিকে তাকিয়ে একই সময়ে নিভৃত ক্ষণে শপথ নিল—পণ আমাদের মৃত্যু! সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শত্রু, তোমার ক্ষমা নেই। দয়া নেই মায়া নেই আপোষ নেই। দুর্জয় প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠুক। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী অনুচরদের বুকের রক্তে আজ জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। দেশমাতৃকার চরণে প্রার্থনা জানালাম - মাগো! আমাদের শক্তি দাও, সাহস দাও—শত্রুনিধনের বল দাও। চৌষট্টিজন দৃঢ়সংকল্প নওজোয়ানের দ্বি-চৌষট্টি সবল বাহু উর্ধ্বে উত্তোলিত হ'ল, চৌষট্টি জোড়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ চক্ষু প্রজ্বলিত হয়ে উঠল, চৌষট্টিটি বিপ্লবী হৃদয়ে এক তান ধ্বনিত হ'ল—

"জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন।"

১৮ই এপ্রিল। মহানায়ক সূর্য সেন ও তাঁর তেষট্টিজন তরুণ সৈনিক নতুন সূর্যকে অভিনন্দন জানালেন—জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে একযোগে অন্তরের নিভৃতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন—

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।"

আজ যে আমাদের নিঃশেষে প্রাণ দান করবার দিন! এই দিনটিকে স্বাগত জানিয়ে আজ আমরা মৃত্যুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত—আজ মরণপণ করে আমরা এগিয়ে যাবো শত্রুশিবির লক্ষ্য করে!

১৮ই এপ্রিলের সূর্যাস্তের পর আবার আকাশ রাঙিয়ে সূর্যোদয় হবে—কিন্তু সেই সূর্যকে স্বাগত জানাতে আমরা কি আগামীকাল বেঁচে থাকব? আমাদের পার্থিব

জীবনে আজ নিশীথে মৃত্যুর হাত ধরে চির অন্ধকার রাত্রি এগিয়ে আসবে। তবু জানি, সেই অন্ধকার নিরেট নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নয়। চরম স্বার্থত্যাগ—দেশমাতৃকার পুজায় চরম আত্মত্যাগ মিথ্যা হবে না। স্বদেশপ্রেমের চিরভাস্বর উজ্জ্বল আলোক শিখা অন্ধকার দূর করে দেশবাসীর চোখের সামনে সুদূর দিগন্তে অরুণোদয়ের রেখা এঁকে দেবে।

আমার লেখা পড়ে মনে হবে কবিতা করছি—লেখার মাধুর্যের জন্যই যেন কবিত্বের প্রয়োজন—তাই এই 'কাব্য'। শুধু কাব্য কেন, জালালাবাদের বীরদের নিয়ে মহাকাব্য রচনাও অসম্ভব নয়। কিন্তু আমার শক্তি সীমাবদ্ধ—আমি সেই দায়িত্বের কথা ভাবতেও পারি না। আমার কবিত্ব করবার ইচ্ছেও নেই—কাব্য আমার আসেও না। তবে বাস্তবকে প্রকৃতভাবে প্রকাশ করতে অনেক সময় প্রয়োজন হয় কাব্যের—মহাকাব্যের। ভবিষ্যতেব আশায় থাকব—কেউ হয়ত সেই অভাব দূর করবেন। বর্তমানে আমার এই সামান্য লেখার মাধ্যমে মৃত্যুসঙ্কল্পে অটল যুববিদ্রোহের তরুণ সৈনিকদের মানসিক প্রতিক্রিয়া বোঝা খুবই কঠিন—আব মাত্র বারো-চোদ্দ ঘণ্টার মধ্যে যাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত তাদের মানসিক অবস্থার সামান্য একটু আভাস মাত্র আমি দিতে চেষ্টা করেছি।

যাঁরা জীবনে সর্বপ্রথম সভা-মণ্ডপে বক্তৃতা দিতে উঠেছেন বা স্টেজে সর্বপ্রথম অভিনয় করতে নেমেছেন বা মুষ্টিযুদ্ধে প্রতিযোগিতা করেছেন, তাঁরাই জানেন ক'দিন আগে থেকেই, বিশেষ করে সেই দিন সকাল থেকে, কতবার তাঁরা অন্য-মস্ক হয়েছেন—কি একটা অজানা আশঙ্কায় থেকে থেকে বুকের ভেতর কাঁপুনি অনুভব করেছেন। সারাটা দিন ধরে কণ্ঠের শুষ্কতা দূর করতে কতবার জল খেয়েছেন, শরীরের উত্তাপ কতখানি বেড়ে গিয়েছিল—যেন সারাক্ষণই জরভাব; একটু চিন্তা করিলেই পাঠকবর্গের পক্ষে, যাঁদের এই ধরণের অভিজ্ঞতা আছে, অনুভব করা কঠিন হবে না যে, সুনিশ্চিত মৃত্যুর ক'টি ঘণ্টা আগে তাঁদের কি ভীষণ উৎকণ্ঠা ও নিদারুণ মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ার কথা।

যুদ্ধ-প্রাঙ্গণের বাস্তব চিত্র বহুদিন আগে থেকেই আমরা মানসপটে এঁকেছি। ভয় আমরা করব না—ভয় আমরা করি না—প্রাণ দেওয়া আমাদের কাছে অতি তুচ্ছ! তবু যেন কিসের একটা ভয়—কিসের একটা শিহরণ, কম্পন—কি একটা বাসনা—মরণ ওগো মরণ! তুমি যখন আসবেই তবে আর একটু দেরিতে এসো, আর সামান্য একটু বিলম্ব কর! অদ্ভুত মানসিক প্রতিক্রিয়া—না, অদ্ভুত নয়, অসামান্য বৈপ্লবিক চরিত্রেও এটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

এই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে মানসিক প্রস্তুতি প্রতি মুহূর্তে প্রয়োজন। যতই যুদ্ধের সময় এগিয়ে আসে ততই বিভিন্ন মানসিক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে

হয়। অভিজ্ঞতায় সাহায্যে জেনেছি, শেষ মুহূর্তের বিরূপ প্রতিক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রে সাহসের অভাব ঘটায়—মনোবল ভেঙে দেয়—মরণ-পাগল বিপ্লবীরও দেখেছি বাঁচবার জন্য কত আকাঙ্ক্ষা, কত চেষ্টা!

এই পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে—আমরা ১৮ই এপ্রিল ভোর থেকে বহুবার নিজ নিজ মনে শপথ গ্রহণ করেছি, কখনও বা একে অন্যের কাছে শ্লোগানের মত বৈপ্লবিক বাণী এবং উদ্দীপক ইংরেজী ও বাংলা কবিতা সরবে আবৃত্তি করেছি। মাঝে মাঝে দৃঢ়ভাবে হাত মুষ্টিবদ্ধ করেছি বা কোন সময়ে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সবকারের ধ্বংস, মেঝেতে পদাঘাত করে বন্ধুদের কাছে ঘোষণা করেছি। এই সব বাড়াবাড়ি মনে হলেও, নেহাৎ নাটকীয় ব্যাপার বলে প্রকাশ পেলেও, বাস্তব জীবনে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়াব কয়েক ঘণ্টা পূর্বে আমরা নিজেদের মধ্যে 'অভিনয়' করেছি। স্টেজে অভিনয় দেখে ক্ষণিকের জন্য হলেও প্রেরণা অনুভব করা যায়। মৃত্যুপণ করাব পর আমরা যে 'অভিনয়' করেছিলাম তার মধ্যে সত্য ছিল—সেই সত্য অভিনয় অন্তরে আগুন প্রজ্বলিত করতে সাহায্য কবেছে, প্রেরণা দিয়েছে, সাহস যুগিয়েছে—বল দিয়েছে।

সেই দিন ভোরে ঘুম থেকে ওঠার পর কে কি ভেবেছিলেন তা ঠিক করে বলতে পাবব না। মাস্টারদার মনে কি হচ্ছিল? অম্বিকাদা, নির্মলদা কি ভাবছিলেন? লোকনাথ ও অন্যান্য তরুণ সাথীরা কিসের চিন্তায় অভিভূত ছিলেন? গণেশ—সেও কি আমার মত মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিল এবং আজকের যুব-বিদ্রোহের সূচনা ও পরিণতির কথা একইভাবে অনুভব করতে চেষ্টা করছিল? প্রত্যেকের কথা বা চিন্তাধারা অপরে কি করে বলবে? আমি নিজেও কি নিজের কথা সবটুকু প্রকাশ করতে পারব—সূক্ষ্মতম সহস্র প্রতিক্রিয়ার কথা? তবে নিজের মন দিয়ে বিচার করে দু'বছরের ঘনিষ্ঠ বিপ্লবী সাথীদের মনের পরিচয় মোটামুটিভাবে দেওয়া বোধ হয় খুব শক্ত নয় এবং তা নির্ভুল হওয়াই সম্ভব।

ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে নির্দেশ অনুসারে আমরা তৈরি হয়ে গেছি। অনেক কাজ—ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় করতে হবে। যার যে কাজ সে তা' করবে। আমি প্রস্তুত হয়ে ড্রয়ার খুলে আমার গুলীভরা পিস্তলটি কোমরে গুঁজে নিলাম। এ তো চার পাঁচ মাস ধরেই চলছে, তবে আজ পিস্তলটি নেওয়ার সময় শিহরণ জাগল—আপনা থেকেই আমার হাত মুষ্টিবদ্ধ হল। আশ্চর্য! মনে মনে বললাম—"আর দেরি নেই; কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী দস্যু—সাবধান! তোমার মাথার ওপর ন্যায়ের দণ্ড নেমে আসছে। এবার আর তোমার রক্ষা নেই—ক্ষমা নেই!"

মোটর গ্যারেজের দিকে এগিয়ে গেলাম। প্রতি পদক্ষেপে চ্যালেঞ্জের ভাব।

'বেবী-অস্টিন'—২৪৪৪ নম্বরের সেই ঐতিহাসিক বেবী-অস্টিন, টিউন করে বার করলাম। চট্টগ্রাম শাখার গণতন্ত্রবাহিনীর সুবিখ্যাত ২৪৪৪ নম্বরের বেবী-অষ্টিন যুব-বিদ্রোহের শেষ দিন ও শেষ সময় পর্যন্ত বিপ্লবীদের একজন বিশ্বস্ত অনুচরের মত নিঃশব্দে সব কাজ সম্পন্ন করেছে। গণতন্ত্রবাহিনীর এই 'বেবী-অস্টিন' প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর যুদ্ধ-জাহাজ 'এমডেনের' মত শত্রুপক্ষকে বিব্রত করেছে বিভ্রান্ত করেছে। তরুণ পাঠকেরা ১৯১৪—১৮ সালের জার্মান ক্রুজার—'এমডেনের' কথা হয়ত জানেন না। সেই সময় 'এমডেন' রূপকথার এক নায়ক। প্রতিদিন সংবাদপত্রে 'এমডেনের' চমকপ্রদ খবর পাওয়ার জন্য পাঠকবর্গ উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। কোথা থেকে কোন অবস্থায় তার উদয় হবে আগে থেকে কেউ তা জানতে পারত না। বৃটিশ, আমেরিকা ও ফ্রান্সের সামুদ্রিক এলাকায় "বেশ পরিবর্তন" করে 'এমডেন' অবাধে বিচরণ করে ক্ষিপ্রগতিতে আক্রমণ চালিয়ে মিত্রপক্ষের সামরিক ঘাঁটি, মালবাহী বা যুদ্ধজাহাজকে বিধ্বস্ত করে নিমেষে উধাও হোত। পাঁচ ছয় ঘণ্টার মধ্যে অনায়াসে চলন্ত অবস্থায় 'এমডেন' বং বদলাত। তাব চোঙা (Funnel) স্থানচ্যুত করার ব্যবস্থা ছিল, এখন একটা চোঙা দেখা যাচ্ছে আবার কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল দুটো বা তিনটে চোঙা। 'এমডেনেব' রূপকথা ছেলেবেলায় আমাদেব আকর্ষণ করেছিল। তাই ভবিষ্যৎ জীবনে আমাদেব 'এমডেন'—২৪৪৪ নম্বরেব বেবী-অস্টিনটি, রং বদলে হুড পালটে, টায়ার বদলে বৃটিশ পুলিশের কড়া নজর এড়িয়ে তার গতিবিধি সযত্নে গোপন বেখেছিল। আজ সেই দিনের কথা বলতে গিয়ে চৌষট্টিজন প্রাণচঞ্চল বিদ্রোহী যুবকের সাথে পর হস্তচালিত ঐ জড় পদার্থ— বেবী-অস্টিনটির কথা, সমান গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করলাম; তা না করলে আমার ইতিহাস বর্ণনায় ত্রুটি থেকে যাবে।

গাড়িটি নিয়ে একা বেরিয়ে পড়লাম। চট্টগ্রামের আঁকা-বাঁকা পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে সরু রাস্তা ধরে চলেছি। কমিশনার সাহেবের বাংলোর টিলার তলা দিয়ে ঘুরে ছোট্ট সরু গলিতে গিয়ে পড়লাম। এঁকে বেঁকে যেখানে গিয়ে গাড়িটা থামালাম, তার পাশে একটি খড়ের ঘর। গাড়ি থেকে নেমে দরজায় ঘা দিলাম —বার বার তিন বার। দরজায় খিল দেওয়া ছিল না, ভেতরে ঢুকলাম।

আমি তখন যেন অন্য জগতের মানুষ। আজ যে কাজ করতে যাচ্ছি তার উত্তেজনা আমার ভাবে ভঙ্গীতে, চোখের দৃষ্টিতে, প্রতিটি পদক্ষেপে যেন ফুটে উঠেছিল—আজ আমি শুধু একজন মানুষ নই, সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহের সৈনিক— মরণ-পণে আবদ্ধ।

দরজা খুলে সেইরূপ দৃপ্ত পদে ঘরে ঢুকলাম—নিজের বেপরোয়া সৈনিকোচিত মনোভাব গোপন করলাম না। নির্জন ঘরে খাটের ওপর প্রতিদিনকার অভ্যস্ত

ভঙ্গীতে বসে আছেন মাস্টারদা—ধীর শান্ত গম্ভীর। তাঁর মুখে গভীর প্রশান্তি দেখে কে অনুমান করতে পারবে তাঁর অন্তরে আগ্নেয়গিরির জ্বালা? বিস্ফোরণের পূর্ব মুহূর্তে বারুদের স্তূপ যেমন শান্ত স্থির নিশ্চল হয়ে ঘুমিয়ে থাকে, ঝড়ের আগে সমস্ত পৃথিবী যেমন নিশ্চুপ হয়ে যায়—তেমনি ১৮ই এপ্রিলের প্রত্যূষে অতলস্পর্শী সমুদ্রের মত, গগনচুম্বী হিমাদ্রি শিখরের মত ধীর স্থির, শান্ত, অচঞ্চল হয়ে বসেছিলেন মাস্টারদা—যুব-বিদ্রোহের মহানায়ক সূর্য সেন!

আমাকে দেখে তাঁর চোখ মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সমস্ত মুখে প্রশান্ত হাসি নিয়ে আমাকে বসতে বললেন। আমাব চোখে মুখে যে উত্তেজনার আভাস প্রকাশ পাচ্ছিল তা তাঁব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সহজেই ধবা পড়ল। একটু মৃদু হেসে বললেন—"মনে হচ্ছে আজ তুই খুব উত্তেজিত।" সত্যি, আমাকে দেখে যে-কেউই বলবে আমি খুব উত্তেজিত। ইচ্ছে করেই আমি নিজেকে গোপন করছিলাম না। ভেবেছিলাম সবারই আজ আক্রমণেব জন্য 'উত্তেজনাপূর্ণ মনোভাব' রাখা উচিত। কিন্তু মাস্টাবদা কেন আমাকে ওই ভাবে ইঙ্গিত কবলেন তা আমি ঠিক বুঝি নি। আমি উত্তর দিলাম—

"আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র বাকি। মনকে প্রস্তুত কবে নিচ্ছি। আপনার তো অজানা নেই মাস্টারদা, শত উত্তেজনাতেও পিস্তলেব ট্রিগারে আমার আঙুল স্থির হয়ে থাকে—তবু নিজের ইচ্ছাব বিরুদ্ধে বা বিনা প্রয়োজনে কখনো গুলী বেরোয় না।"

মাস্টারদা আমাকে নিরুৎসাহ করলেন না। সেদিন শারীরিক উৎকর্ষেব চাইতে মানসিক শক্তির প্রাধান্যেব কথা বলে পরিবেশ ভাবাক্রান্ত কবতেও চাইলেন না। তিনি বুঝেছিলেন কর্মদক্ষতা ও শাবীরিক শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন আজই সবচেয়ে বেশি। কেবল মানসিক শক্তিব কাজ নয়—শত্রুব চাইতে অধিক শক্তি নিয়ে বিপ্লবী সৈনিককে প্রস্তুত হতে হবে—শত্রুকে আক্রমণ কবতে হবে—শত্রু-শিবির ধ্বংস করতে হবে। তাই তিনি আমার এই "যুদ্ধং দেহি" ভাবের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখালেন না—উৎসাহ দিলেন।

তিনি আমার কাছে এগিয়ে এলেন। একদৃষ্টিতে মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন কবলেন—

"ছাখ্, ১৯২২ সালে ওরা ডিসেম্বর তুই দৃঢ়তা ও আত্ম-প্রত্যয় নিয়ে বলেছিলি রেল কোম্পানীর টাকা সফল্যেব সঙ্গে ডাকাতি কবে নিয়ে আসতে পারবি। সফলও হয়েছিলি। আজ আমি আবার জিজ্ঞাসা করছি—তুই বল্, আজকের অভিযান সফল হবে তো?"

প্রস্তুতি চলাকালে গত দুটি মাসে মাস্টারদা খুব কম পক্ষে অন্তত দশবার

আমাকে এই একটিই প্রশ্ন করেছেন। আজ শেষ দিনে আবার সেই একই প্রশ্ন—'রেলের ডাকাতি যেরূপ সফল হয়েছিল আজও সেইরূপভাবে জয় সুনিশ্চিত কি?' এক-একটি ঘণ্টা অতিক্রান্ত হচ্ছে আর এই একটি প্রশ্ন ঘুরে ঘুরে আমাদের পাঁচজনের মনেই উঠছে—সামগ্রিক আক্রমণ সফল হবে তো? একই রকম উৎকণ্ঠা নিয়ে মাস্টারদা আমাকে আজও আবার সেই প্রশ্নই করলেন। আমি উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম। মাস্টারদা আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, যেন চট করে উত্তর না দিয়ে ভাল করে ভেবে জবাব দিই।

মাস্টারদার মনে যে কি ঝড় বইছে তা আমি বেশ অনুভব করতে পারছিলাম। ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার প্রেসিডেণ্ট - সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহের প্রধান নায়ক সূর্য সেন, যাঁর নেতৃত্বে আজ নির্ভীক মরণজয়ী একদল যুবক আত্ম-বলিদানে উদ্যত, তার গুরুদায়িত্ব অভ্যুত্থানের পূর্ব মুহূর্তেও তাঁকে বিচলিত করেছে। তাই সৈনিকের কাছে তাঁর প্রশ্ন—"সফল হবে তো?"

প্রতিটি কথায় সাধ্যমত জোর দিয়ে উত্তর দিলাম—

"মাস্টারদা, সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলছি, শহর আমরা অধিকার করবই। আমাদের শক্তিকে বাধা দেবার সাধ্য কারও নেই। ঝটিকা-বাহিনীর তড়িৎ আক্রমণের আঘাতে শত্রুর সব ঘাঁটিগুলি আমাদের অধিকারে আসবেই। আমাদের ছোট ভাইরাও সু-শিক্ষিত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—জয় সম্বন্ধে তারাও সুনিশ্চিত। মাস্টারদা আপনার সংশয়ের কোন কারণ নেই।"

মাস্টারদার সেই চিরদৃপ্ত চোখ দুটি একবার জ্বল জ্বল করে উঠল। তারপর, আমার হাত চেপে ধরে অত্যন্ত মৃদু স্বরে, যেন নিজের মনে মনেই প্রশ্ন করলেন—"যদি সব ফাঁস হয়ে যায়? যদি ভেতর থেকে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে? সেই আশঙ্কা কি নেই?" স্বগতোক্তি শেষ করে আমার মুখের দিকে তাকালেন—যেন এই কঠিন সমস্যা সম্বন্ধে আমার অভিমত শুনতে চাইছেন।

আক্রমণ চালাবার ঠিক পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই একটি প্রশ্নই আমাদের পাঁচজনের মনকে সারাক্ষণ বিচলিত করেছে—উৎকণ্ঠায় রেখেছে। বিপ্লবীদের অশুভ অতীত ইতিহাস বড়ই পরিতাপের। যতীন মুখার্জি সাথীদের সঙ্গে বালেশ্বর সমুদ্র উপকূলে গেলেন "মেভারিক" জাহাজ বোঝাই জার্মানীর অস্ত্র কূলে নামিয়ে নিতে। এল না "মেভারিক", পেলেন না অস্ত্র! দেখা পেলেন স্যার চার্লস টেগার্টের নেতৃত্বে বৃটিশ সৈন্যদলের! ১৯১৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী সারা ভারতব্যাপী বৈপ্লবিক উত্থানের দিন ধার্য ছিল। ঠিক ছিল সৈন্যদের নিয়ে বিদ্রোহ আরম্ভ হবে। রাসবিহারী বসু ও বিষ্ণুগণেশ পিঙ্গলের নেতৃত্বে লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে বিদ্রোহ সুরু হওয়ার কথা। আগের দিন, অর্থাৎ ২৩শে ফেব্রুয়ারী, 'গোপন'

সংবাদ পেয়ে পুলিশ ব্যারাকের মধ্যেই পিঙ্গলেকে বোমা সমেত গ্রেপ্তার করা হ'ল। পিঙ্গলের ফাঁসি হল। রাসবিহারী বসুর ভারতময় সৈন্যদের নিয়ে বিদ্রোহের আয়োজন এইভাবে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল। কাজেই শেষ মুহূর্তে আমাদেরই বা কি হবে—শত সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও কোনও ছিদ্র দিয়ে পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায় নি তো - পুলিশ শেষ মুহূর্তে আমাদের ফাঁদে ফেলবে না তো? এইরূপ চিন্তায় আমরা অস্থির ছিলাম।

মাস্টারদার প্রশ্নের উত্তর আমার ভেবে দিতে হবে। খুব ভেবেই উত্তর দিলাম—

"আমার মনে হয় গুপ্তচর বিভাগের চোখে আমরা ধূলো দিতে সক্ষম হয়েছি—তারা বিভ্রান্ত হয়ে অন্য পথে চলেছে। ওৎ পেতে আছে ২১শে তারিখের পরে রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতা দিলে আমাদের গ্রেফ্‌তার করবে।"

মাস্টারদা তবু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। খুব ধীরে ও অতি মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—"তুই কি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিস আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে পুলিশের গুপ্তচর কেউ নেই?" কি নিদারুণ প্রশ্ন! এইরূপ সাংঘাতিক প্রশ্ন মনে ওঠাই উচিত নয় বলে হয়ত কেউ উড়িয়ে দিতে চাইবেন। আমাদেব পাঁচজনের বাইরে যদি কেউ পুলিশের চর হোত তবে সে কতটুকু অনিষ্ট করতে পারত? খুব বেশি হলেও সে বলতে পারত যে দু-তিনজনের সঙ্গে মিলে সে কোন একটি অ্যাকৃশনে যাবে। তার চেয়ে অধিক বলা কোন সাধারণ সভ্যের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই মাষ্টারদার প্রধান চিন্তা, কেন্দ্রীয় কমিটির আমরা পাঁচজন ঠিক আছি কি না! হয়ত তিনি সেইরূপ প্রশ্ন করে আমাকেও যাচাই করে নিতে চেয়েছিলেন—দেখছিলেন আমার তাতে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। আমাদের পাঁচজনের মধ্যে পরস্পরের এত জানা-শোনা, এত দিন ধরে এক সঙ্গে প্রস্তুতির কাজ করেছি—কোন দিনই তো বিশ্বাসঘাতকতার কোন চিহ্ন দেখি নি। তবে এত পরীক্ষা, এত ঘনিষ্ঠতার পরও কি মাষ্টারদার এইরূপ প্রশ্ন করার কোন বাস্তব যুক্তি ছিল? অতীত বিপ্লবী ইতিহাসের ধারাবাহিক তথ্যাদি নিয়ে আমরা গবেষণা করেছি বলে পার্টির সাধারণ সভ্যের চাইতে দলনেতাদের ওপর বিশেষ দৃষ্টি রাখাই আমরা বেশি প্রয়োজন বলে মনে করতাম। আমাদের মধ্যে যদি কেউ জানত মাষ্টারদা কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করেছেন তবু কেউ অসন্তুষ্ট হতো না। অবিশ্বাস করেই যে ঐরূপ প্রশ্ন করতে হবে তা নয়—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে উৎখাত করার জন্য ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠনে নীতিগতভাবে দলের কোন সভ্য পুলিশের গুপ্তচর কি না এই প্রশ্নের দরবারে, সে যেই হোক না কেন, তাকে উপস্থিত হতেই হবে। তাই মাস্টারদা এইরূপ প্রশ্নের আলোচনা করা অন্যায় মনে করেন নি—প্রয়োজন মনে করেছিলেন।

আমরা সব সময় সতর্ক ছিলাম যাতে পুলিশের ফাঁদে ধরা পড়ে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা হাস্যকর ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয়। তাই সেই দিনের আক্রমণের পূর্বাহ্নে মাস্টারদার মনে এই প্রশ্নই বারে বারে আঘাত করেছে - নিজের মনে নিজেকেই প্রশ্ন করেছেন—"কেন্দ্রীয় কমিটির কারও দ্বারা কি বিশ্বাসভঙ্গের সম্ভাবনা আছে? পুলিশের জালে ধরা পড়ব না তো? সফল হবে তো সমস্ত আয়োজন?"

ভেবে আমাকে উত্তর দিতে হবে। চৌষট্টিজন নির্ভীক দৃঢ়চেতা বিপ্লবী যুবকের প্রত্যেকের মুখ আমার মনের আয়নায় খুঁটিয়ে দেখলাম। তারপর ধীরে ধীরে মাস্টারদাকে আমার অভিমত জানালাম—

"না, এখন পর্যন্ত সন্দেহ করার মত কিছু নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের সংগঠনে গুপ্তচরের অনুপ্রবেশ সম্ভব হয় নি। কেন্দ্রীয় কমিটির ওপর আমার প্রখর দৃষ্টি আছে। আমার ওপরও তাদের দৃষ্টি রাখবার কথা। সব দিক বিবেচনা করে আমার বিশ্বাস পুলিশের কানে এখনও কিছু পৌঁছয় নি। আমরা নিশ্চয়ই সফল হব।"

মাস্টারদা আমার হাত ধরে খুব ঝাঁকানি দিলেন। তাঁর আনন্দ ও উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ মাত্র এইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এবার আমি বিদায় নেব। উঠে পড়লাম। আমার সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে মাস্টারদা আবার প্রশ্ন করলেন—

—"নতুন গাড়িটা কখন ডেলিভারি দেবে?"

—"সকাল ন'টা নাগাদ। অম্বিকাদাকে নিয়ে গাড়িটা আনতে যাব।"

মৃদু হাসি বিনিময়ের পর আমি মাস্টারদার কাছ হতে বিদায় নিলাম। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে গণেশের বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটলাম। ঠিক সাতটা নাগাদ গণেশের বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। আমাকে দেখেই গণেশ উৎসাহের সঙ্গে 'সম্ভাষণ' জানাল— "হ্যালো মার্শাল!" খুব হাসি ও আমোদের মধ্যে পরস্পরে 'সম্ভাষণ' ও 'অভিবাদন' বিনিময় করলাম।

তারপর আমরা দুজনে ঘরের ভেতরে চলে গেলাম। একটি টেবিল। দুপাশে দুটি চেয়ার। আমরা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। দুজনের মনেই ঝড় বইছে—দুজনেরই একই চিন্তা! তারপর হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠলাম— "দু'বছরের এত আয়োজন, এত রিহার্সেল—আজ পর্দা উঠবে, নাটকের সুরু।"

আমার কথা টেনে নিয়ে শেষ করল গণেশ—"and let Nemesis retribute justice with wrath and retaliation!"—প্রতিহিংসা দেবী! রুদ্রমূর্তিতে নেমে এসো আজ! তোমার রোষবহ্নিতে দিক্‌মণ্ডল ছেয়ে যাক। বৃটিশ সরকারের সব দম্ভ, সব ঔদ্ধত্য বুদ্বুদের মত বাতাসে বিলীন হয়ে যাক।

আমাদের সামনে টেবিলের ওপর চট্টগ্রাম শহরের স্কেচ্—ম্যাপে আক্রমণের ঘাঁটিগুলি বিশেষভাবে চিহ্নিত। আরও অনেক চিহ্ন দেওয়াছিল—কিভাবে, কোন পথে, কারা কোন সময়ে যাবে, ইত্যাদি। দুজনের হাতে লাল-নীল পেন্সিল। ম্যাপ সামনে রেখে দুজনে আজকের আক্রমণ পরিচালনার আগাগোড়া রিহার্সেল শেষবারের মত দিয়ে নিলাম। তারপর ম্যাপটি পুড়িয়ে ফেলা হল।

এখন ৭-৩০ মিনিট। 'জেনারেল বল' (লোকনাথ বল) এখুনি আসবে। পাঁচ মিনিট পর—ঠিক সময়, জেনারেল বল এলেন—গৌরবর্ণ, দৃঢ়সংকল্প, উন্নত বক্ষ, সুগঠিত দেহ, সবল বাহু দুটি যে কোন আক্রমণ প্রতিরোধে প্রস্তুত—শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বদাই উদ্যত।

হাসি মুখে ঘরে ঢুকলো লোকনাথ—আমরা আজই আমাদের মৃত্যুর দিন মনে করে পরস্পর অভিনন্দন জানালাম। এর পূর্বেও রোজই মিলতাম কিন্তু অভিনন্দন বা অভ্যর্থনাব পালা কখনই চলতো না। আজ যে বিশেষ একটি দিন—আজ যে আমরা মরণ অভিসারে চলেছি—তাই 'অভ্যর্থনা', 'সম্ভাষণের' ধুম পড়ে গেছে আমাদের মধ্যে।

আদর্শ সৈনিক, আদর্শ সেনাপতি লোকনাথ বল। সৈনিকের আদর্শে যে বড়, সেই তো বড় সেনাপতি হবার যোগ্য। লোকনাথ বলের আদর্শ ছিল—

"There's not to make reply,
There's not to reason why,
There's but to do and die."

—সৈনিকের মনে 'কেন' এই প্রশ্নের উদয় হবে না. কোন তর্ক নয়, কোন দ্বিধা নয়, শুধু সেনাপতির আদেশ পালন আর প্রয়োজনে মৃত্যুবরণ!

লোকনাথের আদর্শ গ্রহণ করেছিল দলের ছোট ভাইয়েরা। দৃঢ় চিত্ত অনুগত মুষ্টিমেয় সৈন্য দল নিয়ে অগণিত বৃটিশ সৈন্যের সঙ্গে জালালাবাদে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল জেনারেল লোকনাথ বল।

লোকনাথ জানাল—"সব তৈরি। আমার দিকে সব ঠিক আছে। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় কাজ হবে।" তারপর একটু হেসে বলল—"All for one and one for all!"

—সকলের জন্য আমরা প্রত্যেকে, প্রত্যেকের জন্য আমরা সকলে! লোকনাথের আত্মবিশ্বাস আমাদের উৎসাহকে দ্বিগুণ উদ্দীপ্ত করে তুলল।

গণেশ ও লোকনাথের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার মোটরে স্টার্ট দিলাম। পরবর্তী রুটিন অনুসরণ করতে চলেছি। গাড়িতে আমি একা। লোকনাথের সেই কটি কথা—All for one : one for all—ঘুরে ঘুরে আমার মনে উঠছিল, আর

মাঝে মাঝে আমার অন্তরের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে আঘাত করে শিহরণ জাগাচ্ছিল। এই একই কথা কতদিন কতজনের কাছে শুনেছি। আমি নিজেও কতদিন তা' বন্ধুদের কাছে বলেছি—তবে আজ কেন লোকনাথের কথা— All for one : and one for all — অন্তরে এইভাবে তরঙ্গ সৃষ্টি করছে? বহুদিন আগে, জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর, গণেশের কাছ থেকে যখন প্রথম যুব-বিদ্রোহের সামগ্রিক প্ল্যানটা শুনি, তখন All for one : and one for all —আমাদের সংগঠনের এই মূল মন্ত্রটিই আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছিল—কি সুন্দর! একসঙ্গে বিপ্লবী দলে এসেছি, একসঙ্গে যুদ্ধ করব, সমবেত চেষ্টায় সাময়িক গণতন্ত্রী বিপ্লবী সরকার গঠিত হবে, তারপর আমরা একসঙ্গে নিজ নিজ পোস্টে দাঁড়িয়ে মৃত্যুবরণ করব—অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ঘাত-প্রতিঘাতে বিক্ষিপ্ত হয়ে বিপথে পরিচালিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকব! তাই লোকনাথের মুখে যখন ১৮ই এপ্রিল সকালে প্রতিধ্বনিত হ'ল— All for one : and one for all — তখন মনে মনে নতুন করে শপথ নিলাম – সকলের জন্য আমরা প্রত্যেকে, প্রত্যেকের জন্য আমরা সকলে!

আমার গাড়ি ছুটে চলেছে নিজাম পল্টনের দিকে। একটা বাড়ির সামনে গিয়ে গাড়ি থামালাম। এখানে এসে আমাকে বিশেষ সাবধান হতে হ'ল। পাশাপাশি বাড়িগুলির মাঝখান দিয়ে সরু পায়ে চলা পথ—সেই পথে এঁকে বেঁকে আমাকে আমার গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে হবে। সেইজন্য সাবধানতার বিশেষ প্রয়োজন—কারণ, যদি আমার সন্ধানে পুলিশ ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকে তবে হঠাৎ কোন একটি ঘর থেকে বা ছুটি বাড়ির মাঝখানের ছোট পথ দিয়ে অনায়াসে এসে আমাকে আক্রমণ করতে পারবে। আমার ভাবতেই খুব খারাপ লাগতো যে পুলিশ সশস্ত্র অবস্থায় আমাকে চম্‌কে দিয়ে হঠাৎ বন্দী করবে। তাই পিস্তলটি বেল্ট থেকে একটু আল্‌গা করে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গাড়ি থেকে নেমে সন্তর্পণে হাঁটতে লাগলাম। কোন বিপদ হ'ল না।

ছোট্ট একটি ঘর—বাঁশ ও খড়ে তৈরি। এখানে নির্মলদা একা থাকেন। ঘরে ঢুকে দেখি নির্মলদা—আমার আসবার অপেক্ষায় একাই বসে আছেন।

নির্মলদার চেহারা ব্যক্তিত্ব ও আত্মপ্রত্যয়ে ভরা—কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য নির্মলদার চোখ দু'টি। কি সুন্দর উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি! একবার দেখলে আর ভোলা যায় না! প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে নির্মলদা কঠোর, নিষ্ঠুর, নির্মম যোদ্ধা—কিন্তু যারা তাঁর সঙ্গে মিশেছে তারা জানে ঐ আকর্ষণীয় চোখ দুটির অন্তরালে স্নেহ-মমতার প্রস্রবন উচ্ছসিত। আমাদের সকলের ভালবাসার পাত্র নির্মলদা অত্যন্ত কোমল ও ভাবপ্রবণ প্রকৃতির ছিলেন।

অন্তরীণ অবস্থা থেকে ছাড়া পাবার পর ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিলের [illegible]

পর্যন্ত নির্মলদার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের আকার ধারণ করেছিল এবং তা' সম্ভব হয়েছিল নির্মলদার আন্তরিক ব্যবহারে। যদিও তাঁকে আমি দাদা বলে ডাকতাম, বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করতাম, তবু যখন তাঁর কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখেছি তখন কত তীক্ষ্ণ ভাষায় যে তাঁর কঠোর সমালোচনা করেছি, তা' অনেকের পক্ষে ভাবাও সম্ভব নয়। আমার এই খোলাখুলি সমালোচনা নির্মলদা কেবল যে শুনতে পছন্দ করতেন তা' নয়, খুব ভালও বাসতেন। সমালোচনা করবার জন্য তিনি সব সময় আমাকে উৎসাহিত করতেন। আমার সব কথা ধৈর্য ধরে মনোযোগের সঙ্গে শুনতেন ও মৃদু মৃদু হাসতেন। কতখানি আত্মবিশ্বাস থাকলে কঠোর সমালোচনা শুনেও রাগ না করে হাসা সম্ভব? নির্মলদা বিন্দুমাত্র রুষ্ট না হয়ে হাসিমুখে আমার সর্বপ্রকার সমালোচনা সহ্য করেছেন—এটা একমাত্র স্নেহশীল আত্মবিশ্বাসী বিপ্লবীর পক্ষেই সম্ভব।

আজ মনে পড়ে জীবনের কত শত খুঁটিনাটি ব্যক্তিগত ঘটনা নিয়ে নির্মলদার সঙ্গে সমবয়সী বন্ধুর মত আলোচনা করেছি। কখনো মনে হয় নি বা তিনি আমাকে মনে করবার সুযোগ দেন নি যে, ঐ সব ব্যক্তিগত বিষয়ে সমালোচনা করার অধিকার আমার নেই। ঐ কঠোর চেহারার অন্তরালে কত বড় একটি মহৎ প্রাণ লুকিয়ে ছিল তা এই সামান্য দু'টি কথায় কোনমতেই বোঝানো সম্ভব নয়!

সেই দিন সকালে আমাকে দেখেই তিনি উৎসাহভরে ডেকে বসালেন। আমি হাসতে হাসতে বললাম—"কি নির্মলদা আজও কি Late Latif হওয়ার কোন chance আছে—ঠিক সময় আসবেন তো?" আমরা সবাই জানতাম নির্মলদা তার ঐরূপ সময় ঠিক না রাখার ত্রুটির জন্য কতখানি সচেতন ছিলেন। দলের নবীন সদস্যদের Punctuality (সময়নিষ্ঠা) সম্বন্ধে নির্মলদা তাঁর নিজ জীবনের মহামূল্যবান অভিজ্ঞতা দিয়ে শেখাতেন—যেন সময়নিষ্ঠা তাদের চরিত্রগত অভ্যাসে পরিণত হয়। সময়নিষ্ঠার প্রতি নির্মলদার একনিষ্ঠ অনুশীলন আমাদের সবার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল, তবু হাসির ছলে ১৮ই এপ্রিলের সকালে ঐরূপে সময়নিষ্ঠার প্রতি নির্মলদার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম। মনে মনে বিশ্বাস ছিল সময় সম্বন্ধে নির্মলদার পুনরায় ঐরূপ ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই—তবু ১৮ই এপ্রিলের যুব-বিদ্রোহের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ভেবেছিলাম, যদি আর একবার অতীতের ভুল মনে করিয়ে দিই তা'তে দোষের কিছু নেই। অতীত ভুলের পুনরাবৃত্তি আজকের ক্ষেত্রে যেন কোনমতে না ঘটে তার জন্য অতিরিক্ত বলা হলেও আমি হাসির ছলে নির্মলদাকে সজাগ করে দিয়েছিলাম—কারণ, আজকের অ্যাক্‌সন একটার সঙ্গে অন্যটার যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ—কাঁটায় কাঁটায় নির্ধারিত সময়ে প্রত্যেকটি অ্যাক্‌সন ঘটা চাই, নইলে এক মুহূর্তের দেরিও সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে।

নির্মলদা আজকের গুরুত্ব সম্বন্ধে কারও চেয়ে কম সচেতন ছিলেন না এবং প্রত্যেকের স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা কতখানি থাকা সম্ভব তার বাস্তব উপলব্ধি ছিল বলেই আমার অভিব্যক্তি তাঁকে একটুও ক্ষুন্ন করে নি। তাঁর সদাপ্রসন্ন মুখে বিন্দুমাত্র বিরক্তির ছাপ দেখা গেল না। তিনি অতীতের অ্যাক্সনে উপস্থিত হতে না পারার ত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে বসলেন। আমি একেবারে অপ্রস্তুত! তারপব তিনি বললেন—"না, ভাই না। দেখো এবার আর দেরি হবে না। ঠিক সময়েই পোস্টে উপস্থিত থাকব।"

নির্মলদা শিশুর মতই সরল ছিলেন। অতীতের ত্রুটির কথা মনে করে তাঁর চোখে জল এল। বার বার বলতে লাগলেন—"এবাব আমার ভুল হবে না। আমি ঠিক সময়ে পোস্টে উপস্থিত থাকব।" একবার নয়, বার বার এই কথা বলতে লাগলেন। আমি হাসির ছলে কথাটা বলে নির্মলদাকে যে এতখানি বিচলিত করব, আর নিজেও অপ্রস্তুত হব তা' ভাবি নি। নির্মলদা আমাকে যে কতখানি ভালবাসতেন ও আমার ওপর নির্ভর করতেন তা' আমি বুঝতাম। আমি বয়সে ছোট হলেও দলের মধ্যে আমার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটিকে স্বীকার করে নেওয়াতে তাঁর যে অসীম শ্রেষ্ঠত্ব ছিল তা' আমি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছি। আমার সেই অন্তরের সন্ধান রাখতেন বলেই নির্মলদা আমাকে ভালবেসেছেন।

আজকের বিশেষ বিশেষ প্রোগ্রাম আর একবার নির্মলদার সঙ্গে ঠিক করে নিয়ে বিদায় নিলাম। দরজার কাছে দু'জনে করমর্দন করে—অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে পরস্পরের হাত ধরে চোখে চোখে তাকালাম। চোখের নির্বাক ভাষায় আজকের অভিযানে 'মৃত্যু-সংকল্প' ঘোষিত হ'ল। নির্মলদা বললেন—"ভুল না যুবকদের প্রতি তোমার নিজ আহ্বান বাণী—Organisation, Audacity and Death !"
আমি তাঁর সাথে যোগ দিয়ে বললাম—

"Be daring, be still more daring, be daring always !" চাই সাহস, বিক্রম—সিংহবিক্রম! নির্মলদার সংস্পর্শে এসে আর একবার অন্তরের আগুন প্রজ্বলিত করে নিলাম।

আবার গণেশের বাড়ি ছুটলাম। সকাল থেকে রাত আটটা পর্যন্ত গ্রুপে ও ব্যক্তিগতভাবে সাধারণ সভ্য ও নেতাদের morale (মনোবল) কিরূপ আছে পরস্পর check-up করা এবং কিছুক্ষণ পরে পরেই পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে উৎসাহ এবং উদ্দীপনার কথা বলা আমাদের সাধারণ প্রোগ্রামের অঙ্গ ছিল। ফাইন্যাল অ্যাক্সনের আগে technical কাজের কর্মসূচী রিহার্সেল দিয়ে নেওয়ার জন্য এবং morale অটুট ও উঁচু রাখবার উদ্দেশ্যেই সেদিন আমরা পরস্পর বার বার মিলিত হয়েছি।

প্রচুর মূল্যের বিনিময়ে যে অতীত-অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তা' অতি নিদারুণ ও রূঢ় সত্য। পরোইকোরা ডাকাতির সময় আমাদেব মধ্যে যে "বীর বিপ্লবী" সবচেয়ে বৃহৎকায় ও ব'লিষ্ঠ, তিনি অ্যাক্‌সনের আগে এলেনই না। পরে সমর্থক হিসেবে হয়ত ছিলেন কিন্তু রক্তাক্ত বিপ্লবের চিন্তা থেকে চিবতরে বিদায় নিয়ে ছিলেন। সামান্য ট্রেনিং-এর জন্য যখন দলের দু'জনকে বলেছি তারা একত্রে মাত্র একজন পথিককে ছোবা হাতে নির্জন স্থানে ভয় দেখিয়ে টাকা-পয়সা অপহরণ করবার অভিনয় করবে, তখন তাদের মধ্যে একজন বাস্তব অবস্থার বিভীষিকার সম্মুখীন হয়ে বিপ্লবী দল থেকে বিদায় নিয়ে নিস্তার পেলেন। এরূপ আবও অনেক ঘটনার সঙ্গে আমাদেব পবিচয় ছিল—ঠিক বিপদেব আগে অনেকেব morale ভেঙে গেছে এবং তাবা ভয়ে পালিয়েছে। এই নিদারুণ অভিজ্ঞতা সামনে রেখে আমরা সবাই একসাথে শিক্ষা নিয়েছি এবং subjectively মনকে তৈরি করেছি। যুব বিদ্রোহে যাদেব অংশ গ্রহণ কববার জন্য বাছাই কবেছিলাম তাদের সম্বন্ধে প্রায় নিশ্চিত ছিলাম যে, তাবা সেই বৃহৎকায় বলিষ্ঠ বীবপুঙ্গবেব মত ভয়ে পালাবে না। কিন্তু ত'াহলেও ১৮ই এপ্রিলেব যুব বিদ্রোহেব দাযিত্ব যাঁদেব ওপব ন্যস্ত ছিল তাঁবা শেষমুহূর্ত পযন্ত বিপ্লবী সৈনিকদেব morale সম্বন্ধে সজাগ থাকা একান্ত প্রয়োজন মনে কবেছিলেন। সেইজন্য জ্বালাময়ী কথা, শ্লোগান প্রভৃতি আমরা ইচ্ছে কবে ব্যবহাব কবেছি যেন অন্তবেব আগুন আজ শত সহস্রগুণ অধিক প্রখবতায় প্রজ্বলিত হয়।

গণেশের বাড়ি এসে অম্বিকাদার সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি আমাব জন্য অপেক্ষা কবছিলেন। ১৮ই এপ্রিল যুব-বিদ্রোহেব দিন সকালবেলা একটা খুব বড কাজ সম্পন্ন কববাব ছিল। আমার এখন ঠিক মনে নেই—হয় মহেন্দ্র চৌধুরী বা নিতাই, দু-তিন দিন আগে প্রায় বারো চৌদ্দ শ' টাকা বাড়ি থেকে নিয়ে আসেন। এঁদেব মধ্যে কে টাকা এনেছিলেন তা' আমাব আজ ঠিক মনে পডছে না। এটা স্পষ্ট মনে আছে, আমরা শেষ সময়ে টাকার অভাব অনুভব কবেছিলাম। হঠাৎ একটা সুযোগ পেযে, যুব-বিদ্রোহেব দু'দিন আগে, যখন ঐ দু'জনের একজন আমাদের হাতে টাকা এনে দিলেন তখন অপ্রত্যাশিতভাবে এই টাকা পেয়ে আমরা Hire Purchase-এ একটা মোটর গাড়ি কিনব স্থির করলাম।

আজকেব দিনের তরুণ পাঠক-পাঠিকারা শুনে অনেকটা অবাক হবেন, ১৯৩০ সালে 'শেভ্রোলে' মোটব (ট্যুরার) গাড়ির দাম মাত্র দু' হাজাব আট শ' টাকার বেশি ছিল না—যার আজকের দাম অন্তত ষাট-সত্তর হাজার টাকা। তাই মাত্র তের-চোদ্দ শ' টাকা হাতে পেয়েই নতুন শেভ্রোলে গাড়ি কেনা সাব্যস্ত করেছিলাম।

তখনকার দিনে অত সস্তায় পাওয়া সম্ভব ছিল বলেই যে একটা নতুন গাড়ি কিনে ফেললাম তা' নয়। সকালবেলা নতুন গাড়ি একটা খরিদ করে সন্ধ্যার

সময় সেটাকে যদি বিসর্জন দিতে হয়, বা সেদিনের পরও ছু-তিন দিন আরও বেঁচে থেকে যদি গাড়িটাকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হই তাহলে আজ সকালে গাড়িটি কেনাব অর্থ কি ?

কোন একটা গাড়ির ড্রাইভারকে তিন-চার ঘণ্টা অনিশ্চয়তার মধ্যে বেঁধে রেখে অ্যাক্সনে যাওয়া খুব একটা বুদ্ধির কাজ বলে আমবা মনে করি নি। ড্রাইভারকে জোর করে বাঁধা ও তেমন কোন জায়গায় লুকিয়ে রাখার মধ্যে যে অনেক অবাঞ্ছনীয় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকতে পারে তা' আমাদের সাধারণ বুদ্ধি দিয়েও অনুমান করেছিলাম। যুব-বিদ্রোহের তিন-চার ঘণ্টা আগে থেকে জোর-জবরদস্তি করে আমাদের আয়ত্তে গাডি এনে তারপব তা' নিয়ে শহরের মধ্যে ঘোরা ষড়যন্ত্রের মূল-নীতি বিরুদ্ধ বলে আমাদের কাছে বিবেচিত হয়েছিল। একই কারণেই একটি নতুন গাডিব প্রয়োজন ভীষণভাবে অনুভব করি। টেলিগ্রাফ্ ও টেলিফোন অফিস ধ্বংস করতে অম্বিকাদার নেতৃত্বে যে গ্রুপটি যাবে তাদের যেন ড্রাইভারকে বেঁধে রেখে গাড়ি জোগাড় কবার ঝামেলা পোহাতে না হয়।

গণেশের কাপডেব দোকানের খুব নিকটেই ছিল জে, এন, রায়চৌধুরী এণ্ড কোং-এর শেভ্রোলে গাড়িব শো-রুম। গণেশের প্রযোজনে বেবী-অস্টিন্ গাড়িটি রেখে আমি ও অম্বিকাদা হেঁটেই সেই শো-রুমে গেলাম। আগের দিন সেই মোট৲ ,৲ডি কোম্পানীব মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠিক করা ছিল আজ সকালে গাড়িটি ডেলিভারি নেব। শ্রীবীরেশ্বরবাবু (ভট্টাচার্য)—জানি না আজও তিনি বেঁচে আছেন কি না—অম্বিকাদার বিশেষ বন্ধু বা আত্মীয়। চট্টগ্রামের জজ্ ও সেসন্স্ আদালতে তিনি ওকালতি করতেন—বীরেশ্বরবাবু চট্টগ্রাম আদালতে তখনকার দিনে একজন উদীয়মান উকিল। তাঁকেই সঙ্গে এনেছিলাম গাড়িটা Hire Purchase করার জন্য তিনি যেন জামিনদার হন। বীরেশ্বরবাবু জামিন থাকবেন বলে রাজী হয়েই এসেছিলেন। গাড়ি কেনা হ'ল অম্বিকাদার নামে। পনেরো মিনিটের মধ্যে গাড়ি কেনা হয়ে গেল। বীরেশ্বরবাবুকে নতুন গাড়ি করে বাড়ি পৌছে দিয়ে আমি ও অম্বিকাদা সোজা ছুটলাম নিজাম পণ্টনের দিকে। একবার গাড়িটা চালিয়ে দেখে নেবার উদ্দেশ্যে কখনও খুব আস্তে কখনও বা খুব বেগে মোড় ঘুরে ও ভাঙাচোরা রাস্তার ওপর দিয়ে ড্রাইভ করলাম।

এবারে চলেছি সোজা পীচঢালা রাস্তা দিয়ে পাহাড়তলীর দিকে, পাশে অম্বিকাদা। নিজামপণ্টনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়িটি একবার থামালাম। সামনে দেখা যাচ্ছে A.F.I.-এর অস্ত্রাগার। বন্দুক কাঁধে পাহারা দিচ্ছে পাঠান সান্ত্রী। ঐ অস্ত্রাগার আজ রাত্রে আমাদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হবে। আমাদের ছু'জনের সঙ্গেই গুলীভরা পিস্তল আছে। তখন সকাল ন'টার বেশি হবে না। এতক্ষণ আমাদের

মধ্যে কোন কথা হয়নি বললেই চলে। কি কথা বলব? আজকে রাত্রের 'প্রলয়ের' ভয়ঙ্কর মূর্তি, অস্ত্রের সংঘাত ও বিভীষিকা বুকের ভেতর গুমরে গুমরে শিহরণ জাগাচ্ছে। এতক্ষণ গাড়ি চলছিল তাই বোধহয় চুপ করে ছিলাম। এখন গাড়িটি একটু থামিয়ে বসেছি তাই হয়ত অন্তরের ঝড়ের প্রতিক্রিয়া মুখে প্রকাশ পেল—

"অম্বিকাদা! বৃটিশ আর্মির একটা অস্ত্রসজ্জিত গাড়ি বা ট্যাঙ্কের সমকক্ষ আমাদের এই নতুন গাড়িটি!"

উত্তরে অম্বিকাদা বললেন—"আর বৃটিশ সৈন্যের মেশিনগান ও কামানের প্রতিদ্বন্দ্বী আমাদের চোদ্দটি পিস্তল ও রিভলবার আর এক ডজন '১২ বোরের বন্দুক।"

দু'জনেই হেসে উঠলাম। একটু পরে বললাম- "অম্বিকাদা, বৃটিশ জেলের মধ্যে বিশ্বাসহন্তা নরেন গোঁসাইকে হত্যা করে হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরে-ছিলেন কানাইলাল—তাঁব সাহস, তাঁর আত্মত্যাগ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিল সারা দেশময়। আর আজ রাত্রে মাত্র এক ডজন বিভলভার ও এক ডজন বন্দুক সম্বল করে চট্টগ্রামেব বিপ্লবী যুবকেরা অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে শহর অধিকার কবার এক নতুন ইতিহাস রচনা করবে—ভারতের যুব-বিদ্রোহকে আর একধাপ এগিয়ে দেবে!"

অম্বিকাদা মনের আবেগে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন—"এই আশা নিয়েই তো আজ মরব। সমস্ত শহরের শাসন-ব্যবস্থা আমাদের সমবেত আক্রমণে অচল হয়ে পড়বে। ইংরেজ শাসকবর্গ জানবে, ভারতবাসী জানবে, ভারতের স্বাধীনতাকামী যুবকদল জানবে—সামান্য অস্ত্র সম্বল করে অল্পসংখ্যক দৃঢ়চিত্ত যুবকের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা বৃটিশের যে কোন দুর্ভেদ্য দুর্গকে ধূলিসাৎ করে দিতে পারে।"

তাবপব দু'জনের মনেই এক চিন্তা—

"এতদিন ধরে যে স্বপ্ন দেখে এসেছি আজ তা' বাস্তবে পবিণত হবে কি? শেষ পর্যন্ত পারব তো সফলতা অর্জন করতে? আমাদের শ্রমের বিনিময়ে, রক্তের প্রতিদানে পাবব কি যুব-সমাজের সামনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে? ব্যক্তিগত সন্ত্রাস সৃষ্টির পথে বৃটিশ শাসকদের মনে এতদিন ত্রাস সঞ্চার করেছি এবং যুব-সমাজ উদ্বুদ্ধ হয়েছে কানাইলাল, ক্ষুদিরামের ব্যক্তিগত সাহস ও চরম আত্ম-ত্যাগের আদর্শে; আর আজ যদি জয়ী হই তবে, মুষ্টিমেয় বিপ্লবীর "সংঘবদ্ধ আক্রমণ" দ্বারা সমস্ত শহরও যে অধিকার করা যায়—এই দৃষ্টান্ত কি যুব-সমাজের মধ্যে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর বাস্তব পরিবর্তন এনে দেবে না?"

গণেশ ও নির্মলদা প্রত্যেক গ্রুপের সঙ্গে দেখা করেছেন নির্ধারিত স্থানে ও

সময়ে। প্রত্যেকের মানসিক বল অটুট আছে কি না, তারা শারীরিক সুস্থ কি না, তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং মোটর গাড়ির সব ব্যবস্থা প্ল্যান অনুযায়ী ঠিক আছে কি না—এই সব তাঁরা check-up করছিলেন। সেই দিনের সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত clock-like-precisian-এ সমস্ত ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল। বিভিন্ন গ্রুপ-কমাণ্ডার গণেশের সঙ্গে প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় যোগাযোগ রাখছিল—তাদের প্রত্যেকের final report গণেশের কাছে দেওয়ার কথা—কারও কোন ব্যতিক্রম সঙ্গে সঙ্গে report করার কথা। সেই নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী তারা তাদের রিপোর্ট দিয়েছে। এই বিষয়ে আমার বিশেষ কিছু করবার ছিল না।

নতুন শেভ্রোলে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে শহরের দিকে চললাম। কংগ্রেস অফিসে অম্বিকাদাকে নামিয়ে দিয়ে গণেশের বাড়ির রাস্তায় নরেশকে দেখতে পেয়ে সামান্য দু'টি প্রশ্ন করলাম—

"সব ঠিক আছে তো নরেশ? যেখানে যত অস্ত্র আছে সব তুমি নিজ হাতে পরীক্ষা করে দেখেছো কি? সব ঠিক আছে?"

নরেশ খুব স্থিরভাবে উত্তর দিল—"হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।"

আবার প্রশ্ন করলাম—"তুমি বলছ কোন সন্দেহ নেই? আক্রমণের মুহূর্তে একটিও fail করবে না—তুমি নিশ্চিত?"

—"হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত।"

—"তোমার দলের প্রত্যেকের মনোবল কেমন আছে?"

—"খুব ভাল, চমৎকার! তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলেছে—'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান……'।"

ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্ব নরেশের। সেইজন্য আজ রাত্রে বাছা বাছা যুবকদের নিয়ে সুগঠিত একটি দল বাছাই করা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত। নরেশকে বলবার হয়ত আমার কিছুই ছিল না, তবু তাকে বলে নিজেই জোর পাব, এই ভেবে মনের ভেতরে যা' এতক্ষণ গর্জন করে চলছিল তাই বললাম—

"মনে রেখো নরেশ, আমাদের প্রাণদান কখনই ব্যর্থ হবে না! এতদিনের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে চলেছি আজ—শক্তি চাই, সাহস চাই—আর চাই অদম্য মনোবল। দেখ নরেশ, শেষমুহূর্তে যেন একজনও ভেঙে না পড়ে। তাদের গিয়ে বল—দয়া নয় মায়া নয়, বিন্দুমাত্র করুণা নয়! প্রতিশোধ চাই—শুধু চাই নির্মম প্রতিশোধ!—ক্ষুদিরাম, কানাইলালের ফাঁসির প্রতিশোধ—জালিয়ানওয়ালা-বাগের শিশু ও নারী-হত্যার প্রতিশোধ।"

নরেশের চোখ দুটো জলে উঠল—ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীকে পুড়িয়ে শেষ করে দেবার জন্য যেন দুটি আগুনের স্ফুলিঙ্গ। নরেশ নিজের মনকে প্রস্তুত করে নিয়েছে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুরা ভারতবাসীকে এতদিন ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করেছে, তাদের কুকুরের মত হত্যা করতেও এতটুকু মমতা হয় নি। নরেশ আজ প্রস্তুত—এতদিনেব অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবে। খুব দৃঢ়তার সঙ্গে সে আমাকে বলল —

"ইংরেজ শাসকবর্গ আজ বুঝবে অত্যাচার করার একচেটিয়া অধিকার কেবল সাম্রাজ্যবাদী শত্রুরই নেই। তারা দেখবে আমরা কতখানি নিষ্ঠুর হতে পারি—কত নির্দয়, কত কঠিন, কত নিষ্করুণ আমরা! এতদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ তাদের বুকের রক্ত ঢেলে কবতে হবে। মানবত্রাতা যীশুব আদেশ যারা অবহেলা করেছে, ঈশ্বর তাদেব আজ ক্ষমা করবে না! আজকে যে মৃত্যু বিভীষিকা সৃষ্টি করব তা' ইংরেজ শাসকবর্গকে ভবিষ্যতেব জন্য সতর্ক কবে দেবে—তাদের অন্যায় অত্যাচারের পরিণতি আরও অশুভ আবও অমঙ্গলজনক হবে।"

দুটি বছব আমাদের প্রস্তুতিপর্ব চলেছিল। কতরকম শিক্ষা—তাব মধ্যে এইরূপ মানসিক প্রস্তুতিব অনুশীলন সব সময় আমবা কবেছি। তখন আমবা কিবা বই পড়েছি—বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রেব কোন বই আমাদেব ছিল না; সমাজ বিপ্লব ও বাজনৈতিক বিপ্লব সম্বন্ধেও কোন গ্রন্থ পডা হয় নি। আমাদের আলোচনাচক্রে বিষয়বস্তু খুব সামান্যই থাকত। গণসংগঠনের কর্মসূচী নিয়ে আমবা কখনও আলোচনা করি নি। প্রোগ্রাম ছিল, ইংরেজের মনে বিভীষিকা সৃষ্টি করব—নিজে মরে বিপ্লবী সমাজে আদর্শ সৃষ্টি কবব। তাই, আলোচনা যা' হোত তা' দিনের পর দিন মাসের পর মাস এইরূপ ভাবপ্রবণ বৈপ্লবিক কথাব মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। একই কথা হয়ত বার বার বলেছি—কেউ কেউ ভাববেন তা' কি করে সম্ভব? মবণ-পাগল ক্ষ্যাপার দলের পক্ষে তাই সম্ভব ছিল। একই কথা বার বার বলতেও আমরা কখনই শ্রান্তি বোধ করিনি। Sujective mind-কে তেমনি ভাবে অন্তরের প্রেবণা দিয়ে তৈরি করতে না পারলে লডাই করা সম্ভব নয়। কারও হয়ত মনে হবে—নরেশ কি সেইরূপ ভাবে আমাকে কিছু বলেছিল? নাকি ভাবাবেশে এখন আমি মনগড়া কথা সব লিখছি বসে বসে? কয়েক ঘণ্টা পরেই সুনিশ্চিত মৃত্যু-মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ব। সেই দিনটিতে মানসিক প্রতিক্রিয়া কি ভীষণগতিতে ছুটে চলেছিল নরেশের ঐ ক'টি কথায় তার সামান্যই মাত্র প্রকাশ পাচ্ছে। আমাদের প্রত্যেক গ্রুপের মধ্যে সেই দিন এর চেয়ে অনেক বেশি ভাবপ্রবণ বৈপ্লবিক উত্তেজনাপূর্ণ কথা হয়েছে।

বেলা এগারোটার সময় আনন্দের বাড়ি গেলাম। এখানে একটি গ্রুপ আমার

জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি যে নতুন শেভ্রোলে গাড়ি কিনতে যাচ্ছি তা' তারা জানত এবং কথা ছিল সেই গাড়িটি নিয়েই এখানে আসব। তারপর আনন্দ এই গাড়িটি ট্রায়েল দিয়ে দেখবে; কারণ, রাত্রে টেলিফোন অফিস ধ্বংস করার জন্য অম্বিকাদার গ্রুপটিকে নিয়ে আনন্দই এই গাড়িটি চালাবে।

এখানে মিনিট পাঁচেক আগে জড়ো হয়েছে একটি দল—মাখন, রজত, টেগ্‌রা, আনন্দ, হিমাংশু ও বিধু। নতুন শেভ্রোলে গাড়িটি দেখে লাফিয়ে উঠল ওরা—নিজস্ব একখানা গাড়ি—আজকের বিপ্লবের সঙ্গী, আর একটি প্রধান হাতিয়ার! এক মুহূর্তেই গাড়িটাকে ভালবেসে ফেললো তারা, কেউ গায়ে আলতোভাবে হাত বোলাচ্ছে, কেউ ভেতরে গিয়ে বসেছে—কেউ বা যন্ত্রপাতি নেড়েচেড়ে দেখছে।

এই শেভ্রোলে গাড়িখানা পেয়ে বিপ্লবী তরুণদের মুখে যে আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠল তার মূল্য অসামান্য। ১৯১৬ সালে কমব্রাই অঞ্চলে জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রথম ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী কি এর চেয়ে বেশি গৌরব অনুভব করেছিল? জানি না হিটলারের ফ্যাসিস্ট সৈন্যদল "অপ্রতিদ্বন্দ্বী" টাইগার ট্যাঙ্ক চালাবার সময় কতখানি গর্ববোধ করেছিল! অথবা বলতে পারি না অপরাজেয় লালফৌজবাহিনী তাদের শক্তিশালী K. V. ট্যাঙ্কের দুর্বার ক্ষমতায় কতখানি উৎসাহিত হয়েছিল। চট্টগ্রামের তরুণ বিপ্লবীরা আজকের মরণপণ যুদ্ধের সাথী এই শেভ্রোলে গাড়িটি পেয়ে তার চেয়ে কম গর্ব ও গৌরব অনুভব করে নি। এও আমার ভাবের কথা নয়—বাস্তব সত্য।

বিপ্লবীর হাতের সামান্য মাস্কেটী বৃটিশবাহিনীর মেসিনগান ও কামানকে স্তব্ধ করে দিয়েছে ও তাদের বিশাল সৈন্যদলকে পর্যুদস্ত করে তুলেছে। বিপ্লবী ভিয়েতকংরা প্রচণ্ড শক্তিশালী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীর আধুনিক মারাত্মক অস্ত্রের বিরুদ্ধে কিভাবে তাদের সামান্য অস্ত্রবল নিয়ে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে—তাদের পরাস্ত করতে পারে, তা' যদি হৃদয়ঙ্গম করা যায় তবেই বোঝা যাবে সামান্য শেভ্রোলে গাড়িটি পেয়ে সেদিন আমাদেরও কতখানি সাহস ও ভরসা বেড়ে গিয়েছিল!

শেভ্রোলে গাড়িটা ঘিরে গর্বিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে মাখন, রজত, টেগ্‌রা, আনন্দ, হিমাংশু ও বিধু। প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, যেন এক একটি জলন্ত উল্কাপিণ্ড—উৎসাহে, উদ্দীপনায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। তাদের morale দেখে আমার মনের সমস্ত দ্বিধা-সংশয় দূর হ'ল—মানসচক্ষে স্পষ্ট দেখলাম, দিগন্তরেখায় একখণ্ড ঘন কালো মেঘ থমকে আছে; আর কয়েক ঘণ্টা পরেই সমস্ত আকাশ ছেয়ে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সূচনা দেখা দেবে এবং তার আড়ালে ঢাকা পড়বে বৃটিশ-সূর্য—কেঁপে উঠবে বৃটিশ রাজশক্তি। অবিশ্রান্ত গোলাগুলির বিনিময়ে মৃত্যু ও ধ্বংসের

বিভীষিকা যে ভয়ঙ্কর রূপ নেবে তার করাল ছায়া গ্রাস করবে সাম্রাজ্যবাদী শত্রুদের। এই তরুণ বিপ্লবীদের মুখের প্রতিটি রেখায় মৃত্যুপণ প্রতিফলিত; জ্বলছে তাদের চক্ষে ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা!

আমরা সবাইকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে আনন্দকে সঙ্গে করে নতুন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আনন্দ নতুন গাড়িটি প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চালিয়ে দেখে নিল।

ত্রিপুরা প্রত্যেক গ্রুপ-কমাণ্ডারকে ও প্রত্যেক দলে অন্তত দুটি করে ঘড়ি দিয়ে এসেছে—সব ঘড়িগুলির টাইমও চেক্ করেছে।

প্রচারপত্র বিলি করার দায়িত্ব শৈলেশ্বরকে দেওয়া ছিল। প্রচারপত্রগুলি রাখবার নির্দিষ্ট গোপন স্থানটির অস্তিত্ব মাত্র শৈলেশ্বরই জানত। কিন্তু এইগুলির বিষয়বস্তু শৈলেশ্বরকে বলা হয় নি। যে দলটি শৈলেশ্বরের নির্দেশে প্রচারপত্রগুলি নিয়ে আসবে, তাবাও আগে থেকে এই গোপন স্থানটি এবং এতে কি লেখা আছে সেই সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও অনুমান করতে পারেনি। প্রচারপত্রগুলি বিলি করার দলটির morale অক্ষুণ্ণ আছে কি না এবং তাদের সব ব্যবস্থা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ার মধ্যে কোন বাধা বা ত্রুটি ঘটবার সম্ভাবনা আছে কি না খোঁজ করে জানবার পর আমি দুপুরে বাড়ি ফিরলাম।

প্রায় একটা বেজেছে। গত কয়েক মাস ধরে আমিও অন্যান্যদের মত খুব অনিয়মে চলেছি। স্নান, আহার ও নিদ্রার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। বাড়ির লোকেরাও এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে পিস্তলের একশ'টি কার্তুজভরা একটি থলে বৌদিকে দিয়ে সেগুলিকে রোদে গরম করে রাখতে বললাম। মাসে একবার অন্তত বৌদির ওপর এই ভারটি আমার দিতেই হ'ত। দাদাকে আমার পিস্তলটি দিলাম তেল-টেল দিয়ে পরিষ্কার করে দিতে—আমি স্নান-খাওয়ার পর তক্ষুণি আবার বেরিয়ে যাব।

এসব আমার বাড়িতে নতুন কিছুই নয়। মা-বাবা নদীর তীরে ডবলমুরিং জেটির কাছে একটি বাড়িতে মাস কয়েক ধরে আছেন। ডাক্তারেরা মায়ের স্বাস্থ্যের জন্য নদীর ধারে থাকার ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। যখন বাবা-মা বাড়ি ছিলেন তখনও তাঁদের সামনেই দাদা, বৌদি ও দিদিকে কখনও কখনও বোমা-পিস্তল রোদে দিতে বা রাখতে দিয়েছি, এইসব আমার বাড়িতে দৈনন্দিন ব্যাপার। আর আমার মা?—তিনিও এই কাজ থেকে বাদ পড়তেন না। বাড়ি ফিরে সামনে যাঁকে পেতাম তাঁর কাছেই আমার পিস্তল বা রিভলভার জিম্মা করে দিতাম। এটাই আমার রোজকার নিয়ম। যখন বিশেষ কাজে এক মুহূর্তের জন্যও পিস্তল হাতছাড়া করার সময় পাই নি বা কোন অশুভ আশঙ্কার কারণ দেখা দিয়েছে, তখনই কেবল এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে।

আজ অবশ্য সঙ্গে পিস্তল রাখার প্রয়োজন অনেক বেশি। তাই বলে "অকেজো পিস্তল" রাখাব কোন মানে হয় না। সেইজন্যই তেল দিয়ে পিস্তলটি আক্রমণের কয়েক ঘণ্টা পূর্বে ঠিকঠাক করে নেওয়া প্রয়োজন ছিল। আর বলাই বাহুল্য যে, কার্তুজগুলি গরম করে রাখা এই জন্য, যেন কোন একটিও ট্রিগার টেপার সময় ব্যর্থ না হয়। ট্রিগার টেপার পর এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যেই ফলাফল জানা যায়—আমাদের গুলি ব্যর্থ হলে পাহারারত সান্ত্রীদের গুলি আমাদের বিদ্ধ করবে। এইরূপ অনিশ্চয়তার গুরুত্ব যত অনুভব করেছি তত বেশি করে খুঁটিনাটি অনেক বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করেছি। অতি সামান্য গাফিলতির জন্য মস্ত বড় সামগ্রিক প্ল্যানও বানচাল হয়ে যায়—এইরূপ প্রমাণ আগেও পেয়েছি এবং পরেও দেখেছি। শত সাবধান হয়েও ত্রুটির হাত থেকে রেহাই পাই নি এবং অনেক ক্ষেত্রে সেইরূপ ভুলেব জন্য আমাদের বহু মূল্য দিতে হয়েছে।

দাদা—বৌদিকে পিস্তল ও কার্তুজ জিম্মা করে দিয়ে আমি চট্ করে স্নান সেরে নিলাম। আজকে আমার ব্যস্ততা দেখে তাঁরা নিশ্চয়ই তেমন কিছু অনুমান করতে পারতেন না যদি চলাফেরা ভাবভঙ্গী ও মুখের গাম্ভীর্য দিয়ে আমি বোঝাতে চেষ্টা না করতাম যে, আজ আমরা কোন অ্যাক্‌সন করব। দাদা কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। বৌদি কখনই কোন প্রশ্ন করতেন না—কারণ, উত্তর পাবেন না জানতেন।

স্নান করে খাওয়ার ঘরে গেলাম। দিদি বাড়ি ছিলেন—তিনি আমাকে থালা সাজিয়ে খেতে দিলেন। আমার হাবভাব দিদি খুব লক্ষ্য করে দেখছিলেন। খেতে বসে একটু পরে দিদিকে বললাম—

—"দিদি আমরা এবার তৈরি হয়েছি।"

—"কি বলছিস্? খুলে বল—কিসের জন্য তৈরি?"

—"চট্টগ্রামে বৃটিশ রাজত্বের শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে—আজ তাদের সমাধি রচনা হবে। গণতন্ত্রবাহিনীর সৈন্য আজ শহর দখল করবে!"

দিদি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এও কি সম্ভব! "সন্ত্রাসবাদী" কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পুলিশ আর গোয়েন্দা বিভাগ তাদের কর্মতৎপরতা ক্রমশঃ বাড়িয়ে চলেছে। বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে তখনও পর্যন্ত বিপ্লবীরা কোন সক্রিয় পন্থা গ্রহণ করে নি। আমরা তখনও শান্তিপূর্ণ কংগ্রেস আন্দোলনে গা ভাসিয়ে চলেছি। আমাদের যা' কিছু বৈশিষ্ট্য এতদিন দিদি দেখেছেন তা' হচ্ছে ব্যায়ামকেন্দ্রে শরীরচর্চা আর ইউনিফরম্ পরা ভলান্টিয়ারবাহিনীর খালি হাতে কুচকাওয়াজ। গত কয়েক মাস ধরে ব্যায়ামচর্চা ও কুচকাওয়াজ করার মধ্যে আমাদের শৈথিল্য দিদির চোখেও পড়েছে। তা ছাড়া আমাদের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা দিদির এবং বাড়ির অন্যান্য সকলের কানেও কিছু কিছু পৌঁছেছে—আমরা খো-

পাউডার মেখে ঘুরে বেড়াই, ছেলেরা লেখাপড়া ছেড়েছে, অবাধ্য হয়েছে, রেস্টুরেন্টে ও সিনেমায় পয়সা নষ্ট করছে, রাত্রেও তারা বাড়ি থাকে না, ইত্যাদি। দিদির মুখ দেখে বুঝলাম তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে, আমার কথায় যেন তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না!

দিদির মনের সন্দেহ দূর করবার জন্য বললাম—

"দিদি বিশ্বাস করা কঠিন, তবু বলছি, আজ রাত্রেই চট্টগ্রামের বুকে স্বাধীনতার পতাকা ইউনিয়ন জ্যাকের স্থান অধিকার করবে।"

আমার মুখে দিদি কখনও বাজে কথা শোনেন নি। আমার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করে তিনি বুঝতে পারলেন আমি যা' বলছি সত্যি—তাঁর মনে আর সংশয় রইল না। আমার কথা শুনে দিদির মনে সন্দেহ জাগা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। তিনি বাড়িতে থেকে আমাকে, গণেশকে ও আমাদের অন্যান্য সবাইকে দিনে-রাতে দেখেছেন তবু এই বিরাট আয়োজনের কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন নি। তাই আমার কথা শুনে প্রথমে তাঁর বিশ্বাস হয় নি। এই জন্য আমি আবার বলছি পুলিশ গুণতে জানে না। দলের সভ্য—বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় যাঁরা, তাঁদের মধ্যে কেউ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে পুলিসকে সংবাদ না দেন তাহলে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের খবর পুলিস পেতে পারে না। দিদির চোখ দু'টি উৎসাহে জ্বলে উঠল। তিনি অধীর হয়ে আমাকে বললেন—

—"আমিও যাব তোদের সঙ্গে। আমাকে কেন বাদ দিলি তোরা? আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল্।"

—"না, তা হয় না দিদি। আমরা এবার বোনেদের সঙ্গে নিচ্ছি না। প্রথম বারের জন্য এটা ভাইদের কাজ। বোনেরা আসবে পরে।"

আমার কথা শুনে দিদি একেবারে ক্ষেপে উঠলেন। তিনি খুব রেগে অভিমানভরে বলতে লাগলেন—

"কেন? বোনেরা পিছিয়ে থাকবে কেন? বেশ তুই নিতে না চাস্ আমি এক্ষুণি গিয়ে মাস্টারদাকে বলছি—আমিও যাব।"

দিদি মনে করলেন আমিই যেন দিদিকে বাদ দিয়েছি—তাই তাঁর এত অভিমান এত রাগ। একেবারে প্রথম থেকেই আমাদের দলের সঙ্গে দিদির সংযোগ ছিল। তিনি মাস্টারদা ও দলের অন্যান্য নেতাদের সবাইকে চিনতেন এবং তাঁদের অনেকের সঙ্গে পরিচয়ও ছিল। দিদি বোধহয় ভেবেছিলেন, মাস্টারদাকে বলে কয়ে রাজী করাতে পারবেন। কিন্তু যখন আমি জানালাম মাস্টারদার দেখা পাওয়া আজ সম্ভব নয়, তখন তিনি একেবারে দমে গেলেন।

পরক্ষণেই অবশ্য তাঁর মনে একটু আশার সঞ্চার হ'ল। কারণ, আমি বললাম

—"মাস্টারদা তোমার জন্য নির্দেশ পাঠিয়েছেন—একটা চিঠি দিয়েছেন।" আমার খাওয়া তখনও শেষ হয় নি। দিদির তখন সেদিকে লক্ষ্য করার সময় ছিল না। মাস্টারদার চিঠি! মাস্টারদার নির্দেশ! দিদি চিঠির জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। আমি তাঁকে জানালাম যে চিঠি আমার "ম্যানিব্যাগে" আছে— ছোট্ট এক টুক্‌রো কাগজ। দিদি চট্ করে চিঠিটা বার করে পড়তে লাগলেন—

"দিদি

আজ রাত্রে আমরা চলিয়া যাইতেছি। আজ আমাদের মৃত্যু-দিন। হয়ত আর দেখা হইবে না। বিপ্লবের পথে আমাদের পদযাত্রা আজ হইতে নূতন পথ অবলম্বন করিবে। যে পতাকা আমরা পিছনে তোমাদের হাতে দিয়া যাইতেছি, তোমরা তাহা বহন করিও—বিপ্লবের আগুনে যে মশাল আজ জ্বালাইয়া রাখিয়া যাইব তাহা যেন কোনদিন নিভিয়া না যায়।

বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

—মাস্টারদা।"

মাস্টারদার এই শেষ চিঠি। হয়ত আর দেখা হবে না। দিদি আজ অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেলেন না। আহত অভিমানে চোখে ধারা বইতে লাগল। মনের আবেগ সংযত করে বল্‌লেন—

"অনন্ত, মাস্টারদাকে জিজ্ঞেস করিস্ তাঁর প্রিয় ভাইদের চাইতে কিসে আমি পিছিয়ে আছি? শারীরিক শক্তিতে? কেন, মাস্টারদা কি জানেন না আমি চট্টগ্রামের ফিজিক্যাল ক্লাবের বালিকা বিভাগেব ট্রেনার? মুষ্টিযুদ্ধ, ছোরার ব্যবহার, জাপানী কুস্তি—কোন্‌দিকে আমি ভাইদের চাইতে কম ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছি? আমি মোটর চালাতে জানি না? বন্দুক ধরতে শিখি নি? পিস্তল রিভলভার ব্যবহার কি আমাকে শেখানো হয় নি? মাস্টারদা তো খুব ভাল করেই জানেন আমার গুলি কখনই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। তবে, শুধু মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলেই কি এত অবিচার?"

বাংলাদেশের সকল বিপ্লবী বোনেদেরই হয়ত এই একই অভিযোগ ছিল যে, শুধু মেয়ে বলেই আমরা দিদির মত আরও অন্যান্য বোনদের—প্রীতি, কল্পনা, প্রমুখ সবাইকে বাদ দিয়েছি।

দিদির চোখের জল আর অভিযোগ অনুযোগে আমি অস্বস্তিবোধ করছিলাম। তখন যদি একথা বলতাম যে, 'যুদ্ধের একেবারে প্রথম সারিতে অংশ গ্রহণ করার মত উপযুক্ত করে বোনেদের আমরা শিক্ষা দিই নি এবং তা' যে দেওয়া হবে না, সে সিদ্ধান্ত আমরা গোড়ার দিকেই নিয়েছিলাম'—তাহলে হয়ত তিনি আরও আঘাত পেতেন, তাই শুধু সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললাম—

"দিদি আজকের আক্রমণের জন্য যাদের বেছে নেওয়া হয়েছে তাদের বহু দিন ধরে গোপনে অস্ত্রশিক্ষা ও আক্রমণ পদ্ধতি সম্বন্ধে ট্রেনিং দিয়েছি। তোমাদের শক্তি যে কোনদিকেই কম নয় তা' জানি—তবু এবার তোমাকে সঙ্গে নিতে পারব না। জানি না ভুল করেছি কি ঠিক করেছি—আগামী দিনের বোনেরা এ সংশয়ের সমাধান করবে। তবে এবারকার মত এটাই আমাদের সিদ্ধান্ত—এর আর নড়চড় হবে না।"

এখানে এ কথা বললে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, সত্যিই চট্টগ্রামের ও বাংলাদেশেব বোনেরা অদূর ভবিষ্যতে এ প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন। সাহেবদেব পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণকারী দলকে সফলতার সঙ্গে পরিচালিত করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার। মাস্টারদা ও তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁদেব কাজের সমান অংশীদার হয়ে পথে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে ও শত্রুব ফায়ারিং লাইনে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন চট্টগ্রামের মেয়ে—প্রীতি ও কল্পনা। বাংলাব অন্যত্রও মেয়েবা পিছিয়ে থাকে নি। অত্যাচারীর দম্ভের উপযুক্ত জবাব দিতে পিস্তল হাতে নির্ভয়ে এগিয়ে এসেছেন শান্তি, সুনীতি, বীণা।

আমার কথায় দিদি বুঝলেন সত্যিই শেষ মুহূর্তে আমাদের সিদ্ধান্ত কোন মতে বদলান যাবে না—তাঁর কোন আবেদনই কাজে লাগবে না। তাই তিনি আর কিছু না বলে খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর উঠে গিয়ে মাস্টারদার চিঠির উত্তব লিখে আমার হাতে দিলেন—

"মাস্টারদা—

আমার বৈপ্লবিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আহত অন্তরের অভিযোগ জানাইয়া শেষ মুহূর্তে আপনাকে বিরক্ত করিব না। আপনার আদেশ শিরোধার্য করিলাম। আশীর্বাদ করুন যে দায়িত্ব দিয়াছেন তাহা পালনের উপযুক্ত যেন হইতে পারি।

আপনার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

—দিদি।"

চিঠিটা দিয়ে দিদি নিজের ঘরে চলে গেলেন। তাঁর অন্তরের বেদনা আমি নিজের অন্তর দিয়ে অনুভব করছিলাম। কিন্তু কি করব—আমি নিরুপায়!

বৌদিকে আর একবার আমার কার্তুজগুলির কথা মনে করিয়ে দিলাম। তারপর দাদার কাছ থেকে পিস্তলটি নিয়ে বেরিয়ে এলাম। ২-৩০ মিনিটের সময় হেডকোয়ার্টারে মিটিং।

ঠিক সময়ে আমি হেডকোয়ার্টারে উপস্থিত হ'লাম। গণেশও হাজির। নির্মলদা, অম্বিকাদা ও মাস্টারদা আগে থেকেই কংগ্রেস অফিসে (মাস্টারদার বাসা) ছিলেন।

খুব সামান্ত একটু তরল কথাবার্তা ও হাসি-ঠাট্টার পর আমরা সবাই গাম্ভীর্যপূর্ণ আবহাওয়ায় আলোচনা স্বরু করলাম।

সমস্ত প্ল্যান ও আক্রমণের কর্মসূচীটি আমবা মুখে মুখে রিহার্সেল দিলাম—মৌখিক আলোচনাব পরে শেষবারের মত পরীক্ষা করে দেখলাম সব ব্যবস্থা ঠিক আছে কি না। কোন্ সময় কা'কে কোথায় হাজির হতে হবে, কোন্ কোন্ ঘাঁটি আক্রমণ করতে হবে, অস্ত্রশস্ত্র বিলি করার ঠিক মত ব্যবস্থা, কোন্ কোন্ পথ ব্যবহার করা নিরাপদ, বিভিন্ন নেতা ও বিভিন্ন দলের মধ্যে সংযোগ রক্ষার উপায়—সংকেত, সংকেত বাক্য, বিশেষ শ্লোগান, ইত্যাদি—সব কিছু বার বার খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হ'ল।

তারপব মাস্টারদা কয়েকটি প্রশ্ন করলেন, আমরা সেগুলিব উত্তর দিলাম—

মাস্টাবদা :—"আমাদেব বেবী-অস্টিনটি সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ক্লাব আক্রমণকারী দলের সঙ্গে যাচ্ছে। গাড়িটি ঠিক আছে কি? কে প্রথম চালাচ্ছে? যদি সে আহত হয় বা তার মৃত্যু হয়, তবে সেই গাড়ি কে চালাচ্ছে?

গণেশ :—এই সুদক্ষ দলটি প্ল্যান অনুযায়ী নবেশেব পবিচালনায় থাকবে। তাদের সব ব্যবস্থা পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক আছে। বেবী-অস্টিনটি ঠিক আছে। প্রথম নরেশ চালাবে, তাবপব ত্রিপুবা, তারপব মনোবঞ্জন—ওদের জন্য ভাবনার কোন কাবণ নেই।

মাস্টারদা :—নতুন বড গাড়িটি আনন্দ ঠিক মত চালাতে পাববে তো? গাড়িটির ট্রায়েল নিয়ে তার কি মনে হ'ল? সে চালায় ভাল তাতে সন্দেহ নেই,—তবু গাড়িটির অনুপাতে সে যে খুব ছোট! শেষ মুহূর্তেও যদি আমাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে, তবে তার বদলে অন্য কাউকে বড় নতুন গাড়িটি চালাবার ভার দেওয়া হোক্। অম্বিকাবাবুব মতটা চাই, তিনি কি আনন্দ গাড়ি চালালে নির্ভর করতে পারেন? টেলিফোন-ভবন আক্রমণকারী দলটিকে যদি আনন্দ গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যায় তাতে অম্বিকাবাবু ভরসা রাখতে পারছেন কি?

অনন্ত :—আমি তার ট্রায়াল নিয়েছি। আনন্দের মোটরগাড়ি চালাবার পারদর্শিতা সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। বড় গাড়ি হলেও গাড়িটির ওপর আনন্দের পুরো দখল আছে। আমার মনে হয় অম্বিকাদা নিঃসন্দেহে তাঁর দলটিকে নিয়ে আনন্দের গাড়ি করে টেলিফোন-ভবন ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে যেতে পারেন।

অম্বিকাদা :—অনন্ত বলেছে, ভালই করেছে। তার অভিমত শুনে আমরা সবাই আশ্বস্ত হয়েছি। কিন্তু যদি অনন্তের মত নাও শুনতাম তবু আনন্দের গাড়ি চালাবার দক্ষতা সম্বন্ধে আমার মনে কোন প্রশ্ন উঠত না।"

এই দু'টি মোটর গাড়ির deployment সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য জানবার পর আরও দু'টি গাড়ির ব্যবস্থা করা সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা হয়েছে। A.F.I. আর্মারী আক্রমণকারী দলের সঙ্গে অন্তত একখানা গাড়ি থাকা চাই। নির্মলদা ও লোকনাথের সঙ্গে যে দলটি এই অস্ত্রাগার দখল করতে যাবে, তাদের সঙ্গে ছয় সিলিণ্ডারযুক্ত একটি ডজ্ গাড়ি থাকবে। সেই উদ্দেশ্যে একটি ডজ্ গাড়ির ট্যাক্সি ড্রাইভারকে কিছু আগাম টাকা দিয়ে বন্দোবস্ত করে রাখা হয়েছিল। কথা ছিল এই ট্যাক্সির ড্রাইভার এলে তাকে জোর করে বেঁধে রেখে লোকনাথরা প্রায় ঘণ্টা তিন আগে থেকে গাড়িটি নিজেদের আয়ত্তে রাখবে। এই জন্যে সবরকম কার্যকরী বন্দোবস্ত বহু পূর্ব থেকেই করা ছিল—কখন, কোথায়, কারা, কিভাবে ড্রাইভারকে কোনরূপ জখম না করে হাত পা বেঁধে ক্লোরোফর্মের সাহায্যে অজ্ঞান করে রাখবে তার বিস্তারিত প্ল্যান করা ছিল। শেষবারের মত আলোচনা করে নিশ্চিন্ত হ'লাম যে, A.F.I. আর্মারী আক্রমণকাবী দল সুষ্ঠুভাবে এই গাড়িটি যোগাড় করবেই।

এখানে ক্লোরোফর্ম করার ব্যাপার নিয়ে একটু বলি। ডিটেকৃটিভ উপন্যাসে খুব ছোটবেলায় পড়েছি, আর যুব-বিদ্রোহের কিছুদিন পূর্বে আমাদের তরুণ বন্ধুরাও হযত সেইরূপ বই পড়েই জ্ঞান অর্জন করেছেন যে, ক্লোরোফর্ম নাকে চেপে ধরলেই অজ্ঞান হয়ে যায়। আমাদের মধ্যে শহীদ নরেশ রায় ও শহীদ বিধু ভট্টাচার্য, দুজনেই মেডিকেল স্কুল থেকে খুব ভালভাবে পাশ করে Gold Medalist বলে খ্যাতি লাভ করেছিল। আমাদের প্ল্যানের অপরিহার্য অংশ হিসেবে যখন দেখা গেল যে, অনেককেই অজ্ঞান করাবার প্রয়োজন হবে, তখনই আমরা কি করে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে অজ্ঞান করা যায়, তার প্রকৃত ট্রেনিং নেওয়ার ব্যবস্থা করি। গণেশের তত্ত্বাবধানে, গণেশেরই বাড়িতে নরেশ ও বিধু ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে অজ্ঞান কবাবার সাধারণ পদ্ধতি মাখন, ত্রিপুরা, দেবু, মনা ও আরও কয়েকজনকে শিক্ষা দেয়। একদিন সাত-আটজন যুবকবন্ধু স্বেচ্ছায় এগিয়ে এল তাদের অজ্ঞান করে প্র্যাক্‌টিস করার জন্য। তাদের অজ্ঞান করা হ'ল। দু'তিন ঘণ্টা ধরে এক একজন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। অজ্ঞান অবস্থায় তাদের নানারূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে—গোঙানি, হাত-পা ছোঁড়া, বমি করা, প্রভৃতি। এই বাস্তব অভিজ্ঞতার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল—অজ্ঞান করে যেখানে সেখানে ফেলে আসা যায় না। অজ্ঞান করে রাখবার উপযুক্ত স্থান বেছে না নিলে গোঙানি শুনে লোক জড়ো হওয়ার সম্ভাবনা।

তাই আমরা শেষ মুহূর্তে আবার একবার আলোচনা করে বুঝতে চাইলাম আমাদের ব্যবস্থা নিখুঁত আছে কি না—অক্ষরে অক্ষরে নির্দেশ প্রতিপালিত হবে কি না। নির্মলদা লোকনাথের সঙ্গে A.F.I. আর্মারী আক্রমণকারী দলটিকে পরিচালনা

করবেন এবং তাঁরাই ড্রাইভারকে শারীরিক শক্তিতে বশীভূত করে আক্রমণের তিন ঘণ্টা আগে থেকে গাড়িটি নিজেদের কর্তৃত্বে রাখবেন। নির্মলদা খুব জোরের সঙ্গে বলে আমাদের নিশ্চিন্ত করলেন—

"চিন্তার কোন কারণ নেই। আমরা স্থির জানি প্ল্যান অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হবেই। বহু rehearsal দিয়েছি—ড্রাইভারকে কে কিভাবে command করব, কে কোথায় দাঁড়াব, কিভাবে দূর থেকে পিস্তল লক্ষ্য করে তাকে ভয় দেখাব, ড্রাইভার হঠাৎ যেন কিছু করে না বসে তার জন্য প্রস্তুত থাকা, ইত্যাদি, ইত্যাদি অনেক বিষয় আমরা এতদিন ধরে প্র্যাক্‌টিস্ করেছি—গতকালও rehearsal দিয়েছি। মোটরগাড়ি হস্তগত করতে আমবা সফল হবই এবং অ্যাক্‌সনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নির্ধারিত নিরাপদ রাস্তায় ও স্থানে গাড়ি নিয়ে নির্বিঘ্নে অপেক্ষা করতে পারব।

A.F.I আর্মারী দখলের জন্য এই ডজ্ গাড়িটি পূর্বাহ্ণেই হস্তগত করা সম্বন্ধে আমরা আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু আমাদের প্রধান দুর্বলতা সম্বন্ধে আমরা সচেতন ছিলাম। যদি একটা গাড়ি কোন রকমে অকেজো হয়ে পড়ে, তবে সেই ক্ষেত্রে কি হবে? এই জন্যই প্রত্যেকটি আক্রমণকারী প্রধান দলের সঙ্গে অন্তত দু'টো করে গাড়ি থাকা উচিত। প্রথম শ্রেণীর লোকবলের limitation-এর জন্য এবং গোপনে ড্রাইভারকে নিরাপদে বেঁধে রাখবার পর্যাপ্ত স্থান না থাকায় জোর জবরদস্তি করে গাড়ি নেওয়ার পথ পরিহাব করতে বাধ্য হয়েছিলাম। দ্বিতীয় গাড়িটি—একটি ডজ্, আমাদের দরদী বন্ধু হেরম্ব বলের নিজস্ব গাড়ি। এই গাড়িটি মাঝে মাঝে আমরা চালাতাম—তার কাছ থেকে যখন তখন নিয়েও আসতে পারতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় গাড়িটি সেইদিন কারখানায় মেরামত হচ্ছিল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমরা খোঁজ রাখছিলাম সন্ধ্যের মধ্যে গাড়িটি সারানো হয় কি না। check-up করবার সময়, পর্যন্ত জানি যে, এই দ্বিতীয় গাড়িটি পাওয়া সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যাচ্ছে না, তবে পাওয়ার আশা আছে।

এই কারণে আমাদের স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা ছিল—যদি শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় গাড়িটি না পাই এবং কোন কারণে আমাদের একমাত্র গাড়িটিও খারাপ হয়ে যায়, তবে কি হবে? অন্ধকারে বা গাছের আবছা ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে রেল-লাইন ও নিজাম পল্টনের মাঠ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে হলেও আমরা অতর্কিতে A.F.I আর্মারী আক্রমণ করতে পারব এবং প্রতিকূল অবস্থায় যদি পড়ি তবে যে তাই করব, তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। তবু একটি মস্ত বড় প্রশ্ন আমাদের মনকে আলোড়িত করছিল—যদি ডজ্ বা অনুরূপ কোন ছয় সিলিণ্ডারের গাড়ি আমাদের সঙ্গে না থাকে তবে, আর্মারী দখল করে নেওয়ার পর অস্ত্রাগারের দরজা ভাঙবার বা খোলবার

সহজ ও সুনিশ্চিত পন্থা থেকে আমরা বঞ্চিত হব। জাহাজ বাঁধবার দড়ি নীয়েট লোহার দরজার হাতলের সঙ্গে ও মোটরের পেছনে বেঁধে চলন্ত মোটরের হ্যাচ্‌কা টানে দরজাটি ভাঙবার সহজ ও সম্ভাব্য কৌশলটি প্রয়োগ করতে না পারলেও অন্যান্য অপেক্ষাকৃত অনিশ্চিত ও কষ্টসাধ্য পন্থায় দরজা খোলার চেষ্টা করবার ব্যবস্থাও অবশ্য ছিল।

আমাদের ব্যাপক পরিকল্পনায় ছিল যে, পাঁচ মিনিট আগে টেলিফোন-ভবন ধ্বংস করা হবে, এবং ঠিক পাঁচ মিনিট পরে একসঙ্গে দুটি প্রধান শত্রুঘাটি— A.F.I. আর্মারী ও পুলিস-লাইন আক্রমণ এবং দখল করা চাই-ই। ত'াছাড়া সেই সঙ্গে ইউরোপীয়ান ক্লাবটিকেও যুগপৎ আক্রমণ করে সরকারী উচ্চপদস্থ ইউরোপীয়ানদের হত্যা না করলেই নয়।

ক্লাব-গৃহটি আক্রমণের জন্য সশস্ত্র বিপ্লবী দলটিব নানাভাবে ও নানা দিক্ দিয়ে পায়ে হেঁটে ক্লাবটিব খুব কাছে, মাঠের মধ্যে গাছের আড়ালে, 'পজিসন' নেওয়ার কথা ছিল। তাদের নিজেদের সঙ্গে যে সব অস্ত্র গোপনে নেওয়া সম্ভব তা'ছাড়া তরবারি, কুড়ুল, ভোজালী, ব্রীচ্‌লোডার বন্দুক, হাত-বোমা, পেট্রোলের টিন, প্রভৃতি বেবী-অস্টিনে করে আক্রমণের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তাদের কাছে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক আছে—কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি জানান হ'ল মাস্টারদাকে।

পুলিস-লাইন আক্রমণকারী দলের সঙ্গে গণেশ ও আমার থাকবার কথা—সেই দায়িত্ব আমাদের ওপর ছিল। পুলিস-লাইন আক্রমণ করতে যাওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গেও অন্তত একটি গাড়ি থাকা চাই। আমাদের প্ল্যান ছিল ড্রাইভারকে বাঁধাবাঁধির মধ্যে না গিয়ে আমরা মাখনদের, অর্থাৎ মাখন ঘোষালের বাবা—যশোদা ঘোষালের, ছয় সিলিণ্ডারযুক্ত প্রায় নতুন "এসাক্স" গাড়িটি নিয়ে পুলিস-লাইন আক্রমণ করতে যাব। এই গাড়িটিও আমবা প্রায়ই ব্যবহার করতাম। তারক ও অর্ধেন্দু যখন সাংঘাতিকভাবে বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়, তখন তাদের শুশ্রূষার জন্য সুবিধাজনক নিরাপদ বাড়ি খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এই "এসাক্স" গাড়িটি করেই তাদের নিয়ে নিরাপদ ও নির্জন রাস্তায় রাস্তায় আট ঘণ্টা ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি। কাজেই ১৮ই এপ্রিল রাত্রে পুলিস-লাইন আক্রমণের জন্য এই গাড়িটি যে আমরা নিশ্চয়ই নিতে পারব সে বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হয় নি। কিন্তু সব বাধাবিপত্তি যেন আমাদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে চক্রান্ত করেছে! এই "এসাক্স" গাড়িটিও কারখানায় ছিল। আমাদের হেড-কোয়ার্টারে যখন বিকেল আড়াইটা থেকে চারটা পর্যন্ত আমাদের শেষ সভা বসে, তখনও নিশ্চিত খবর পাই নি যে, "এসাক্স" গাড়িটি আমরা সন্ধ্যা ছ'টা বা সাড়ে ছ'টার সময় পাব।

এই জন্য সকলের দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না—যদি শেষ পর্যন্ত এই গাড়িটিও পাওয়া না যায়! সবাই গম্ভীর, সকলেই আকাশ-পাতাল ভাবছেন, মাস্টারদা বার বার আমার ও গণেশের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন—শুনতে চাইছিলেন আমরা এই সম্বন্ধে কি ভাবছি—কিভাবে এই সমস্যাব সমাধান করা যায়? গণেশ বলল—"এই ব্যাপারটা আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। হেরম্ব বলের 'ডজ্' আব মাখনদের 'এসাক্স' যদি শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রবঞ্চনা করে তবুও ভাববার কিছু নেই। আমরা একটি ট্যাক্সি-চালককে পরাভূত করে অনায়াসে গাড়িব সমস্যা দূর করব।" গণেশের কথা শেষ হতে না হতেই মাস্টাবদা আমাকে জিজ্ঞাসা কবলেন—"তুই কি বলিস্?" আমি মাস্টাবদাকে গণেশেব মত ভরসা দিয়ে বললাম—"শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমবা যে কোন উপায়ে মোটবগাড়ি যোগাড় করে নেবই।" এ কথায় সকলেই আশ্বস্ত হলেন বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সবাব মনেই যে একটা অনিশ্চয়তার ভয় ছিল, তা' সহজেই অনুমান করা যায়।

সামগ্রিক প্ল্যান অনুযায়ী এটা ঠিক ছিল যে, টেলিফোন-অফিস ধ্বংস করার পর অম্বিকাদা তাঁব দলটিকে নিয়ে, নতুন শেভ্রোলে গাড়িতে, পূর্ব নির্ধারিত পথে এসে পুলিস-লাইনে আমাদেব সঙ্গে মিলিত হবেন। এটা ধরেই নেওয়া হয়েছিল ইতিমধ্যে পুলিশ-লাইন ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিনীব চট্টগ্রাম শাখাব আক্রমণে বিধ্বস্ত হবে ও আত্মসমর্পণ করবে। প্ল্যান অনুসারে ইউবোপীয়ান ক্লাব আক্রমণকারী দলও তাদের নিদারুণ হত্যাকাণ্ড সমাপ্ত করে বিদ্রোহীবাহিনীর হেডকোয়ার্টার, এই পুলিস-লাইনে এসে যোগ দেবে—এই সিদ্ধান্তই স্থিব ছিল। আর নির্দেশ ছিল A.F.I. আর্মারী আক্রমণকারী দলটি অস্ত্রাগাব দখল করার পর সেখানেই অবস্থান করবে। হেডকোয়ার্টার থেকে, অর্থাৎ, আমাদের অধিকৃত পুলিস-লাইন থেকে, A.F.I. আক্রমণকারী দলেব সঙ্গে আমরা সংযোগ স্থাপন করব এবং অবস্থা অনুযায়ী নির্দেশ পাঠাব।

মোটরের হ্যাঁচকা টানে A.F.I. আর্মারীর দরজা ভাঙবার বিকল্প ব্যবস্থা এইভাবে করে রেখেছিলাম যে, টেলিফোন অফিস ধ্বংস করার পর 'শেভ্রোলে' গাড়িটি পুলিস-লাইনে যদি অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসে, তখন সেই গাড়ি করেই পুলিস-লাইন থেকে একটি ছোট দল A.F.I. আর্মারী দখলকারী দলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে যাবে এবং যদি গাড়ির অভাবে আর্মারীর দরজা তখনও ভাঙা না হয়ে থাকে তবে, শেভ্রোলে গাড়িটির সাহায্যেই সেটি ভাঙবার চেষ্টা করা হবে।

হেডকোয়ার্টারের এই শেষ সভায় এইরূপ বিস্তারিত আলোচনার পর বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থার বিষয় ভালভাবে check-up করে নেওয়া হ'ল। পুলিস-লাইন আক্রমণকারী দলের জন্ত মোটরগাড়ির ব্যবস্থা কিভাবে করা যায়—এই একটিমাত্র

'ট্যাক্‌টিক্যাল' বিষয়ের আলোচনা করেও এর "বিকল্প ব্যবস্থা" কিছু তখনও ঠিক করা সম্ভব হয় নি। গণেশ ও আমার কথার ওপর ভরসা করা ছাড়া অন্যান্যদের আর কোন উপায় ছিল না।

এই মারাত্মক দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও আমরা ১৮ই এপ্রিল দিনটি পিছিয়ে দিতে চাই নি। বেল-লাইন উপড়ে ফেলে শত্রুর রেলপথে চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ কববার জন্য দু'টি দল আগের দিন, ১৭ই এপ্রিল, রওনা হয়ে গেছে। প্রচারপত্র বিলি করার জন্য ছোট ছোট দল নির্দেশ মত স্থানে স্থানে চলে যাওয়ার কথা। আর তিনটি ছোট দল টেলিফোন, বিশেষ করে টেলিগ্রাফের তার কাটার জন্য ইতিমধ্যে বেরিয়ে পড়েছে।

এই সব ট্যাক্‌টিক্যাল বিষয়ে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া হয়েছে বলেই যে আর একদিন পেছনো যেত না, তা' নয়—ইচ্ছা করলেই অ্যাক্‌সন তখনও একদিন স্থগিত রাখা সম্ভব ছিল। কাবণ, তখনমাত্র বিকেল তিনটে।

আমাদের যুব-বিদ্রোহেব দিনটি আর পরিবর্তন কবতে চাইনি এই জন্যে যে, যদিও তখন পর্যন্ত গাড়িব সঠিক ব্যবস্থা না থাকা একটা "মারাত্মক" সাংগঠনিক দুর্বলতা, তবু চার ঘণ্টাব মধ্যে কোন একজন ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে কাবু কবে একটা গাড়ি যোগাব কবে আমবা প্রস্তুত হতে পাবব না—এটা একেবাবেই অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। প্ল্যান এবং আয়োজন আগাগোড়া নিখুঁতভাবে সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অ্যাক্‌সন সুরু না কবাই যেমন বিবেচনাপ্রসূত মিলিটারী স্ট্র্যাটেজী, ঠিক আবার বাস্তব অবস্থার সঠিক মূল্যায়ন না করেই অ্যাক্‌সন বিলম্ব কবাব 'অজুহাত' খুঁজে বেড়ানো মিলিটারী স্ট্র্যাটেজীর ততোধিক প্রতিকূল রণ-নীতি।

একদিন বিলম্বেব জন্য কত কি ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল! এতগুলি দলকে নির্দেশ দিয়ে তাদের নিজ নিজ দায়িত্বে আক্রমণ চালানোব জন্য deploy করেছি (ছড়িয়ে দিয়েছি)। তাবা প্রত্যেকে যদিও যুব-বিদ্রোহেব সামগ্রিক প্ল্যানটি জানতো না, তবু তাদেব নিজের নিজের অ্যাক্‌সন সম্বন্ধে অবহিত ছিল; আর অন্তত আন্দাজ করতে পারছিল যে, সেই দিনটিতে আরও অ্যাক্‌সন হবে। এইরূপ ক্ষেত্রে এতজনের মধ্যে যদি একজনও কেউ ভয়ে পালায়, অসুস্থ হয়ে পড়ে বা বিশ্বাস-ঘাতকতা করে তবে সার্বিক প্ল্যানের কাযকারিতার ওপরে আরও অধিক ব্যাঘাত আসবার আশঙ্কা আছে—এই ভেবে আমবা ১৮ই এপ্রিল অভ্যুত্থানের দিনটি পরিবর্তন করি নি।

তা'ছাড়া মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে বিবেচনা করে আমবা কোনমতেই আর একটি দিনও স্থগিত রাখা সমীচীন মনে করি নি। আজ সবার morale খুব উচ্চস্তরে আছে—কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সবাই আমরা আক্রমণ করতে যাব। এখন যদি একটি দিন পিছিয়ে

দিই তবে সবার মনে অবসাদ আসবে। এই সময় অবসাদ আসবার একটুও সম্ভাবনা যেখানে আছে, সেখানে কোনপ্রকার বিলম্ব করবার নীতি বর্জন করাই আমরা সর্বতোভাবে শ্রেয় মনে করেছি। সৈন্যদের morale আক্রমণের জন্য সব সময় উচ্চস্তরে তৈরি থাকে না—থাকা সম্ভবও নয়। বিশেষ করে সেইজন্যই একটি গাড়ির পাকাপাকি বন্দোবস্ত না থাকায় যুব-বিদ্রোহের দিনটি আরও একদিন স্থগিত রেখে বেশি প্রস্তুত হওয়ার অজুহাত অযৌক্তিক মনে হয়েছিল।

এই যুক্তি সমর্থনের জন্য তখনও আমরা লেনিনের (Lenin) লেখা কিছু পড়ি নি। বাস্তবক্ষেত্রে বাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সেইদিন মুষ্টিমেয় বিপ্লবীরা সূর্য সেনের নেতৃত্বে যুববিদ্রোহের দিনটি একদিনও পিছিয়ে দেওয়া অযৌক্তিক মনে করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, তার যৌক্তিকতা যখন আন্দামান জেলে মহান্ বিপ্লবী নেতা লেনিনের লেখায় পড়লাম তখন আমার মনে খুব আনন্দ হয়েছিল। লেনিন লিখছেন—

"To this we reply : speaking abstractly, it can not be denied, of course, that a militant organisation may thoughtlessly commence a battle, which may end in defeat, which might have been avoided under other circumstances. But we can not confine ourselves to abstract reasoning on such a question because every battle bears within itself the abstract possibility of defeat and there is no other way of reducing this possibility than by organised preparation for battle." (What is to be done ? Under heading—" 'Conspirative', Organisation 'Democracy' "—Lenin).

বাংলা অর্থ এইরূপ—এই সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য : অবাস্তব কল্পনায় অবশ্য অস্বীকার করা যায় না যে, কোন একটি সংগ্রামী সংগঠন বিচার-বিবেচনা না করেই হয়ত কোন সংগ্রাম আরম্ভ করে দিতে পারে যা' পরাজয়েই পরিণতি লাভ করবে, যদিও ভিন্ন পরিস্থিতিতে হয়ত এই পরাজয় পরিহার করা সম্ভব হ'ত। কিন্তু এইরূপ প্রশ্নের সমাধানের জন্য আমরা কখনও অবাস্তব কাল্পনিক যুক্তির মধ্যে আমাদের সীমাবদ্ধ রাখতে পারি না। কারণ, প্রত্যেক যুদ্ধের মধ্যেই পরাজয়ের কাল্পনিক সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকবে এবং সেইরূপ সম্ভাবনাকে লাঘব করার জন্য সংগ্রামের সুসংবদ্ধ প্রস্তুতি ছাড়া আর কোন কার্যকরী পন্থা নেই।

পুলিস-লাইনের জন্য গাড়ি যোগাড় করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব গণেশ ও আমার ওপর ছেড়ে দেওয়া হ'ল। তারপর আর একটি বিষয় খুব সংক্ষেপে আলোচিত হ'ল। সমস্ত শহর দখল করার পর আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম—বন্দুকের দোকান,

Imperial Bank ও জেল আক্রমণ করা। এখন কিভাবে তা' পরিচালনা করা হবে সেটা পরিস্থিতি অনুযায়ী ঠিক করে নেব—এমনও হতে পারে চোঙা মুখে চীৎকার করে বললে খুব সম্ভবতঃ তারা বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করবে। আক্রমণ ও অধিকারের পর প্রথম অধ্যায় শেষ হবে। দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু করার আগে আমরা সবাই বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে রাত্রের খাওয়া খেয়ে নেবো।

খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল মকলেশ্বর রহমানের রেস্তোরাঁতে। রেস্তোরাঁটি গণেশের দোকানের কাছেই। মকলেশ্বরের সঙ্গে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমরা সব সময় তার রেস্তোরাঁটির পৃষ্ঠপোষকতা করেছি। সেইদিন রাত্রে তার রেস্তোরাঁতে চৌষট্টিজনের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম। বোধহয় কিছু আগাম টাকাও দিয়েছিলাম। মকলেশ্বর সাহেবকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সরকারী পক্ষ আমাদের criminal association প্রমাণ করবার জন্য বহু প্রশ্ন করেছে। মকলেশ্বর সাহেব সব প্রশ্নই এড়িয়ে গেছেন। আজ হয়ত তিনি বেঁচে নেই। তিনি আমাদের বন্ধু ছিলেন। তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা চিরদিন অক্ষুন্ন থাকবে।

এবাব আমাদের মিটিং শেষ হ'ল। সকলে উঠে দাঁড়ালাম। এর পরে দেখা হবে রণসাজে—অভিযানের পূর্বমুহূর্তে। তারপরেও কি আবার দেখা হবে?—হয়ত এ' জীবনে আর হবে না!

সকলে উঠে পড়বার পর দিদির চিঠিটা মাস্টারদাকে দিলাম। চিঠিটা পড়ে মাস্টারদা একটু হাসলেন। তারপর আমার কাছে এসে নিম্নস্বরে বললেন—

"দিদি সত্যিই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কিন্তু কি করব? ভবিষ্যতের ইতিহাস যারা লিখবে তারাই আমাদের বিচার করবে। হয়ত এমন দিন আসবে, যেদিন বোনেরাই এগিয়ে যাবে ভাইদের পেছনে ফেলে।" একটু থেমে তারপর আবার বললেন—

"দিদিকে গিয়ে বলো······"—কি বলেছিলেন পরে বলছি।

যাবার সময় মাস্টারদা সবাইকে ডাকলেন। তাঁর গম্ভীর ধীর-স্থির কণ্ঠস্বর শেষবারের মত মৃত্যুপথযাত্রী সৈনিকদের কানে নব-জীবনের মন্ত্রে ধ্বনিত হ'ল—

"মাতৃভূমির নামে তুচ্ছ প্রাণ উৎসর্গ করে বীরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ব—শত্রুর দুর্গ অধিকার করে বিজয় পতাকা আকাশে ওড়াবো। যে কোন উপায়ে যে কোন মূল্যে শহর আমাদের চাই।"

হেডকোয়ার্টারে সভা শেষ হওয়ার পর প্রায় সাড়ে পাঁচটা-ছ'টার সময় বাড়ি ফিরলাম। দুপুর দু'টো নাগাদ যখন বাড়ি থেকে দিদির চিঠি নিয়ে বেরিয়ে আসি তখন দিদি ও দাদাকে বলে এসেছিলাম—"মা-বাবা তো ডবলমুড়িং-এর বাড়িতে আছেন; তোমরা যদি পার আজই মা ও বাবাকে নিয়ে শহর ছেড়ে কোন গ্রামে

চলে যাও। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শত্রু প্রথম পরাজয়ের পর হিংস্র জন্তুর মত আমাদের কয়েকজনের বাড়ি আক্রমণ করবে। আমাদের অবর্তমানে তা'রা তোমাদের ওপরেই নির্মম পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে তাদের জিঘাংসা চরিতার্থ করবে। মাস্টারদারও একই মত। তোমরা পারলে কোথাও চলে যেও।"

দিদির চোখমুখ মুহূর্তে লাল হয়ে উঠেছিল। তাঁর মধ্যে খুব একটা উত্তেজনা দেখতে পেলাম। তিনি নিজেকে খুব অসহায় মনে করছিলেন। তাঁকে আজকের অ্যাক্সনে নেওয়া হ'ল না, এর ওপরে আরও মা-বাবা, দাদা ও বৌদিকে শহর থেকে কোথাও দূরে নিয়ে যাবার দায়িত্ব দিলাম। তিনি এরকম কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তবু দিদিকে দু'কথায় যে বলেছিলাম—'আজ রাত্রে তোমরা শহর থেকে দূরে কোন গ্রামে চলে যেতে পারলে তাই যেও' এর বেশি দিদির সঙ্গে আমার কথা হয় নি—প্রয়োজনও ছিল না। আমার ঐটুকু কথার অর্থ ব্যাখ্যা করে না বোঝালেও দিদি যে অবস্থার গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

কারও হয়ত মনে হতে পারে অভ্যুত্থানের ঠিক পূর্বে অত গোপন প্ল্যান বাড়ির সবার কাছে আমার বলে দেওয়া কি ন্যায়সঙ্গত কাজ হয়েছে? যাঁরা আপাতদৃষ্টিতে দেখবেন তাঁদের তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। সেই যুগে যখন যুক্তিবাদের ওপর ভাবপ্রবণতার প্রাধান্য অনেক বেশি ছিল, তখনও আমরা মাস্টারদার নেতৃত্বে **Rational** হতে শিখেছি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধান্ত ভাবপ্রবণতার প্রভাব মুক্ত ছিল। আমার সহপাঠী, বন্ধু—কেদারেশ্বর ও সুধাংশু, পরোইকোড়া রাজনৈতিক ডাকাতিতে অংশগ্রহণের পর দল ত্যাগ করে। সেই সময় ভাবপ্রবণতার বশবর্তী হয়ে আমরা তাদের প্রতি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করি নি। বিচারবুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করেছি—তাদের পক্ষে পুলিসের প্রভাবে আসক্ত হওয়া সম্ভব, না কি আমাদের সহানুভূতি লাভ করলে দলের সঙ্গে শত্রুতা না করে বরং সাহায্য করা সম্ভব? ভবিষ্যৎ প্রমাণ করেছে, আমাদের সেই সিদ্ধান্ত নির্ভুল ছিল। আবার আর এক ক্ষেত্রে যখন বিশ্বাসঘাতক পুলিসের চর বলে বিশেষ একজনকে আমাদের জানতে বাকি ছিল না, তখনও ভাবপ্রবণতার উর্ধ্বে থেকে তাকে আমরা পুলিসেরই বিরুদ্ধে সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহার করেছি। মাস্টারদার নেতৃত্বে এইরূপ বহু **Rational** সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি।

আমাদের বাড়ির সবাইকে যুব-বিদ্রোহের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে "কোন একটি" সাংঘাতিক অ্যাক্সনের জন্য যে যাচ্ছি তার ইঙ্গিত দিয়েছিলাম। আমাদের অভ্যুত্থানের প্রথম শ্রেণীতে অংশগ্রহণকারী প্রায় আশিজন যুবক আজ যে একটা ঘটনা ঘটবে, সেইরূপ ধারণা পোষণ করেছে।

কিন্তু তাদের কারও পক্ষে সার্বিক প্ল্যান জানা বা অনুমান করা সম্ভব ছিল না। আমাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন বাদে, অন্য কর্মীদেব প্রায় সবাই—দু-তিন বছর, কেউ কেউবা মাত্র বছরখানেক পূর্বে আমাদেব বৈপ্লবিক সংগঠনে সভ্যপদ লাভ করেছে। অথচ আমাদেব বাড়িটি প্রথম থেকেই মাস্টাবদাব নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের একটি সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠেছিল এবং আমাদের সকলেবই গর্বের বস্তু ছিল। বিগত দশ বছব ধবে মা, বাবা, দাদা, বৌদি—সকলেই আমাদের সমর্থক ও অনেকভাবে সক্রিয় সাহায্য করেছেন। ১৯২৩ সালে, গৌরবময় "নাগাবখানা" খণ্ডযুদ্ধেব পব, বাড়িব টাকা "অপহবণ" কবাব সময় থেকে আমাব প্রতি বাবার যে বিরূপ মনোভাব ছিল, তা' তাঁব মন থেকে একেবাবে মুছে যায়। টাকা আমি "অপহবণ" কবেছিলাম কি না তাও অবশ্য বিবেচ্য, কাবণ, দিদিই আমাকে চাবি দিয়েছিলেন ও কোথায় কি থাকে তা' দেখিয়ে দেন। দাদা আমাকে গোপনে খবব পাঠালেন প্রেমানন্দকে নিয়ে যেন সেই ট্রেনে না যাই, কাবণ, গণেশের সঙ্গে আমাব পিসেমশাই যাচ্ছেন আমকে "পাকড়াও" করতে। বাড়িতে সব সময় বোমা-পিস্তল আনছি, বাখছি—সকলেই জানেন। তাঁবাই সব অস্ত্র যত্ন করে লুকিয়ে বাখতেন। ১৯২৪ সালেব অক্টোবব মাসে অর্ডিন্যান্সেব সাহায্যে যখন আমাকে পুলিস গ্রেফ্‌তাব কবতে এল তখন একটি বোমা ও দু'টি বিভলভার মা ও আমাব পিসতুত বোনেবা তাঁদের গাত্রাববণেব মধ্যে লুকিয়ে বাখলেন। ১৯২৮-৩০ সালে আমাদেব প্রতিটি বিষয় তাঁবা বাইবে থেকে লক্ষ্য করেছেন এবং প্রায় সময়েই দেখেছেন আমবা হাতবোমা ও বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র বাড়িতে এনে বাখছি এবং অনেক সময় অনেককে ঐ সবেব সাবাবণ ব্যবহাবপদ্ধতিও শিক্ষা দিচ্ছি। তা'ছাড, আমি বাড়িবই একজন বলে তাঁদেব প্রতি সদাসর্বদা দৃষ্টি বাখা ও তাঁদেব সহানুভূতিশীল চাবিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কবা আমার পক্ষে খুব স্বাভাবিক ছিল। সব চাইতে বড় কথা, তাঁবা দশ বছব ধবে নানাভাবে বিপদেব সময় পরীক্ষিত হয়েছেন—তাঁদের প্রতি আমার সন্দেহেব কোন অবকাশ ছিল না। সেইজন্য যুব-বিদ্রোহেব মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তাঁদেব শহর ছেড়ে কোন দূর গ্রামাঞ্চলে যাওয়ার সুযোগ থাকলে সেখানে যাওয়াই সমীচীন বলে মনে করেছিলাম। তাও মাস্টাবদাকে জিজ্ঞাসা না করে ও তাঁর অনুমতি না নিয়ে আমি তাঁদেব সেইরূপ পবামর্শ দিই নি। তাঁদেব সে কথা বলতে মাস্টাবদা একটুও দ্বিধাবোধ কবেন নি। মাস্টারদাব এই সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল ছিল তা' পরে প্রমাণিত হয়েছে—এই বাড়ির প্রত্যেকেই তাঁদের জীবন বিপন্ন করে আমাদেব আরও নানাভাবে সাহায্য কবেছেন।

আমি যখন হেডকোয়ার্টারের মিটিং সেরে বাড়ি ফিবলাম তখন দেখি বাড়িতে এক 'বিপ্লব'। মা-বাবা ডবলমুড়িং-এর বাসা থেকে বাড়িতে ফিরে এসেছেন।

বাড়ির সকলে দেশভ্রমণে যাবেন, এই অজুহাতে চাকর দু'জনকে ইতিমধ্যে ছুটি দেওয়া হয়েছে। হোল্ডঅলে দু-একটি বিছানা বাঁধা হয়েছে, দু-তিনটি ট্রাঙ্কও ঘরের মেঝেয় এনে রাখা হয়েছে। দাদা, দিদি ও বৌদি ব্যস্তসমস্ত হয়ে আরও কি কি বাঁধাছাদা করছিলেন। মা ও বাবা স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। বাড়ির আবহাওয়া থমথমে। দাদা, দিদি, বৌদি, মা, বাবা সবাই বিষণ্ণ।

আমাকে দেখামাত্র মা ও বাবা ব্যাকুল হয়ে উঠলেন—সহস্র প্রশ্ন তাদের মনে ভিড় করে আছে। বাবা বোধহয় আমাকে কি একটা বলতে চাইছিলেন কিন্তু বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না। মনে ঝড় বইছে—তার মুখের কথা মুখেই আটকে গেল। বিষাদভরা ঘরের ভারী আবহাওয়াকে হাল্কা করে দেবার জন্য সহজভাবে বললাম—

"কি বৌদি, আমার জিনিসগুলি ঠিক করে রেখেছ তো? তাড়াতাড়ি দাও, আর সময় নেই"—বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই সাজসজ্জা করবার জন্য নিজের ঘরে চলে গেলাম। বৌদির সঙ্গে সঙ্গে মাও এলেন, মায়ের পেছনে এলেন বাবা।

জীবনে সকলেই হয়ত সিনেমা ও স্টেজে নাটকের অভিনয় দেখেছেন—আমিও দেখেছি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত নিজেও অভিনয় করেছেন। আমি নিজে কখনও যে খুব ভাল অভিনয় করতাম তা' বলতে পারি না, তবে স্কুলে কয়েকবার ড্রামাতে অংশ গ্রহণ করেছি—দু-একবার হয়ত পুরস্কারও পেয়েছি। অভিনয় ভাল করেছি বলে পুরস্কার পেয়েছি নাকি আমার উৎসাহ দেখে মাস্টারমশাইরা আমাকে consolation prize দিয়েছিলেন তা' অবশ্য জানি না! গণেশ স্কুলের ড্রামায় খুব ভাল অভিনয় করত—বছরে দুটো ফাংশনে তার অংশগ্রহণ করতেই হ'ত। আন্দামান জেলে রাজনৈতিক বন্দীরা যখন নাটক মঞ্চস্থ করতেন, তখন একবার শরৎবাবুর কোন একটি বই করা হয়েছিল এবং তাতেও "নায়কের" ভূমিকায় গণেশ অভিনয় করে আমাদের কাছ থেকে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেছিল। নাটক যাও-বা করেছি গান সম্বন্ধে আমি বোধহয় অদ্বিতীয়। চার পাঁচ বছর আগে কোন এক ছুটির দিনে Mobility Pr. Ltd—মোটর কারখানার সুন্দর একটি অফিসে বসে আমার বিশেষ বন্ধু, কারখানার মালিক ৺কমল দে-র সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলাম। সেই সময়ে অন্যান্য বন্ধুরাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সবাই বিভিন্ন গায়ক ও গান সম্বন্ধে বেশ জমিয়ে আলোচনায় রত। তাঁদের বিভিন্ন মত বিনিময়ের মাধ্যমে যখন আসর খুব জমে উঠেছে তখন আমি কি একটা কথার জবাবে তাঁদের বললাম—"গান? তা' আমি খুব ভালই জানি! তবে কোরাসে সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান আমার আসে না—আমি solo (একা) গান গাইতেই অভ্যস্ত। প্রথমটা তাঁরা বুঝতে পারলেন না আমি কি বলতে চাইছি। তারপর যখন আমার solo গানের

রহস্য উদ্ঘাটন করলাম তখন তাঁরা হেসেই বাঁচেন না। দশম-শ্রেণীতে পড়বার সময় গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিই। প্রতিদিনই সভা, মিছিল লেগে আছে। মিছিলে একসঙ্গে পা ফেলে হাঁটবার সময় প্রায়ই marching song কোরাসে গাওয়া হ'ত। 'উর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণীতল'—কোরাসে গান হচ্ছে। সবার সঙ্গে উৎসাহে আমিও গান ধরলাম। সবার গান এক সুরে মিলে চলেছে একদিকে, আর আমার গান চলেছে অন্যদিকে—কারও সঙ্গে তার মিল নেই, কোন সুরের বালাইও নেই। আমার পাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা বিরক্ত হলেন—জোর করে আমার কোরাসে গাওয়া বন্ধ করে দিলেন। বললেন—"না ভাই, না—তোমার আর গান গাওয়ার দরকার নেই।" আমার গানের এই দক্ষতা সম্বন্ধে জানতে পারলে কে না হাসবে! কাজেই গানের চেষ্টা আমার জীবনে আর হ'ল না।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। আজকে যেমন ঘরে ঘরে Radio, চট্টগ্রামে সেই সময় গ্রামোফোনেরও তেমন আমদানী হয় নি। আমাদের পাড়ায় তখন পিসেমশায়েরই বোধহয় একটি মাত্র His Master's Voice গ্রামোফোন ছিল। গানের রেকর্ড বাজলে আমি শুনতে চাইতাম না, সব গানই একরকম মনে হ'ত। নাটক জাতীয় রেকর্ড যখন বাজত আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। সেইসব রেকর্ডের কথোপকথন সব সময় শুনে শুনে আমার প্রায় মুখস্ত ছিল। একটি রেকর্ড আমি প্রায় হাজারবার বাজিয়েছি—"জনা ও প্রবীর"—কি অপূর্ব লাগত! মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে প্রবীর যুদ্ধে চলেছে—মায়ের প্রাণভরা আশীর্বাদ প্রবীরের বুকে যেন অক্ষয় কবচ!

১৮ই এপ্রিল, সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে একটি বাস্তব "নাটকাভিনয়" হয়ে গেল, সেই নাটকের প্রধান নায়ক আমিই ছিলাম, আর সেই "নাটকের" চরিত্রায়নে অংশগ্রহণ করেছিলেন আমার দিদি, দাদা, বৌদি এবং মা ও বাবা। আজ বাবা-মা ও দিদি বেঁচে নেই—আছি আমরা ভাই দু'জন ও বৌদি। জীবনের বাস্তব নাটকের যে একটি চিত্র এখন দিচ্ছি, তা' পড়ে মনে হবে যেন সিনেমা বা থিয়েটারের জন্য রং চড়িয়ে মনোগ্রাহী করে লেখা একটি চিত্রনাট্য। কিন্তু সেইদিন নিজ জীবনে বাস্তব সত্য যা ঘটেছিল সেই দৃশ্য সিনেমা বা থিয়েটারের স্টেজে পাওয়া সম্ভব নয়।

বৌদির সঙ্গে মা-বাবাও আমার ঘরে এলেন। মায়ের মন তখন অনাগত বিপদের আশঙ্কায় অধীর হয়ে উঠেছে—স্নেহ-ব্যাকুল হৃদয়ে বার বার প্রশ্ন করছেন—

"কি হবে আজ? কি করতে চলেছিস্ তোরা?" পৃথিবীর লোকে কি জানবে তা' জানবার মায়ের আগ্রহ নেই—তিনি জানতে চান তাঁর পুত্রের ভবিষ্যৎ, তাঁর পুত্রের

জীবনের নিশ্চয়তা! মা উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করে চলেছেন—"বল্ বাবা, আমাকে খুলে বল্। কোথায় যাচ্ছিস্ এমন করে? কি তোরা করতে চাস্? কি হবে আজ রাতে?"—অনুভব করেছি তাঁর উৎকণ্ঠা। বুঝতে পারছিলাম মায়ের অশান্ত, অস্থির, উদ্বেলিত অন্তরের কথা। হৃদয়ঙ্গম করেছি পুত্রের অশুভ চিন্তায় তাঁর ব্যথিত হৃদয়ের করুণ আর্তনাদ! কি বলে মাকে বোঝাব? সোজা উত্তর দিলাম না। বললাম—"অস্থির হোয়ো না মা! জানতে পাবে, সবাই জানবে। আর কয়েক ঘণ্টা সময় দাও—সারা পৃথিবী জানবে কি করতে যাচ্ছি আমরা!"

মা একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন। মনের আসল কথাটি আর চেপে রাখতে পারলেন না। আবেগভরে বললেন—"সারা পৃথিবী যা খুসি জানুক! আগে বল্ তোর কি হবে? কি করতে চলেছিস্ তুই? বল্ আমাকে—সত্যি করে বল্।"

এবার মাকে মিথ্যা সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা না করে যাতে তিনি সত্য উপলব্ধি করতে পারেন সেইজন্য বললাম—"এত ভাবছ কেন মা? লক্ষ্মী মা আমার, শান্ত হও! কি আবার হবে আমার? কলেরা, প্লেগ কিম্বা যক্ষ্মা হলে যা হতে পারত, তার চেয়ে বেশি তো আর কিছু হবে না?"

সত্যিই মৃত্যুর চেয়ে বেশি আর কি হবে? তাও গৌরবের মৃত্যু। বিছানায় শুয়ে রোগে ভুগে ভুগে যন্ত্রণাকাতর মৃত্যু নয়—হাসিমুখে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা—বিপ্লবী সৈনিকের কাছে এর চেয়ে বেশি কাম্য আর কি হতে পারে?

আমি অল্পক্ষণের জন্যও তাঁদের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলবার সময় পাই নি। ছোট একটি ঘরে তাঁরা তিনজন দাঁড়িয়ে, আর আমি সর্বক্ষণ ঘুরে ঘুরে এটা-ওটা নিচ্ছি, সব গোছগাছ করছি সাজসজ্জা করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বার জন্য। তাঁরা হয়ত খুব মনঃক্ষুণ্ণ হচ্ছিলেন। কিন্তু আমার তা' ভেবে দেখার সময় তখন ছিল না। আমার গোছগাছ করবার কাজের মধ্যে মাকে আমি মাঝে মাঝে ঐসব বলে চলেছিলাম।

মা বাস্তব সত্য বুঝতে পারলেন—আমার মৃত্যুর বিভীষিকা যখন তাঁর মন আলোড়িত করল তখন চাপা কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

বাবা আর একবার কিছু বলবার চেষ্টা করলেন—"দেখ, আমি বলছিলাম কি—বলছিলাম·········"—এবারেও তাঁর বলা হ'ল না, আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

চামড়ার ক্রস্‌বেল্ট, পিস্তল রাখবার চামড়ার খাপ, হেলমেট্, বুট, পট্টি ও চামড়ার লেগিং নিয়ে আমি অন্য ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলাম। বাবা, মা, বৌদি হতবুদ্ধি হয়ে অসহায়ের মত সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

প্রায় পনেরো মিনিট পর আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বৃটিশ আর্মি জেনারেলের অনুকরণে খাকী পোশাক পরেছিলাম। দুই কাঁধের ওপর ঝক্‌ঝকে পেতলের ছোট ছোট তাবকা, ভারতবর্ষ, আড়াআড়িভাবে রাখা তরবারি, প্রভৃতি প্রতীক। কাঁধ থেকে দুই বাহুর ওপর ঝোলানো ঝল্‌মলে বিভিন্ন কারুকার্য করা ঝালর পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে। ইউনিফর্মের সঙ্গে কোটের কলারে ও বুকের ওপর নানা ধবণের ঝক্‌মকে চিহ্ন ও পদকাদি, পায়ে বুট, পট্টি ও তার ওপর চামড়ার লেগিং, কোমরে ও বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে ক্রস্‌বেল্ট আঁটা, মাথায় উজ্জ্বল সোনালী চিহ্নযুক্ত হেলমেট্‌ ও হেলমেটের একপাশে পালক গোঁজা। অপূর্ব রণ-বেশে মা-বাবাব কাছে এসে দাঁড়ালাম। এর আগে বহুবারই ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় আমাদের তাবা দেখেছেন। কোন কোন সময় জাতীয় ফাংশনে যখন ইউনিফর্মে সজ্জিত স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর সমাবেশ হ'ত, তখনও আমবা এইরূপ বৃটিশ আর্মির পোশাক পরেছি। আজকে যদি কাউকে সেই বেশে দেখি, তবে মনে হবে থিয়েটারের নকল জেনাবেল সেজেছে। কিন্তু সেইদিন যদিও নকল পোশাক পরেছিলাম, তবু নকল জেনারেল বলে মনে হওয়ার কোন অবকাশ হয় নি। যুব-বিদ্রোহের যে থিয়েটার-প্রাঙ্গণে অভিনয় করতে চলেছি, তার বাস্তবতা আমাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন কবেছিল যে, আমি নকল পোশাক পরেছি এটা ভাবা আমার পক্ষে সম্ভবই ছিল না।

মা ও বাবা জানতেন আজ তাঁদের পুত্র স্টেজে অভিনয় করবে না—যুদ্ধ-প্রাঙ্গণে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করবে। বিস্ফারিত নয়নে দু'জনে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁবা মুহূর্তের জন্য নির্বাক, নিস্পন্দ ও স্থির হযে দাঁড়িয়েছিলেন। পরক্ষণেই তাঁদের দীপ্ত উদ্ভাসিত চোখমুখ দেখে মনে হ'ল পুত্রের যুদ্ধযাত্রা ও প্রস্তুতি দেখে বাবা-মা শত অশুভ চিন্তা-ভাবনার মধ্যেও গর্ব অনুভব করছেন। বেশ বুঝতে পাবছিলাম দুই ধাবায তাঁদের চিন্তা প্রবাহিত হচ্ছে—একই সঙ্গে গর্ব অনুভব ও পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় বিচলিত হচ্ছেন; স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার আত্মবলিব প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন, আবার যেন কি একটা অনাগত মৃত্যু-বিভীষিকা তাঁদেব কোমল হৃদয়কে পুত্রস্নেহে চঞ্চল করে তুললো; আমার রণসাজ দেখে সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধকে অন্তরে অন্তরে স্বাগত জানালেন, আবার পর মুহূর্তেই আজ রাতে রণপ্রাঙ্গণের মৃত্যুর করালছায়া তাঁদের হৃদয়কে যেন ব্যথিত নিপীড়িত ও আলোড়িত করে তুললো।

আমার আজকের পরিহিত ইউনিফর্মে শুধু দু'টি ব্যতিক্রম ছিল। ডানদিকে বেল্টের সঙ্গে পিস্তল রাখবার চামড়ার একটি খালি হোল্‌স্টার বাঁধা আছে। বাড়িতে এসে হাতমুখ যখন ধুতে যাই তখন পিস্তলটি দিদিকে রাখতে দিই। তাই এই সময় হোল্‌স্টারটি খালিই ছিল। আমি আগে কখনও হোল্‌স্টার বেল্টের সঙ্গে

নিতাম না। আর একটি বিশেষ নতুন জিনিষ আজকের ইউনিফর্মের অঙ্গ হিসেবে ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার সৈনিকদের ব্যবহার করতে হয়েছিল। সেটি হচ্ছে, প্রায় রুমালের সাইজের কালো ভেলভেটের ওপর দুটো জাতীয় পতাকার নিদর্শন, তার চারপাশে উজ্জ্বল রূপালী জরীর কাজ করা, দূর থেকে সহজে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার মত এইরকম দুটি ব্যাজ আমার বুক ও পিঠ জুড়ে আঁটা ছিল। ভুল করে নিজেদের মধ্যে যাতে গুলী বিনিময় না হয়, সেই আশঙ্কায় বৃটিশ মিলিটারী ও পুলিসের খাকী পরিধানের সঙ্গে আমাদের ইউনিফর্মের এই ব্যবধান রাখা প্রয়োজন মনে করেছিলাম। ইউনিফর্ম পরে যখন ঘব থেকে আমাকে বেরিয়ে আসতে দেখলেন, তখন এক মুহূর্তে শতসহস্র চিন্তায় মা ও বাবার মন আলোড়িত হয়ে উঠলো। তারপর মা আর থাকতে পারলেন না। ধীরে ধীরে আমার কাছে এগিয়ে এলেন। আমার বুকে ভেলভেটের ওপর জরীর কাজ করা তাঁরই হাতের তৈরি ব্যাজ খুব ভাল করে দেখতে লাগলেন। দু'দিন আগে গণেশ মাকে দিয়ে এই ব্যাজগুলি তৈবি করিয়েছিল। সীতাকুণ্ডের মেলায় ভলাণ্টিয়ার-বাহিনী এইরূপ ব্যাজ পরবে বলে মাকে অজুহাত দেওয়া হয়েছিল। আজ মা বুঝতে পারলেন সেই ব্যাজের মূল উদ্দেশ্য। আমার বুকের ওপর তাঁর স্নেহমাখা কোমল হাতটি বোলাতে লাগলেন। কত মঙ্গল কামনা! কত আশীর্বাদ! বুকভরা কত মাতৃস্নেহ! রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে জলভরা দুটি চোখে মা তখনও নিজেকে প্রাণপণে সংবরণ করছেন। আর যেন পারছিলেন না—থর থর করে অধর কাঁপছে, মুখে কথা নেই। তাঁর স্নেহমাখা কোমল হাতের স্পর্শ আমার সারা শরীরে শিহরণ জাগিয়েছে, আবেগে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। অন্তরে অন্তরে মাকে প্রণিপাত জানালাম!

কী এক অপূর্ব দৃশ্য! ভারত-রমণীরা নিজ হাতে পুত্রকে, ভ্রাতাকে, স্বামীকে রণসাজে সাজিয়ে যুদ্ধে পাঠাতেন। বীর মাতা জনা বীর পুত্র প্রবীরকে সমর সাজে রণাঙ্গনে পাঠিয়েছিলেন। আজ যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার আগে পুত্র এসে দাঁড়িয়েছে পিতা-মাতার সম্মুখে তাঁদের আশীর্বাদ কামনা করে—ভাই এসেছে ভাইয়ের কাছে, বোনের কাছে, সহানুভূতি উৎসাহ ও প্রেরণা ভিক্ষা করে! স্টেজে অভিনীত নাটক নয়—জীবন-রঙ্গমঞ্চের বাস্তব নাটকের একটি দৃশ্য!

আজ স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীর নিজের হাতে গড়া অক্ষয় কবচ ধারণ করে আমি চলেছি স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির বন্ধনমোচন-মন্ত্র সার্থক করার উদ্দেশ্যে। মায়ের কোমল স্পর্শ আমার সর্বাঙ্গে অনুভব করলাম। মায়ের চোখের জল আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছিল—জোর করে নিজেকে সংযত করতে হ'ল।

সকলেরই মন তখন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। বাবা এতক্ষণ চুপ করে নির্বাক

দর্শকের মত সব দেখছিলেন। অনেক কষ্টে আবেগ সংযত করে এতক্ষণে তিনি বললেন—

"দেখ, আমি বলছিলাম, তোমরা কি খুব তাড়াতাড়ি একটা কিছু করে ফেলছ না? দেশ কি প্রস্তুত আছে? ভাল করে ভেবে দেখেছ, এখন এ রকম একটা কাজ করা কি ঠিক হবে?"

প্লাবনের যে প্রবাহে আমাদের তরুণ হৃদয় আজ উদ্বেলিত—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুকে সশস্ত্র আঘাত হানতে আমাদের যে খড়্গ আজ উদ্যত, তাকে প্রতিরোধ করার শক্তি কারও নেই—তাঁর কোন কথা, কোন নীতিবাক্যই আজ আর কোন কাজে আসবে না—এই অবশ্যম্ভাবী সত্য বাবার জানা থাকা সত্ত্বেও মনের অহেতুক নিষ্ফল বাসনা অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

বাবাকে তাঁর কথার কি আর জবাব দেব?' মনে স্বাভাবিকভাবেই বাবার কথাব প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া হ'ল। কবির ভাষায় মন আমাব গর্জন করে উঠল—

"আজকে যে যা বলে বলুক তোরে
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা
আয় দুরন্ত, আয় রে আমাব কাঁচা।"

এই কবিতাটি সে যুগে আমাদের সবার মুখে মুখে ছিল।

বাবার মনে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না। তিনি নিজ স্বার্থে—তাঁর পুত্রের স্বার্থে অভিভূত হয়েই তা' বলেছেন। ঐ কবিতাটি আমাদের সংগঠনে যদিও তরুণরা প্রবীণদের বিরুদ্ধে প্রায়ই ব্যবহার করত, তবু বাবাকে সেইটি শুনিয়ে আঘাত দেওয়া উচিত মনে হ'ল না। নিজেকে খুব সংযত করে শ্রদ্ধার সঙ্গে বাবাকে বললাম—

"দু'শ বছর ধরে পরাধীনতার ভার যারা বহন করেছে, শেকল ভাঙবার চেষ্টা করার সময় তাদের আর কবে আসবে? আমাকে আশীর্বাদ কর বাবা! তোমার পুত্র মাতৃভূমির জন্য আজ মৃত্যুবরণ করবে—একথা ভেবে দুঃখ ভুলে গর্ববোধ কর!"

বাবা একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন। ছেলে আজ রাত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেবে—স্বাধীনতার বেদীমূলে বুকের রক্তে আজ নিশীথে পূজার অর্ঘ্য সাজাবে! আসন্ন মৃত্যু, স্নেহ, গর্ব, আশীর্বাদ, কত কি বাবার মনে এক মুহূর্তে উদিত হ'ল! আবেগভরে তিনি বললেন—

"তোমার জন্য, তোমাদের সকলের জন্য আমার প্রাণভরা আশীর্বাদ রইল। মৃত্যু নয়—জয়ী হয়ে ফিরে এসো তোমরা!"

বাবার আশিসবাণী আমাকে শক্তি দিল, সাহস দিল, আমার যুদ্ধযাত্রা আরও প্রাণবন্ত করে তুলল। বাবার পায়েব ধুলো নিলাম। মায়ের প্রাণ এবার আর্তনাদ কবে উঠল—

"আমি যে ভাবতেই পারি না, তুই এই অসময়ে চলে যাবি! চিরকালেব মত আমায় আজ তোকে হারাতে হবে! এ যে অতি নিদারুণ! তোকে ছেড়ে আমি থাকব কি করে?"

মা আর বলতে পারছিলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ হ'ল। ছেলের যুদ্ধযাত্রা মায়েব চোখের জলে পাছে অমঙ্গল সূচনা কবে, তাই শত কান্না বুকে চেপেও মা প্রাণপণে চোখের জল সংবরণ কবলেন।

মাকে জড়িয়ে ধবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা কবলাম—"মা, তুমি ভেবো না। তুমি এমনি কবে ভেঙে পড়লে আমার সান্ত্বনা কোথায়? আমাকে তুমি অভয় দাও, উৎসাহ দাও—সাহস দাও। তুমি তো আমাদেব বৈপ্লবিক কাজে সব সময় সাহায্য করেছ। তবে আজ চূড়ান্ত পরীক্ষার দিনে তোমাব দ্বিধা কেন মা? মা, তুমি হাস! হেসে আমাকে একবাব বল –'যা ছুটে যা, শত্রুব শিবির বিধ্বস্ত করে ফেল্। Do or die শপথ নিয়ে শত্রুর ঘাঁটি লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়্'!"

মা'র মুখে একটু হাসি দেখলাম। একটুখানি যেন মানসিক বল ফিবে পেলেন। আমি বাড়ির বিষণ্ণ আবহাওয়ায় পরিবর্তন আনবার জন্য দাদাকে ডেকে বললাম—

"দাদা, আমাব তরবারিটি দাও!" তরবারি জেনারেলদের ইউনিফর্মের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। দাদা আমার হাতে খাপ সমেত কিরীচটি দিলেন। বাম কটিদেশে বেল্টের সঙ্গে তরবারি বেঁধে ফেললাম। তারপর পায়চারি করতে করতে বৌদিকে সম্বোধন করে বললাম—"কই বৌদি, আমাকে পিস্তলের কার্তুজগুলি এখনও দিলে না? শীগ্‌গির দাও, দেরি হয়ে যাচ্ছে।" বৌদিব হাতেই কাপড়ের থলেতে ভর্তি কার্তুজগুলি ছিল। কার্তুজের থলে হাতে নিয়েই এতক্ষণ তিনি আমাদের সাথে সাথে ঘুরছিলেন—আমাকে দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। আমি বলামাত্র বৌদি আমাকে থলেভর্তি কার্তুজগুলি দিলেন। সেগুলি ঠিকঠাক করে রাখতে রাখতে দিদিকে বললাম—"দিদি, এবার তুমি আমার পিস্তলটি দাও।"

গুলীভরা পিস্তলটি আমার হাতে তুলে দিয়ে দিদি বললেন—"এগিয়ে যাবি! একটি গুলীও যেন ব্যর্থ না হয়।" পিস্তলটা হোল্‌স্টারে রেখে দিদির কানে কানে বললাম মাস্টারদার শেষ বাণী—

"তোমাদের বাড়ির ব্রীচ্‌লোডার বন্দুকটি তোমার জন্য রইল। প্রয়োজন হ'লে বিনা দ্বিধায় ব্যবহার কোরো। জানি, তোমার গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।"

দিদির চোখদু'টি উৎসাহে একবার জ্বলে উঠল। অধর দংশন করে মনে মনে

যেন কি একটা প্রতিজ্ঞা করে নিলেন। তারপর খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—'বুঝেছি, আর বলতে হবে না। মাস্টারদাকে বলিস্, আমার কাজ আমি ঠিকই করব।"

বাবা-মা বুঝতে পারছিলেন, আর বেশি সময় নেই। নাটকের শেষঅঙ্ক অভিনীত হচ্ছে। আমার বিদায়ের পালা—এখনি আমি চিরকালের জন্য তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাব। মৃত্যুপণ করে চলেছি—জীবনে আর তাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হবে না।

দিদিকে প্রণাম করে আশীর্বাদ চাইলাম। দিদি অকুণ্ঠচিত্তে আশীর্বাদ করে বললেন—"দেশের মুক্তিযুদ্ধে তোদের প্রাণ দান কখনও নিষ্ফল হবে না !"

দাদা-বৌদিকে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিলাম। বাবার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বিদায় নিলাম। বাবা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বুঝতে পারছিলাম অতি কষ্টে আমার মুখ চেয়ে তিনি নিজেকে সংযত রেখেছেন। তাঁর অন্তরের তুমুল ঝড়ের বহিঃপ্রকাশ নেই। কেবলমাত্র একটি দীর্ঘশ্বাস পড়তে শুনলাম। আমার মাথায় হাত রেখে তিনি আশীর্বাদ করলেন।

এবার মা'র দিকে এগিয়ে গেলাম। এতক্ষণ বহু কষ্টে মা যতদূর সম্ভব নিজেকে সংযত রাখতে চেষ্টা করেছেন। বার বার তাঁর চোখ ঝাপ্‌সা হয়েছে, তবু সামলে নিয়েছেন—কান্না রোধ করেছেন। আমি তাঁকে শেষবারের মত প্রণাম করে বিদায় নিতে যাচ্ছিলাম। মা আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না। আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। আর দেরি করলে চলবে না। মার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে যাত্রা করলাম। উঠোন পার হবার সময় আর একবার হাত নেড়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। করুণ দৃষ্টিতে তাঁরা আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। কি যে করবেন তা' যেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। আমি উঠোন পেরিয়ে যখন বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করব, তখন মা-বাবা সকলেই আমাকে অনুসরণ করলেন শেষবারের মত দেখবার জন্য। আমার বুকের মধ্যে ঝড় বইছিল। মায়ের কাতর কণ্ঠস্বর আমার কানে বাজছিল। তাঁর চোখের জল আমার হৃদয় মথিত করে তুলছিল। আমার অন্তরের কান্না আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। মা-বাবা সাময়িক কষ্ট পেলেও স্বাধীনতা যুদ্ধে আমার প্রাণদানের জন্য পরে নিশ্চয়ই গর্ব অনুভব করবেন—এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিলাম।

আমি গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় মা বৈঠকখানা ঘরের সিঁড়ির ওপর থেকে বেশ জোরে জোরে চীৎকার করে বলছিলেন—"না, না, তা' হয় না—হতে পারে না। আমার আশীর্বাদ রইল তোর সঙ্গে। মৃত্যু কাছে আসতে পারবে না,

জয়ী হয়ে ফিরে আসবি তুই। আমার বুক থেকে তোকে ছিনিয়ে নিতে কেউ পারবে না—কেউ না, কেউ না—।"

নতুন শেভ্রোলে গাড়িটি বাড়ির কম্পাউণ্ডে রাস্তার দিকে মুখ করে রেখে বাড়ির অন্দরমহলে গিয়েছিলাম প্রস্তুত হয়ে আসতে। গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। শেষবারের মত মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকালাম। মা সিঁড়ির ওপর তখনও দাঁড়িয়ে। আমার মুখ দেখতে পেয়ে দু' হাত সোজা আকাশের দিকে তুলে জোরে জোরে কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে বললেন—

"আমার আশীর্বাদ—কেউ তোকে স্পর্শ করতে পারবে না…।" বিগলিত ধারায় অশ্রু বইছে। তখনও মা দু' হাত তুলে আছেন—কতই না আশীর্বাদ করছিলেন!

আর অপেক্ষা করলাম না। ধীরে ধীরে আমার গাড়ি এগিয়ে চলল। গাড়ির মধ্যে ভাবাবেশে রেকর্ডের 'জনা ও প্রবীর' নাটকের আমার প্রিয় ক'টি লাইন উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগলাম—

"অক্ষয় কিরীট শির তব পদধূলি,
মাতৃনাম অক্ষয় কবচ বুকে
সম্মুখ সমরে বিমুখ কে করে মোরে?"

আমার গাড়ি গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়লো। একা গাড়ি চালাচ্ছি। বাড়িতে এত করুণ একটি নাটক শেষ করে এসেছি। তার রেশ তখনও কিছুটা অনুভব করছিলাম। বাবা ও মা'র জন্য কষ্ট হচ্ছিল। আসবার সময় তাঁদের একবারও জিজ্ঞেস করি নি তাঁরা কোথায় যাচ্ছেন, আর তাঁরাও আমাকে কিছু বলে আমার মন ভারাক্রান্ত করতে চান নি। তাঁরা কোথায় যাবেন বা কি করবেন—এইরূপ কোন ভাবনাই তখন আমার মনে আসে নি। দিদি আছেন—দাদা উপস্থিত, তবে ভাববার কি আছে?

বাড়ি ছেড়ে এতক্ষণে আমি অনেক দূর চলে এসেছি। বিপ্লবী দলে যোগ দেওয়ার পর থেকে শিখেছি আনন্দমঠের স্বদেশপ্রেমের বাণী—'আমাদের ঘর নেই, বাড়ি নেই, মা নেই, বাপ নেই—আমরা শুধু জানি জন্মভূমিই আমাদের জননী!' আজ, ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ সাল, সন্ধ্যার সময় যখন চিরকালের জন্য ঘরবাড়ি সব ছেড়ে চলে এলাম, তখন আমি আর বলতে পারলাম না—'মা নেই, বাপ নেই।' আমার অন্তর বলছিল—মা আছেন, বাবা আছেন—আছে তাঁদের স্নেহ, আশীর্বাদ। ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধে—জননী জন্মভূমির মুক্তিযুদ্ধে মা-বাবার আশীর্বাদ এক মহান্ ইতিহাস রচনা করেছে।

আমার এই লেখাটি একটুও অতিরঞ্জিত নয়—এর একটি অক্ষরও মিথ্যে নয়। এর সবটুকুই বাস্তব সত্য। আরও অনেক সূক্ষ্ম নাটকীয় ঘটনা সেই সময় পর পর দ্রুত

ঘটে যায়। আমি সবটুকু লিখে পাঠকবর্গের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। সেই অবস্থার মাত্র একটুখানি বাস্তব চিত্র না দিলে বোঝা সম্ভব হবে না বাংলা ও ভারতের বিপ্লবী ইতিহাসে এইরূপ কত ঘটনা আছে। আমার জীবনে যে ক'টি এই ধরণের ঘটনার সঙ্গে পরিচয় ছিল তারই মাত্র বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব। পরের কাছে শোনা ঘটনা আমার যা' জানা আছে, তাও অবশ্য উল্লেখ করব। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বা নিজে অংশগ্রহণ করে যা উপলব্ধি করা যায়, তার বিবরণ পরিবেশন কবা নিজের সসীম ক্ষমতাব মধ্যে যতদূর সম্ভব, শোনা কথার ভিত্তিতে তা' কবা যায় না। তাই শোনা কথা আমি ভালকরে ও বিশদভাবে লিখতে না পারার জন্য যদি কেউ মনে করেন যে, কেবল নিজের কথাই লিখছি তবে আমাব প্রতি অবিচার কবা হবে। বাড়ির সবাই সশস্ত্র বিপ্লবের সহায়ক না হলে আমার বাড়িতেও এইরূপ ঘটনা ঘটা সম্ভব ছিল না। যতীন মুখার্জী, কানাইলাল, ক্ষুদিরাম, সূয সেন, নির্মলদা, লোকনাথ, গণেশ ও অন্যান্যদেব জীবনেও এই ধরণের অনেক ঘটনা হয়ত আছে। সেই সব জীবনস্মৃতি কে লিখবে?

কত করুণ—কত হৃদয়গ্রাহী কাহিনী! ভারতেব বিপ্লবী ইতিহাসের পাতায় পাতায কত বিস্ময়কর ঘটনা! আমার পক্ষে সে সমস্ত জানা সম্ভব নয়। তা' ছাড়া আমার অক্ষম লেখনীতে তার প্রকৃত বর্ণনা দেওয়াও সম্ভব নয়। শক্তিশালী কোন সাহিত্যিকের লেখনী যদি সেই যুগের স্মৃতি বহন কবে এ কাহিনী লিখতে পাবত, তবেই অতীত ইতিহাসের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব হ'ত।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। সাতটার সময আমাদের ফাইনাল রিপোর্ট জানা প্রয়োজন—সব ঠিক আছে কিনা—আক্রমণ করবার জন্য সব দল সর্বতোভাবে প্রস্তুত কিনা।

স্থান—আসাম-বেঙ্গল রেল অফিসের পাশের রাস্তা। সময়—১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল, সন্ধ্যা সাতটা। নতুন শেভ্রোলে গাড়ি ও অপর দিক থেকে আমাদের "এম্ডেন"—২৪৪৪ নম্বরের গাড়িটি এসে পাশাপাশি দাঁড়াল। দ্বিতীয় গাড়িটি থেকে গণেশের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"হ্যালো মার্শাল!"

গণেশও আমার মত জমকালো পোশাক পরেছিল। তবে তার ফিল্ড মার্শালের পোশাকে—কটিদেশে তরবারির পরিবর্তে হাতে ফিল্ড-মার্শালের "ব্যাট", অর্থাৎ ছোট যষ্টি ছিল। কী অপূর্ব মানিয়েছে! গণেশের তখন গোঁফ ছিল। উদ্ধতভাবে গোঁফে তা দিয়ে রাখত বলে মনে হ'ত যেন শত্রুকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানাচ্ছে।

গণেশ আমাকে বলল—"দুটো গাড়ির একটিও শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। কোনটারই মেরামত শেষ হয় নি। আমাদের বন্ধু দু'জন দু'টো কারখানাতেই সারাক্ষণ তদারক করেছে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত কোনমতেই মিস্ত্রীরা আজ গাড়ি দিতে পারল না।"

হেডকোয়ার্টারের সভায় আমরা এইরূপ একটা আশঙ্কা করেছিলাম। তবু মনে মনে ভরসা ছিল যে একটা গাড়ি অন্তত সময় মত পেয়ে যাব। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ছেলেরা এসে রিপোর্ট করেছে—আর কত কাজ বাকি আছে, কতক্ষণে গাড়ি পাওয়া যাবে, ইত্যাদি। তারপর শেষের দিকে পনেরো মিনিট অন্তর সাইকেলযোগে গণেশকে বারে বারে জানিয়ে গেছে মেরামতের কাজ আর কত বাকি।

কী নিদারুণ দুঃসংবাদ! কী ভয়ানক সমস্যা! এখন সাতটা বেজেছে। নির্মলদা ও লোকনাথের সঙ্গে আমাদের দেখা হওয়াব কথা সাড়ে সাতটার সময়। তারপর দেখা হবে অম্বিকাদাদের সঙ্গে। এই ফাইনাল চেক্‌আপের পর টেলিফোন-অফিস, অক্‌জিলিয়ারি ফোর্সের আর্মারি ও পুলিস লাইন প্ল্যান অনুযায়ী একযোগে আক্রমণ করবাব জন্য এই প্রধান তিনটি দল আক্রমণস্থলের নিকটে পজিসন নেবে এবং ঘডিব কাঁটায় কাঁটায় ধায সময়ে আক্রমণ সুরু করবে। শেষ মুহূর্তে যদি কোন বিভ্রাট হয় সেইরূপ অনিশ্চয়তার আশঙ্কা করেই আমবা বিশেষ প্রয়োজনবোধে আক্রমণের কিছুক্ষণ আগে প্রধান তিনটি দলেব মধ্যে একবার সংযোগ স্থাপন ও ফাইনাল চেক্‌-আপের ব্যবস্থা রেখেছিলাম।

পুলিস-লাইন আক্রমণকারী দলের সঙ্গে যাওয়াব জন্য যে গাড়ির ব্যবস্থা করা ছিল তা' যখন শত চেষ্টার পরেও শেষ মুহূর্তে পাওয়া গেল না, তখন সমস্যাটি বাস্তবে দাঁড়াল এইরূপ—যে কোন উপায়ে হোক্ না কেন আমাদের একখানা গাড়ি কিছুক্ষণেব মধ্যেই যোগাড় করতে হবে। কিন্তু এই আধ ঘণ্টার মধ্যে একটি ট্যাক্সি ভাড়া কবে এনে চালককে বেঁধে রেখে গাড়িটি নিয়ে আমাদের সকলের ঠিক 'জিরো আওয়াবে' (zero-hour) আক্রমণের জন্য পুলিস-লাইনে পৌছনো সম্ভব নয়। অন্তত দুটি ঘণ্টা সময় চাই—অর্থাৎ রাত আটটার সময় যুগপৎ আক্রমণ সুরু না করে আমাদের তা' করতে হবে রাত দশটায়।

গণেশ ও আমার মধ্যে কোন মৌখিক আলোচনা হচ্ছিল না। দু'জনের মাথার মধ্যেই যেন অবিরত মেশিনগানের গুলীবর্ষণ হচ্ছে। ছোট বড় সব দলকে দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করবার জন্য এই অল্প সময়ের মধ্যেই খবর পাঠাতে হবে। শেষ মুহূর্তে এইরূপ আকস্মিক ব্যতিক্রম সকলের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে? দু'ঘণ্টা দেরি করার অর্থ হ'ল, চৌষট্টিজন যুবক বৃটিশ সামরিক পোশাকে সজ্জিত হয়ে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আরও দু'টি ঘণ্টা অপেক্ষা করবে। এর মধ্যে যে বিলক্ষণ অনিশ্চয়তা আছে! ট্যাক্সি চালককে বেঁধে রেখে হস্তগত করা ট্যাক্সি নিয়ে লোকনাথদের আরও দুটি ঘণ্টা শহরে অতিবাহিত করাও ততোধিক বিপদের কথা। কি করে সব দলগুলিকে এই অল্প সময়ের মধ্যে খবর দেব? কি করেই বা এইটুকু সময়ের মধ্যে একটি গাড়ি যোগাড় করব?—এইসব প্রশ্নে আমাদের মন তোলপাড় করছিল।

এতক্ষণ ধরে যে সমস্তাগুলির কথা বললাম তা' এক সেকেণ্ডের কম সময়ে মনের পর্দায় ছবির মত ভেসে উঠল। এরকম সঙ্কটমুহূর্তে বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে মাথা স্থির রেখে বিকল্প কর্মসূচী গ্রহণ করা সমব-কুশলতার প্রধান অঙ্গ। নিমেষে অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে আমাদের তখনি কার্যকরী ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে হ'ল। এক মুহূর্তে প্ল্যান করে ফেললাম কি করে সমস্ত বিভক্ত দলগুলিকে দুটি ঘণ্টা আক্রমণ বিলম্বিত করার খবর পাঠানো যাবে।

আমরা দুজনে একই সঙ্গে আগে পিছে গাড়ি নিয়ে চলেছি। খুব কাছেই নরেশ রায় অপেক্ষা করছিল। গণেশ বেবী-অস্টিনটি প্ল্যান অনুযায়ী নরেশের জিম্মায় দিয়ে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে জানিয়ে দিল—সময পরিবর্তন কবা হয়েছে, রাত আটটার পরিবর্তে বাত দশটায আক্রমণ করতে হবে।

তারপর আমরা দুজনে শেভ্রোলে গাড়িটি নিয়ে আর্মারির আধ মাইলের মধ্যে একটি স্থানে লোকনাথদের সঙ্গে দেখা করতে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলাম। আসাম-বেঙ্গল বেলের জেনারেল-বিল্ডিং-এব রাস্তাটি দুটি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে নেমে নিজাম পল্টনের মাঠেব গা ঘেঁষে দু'ভাগ হয়ে বামে ও দক্ষিণে চলে গেছে। তখন এই বাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির কোন আলোর ব্যবস্থা ছিল না। সারি সারি গাছের ছায়া রাস্তার উপব এসে পড়েছে। রাস্তার অপর দিকে পাহাড়, তার ওপর সাহেবদের বাংলো—এই নির্জন স্থানটিতে ঠিক সাড়ে সাতটার সময, আক্রমণের আধ ঘণ্টা পূর্বে, শেষবারের মত আমাদের সাক্ষাৎ।

দু'দিক থেকে আমাদের দু'টো গাড়ি পাশাপাশি এসে দাঁড়াল। একটি আমাদের শেভ্রোলে ও অপরটি বলপূর্বক হস্তগত করা ডজ্ গাড়ি। মোটরের আলোতে যখন লোকনাথের দলটিকে দেখলাম তখন যেন আমার চোখ ঝলসে গেল! পুরোদস্তুর জেনারেলের পোশাকে লোকনাথ গাড়ির প্রথম সীটের বাঁদিকে ও তার ডানদিকে বসে স্টিয়ারিং হাতে মাখন ঘোষাল গাড়ি চালাচ্ছে। মাখন ঘোষালও বৃটিশ অফিসারদের মত নিখুঁত সামরিক খাকী পোশাকে সজ্জিত। পেছনের সীটে নির্মলদা, রজত আর বোধহয় সুবোধ চৌধুরী বসা। প্রত্যেকেরই আমাদের দলের সামরিক-পদ অনুযায়ী ইউনিফর্ম পরা ছিল। তাদের মাথায় বিভিন্ন চিহ্ন শোভিত হেলমেট্, বুকে সোনালী ও রূপালী রং-এর তারকা ও নানা রকমের কারুকার্য এবং সর্বোপরি বুকে পিঠে আমাদের ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির বিশেষ ধরণের উজ্জল ব্যাজ জ্যোতি বিকিরণ করছিল। এই চোখ ধাঁধানো দৃশ্যের বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করলাম বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসে উদ্যত পাঁচজোড়া চোখের বিদ্যুৎ ঝলকানো চাহনিতে।

অন্ধকারে পাহাড়ের ধারে গাছের ছায়ায় ফিল্ড মার্শাল গণেশ ঘোষ ও আমি এসে

উপস্থিত। আক্রমণের পূর্ব মুহূর্তে এই দু'টি দলের ঐতিহাসিক মিলনের সাক্ষী মাত্র আমরা এই ক'জন। আর অন্ধকারে গোপনে আমাদের দেখেছে আকাশের রাশি রাশি নক্ষত্ররাজি। নির্মলদারা ডজ্ গাড়িটি বলপূর্বক হস্তগত করেছেন। গাড়ির ড্রাইভারকে বেঁধে রেখে এসেছেন। আক্রমণের প্রথম পদক্ষেপ ইতিমধ্যে তাঁরাই সুরু করেছেন। আমাদের কাছ থেকে "সব ঠিক আছে—আটটার সময় আক্রমণ করা চাই", এই কথা শোনবার জন্যই সকলে উদগ্রীব হয়ে ছিল।

ড্রাইভার ছাড়া ডজ্ গাড়িটি দেখেই বুঝেছিলাম ইতিমধ্যে প্রাথমিক কাজ তারা নির্বিঘ্নে সেরে এসেছে। তবু জিজ্ঞাসা করলাম—"কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটে নি তো? ড্রাইভার অক্ষত আছে তো? কোনরূপ চেঁচামেচি, লোক জানাজানি হয় নি তো? আরও দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে ড্রাইভার সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে পুলিসে খবর দিতে পারবে না তো?"

এইরূপ প্রশ্নের কারণ প্রথমটা ঠিক বুঝতে না পারলেও তারা অনুমান করেছিল বোধ হয় কোন ব্যবস্থা তখনও অসম্পূর্ণ আছে। লোকনাথ অস্থির হয়ে বলল—"প্রাথমিক কাজ যা' করবার তা' আমরা সুষ্ঠুভাবেই করেছি। এখন বলুন আপনাদের আর আর সব ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা।"

গণেশ উত্তর দিল—"সবই ঠিক আছে, তবে—" গণেশের কথা শেষ হবার আগেই লোকনাথ অস্থির হয়ে প্রশ্ন করল—"তবে? তবে কি?"

গণেশ—"পুলিস-লাইনে নিয়ে যাবার জন্য যে ক'টি গাড়ি রাখা ছিল তার একটিও পাওয়া গেল না। সব গাড়িই কারখানায়। সেইজন্য আমাদের আরও দু'ঘণ্টা সময় পেছুতে হবে।"

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সবার মধ্যে একটা অস্বস্তির ভাব দেখা গেল। শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতি ও প্ল্যানের এইরূপ ব্যতিক্রম ও ওলোট-পালট হওয়াটা সবার কাছেই অবাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়েছিল। নির্মলদা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এই সময়ে আরও দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করা যেন একেবারে ধৈর্যের সীমার বাইরে!

যাঁদের জীবনে অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা বুঝতে পারবেন অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম নিয়ে কোন অ্যাক্‌শনে যাওয়ার আগে মনের অবস্থা কিরূপ থাকে—প্রতি মুহূর্তে আতঙ্ক, আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দোল খেতে হয়। লোকনাথেরা ড্রাইভারকে কিছু আগে বেঁধে রেখে এসেছে। সঙ্গে তাদের নানা অস্ত্রশস্ত্র আছে। ছোট ছোট আরও কয়েকটি দল পায়ে হেঁটে নিজাম পল্টনের মাঠে এ, এফ, আই, আর্মারির কাছাকাছি এসে গোপনে অবস্থান করছে। তাদের সঙ্গে জাহাজ বাঁধার মেনিলা দড়ি, মই, গাঁইতি, পেট্রলের টিন, ইত্যাদি সরঞ্জামও থাকবার কথা। বলাই বাহুল্য, এই অবস্থায় আরও দু'টি ঘণ্টা অপেক্ষা করা কেউ বাঞ্ছনীয় মনে করছিল

না। আমাদেরও তা' ঈপ্সিত ছিল না। কিন্তু অবস্থা-বিপাকে অনিবার্য কারণে দু'টি ঘণ্টা বিলম্ব করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় ছিল না। ফিল্ড-মার্শাল গণেশ ঘোষ জানালেন—

"দু' ঘণ্টা আবও অপেক্ষা করব। দশটার সময় আক্রমণ কবা চাই। ইতিমধ্যে গাড়ি একটি আমরা কোনমতে যোগাড় করে নেব। আর যদি যোগাড় করতে নাও পাবি, তবু পায়ে হেঁটে গিয়ে হলেও আমরা পুলিস-লাইন আক্রমণ করবই—এটাই ঠিক রইল ; আক্রমণের পূর্বে আমাদের আর সাক্ষাৎ হবে না।"

সময় খুব সংক্ষেপ বলে আমবা তাড়াতাড়ি ছুটলাম চারদিকে বিভিন্ন দলগুলিকে খবব পাঠাতে—সবাই যেন দু'ঘণ্টা দেবি কবে। কয়েকটি দলকে নতুন পরিস্থিতি জানাবাব ভাব দেওয়া হ'ল নির্মলদার ওপব। কয়েক মিনিটের মধ্যেই top speed-এ ছুটে গেলাম গণেশেব বাড়ি। কয়েকজনকে সাইকেলে পাঠানো হ'ল কয়েকটি দলকে আক্রমণের পবিবর্তিত সময জানাবাব জন্যে। ছোট শহর, তাই গন্তব্যস্থল সব আধ মাইল থেকে তিন মাইলেব মধ্যেই ছিল। গণেশ নিজে বাড়িতে রইল। আগেই বলেছি, গণেশেব বাডি বা দোকান ছিল আমাদেব ফিল্ড্-হেডকোয়ার্টার। তা'ছাড়া, এখান থেকেই পুলিস-লাইন আক্রমণকাবী দলটি প্রস্তুত হয়ে বেরোবার কথা। তাই গণেশেব এখানে থাকা প্রয়োজন।

গণেশকে বাসায় নামিয়ে দিয়েই আমি ছুটলাম মাস্টারদার কাছে। যে সব ছোট ছোট দলেব সঙ্গে মাস্টারদার এখান থেকে সংযোগ রাখার ব্যবস্থা ছিল, তাদের আক্রমণেব পরিবর্তিত সময় জানাতে সাইকেলযোগে লোক পাঠানো হ'ল। বলা বাহুল্য, মাস্টারদাকে প্রথমেই গাড়ির বিভ্রাট জানিয়েছি এবং পূর্ব নির্ধারিত সময়ের আরও দু' ঘণ্টা পরে যে আক্রমণের 'জিরো-আওয়ার' ধার্য করতে বাধ্য হয়েছি, তাও বলেছি। মাস্টারদা খুব চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"এই দু'ঘণ্টার মধ্যে তোরা পুলিস-লাইন আক্রমণ করতে যাওয়ার জন্য গাড়ি যোগাড করতে পারবি? এই দু'ঘণ্টার মধ্যে যে ড্রাইভার সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আছে তার জ্ঞান ফিরে এলে সে কোন বিভ্রাট ঘটাবে না তো? সৈনিকের খাকী পোশাকে আমরা এতজন সশস্ত্র হয়ে শহরের চারিদিকে ছড়িয়ে আছি—দু' ঘণ্টা বিলম্বের জন্য কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই তো?"

প্রশ্ন তিনটিই অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের মাথায়ও তা' ছিল। মাস্টারদার প্রশ্নের উত্তরে বললাম—

"ড্রাইভারের জ্ঞান ফিরে এলেও তার কোন থানায় যাওয়া—প্রাথমিক রিপোর্ট করা, তারপর উপর মহলের পুলিস-কর্তারা সব শোনার পর অ্যাক্‌শন নেওয়ার বহু পূর্বেই আমরা আক্রমণ করতে পারব। আমাদের মধ্যে পুলিসের চর নেই বলেই

মনে হয়। তাই খাকী পোশাকে শহরের চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকায় নতুন কোন বিপদের কারণ আছে বলে মনে হয় না। চট্টগ্রামের পুলিস আমাদের সৈনিকের খাকী পোশাকে দেখতে অভ্যস্ত। দু'ঘণ্টার মধ্যে একটি গাড়ি যোগাড় করতে পারব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস—যদি কোনমতেই তা' সম্ভব না হয় অগত্যা পায়ে হেঁটে গিয়েই আমরা 'জিরো-আওয়ারে' পুলিশ-লাইন আক্রমণ করে অধিকার করব।"

মনে হতে পারে পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী আটটায় আক্রমণ না করে দু'টি ঘণ্টা স্থগিত রাখবার মধ্যে যখন এইরূপ সমস্যা ও অনিশ্চয়তার কারণ ছিল, তখন পূর্ব-নির্ধারিত সময় পরিবর্তন না করলে কি হ'ত? যদি এই দু'ঘণ্টার মধ্যে আমরা একখানা মোটর গাড়িও যোগাড় করতে না পারি তবে আমাদের পদব্রজে গিয়ে পুলিস-লাইন আক্রমণ করাই তো সাব্যস্ত হ'ল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভাবলে এটাই কি অধিক শ্রেয় মনে হবে না যে, আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে আরও দু'ঘণ্টা সময় অতিবাহিত না করে প্রথমেই স্থির করা উচিত ছিল পুলিস-লাইন আক্রমণকারী দলটি পদব্রজে যাবে এবং 'জিরো-আওয়ার' অপরিবর্তিত থাকবে?

ঝটিকাবেগে প্রধান শত্রুঘাঁটিগুলি একযোগে অধিকার করে নেওয়ার স্ট্রাটেজী অনুসারে পুলিস লাইন দখল করা সর্বপ্রধান কাজ ছিল। কোন একটি প্রধান ঘাঁটি, 'বিশেষ করে পুলিস-লাইন', যদি প্রথম চোটেই নিমেষে অধিকার করা না যায়, তবে সার্বিক জয়ের সম্ভাবনায় পুরোমাত্রায় অনিশ্চয়তা থাকে। পাহারায় নিযুক্ত প্রহরীদের কিছু বুঝতে দেওয়া বা ভেবে ঠিক করতে দেওয়ার আগেই তাদের খুব নিকটে গিয়ে surprise attack (বিস্মিত করে আক্রমণ) করা গেলে জয় সুনিশ্চিত বলে মনে করেছিলাম। আক্রমণকারীদের সঙ্গে একখানি মোটরগাড়ি থাকলে প্রহরীদের সন্দেহ উদ্রেক না করেই তাদের খুব কাছে, রিভলভারের পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জের মধ্যে গিয়ে পৌছনো সম্ভব। এই সম্বন্ধে হিসেব করে স্পষ্ট বুঝেছিলাম যে, গাড়ি যোগাড় করতে না পারলে—যদি পদব্রজে যেতে হয়—তবে অনেক দূর থেকেই আমাদের প্রতি প্রহরীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়ত, এই দু'টি ঘণ্টার মধ্যে কোন অবাস্তব আশঙ্কার প্রতিচ্ছবি আমাদের কাউকে সেইরূপভাবে বিচলিত করে নি। আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানতাম, যদি আমাদের মধ্যে পুলিসের চর থাকত তবে তা'রা ইতিমধ্যেই আমাদের ধরবার চেষ্টা করত। কাজেই অহেতুক ভাবব কেন? মোট কথা, পুলিসের চর না থাকলে কোন ভয় নেই—কারণ, পুলিস আমাদের এইরূপ গতিবিধি ইতিপূর্বে বহুবার দেখেছে।

সংজ্ঞাহীন ড্রাইভার চেতনা ফিরে পেয়ে পুলিসে খবর দেওয়ার পর আমাদের

বিরুদ্ধে তাদের অ্যাক্‌শন আরম্ভ করতে অনেক ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে; তার আগেই আমরা আক্রমণ সুরু করতে পারব, এইরূপ বাস্তব ধারণা না থাকলে আমরা কখনও দু'ঘণ্টা দেরি করবার সিদ্ধান্ত নিতাম না। আমাদের সেই ধারণা ও হিসেবে যে ভুল ছিল না তা' সরকারপক্ষের সাক্ষীদের কথা থেকেই জানা যায়। আমাদের মামলার মুদ্রিত জাজ্‌মেণ্টের ৪২ ও ৪৩ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত করছি—

"Ahamadur Rahaman alias Ahamad (P. W. 18), taxi driver was employed at that time as driver of taxi No. 21929......Three of them (Lokenath and others) got down, went to the roadside, remained there for a few minutes and then coming back to the car, two of them pointed pistols at him and ordered him to get down from the car. As he did not comply at once, one of them, a stout man with a fair complexion pulled him out of the car. They then dragged him into the paddy field close by and there some cotton was pressed over his mouth and nose and he became unconscious... That same night Tazu Mia (P. W. 29) was returning along the road from his father-in-law's house when between Faujdarhat and Fakirhat, he heard a sound as of someone groaning in the field by the roadside......... he found Ahamadur Rahaman lying groaning beside a patch of jungle......His taxi was nowhere to be seen. Tazu Mia fetched a taxi from Idgaon and placing him in it drove to the General Hospital............About 3-45 a. m. the subdivisional officer (P. W. 142) came to the hospital and recorded his statement......"

—উপরের বিবরণ থেকে জানা যায়, ২১৯২৯ নম্বরের ট্যাক্সি ড্রাইভার আহমদুর রহমানকে অজ্ঞান করে তার ট্যাক্সি নিয়ে লোকনাথরা চলে এসেছে। .... আরোহী তিনজন নেমে রাস্তার ধারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আবার গাড়ির দিকে ফিরে আসে। তাদের মধ্যে দু'জন তার (ড্রাইভারের) দিকে দু'টি পিস্তল লক্ষ্য করে আদেশ দেয় গাড়ি থেকে নেমে আসতে। ড্রাইভার নামতে ইতস্ততঃ করছিল বলে একজন গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ ব্যক্তি তার হাত ধরে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে আনে। তারপর ড্রাইভারকে ধানক্ষেতে নিয়ে গিয়ে তার নাকে-মুখে তুলো চেপে ধরে এবং তা'তে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।.........সেইদিন রাত্রে জনাব তজু মিঞা সেই রাস্তা ধরে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরছিলেন। যখন তিনি ফৌজদারহাট ও ফকিরহাটের মধ্যের রাস্তা অতিক্রম করছিলেন তখন পথের ধারে ধানক্ষেতের

মধ্যে একজন লোকের গোঁঙানি শুনতে পান। তিনি আহমদুর রহমানকে একটি জঙ্গলা জায়গার আড়ালে পড়ে থেকে গোঁঙাতে দেখেন।······তার ট্যাক্সিটি অবশ্য কাছে-পিঠে কোথাও দেখতে পান নি।···· তজু মিঞা ঈদ্‌গাঁও থেকে ট্যাক্সি আনেন এবং তা'তে করে ড্রাইভার সাহেবকে জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসেন।······ ভোর রাত্রে ৩-৪৫ মিনিটের সময় S. D. O. এসে তার (ড্রাইভারের) জবানবন্দী গ্রহণ করেন।

এই একটিমাত্র ড্রাইভারের বিশেষ ক্ষেত্রে বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আমাদের হিসেবে ভুল হয় নি—ড্রাইভারের কাছে সংবাদ পেয়ে ছ'ঘণ্টার মধ্যে আমাদের বিরুদ্ধে কোন অ্যাক্‌শন নেওয়া পুলিসের পক্ষে সম্ভব হয়নি। উপরের তথ্য থেকে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে—জোর করে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বেঁধে রেখে গাড়ি যোগাড় করতে কেন আমরা ইতস্ততঃ করেছি। পথের ধারে গোঁঙানি শুনে একজন পথচারী সংজ্ঞাহীন ড্রাইভারকে উদ্ধার করেছে। ইউরোপীয়ান ক্লাব, টেলিফোন-এক্সচেঞ্জ ও পুলিস লাইন আক্রমণকারী তিনটি দলের জন্য আরও তিনজন মোটরচালককে অজ্ঞান ও বন্দী করে রাখতে হ'লে আমরা যে আরও অনেক বেশি অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতাম তা'তে কোন সন্দেহ নেই। একজন নিরীহ ড্রাইভারকে বেঁধে রাখার মধ্যেও যে অনেক অঘটন ঘটতে পাবে তা' ভেবেই আমরা ১৮ই এপ্রিল সকালে টেলিফোন-অফিস আক্রমণকারীদের জন্য একখানা নতুন শেভ্রোলে গাড়ি কিনে ফেলি। নিজেদের বেবী-অস্টিনটি ক্লাব-হাউস আক্রমণকারীদের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র বহন করার জন্য দেওয়া হ'ল এবং আক্রমণকারীরা প্রায় সবাই পায়ে হেঁটেই সেখানে যাবে স্থির হ'ল—তবু বলপূর্বক ট্যাক্সি না নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করেছিলাম। এই একই কারণে পুলিস-লাইন দখল করতে যাওয়ার জন্যও জোর করে ট্যাক্সি হস্তগত করায় আমাদের আপত্তি ছিল।

যে ট্যাক্সিচালককে বেঁধে রেখে লোকনাথ মোটরটি হস্তগত করেছিল, অনভিজ্ঞতার জন্য সেই ড্রাইভারটির জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়—"His legs were tied together, his hands were tied behind his back, and his face and head were wrapped in cloth, kept in position by rope tied round it.......There the Assistant Surgeon (P. W. 147) examined Ahamadur and found him suffering from facial injuries caused by some corrosive substance such as chloroform when used in quantity and concentrated form······" (P. 43-Judgement in Armoury Raid Case No. I of 1930).

—ড্রাইভারের হাত, পা ও মুখ বাঁধা ছিল, কাপড় দিয়ে মাথা সমেত সমস্ত

মুখ ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। খুব ঘনীভূত ক্লোরোফরম্ ব্যবহার করা হয়েছিল বলে ড্রাইভারের মুখ জায়গায় জায়গায় পুড়ে গিয়েছিল।

ক্লোরোফরম্ করা যদি অত সহজ ব্যাপারই হ'ত তবে ডাক্তারি শাস্ত্রে anaesthetic সম্বন্ধে ছ'মাস বা এক বছরের শিক্ষণ ব্যবস্থা থাকত না। কারও ওপর জোর করে ক্লোরোফরম্ ব্যবহার করার পদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা মাত্র ছ'একদিন সামান্য শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। আমাদের অনভিজ্ঞতার জন্য বেচারী ড্রাইভার অনেক কষ্ট পেয়েছেন—এমন কি তাঁর জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়েছে। জনাব আহমদুর রহমন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর চর নহেন, তিনি একজন নিরীহ গরীব ড্রাইভার। স্বাধীনতা যুদ্ধে কর্তব্যের খাতিরে নিরীহ গরীব ড্রাইভারকেও আমাদের বেঁধে রাখতে হয়েছে। জনাব আহমদুর রহমান স্বেচ্ছায় আমাদের সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দিতেন কিনা জানি না—তাঁকে সেই সুযোগ দিয়ে পরীক্ষা করা হয় নি। তবে আজ আমাদের অকপটে স্বীকার করতে হবে, জনাব আহমদুর রহমান আমাদেরই একজন সাথী—স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর পরোক্ষ দানকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তাঁর কাছে কর্তব্যের খাতিরে আমরা অপরাধী। তিনি বাস্তব সত্য উপলব্ধি করে নিশ্চয়ই আমাদের ক্ষমা করেছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে আহমদুর রহমানের পরোক্ষ অবদানকে আমরা অস্বীকার করব না—শ্রদ্ধার চোখে দেখব।

আমার লেখা পড়ে মনে হবে খাকী সামরিক পোশাকের ওপর আমাদের বেশ মোহ ছিল। ইউনিফর্মের প্রতি মোহ বা আসক্তি কতখানি ছিল তা' বলতে পারি না, তবে আমাদের সামরিক পোশাক পরতে খুব ভাল লাগত। শুধু এইটুকুই বলতে চাইছি—যুবকদের মধ্যে সামরিক খাকী পোশাকের প্রচলন ভাবী যুব-বিদ্রোহের প্রয়োজনে অপরিহার্য বলে আমারা মনে করেছিলাম। ১৯২৮ সালে কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেই সময়েই প্রথম গান্ধীজীর অহিংস কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রভাবের বিরুদ্ধে বাংলার প্রধান বিপ্লবী নেতারা সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বৃটিশ সামরিক বেশে সুসজ্জিত স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠিত করেন। ভারতের যুবকেরা সেই খাকী সামরিক পোশাক পরিহিত ভলিন্টিয়ারদের দৃষ্টান্তে সুসংগঠিত ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিনী গড়ে তুলুক—সুভাষচন্দ্র ও প্রবীণ বিপ্লবী নেতাদের সেই অভিলাষই ছিল। সূর্য সেনের নেতৃত্বে ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার যুবকেরা সামরিক কায়দায় ও পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে গঠিত হয়। আমরা চেয়েছিলাম গণতন্ত্রীবাহিনী সারা ভারতে যেন আমাদের দৃষ্টান্তে গড়ে ওঠে এবং তাদের সামরিক পোশাক ও সামরিক শিক্ষার একটি অভিন্ন প্রোগ্রাম যেন সারা ভারতের যুবকদের মধ্যে প্রচলিত হয়।

কলিকাতা কংগ্রেসের সময় সামরিক পোশাকে ও শিক্ষায় যে ভলান্টিয়ার-বাহিনী গঠিত হয়, যুবসমাজের মধ্যে তার একটা mass effect ছিল। কিন্তু সারা ভারতের যুবকদের মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের চেতনা জাগাতে আমরা মনে করেছিলাম কেবল সামরিক পোশাক নয় তার সঙ্গে একটি সশস্ত্র বাহিনী এবং সেই উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতেই সশস্ত্র গণতন্ত্রবাহিনী গঠনের জন্য একটি বাস্তব দৃষ্টান্তের প্রয়োজন। কেবল প্রাণ দান করলেই সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যাবে না। বৃটিশ সরকারের শাসন ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে সশস্ত্র গণতন্ত্রবাহিনী গড়ে তুলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যের সঙ্গেও যে যুদ্ধ করা যায়—এই দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রয়োজন মহানায়ক সূর্য সেন সেই যুগে ভেবেছিলেন। কাজেই শুধু মোহ নয়—প্রয়োজনবোধেই সৈনিকের বেশে সজ্জিত হওয়া ও সেই বেশে সামরিক কায়দায় সংঘবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে মৃত্যু বরণ করা আমাদের কাম্য ছিল।

আরও একটি বিষয় উপলব্ধি করে বুঝতে হবে, আক্রমণ করতে যাওয়ার আগে যদি সৈনিকের বেশে সজ্জিত হওয়া যায় তাতে নিজের মনেও জোর আসে। আজ আমি খুব নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আমার বাবা-মা আমাকে সামরিক বেশে দেখেছিলেন বলেই তাঁদের অন্তরে জোর পেয়েছিলেন—অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

সমর-বিজ্ঞান বা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের বিস্তারিত ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, সার্বিক প্ল্যানের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পরিবর্তন হয়েছে। সমর-বিজ্ঞানের এই শিক্ষা যে যত বেশি করে নিজের চিন্তা দিয়ে বুঝতে পারবে, সঙ্কট মুহূর্তে সেই তত বেশি নেতৃত্ব দেওয়ার উপযুক্ত বলে গণ্য হবে। সমর-বিজ্ঞান বা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ইতিহাস যদি বাদও দিই তবু জীবনের সামান্য অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিলাম, সার্বিক প্ল্যানের কিছু না কিছু শেষ মুহূর্তেও রদবদল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। পরইকোড়া ডাকাতি করতে যাওয়ার সময় আমাদের সবার ভরসাস্থল, সেই বৃহৎকায় বলিষ্ঠ যুবক বন্ধু আর এলেন না। তারপর বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করার মুখেই প্রেমানন্দের পকেট থেকে পটকা মাটিতে পড়ে সশব্দে ফেটে গিয়ে সমস্ত গ্রামের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে এবং প্রেমানন্দ আহত হয়। রেল-কোম্পানীর টাকা লুঠ করবার সময় নির্মলদা উপস্থিত হতে পারলেন না। যখন গাড়ি থামিয়ে অ্যাকৃশন আরম্ভ করি তখনও প্ল্যান অনুযায়ী রাজেন দাস ও অবনী এসে পৌছয় নি। গাড়ি যখন বাঁক ঘুরে চলেছে তখন তারা লাফ দিয়ে চলন্ত গাড়িতে উঠল। যদি আলোচনা করি তবে দেখতে পাব, এরকম প্রায় সব অ্যাকৃশনই একেবারে নিখুঁতভাবে প্ল্যান অনুযায়ী হয় নি। এখন লিখতে গিয়ে আবার মনে পড়ছে, যদি দেবেন দের (খোকার) পোশাকে আগুন লাগায় গোপীনাথ ও আমার প্রতি তালতলার

বাড়িতে ফিরে যাবার আদেশ না হ'ত তবে হয়ত বা সার্ চার্লস টেগার্ট বাংলার বিপ্লবীদের উপহাস করে বহাল তবিয়তে ইংলণ্ডে ফিরে যেতে পারতেন না।

পুলিস-লাইনে যাওয়ার জন্য সময় মত গাড়ি না পাওয়া আমাদের পক্ষে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক সমস্যা—কোনমতেই তা' হওয়া উচিত ছিল না। এইটি যেমন শিক্ষণীয় বিষয়, এর চেয়েও অনেক বেশি শিক্ষণীয়—ভীত না হয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য হাজারগুণ বেশি সক্রিয়ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়াই সামরিক নেতৃত্বের দাবী।

সমস্ত দলগুলিকে 'জিরো-আওয়ারটি' সময় মত অবগত করাবার এবং এই সময়ের মধ্যে যে কোন উপায়ে একটি গাড়ি যোগাড় করবার গুরু দায়িত্ব ছিল ফিল্ড্-মার্শালের। গণেশ ঘোষের অন্তর গর্জন করে উঠলো—Impossible is the word found in the Dictionary of fools ! সব দলকে খবর পাঠানো হবেই। গাড়ি যোগাড় হবেই। কেউ আমাদের রুখতে পারবে না। সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে আমরা সঙ্কট-মুহূর্তের সম্মুখীন হ'ব।

মাস্টারদার সঙ্গে কংগ্রেস অফিসেও দু-তিন মিনিটের বেশি কথা হয় নি। যাকে যাকে বা যেসব গ্রুপকে দু'ঘণ্টা সময় পিছিয়ে দেবার সংবাদ পাঠাবার কথা ছিল মাস্টারদা তাদের সবার কাছে তড়িৎবেগে বিশেষ বিশেষ ছেলেদের পাঠালেন। লোকনাথদের সঙ্গে ফাইনাল চেক্-আপের দু'মিনিট আগে—৭-৩০ মিনিটের সময় ক্লাব আক্রমণকারী গ্রুপের হেপাজতে গণেশ বেবী-অস্টিনটি দিয়ে দেয়। দু'ঘণ্টা পরে আক্রমণ করবার নির্দেশ জানিয়ে আমি আর গণেশ শেভ্রোলে গাড়ি করে লোকনাথদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। লোকনাথদেরও নতুন পরিস্থিতি জানিয়ে দশটার সময় আক্রমণের জন্য অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হ'ল। সেখান থেকে ৭-৩৫ মিনিটে আমরা গণেশের বাড়িতে পৌঁছই। এক মিনিটের মধ্যে সাইকেল দিয়ে বার্তা-বাহকদের ডেস্‌প্যাচ করা হ'ল। তারপর গণেশ ও আমি প্রায় ৭-৪০ মিনিটের সময় ডাক্তার জগদাবাবুর বাসায় তাঁর গাড়িটি পাওয়ার আশায় গেলাম। সেখানে গাড়ি না পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে শেভ্রোলে নিয়ে ছুটলাম। গণেশকে বাড়িতে নামিয়ে মাস্টারদার কাছে ৭-৪৫ মিনিটে গিয়ে পৌঁছলাম। কথা ছিল, শেভ্রোলে গাড়ি ও পুলিস-লাইন আক্রমণকারীদের জন্য আর একটি গাড়ি—হেরম্ব বলের ডজ্ বা মাখনদের এসাক্স, আমাদের সঙ্গে থাকবে। পূর্ব নির্ধারিত সময় আটটার পাঁচ মিনিট আগে, অম্বিকাদারা টেলিফোন-অফিস আক্রমণ করবেন স্থির ছিল। সেইজন্য ৭-৫০ মিনিটের সময় শেভ্রোলে গাড়িটি আনন্দ গুপ্তের জিম্মায় তাদের ছেড়ে দিয়ে আমাদের দল ডজ্ গাড়ি করে পুলিস-লাইনের দিকে অগ্রসর হবে—এইরূপ ব্যবস্থাই ছিল। আগে বহুবার আমরা

রিহার্সেল দিয়ে পরস্পর মিলিত হবার স্থানগুলি ও বিশেষ বিশেষ গতিপথ চিহ্নিত করে রেখেছিলাম। সেই হিসেবে আমি শেভ্রোলে গাড়ি নিয়ে আনন্দের বাড়ি পৌছলাম। পূর্বের প্ল্যান অনুযায়ী পেছনে পেছনে ডজ্ বা এসাক্স্ গাড়ির থাকবার কথা। কিন্তু প্ল্যান পরিবর্তন হওয়ায় আমি একাই আনন্দকে শেভ্রোলে গাড়িটি দিতে ও জানাতে গেলাম ৯-৫৫ মিনিটের সময় তারা টেলিফোন-অফিস আক্রমণ করবে।

অম্বিকাদারা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও পেট্রোল প্রভৃতি নিয়ে টেলিফোন-অফিসের পেছনে খুব কাছে গোপনে অপেক্ষা করছিলেন। আনন্দ তার বাড়িতেই ছিল। আমি গাড়ি নিয়ে গেলেই সে গোটা দুই স্লেজ হ্যামার নিয়ে গাড়িতে উঠবে। আনন্দ আমাকে একা একটি গাড়িতে আসতে দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল—"আপনি ফিরবেন কিভাবে?"

সময় অতি সংক্ষেপ, তাই খুব তাড়াতাড়ি আমাদের নতুন নির্দেশের কথা তাকে বললাম—তাদের টেলিফোন-অফিস আক্রমণ করতে হবে রাত ৯-৫৫ মিনিটের সময়। আনন্দ, তাদের পড়ার ঘর থেকে বড় বড় দুটি হাতুড়ি আনতে গেল। তাকে সাহায্য করতে আমিও একটু এগিয়ে গেলাম। আনন্দের বাড়ি একটি ছোট টিলার ওপর। এই টিলাটিতে ওঠার জন্য কয়েকটি বড় বড় ধাপে ছোট ছোট সিঁড়ি ছিল। আমি তাদের বাড়ির সর্ব উচ্চ ধাপের নিচে দাঁড়িয়েছিলাম—দশ-বারোটি সিঁড়ি উঠলে তবে তাদের বাড়ির বড় উঠোনে আসা যায়।

অপ্রত্যাশিতভাবে মাসীমা ও দিদি (আনন্দের মা ও দিদি) আমাকে দেখে ফেললেন। তাঁরা যেন খুব অস্থির চঞ্চল হয়ে পায়চারি করছেন! দেখা মাত্রই মাসীমা আমাকে ডাকলেন। চিন্তা উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কা মেশানো তাঁর কণ্ঠস্বর। মনে হ'ল ইতিমধ্যে কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু আমি কিছু অনুমান করবার আগেই মাসীমা আমাকে বাললেন—

"অনন্ত, শীগ্‌গির ওপরে এসো!" আমি কালবিলম্ব না করে উঠোনের দিকে গেলাম। মাসীমার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দিদিও (জ্যোৎস্না দিদি—আনন্দের ছোট্‌দি) মাসীমার সঙ্গে সেখানে উপস্থিত। আমাকে ইতিপূর্বে অনেকবার তাঁরা খাকী পোশাকে দেখেছেন। তবে আজকের মত পুরোপুরি জেনারেলের পোশাকে—কটিদেশে তরবারি নিয়ে দেখেছেন কিনা মনে নেই। ডানপাশে চামড়ার পিস্তল রাখবার হোল্‌স্টারে পিস্তল ছিল—তাঁদের দৃষ্টি তখনও সেদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল কিনা জানি না। আমার বুকের ওপর ইণ্ডিয়ান রিপাব্‌লিকান আর্মির আজকের বিশেষ চিহ্ন, সেই জরীর কাজ করা ভেলভেটের ব্যাজ যে তাঁদের চোখে পড়েছে তা'তে সন্দেহ নেই। ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁরা আমার দিকে তাকালেন। এই

সময়ে এইরূপ পোশাকে আমাকে দেখে যেন তাঁরা আরও ত্রস্ত, আরও শঙ্কিত হলেন। কম্পিতকণ্ঠে মাসীমা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—

"অনন্ত, খোকা (শহীদ দেবপ্রসাদ গুপ্ত—আনন্দের বড় ভাই) আমাকে বলে গেল সে দিন সাতেকের জন্য বাইরে বেড়াতে যাচ্ছে। খাকী মিলিটারী পোশাক পরে সে বেরিয়ে গেল। সে কোথায় গেল?" মায়ের মন পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় অধীর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আমার জবাব পাওয়ার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়েছেন— "বল, বল অনন্ত খোকা কোথায় গেছে?"

কঠিন প্রশ্ন! মাসীমাকে সরাসরি মিথ্যা বলতে পারছিলাম না। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর এইভাবে দিলাম—"তাই নাকি? দেবু তো আমাকে বলে নি সে কোথায় যাচ্ছে! তার সঙ্গে তো আজ সকালেও আমার দেখা হয়েছে।" মাসীমা ও দিদি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁরা বেশ বুঝতে পারছিলেন যে আমি সত্য গোপন করছি। মাসীমা রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে আবার বললেন —"খোকা যাওয়ার সময় প্রণাম করে গেল! বলে গেল—'মা তুমি কিছু ভেবো না, ছোটকোন্ তো রইল!' অনন্ত, আমি বড় ব্যাকুল হয়েছি—বল খোকা কোথায় গেল?" ছোটকোন্, আনন্দ ও দেবুর ছোট ভাই। তখন তার বয়স আট-নয় বছর হবে।

কি জবাব দেব! মাকে দিদিকে কি বলে সান্ত্বনা দেব? ভেবেছিলাম বলি— 'বীর জননী তুমি, তোমার পুত্রকে আশীর্বাদ কর, আমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাও—আমরা যেন ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হই!' মাসীমার কাছে খুলে বলা চলে না—সহ্য করতে পারবেন না। তাঁদের প্রবোধ দেওয়ার জন্য আবার মিথ্যা বললাম—

"আপনাকে যখন বলেছে সাতদিনের মধ্যে ঘুরে আসবে, তখন দেবু নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। ভাবছেন কেন? আমি খোঁজ নিয়ে আপনাকে কাল জানাব।" মাকে মিথ্যা বলে সান্ত্বনা দেবার এ আমার ব্যর্থ প্রয়াস! তাঁর মন কিছুতেই মানছিল না যে আমি সত্যি কথা বলছি। একটার পর একটা আশঙ্কার চিহ্ন তাঁর চোখে পড়েছে— দেবু হঠাৎ সাতদিনের জন্য বিদায় নিয়ে চলে গেল। তারপর এই অসময়ে রণবেশে আমাকে দেখলেন। তার আগে থেকে আনন্দ সামরিক পোশাকে সজ্জিত হয়ে আমার অপেক্ষায় ছিল। এইরূপ অবস্থায় আমরা যে সবটাই তাঁদের কাছে গোপন করছি তা' তাঁরা খুব সহজেই অনুমান করতে পারছিলেন। মাসীমা আমাকে আরও জটিল প্রশ্ন করলেন—

"টুনু (আনন্দ) যাচ্ছে কোথায়? সে কেন এই অসময়ে মিলিটারী পোশাক পরেছে? তুমিই বা কেন এই অসময়ে সামরিক পোশাকে এখানে এসেছ? টুনু

কেন বল্‌ল যে আজ রাত্রে বাড়ি ফিরবে না? বল—আমাকে সত্যি করে বল। তোমাদের জীবনের কোন আশঙ্কা নেই তো?" বলতে বলতে মাসীমার কণ্ঠরোধ হয়ে আসছিল। আমার অবস্থা খুবই সঙ্গীন। মায়ের আকুল মন পুত্রের কুশল সংবাদ চাইছে—"তাদের জীবনের কোন আশঙ্কা নেই তো?" কি বলতে পারি? আমি স্থির অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ছোড়দি খুব উষ্মা ও অভিমান নিয়ে অভিযোগ জানালেন—"এ তোমাদের খুব অন্যায়। তোমরা বাড়ির দু'টি ছেলেকেই এইভাবে কোথায় নিয়ে চলেছ? বাবা-মা'র মুখের দিকে একবারও চাইলে না?" এই তিরস্কারের কি উত্তর আমি দিতে পারি! আমরা একটি ভাইকেই চেয়েছিলাম। কিন্তু দুই ভাই-ই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আমাদের জানিয়েছিল যে, তারা উভয়েই অ্যাক্‌শনে অংশ গ্রহণ করবে—তাদের কাউকে বাদ দেবার অধিকার আমাদের নেই। আমি চুপ করেছিলাম। জানতাম কোন সান্ত্বনাই কাজে আসবে না। ভাবছিলাম তাঁরা কতটুকু আন্দাজ করতে পারছেন—কি করে দিদি ঐসব কথা বললেন—দুই ভাইকে নেওয়া আমাদের উচিত হয় নি? লিখতে সময় লাগছে—এই সবটুকু ঘটেছে কিন্তু দু'মিনিটের মধ্যে। আমি যে খুব অসহায় অবস্থায় পড়েছি, তা' আনন্দ বুঝতে পারছিল। আমার পক্ষে আর দাঁড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না। মাসীমা শেষবারের মত কাতরকণ্ঠে আমাকে আবেদন জানালেন, অনুনয় করলেন, ভিক্ষা চাইলেন—"অনন্ত, দু'টি সন্তানকে আমার বুক থেকে কেড়ে নিও না! টুন্‌ এখনও খুব ছোট—অন্তত তাকে আমার কাছে দিয়ে যাও।" মাসীমা আর বলতে পারলেন না। দু'চোখ তাঁর জলে ভরে গেল। আমিও নিজেকে আর সামলাতে পারছিলাম না। আমার বাবা, মা, দাদা, দিদি ও বৌদিকে ঘণ্টা দুই আগে প্রণাম করে এসেছি—তাঁদের কাছ থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নিয়ে এসেছি! আবার এখানে এমনি একটি অবস্থায় পড়ব তা' ভাবি নি। ভাবাবেগে আমার চোখেও জল এল। মনে মনে মাসীমা ও দিদির কাছে ক্ষমা চাইছিলাম। এমন সময় আমাকে রক্ষা করল আনন্দ। সে নিচে থেকে জোরে জোরে আমাকে ডাকতে লাগল—"দেরি হচ্ছে, শিগ্‌গির আসুন।" সেই সুযোগে এই করুণ দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটালাম। "মাসীমা, দিদি—তবে আসি"—এই বলে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম। মাসীমা করুণ আর্তনাদ করে বললেন—"অনন্ত, আমার দু'টি ছেলের মঙ্গলামঙ্গলের সব দায়িত্ব তোমার ওপর রইল। আশীর্বাদ করি তোমরা অক্ষত দেহে দীর্ঘজীবী হও!" দূর থেকে একবার বল্‌লাম—"মাসীমা আপনার আশীর্বাদ কখনও বিফল হবে না!"

আমি দ্রুত গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। আমার পাশে আনন্দ। তখনও আমার চোখ ছল্‌ ছল্‌ করছে। মুখে কোন কথা নেই—আমি মাসীমা ও দিদির করুণ

আবেদনের কথা ভাবছিলাম—'অনন্ত, একজনকে অন্তত আমাদের কাছে রেখে যাও।'

আনন্দ আমাকে তিরস্কার করে বলল—"কি! আপনার চোখে জল? দু'ঘণ্টার মধ্যে না আপনার গাড়ি যোগাড় করতে হবে? কত কাজ—এখন কি আপনার চোখে জল শোভা পায়?" আমাদের তরুণ সাথীরা এইরূপ দৃঢ়প্রকৃতির বিপ্লবী ছিল। আনন্দ প্রায়ই নজরুলের সেই বিখ্যাত কবিতাটি আবৃত্তি করত—এখন এই আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য জোরে জোরে সেই কবিতাটি আবৃত্তি করে সে আমাকে শোনাতে লাগল—

দুর্গম গিরি, কান্তার মরু দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হ'বে রাত্রি নিশিথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার⋯।

আনন্দের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে আমার অন্তরও গর্জন করে উঠল—"There shall be no Alps!"

মাত্র দু'টি ঘণ্টা সময় আমাদের হাতে। একখানা মোটর গাড়ি এই সময়ের মধ্যে জোগাড় করতেই হবে। উর্ধ্বশ্বাসে শেভ্রোলে নিয়ে ছুটলাম গণেশের বাড়ির দিকে। পথে টেলিগ্রাফ্-অফিসের সন্নিকটে অম্বিকাদাদের সঙ্গে দেখা করে সময় পরিবর্তনের কথা জানালাম। অম্বিকাদা শুনেই সমস্যার গুরুত্ব অনুভব করলেন। তিনি একটুও বিচলিত না হয়ে বললেন—"কিছু ভাববার নেই—সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার বিশ্বাস তোমরা কোন একটি গাড়ি যোগাড় করতে পারবেই। সময় নেই, ছুটে যাও—আমরা এখানে নিরাপদে অপেক্ষা করতে পারব।" আনন্দকে তিনি বললেন আমাকে গণেশের বাড়িতে পৌছে দিয়েই সে যেন সেখানে ফিরে আসে। আমি ও আনন্দ যত স্পীডে পারি ছুটে চললাম। পথে এক জায়গা থেকে হিমাংশুকে তুলে নিলাম। হিমাংশু গাড়ি বিভ্রাটের কথা জানতে পারল এবং আক্রমণের সময় যে দু' ঘণ্টার জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে তা'ও শুনলো। এই সংবাদ জানবার পর হিমাংশুকে বেশ একটু বিচলিত দেখলাম। সে বলল—"এত দিন ধরে কি সুন্দরভাবে কাজ গুছিয়ে নিয়ে এসেছেন আপনারা! এই শেষ-মুহূর্তে গাড়ি বিভ্রাট ও সময় পাল্টানো, আমার কোনটাই ভাল লাগছে না। মনে বড় অস্বস্তিবোধ করছি।"

আগেই বলেছি অনভিজ্ঞতার জন্য অপরিণত রণকুশলীরা হঠাৎ কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তরুণ যুবক হিমাংশু সাহস ও বিক্রমে কম ছিল না। পুলিস-লাইন আক্রমণকারী প্রথম পাঁচজনের দলে সে নির্বাচিত হয়েছিল এবং গণেশ ও আমার পাশে থেকে সে সাহসের সঙ্গে অ্যাক্শন্ করে গেছে। গুলীর মুখে দাঁড়াবার সাহস সবার থাকে না। সেইরূপ সাহসী—

হাসতে হাসতে যাঁরা গুলীর মুখে প্রাণ দিতে পারেন, তাঁরাও যে বিপদের সময় মাথা স্থির রাখতে পারবেন এবং হঠাৎ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে নৈরাশ্যে ভেঙে পড়বেন না তা' বলা যায় না। বিপ্লবে যারা সাংগঠনিক ও সামবিক নেতৃত্ব দেবেন, তাঁদেব সাহস ও বিক্রমই যথেষ্ট নয়—যদি সমস্যা দেখা দেয বীরত্বের সঙ্গে তার সম্মুখীন হওয়ার জন্য সব সময়েই তাঁদেব প্রস্তুত থাকতে হবে।

হিমাংশুর সাময়িক হতাশাব ভাবকে দূর করবার জন্য আমি বললাম—"আশু, (হিমাংশুর ডাক নাম) দেখ, আমাদের পথ বিপদসঙ্কুল ও কণ্টকাকীর্ণ। Zigzag পথে—আঁকাবাঁকা পথে এগোতে হবে। সব সময় Smooth Sailing (শান্ত সমুদ্রপথ যাত্রা) হবে ভাবাটা মূর্খতা। রণকুশলীর প্রধান শিক্ষা—যত কঠিন সমস্যাই দেখা দিক না কেন তার সমাধান কবা চাই-ই, ঘাবডে গেলে চলবে না। এটা অতি সামান্য সমস্যা— দু'ঘণ্টাব মধ্যে ট্যাক্সিচালককে বেঁধে রেখে তাব গাড়িটি দখল করা, আর এই দু'টি ঘণ্টা অপেক্ষা করবার জন্য সবাব কাছে আটটার আগে খবর পাঠিয়ে দেওয়া। আমাদের সংগঠনে এতগুলি সাইকেল আছে, প্রত্যেকে সাইকেল চালাতে জানে, গাড়ি আছে, আমাদের সংগঠনটি অবস্থার পবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত খাপ খাইযে নিতে পারার শক্তিও রাখে। বামকৃষ্ণ, তারক ও অর্ধেন্দুকে দগ্ধ অবস্থায় পুলিসেব ব্যাপক তৎপবতা সত্ত্বেও যখন আমরা নিরাপদে দ্রুত স্থানান্তরিত করে লুকিয়ে রাখতে পেরেছি তখনই এই পরীক্ষা আমাদের হয়ে গেছে। তা'ছাড়া, যতদূব বুঝতে পারছি আমরা খুব সফলতার সঙ্গে একটিও পুলিসের চরকে আমাদের সংগঠনে প্রবেশ করতে দিই নি। সংগঠনের এইরূপ সার্বিক শক্তির অধিকারী যারা, তাদের কি এই সামান্য একটি সমস্যার কাছে হার মানা শোভা পায়··· ?"

আমি গাড়ি চালাতে চালাতে খুব জোরের সঙ্গে এই ধরণের কথা বলে চলেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল আশু আক্রমণের পূর্বে আমাদের মধ্যে একজনেরও morale শিথিল হলে চলবে না। তাই হিমাংশুর মনে জোর আনবার অভিপ্রায়ে, বাস্তব দৃষ্টি-ভঙ্গীর যাতে উন্মেষ হয়, আমাদের সাংগঠনিক শক্তির একটি উজ্জ্বল চিত্র তার চোখের সামনে ধরলাম। আমার কথাগুলি শুনে হিমাংশুও নিমেষে বুঝেছিল সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির অভাবেই সাময়িকভাবে সে অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় প্রভাবিত হয়েছে। সে তার নিজের ত্রুটি বোঝামাত্রই আমাকে বাধা দিয়ে বলল —

"আমার ভুল হয়েছে। বিপ্লবী সৈনিকের এই মূল গুণটিই আমি সাময়িকভাবে হারিয়ে ফেলেছি। কেবল মৃত্যু তুচ্ছ করা সাহসই সব নয়—সমস্যা সমাধানের দৃঢ়তাও অপরিহার্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবই হবে। হলেই বা একেবারে শেষ সময় সামান্য এই রদবদল, তা'তে ভাবনার কি আছে? আমি আর ভাবছি না। বলুন এখন কি করতে

হবে।" আমি খুশি হয়ে বলে উঠলাম—"এই তো চাই!" আনন্দও আমার সঙ্গে যোগ দিল—"এই না হলে কি আশু!"

আমরা গণেশের বাড়ি এসে পৌঁছলাম। আসবার সঙ্গে সঙ্গে গণেশের কাছে জানতে পারলাম—একটা ট্যাক্সিও পাওয়া যাচ্ছে না, সব ট্যাক্সিই নিখিল-বঙ্গ মুস্‌লিম কন্‌ফারেন্সে নিযুক্ত আছে। আনন্দ গাড়িটি নিয়ে উক্ষুণি ফিরে যাবে অম্বিকাদার কাছে। আমি হিমাংশুকে আনন্দর সঙ্গে যেতে বললাম। আনন্দ তাকে লালদীঘির কাছে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে নামিয়ে দিয়ে চলে যাবে। আমি হিমাংশুকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে বললাম—

"যে কোন উপায়ে হোক্—যে কোন মূল্যেব বিনিময়ে সম্ভব, একটি ট্যাক্সি তোমাকে আনতেই হবে। তুমি ট্যাক্সি নিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে, অন্তত সাড়ে ন'টার পবে নয়, নিশ্চয়ই এখানে (গণেশের বাড়িতে) চলে আসবে। মনে রেখো —Impossible is the word found in the dictionary of fools!" এইসব proverb বা প্রবাদ বাক্য আমাদের মধ্যে খুব প্রচলিত ছিল। আমাদের মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষার জন্য আমি সকলকেই বলতাম—"দেখ, মাস্টারদা যদি বলেন—'বাঘেব দুধ চাই, যেখান থেকে পার নিয়ে এসো'—তখন তা' আনতেই হবে। কোথায় বাঘ পাব, কোন জঙ্গলে খুঁজব, কি করে বাঘ ধরব, কি করে বাঘের দুধ নিতে হবে—এই সমস্ত মাস্টারদা বসে বসে আমাদের দেখাবেন না। আমাদের initiative নিয়ে বুদ্ধি ও দৃঢ়তার সঙ্গে বাঘ খুঁজে বার করতে হবে—দুধ আনতে হবে!"

আমি বুঝেছিলাম আমার কথার মর্ম হিমাংশু হৃদয়ঙ্গম করেছে। আমার কথা শেষ হতে না হতেই আনন্দ বলল—"ও নিশ্চয়ই একটা ট্যাক্সি আনবেই আনবে।" তারপর হিমাংশুর উদ্দেশ্যে বলল—"কি রে আশু, পারবি না—নিশ্চয়ই পারবি।" ইতিমধ্যে আমি গাড়ি থেকে নেমে গেলাম। আনন্দ স্টিয়ারিং-এ গিয়ে বসলো। হিমাংশু খুব দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের সবাইকে জানালো—যে কোন উপায়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সে একটি ট্যাক্সি যেখান থেকেই হোক্ না কেন নিয়ে আসবেই। আনন্দ গাড়ি ঘুরিয়ে সবেগে হিমাংশুকে নিয়ে লালদীঘির দিকে অগ্রসর হ'ল।

আমি গাড়ি থেকে নেমেই গণেশের বাড়িতে ঢুকলাম। রাস্তার দিকে মুখ করে চার-পাঁচটা দরজা জুড়ে লম্বা-লম্বিভাবে কাপড়ের দোকানটি। দোকানের এই শো-রুমটির পশ্চিম প্রান্তের দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢোকার একটি দরজা। আটটার পর আজকে স্বভাবতই দোকানের সব দরজা বন্ধ ছিল। মাত্র একটি দরজা ভেজানো। এই দরজা ও বাড়ির ভেতরে ঢোকার প্রবেশ দ্বারের মধ্যে আমাদের একজন সাথী প্রহরায় নিযুক্ত। গণেশ, বিধু ভট্টাচার্য, হরিপদ মহাজন ও সরোজ গুহ

এই বাড়িতে সামরিক পোশাকে সজ্জিত হয়ে পুলিস-লাইন আক্রমণ করতে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমার এবং হিমাংশুর তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা। কিন্তু হিমাংশু ট্যাক্সি আনতে যাওয়ায় আমি একাই বাড়ির ভেতরে গেলাম। আমি ঘরে ঢুকেই দেখি—ম্লান মুখে ও ক্ষুণ্ণ মনে তারা সবাই বসে আছে—আর বড় একটা খাটের ওপর পাঁচটি ডবল-ব্যারেল ব্রীচ্‌লোডার বন্দুক (দোনলা বন্দুক) এবং বন্দুকগুলির চারপাশে প্রায় দু'শ কার্তুজ পড়ে আছে। একটু পরেই জানতে পারলাম এই পাঁচটি বন্দুকের একটিও কাজে লাগবে না। কোনটাতেই কার্তুজ ঢুকছে না। সত্যিই দেখি একটি চেম্বারেও পুরোপুরিভাবে টোটা প্রবেশ করান যাচ্ছে না। কি আশ্চর্য—এ কি করে সম্ভব? ভাল ভাল পাঁচটি দোনলা বন্দুক আমরা একেবারে শেষ সময়ে এনেছিলাম। মধুসূদন দত্ত তার পিতার বন্দুকটি পাথরঘাটার বাড়ি থেকে অন্যের দৃষ্টির অগোচরে নিয়ে আসে। মধুসূদন জালালাবাদ পাহাড়ে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দেয়। ১৯২০ সাল থেকেই সে আমাদের সঙ্গে ছিল। মধু এক ধনী জমিদারের ছেলে। সম্পদ ও প্রাচুর্যের কোন আকর্ষণই তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। সে সাধারণের চাইতে অনেক উর্ধ্বে। মধু বাড়ি থেকে বন্দুক নিয়ে এল, কিন্তু সেটা কাজে লাগান গেল না।

কৃষ্ণকুমার চৌধুরী, তার কাকা জজ্‌কোর্টের উকিল মণীন্দ্রলাল চৌধুরীর আলমারিতে রাখা বন্দুকটি গোপনে সরিয়ে ফেলেছিল। আলমারি যেমনটি থাকার তাই ছিল। আলমারির মধ্যে বন্দুকের বাক্স যেমন বন্ধ থাকে তার কোন ব্যতিক্রম ২২শে এপ্রিলের আগে বাড়িব কারও চোখে পড়ে নি। ২৩শে এপ্রিল মণীন্দ্রবাবু তাঁর বন্দুকের অপহরণ সংবাদ কোতোয়ালিতে জানান। কৃষ্ণকুমার চৌধুরীর সন্ধানও তাঁরা পাচ্ছিলেন না। কৃষ্ণকুমার চৌধুরী ১৮ই এপ্রিল যুব-বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে এবং ২২শে এপ্রিল জালালাবাদে মিলিটারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার গৌরব অর্জন করে। তার আনা বন্দুকটির সদ্ব্যবহার হ'ল না—গণেশের বাড়িতেই পড়ে রইল।

রণধীর দাশগুপ্ত তার বাড়ি থেকে বন্দুক নিয়ে এল। সেটিও কাজে লাগল না, কারণ, টোটা বে-সাইজেব—ফিট্ করছিল না। রণধীর যুব-বিদ্রোহের একজন বীর সৈনিক। বয়স তার খুব কম ছিল—মাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। পাশের ফল জানতে পারল আমাদের বিরুদ্ধে যখন মামলা চলছে। রণধীর খুব ধনী পরিবারের ছেলে। একজনকে অভিভূত করার পক্ষে সংসারের যতরকম চাকচিক্য ও আকর্ষণ থাকা সম্ভব, রণধীরের বাড়িতে তার সবই ছিল। সেই পরিবেশের মধ্যে থেকেও সে বৈপ্লবিক নিষ্ঠায় অটল ও দৃঢ় ছিল। ১৮ই ও ২২শে এপ্রিলের যুদ্ধের গৌরব তার ললাটে জয় তিলক এঁকে দিয়েছে। রণধীরের আনা বন্দুকও আমরা কোনমতে কাজে লাগাতে পারলাম না—'১২ বোরের টোটা তাতে ঢোকানই গেল না।

ধীরেন্দ্রলাল দস্তিদার অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। লোকনাথের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জানাশোনা ও বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। ধীরেন আমাদের সবাইকে খুব পছন্দ করত। তবু আমরা কেউ তা'কে দলে আনবার চেষ্টা করি নি। তাদের ছোটখাটো একটা জমিদারী ছিল। তা'র বন্দুক নিয়ে লোকনাথরা প্রায়ই শিকারে যেত। ১৮ই এপ্রিল তার বাড়ির দু'টি তরবারি, একটি stick-gun ও একটি বন্দুক সে লোকনাথ ও গণেশকে ব্যবহার করতে দেয়। সে কিন্তু জানত না, কেন আমরা সেই অস্ত্রগুলি তার কাছ থেকে চেয়ে নিলাম। সরল মনে বিশ্বাস করে সে অস্ত্রগুলি দিয়েছিল—ভেবেছিল, আমরা হয়ত শিকারে যাব। তার stick-gunটি এবং তরবারি দু'টি কাজে লাগল, কিন্তু বন্দুকটি গণেশের বাড়িতেই পড়ে রইল। ধীরেন দস্তিদারকে পুলিশ গ্রেফ্‌তার করে। সে বেচারা হাসিমুখে আমাদের সঙ্গে দু'-বছর জেল-হাজতে ছিল। তারপর যদিও মামলার রায়ে সে মুক্তি পেল, তবু বহু বছর বিনা বিচারে ডেটিনিউ হয়ে জেল ভোগ করেছে। এক মুহূর্তের জন্যও তাকে আমাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে দেখি নি। মুক্তি পাওয়ার পর সে রেঙ্গুনে যায় এবং সেখানে শিখ ধর্ম গ্রহণ করে—তার নাম বর্তমানে রঞ্জিৎ সিং। এখনও সে আমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করে এবং সবসময় বন্ধুত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করে।

মাখন ঘোষাল তার বাড়ি থেকে যে বন্দুকটি নিয়ে আসে সেটিও রেখে যেতে হ'ল।

একেই তো আমাদের অস্ত্রের স্বল্পতা—সবার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দিতে পারি নি; তার মধ্যে বহু কষ্টে নিজেদের বাড়ি থেকে সংগ্রহ করা পাঁচ পাঁচটি বন্দুক টোটা ফিট্ করছে না বলে পড়ে রইল—এ যেন অত্যন্ত মর্মান্তিক। কি কারণে বে-সাইজের টোটা, বে-সাইজের চেম্বার বা বোরওয়ালা বন্দুক আমার হাতে এসে জুটল? আমরা ঐ বন্দুকগুলি এনে কত বোরের তা' গোপনে পরীক্ষা করে দেখি নি বা পরীক্ষার কথা ভাবিও নি। তা'ছাড়া পূর্বে সব বন্দুকগুলির ব্যবহারও হয় নি। কোনটার হয়ত ব্যবহারের সুযোগ ছিল, কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ প্ল্যান অনুযায়ী নিজ নিজ বাড়িতে বন্দুক নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠুক, সেটা আমরা চাই নি—পাছে অভিভাবকেরা বন্দুক আরও নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে ফেলেন বা সুরক্ষিত করে রাখেন। সেই জন্য সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের বন্দুক, আমরা আগে থেকে বার করি নি।

কার্তুজ ফিট্ না করার বিভ্রাটের কারণ বোধহয় বন্দুকগুলির বোর '১২ না হয়ে '১৬ ছিল। বন্দুকের ছিদ্রের মাপ '১৬ ও '১২-র মধ্যে দেখতে খুব একটা পার্থক্য বোঝা যায় না। আমাদের সবগুলি কার্তুজই '১২ বোরের কেনা ছিল। টোটা,

ফিট্ না হওয়ার আরও একটি কারণ হয়ত লম্বা চেম্বারে ফিট্ করার জন্য কার্তুজগুলি অপেক্ষাকৃত লম্বা ছিল, নয়ত এই ক'টি বন্দুকের চেম্বারের length অপেক্ষাকৃত কম ছিল। যাই হোক্, উপস্থিত আমাদের সংগৃহীত টোটা এই পাঁচটা বন্দুকের কোনটাতেই যখন খাপ খাচ্ছে না, তখন নিরুপায় হয়ে ভাগ্যকে দোষারোপ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

এই বন্দুকগুলির অভাবে কিন্তু আমাদের সামগ্রিক প্ল্যানের একবিন্দুও বিচ্যুতি ঘটে নি। আক্রমণ করে ঘাঁটিগুলি দখল করার জন্য যে দলগুলি প্রস্তুত ছিল, তাদের সবার জন্য আমাদের হাতে নিশ্চিতভাবে মজুদ করা যে সব অস্ত্র ছিল তাই সংরক্ষিত করে রাখা হ'ল। কোন্ কোন্ বাড়িতে বন্দুক আছে এবং সবার দৃষ্টির অগোচরে কি ভাবে কা'রা সেগুলি নিয়ে আসতে পারবে তার প্ল্যান করেছিলাম বটে, তবু সব ক'টি বন্দুকই আমাদের সর্ত অনুযায়ী গৃহস্বামী ও অন্যান্যদের সম্পূর্ণ অগোচরে আমাদের কাছে এসে পৌছবে, সেইরূপ ধারণা করি নি—ব্যতিক্রম যে ঘটতেই পারে, তা' ভেবে রেখেছিলাম। মোটামুটি নিজেদের বাড়ির ১৪।১৫টি বন্দুকের হিসেব করেছিলাম—তার মধ্যে যে ক'টি আমাদের পাওয়া সম্ভব সেইগুলি in order of merit (উপযুক্ততা অনুযায়ী) যুবক-সৈনিকদের হাতে দেওয়া হবে স্থির ছিল। কাজেই ব্রীচ্‌লোডার বন্দুক পাঁচটি বেশি বা কম, এর ওপর প্রথম আক্রমণ করে শত্রুঘাঁটি অধিকার করা নির্ভর করছিল না। আগেই বলেছি, ১৮ই এপ্রিল মুক্তি-যুদ্ধের সৈনিক, যারা যুব-বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে, তাদের অধিকাংশকেই আক্রমণের প্রথম অবস্থায় আমরা আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করতে পারি নি। তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম মাত্র লোহার রড্, বড় বড় ছোরা, গুর্খাদের ভোজালি বা তরবারি। মরণ-পাগল মুক্তিযুদ্ধের যুবক-সৈনিকেরা তাতেই খুশি। তাই পাঁচটি ব্রীচ্‌লোডার বন্দুক না থাকাতে আক্রমণ চালাবার প্ল্যানের ব্যাঘাত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। তবু এই অবস্থা আমাদের অসহ্য মনে হচ্ছিল—পাঁচটি বেশি আগ্নেয়াস্ত্র তো আমরা যুবক সৈনিকদের হাতে দিতে পারতাম—পেয়েও যে তা' ব্যবহার করতে পারলাম না!

সমস্ত বাধাবিঘ্ন চুরমার করে বিপদ-সাগর মথিত উদ্‌বেলিত করে পাড়ি দিতে যারা বদ্ধপরিকর, তাদের মনে বাড়ির করুণ দৃশ্য, মা-বোনের চোখের জল, মর্মান্তিক অক্ষমতার দীর্ঘশ্বাস, কোনটাই বেশিক্ষণের জন্য স্থায়ী হয় নি। প্রধানতম সমস্যা সম্বন্ধে গণেশের সঙ্গে আমার খুব সংক্ষিপ্ত আলোচনা হ'ল। আমাদের সংবাদ বিনিময়ের মাধ্যমে জানবার প্রয়োজন ছিল সুনিশ্চিতভাবে দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করার জন্য সমস্ত দলকে সময় থাকতে সংবাদ পাঠানো সম্ভব হয়েছে কি না। আগেই বলেছি, প্রধান চারটি গ্রুপকে—টেলিফোন-ভবন, এ, এফ, আই, অস্ত্রাগার, পুলিস-লাইন ও

ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণকারী দলগুলিকে দশ মিনিটের মধ্যেই আক্রমণের সময় পরিবর্তনের সংবাদ জানানো হয়েছে। কেবল এই চারিটি দলকে ছু'ঘণ্টা আক্রমণ স্থগিত রাখবার সংবাদ দেওয়াটা খুব একটা মুস্কিল ছিল না। খবর পাঠাবার অসুবিধা ছিল পুলিস-লাইনের চারপাশ ঘিরে যে পাঁচ-ছ'টি গ্রুপ একে অন্যের অগোচরে বিভিন্ন পথে অগ্রসর হয়ে আক্রমণের মিনিট দশেক আগে স্থান গ্রহণ করবে তাদের। যে তিনটি গ্রুপ শহরের তিনটি নির্জন স্থানে রাত ৮-৫ মিনিটের সময় টেলিগ্রাফ্ তার ছিন্ন করার জন্য অনেক আগেই যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে, তাদেব কাছে দ্রুত খবর পাঠানো খুবই দুরূহ ব্যাপাব ছিল। আর সব চাইতে বেশি ভাবনার বিষয় ছিল—কি উপায়ে সময থাকতে খবর পাঠিয়ে দু'টি ঘণ্টার জন্য প্রচাবপত্র বিলি বন্ধ করা যায়। যদি প্রচারপত্র বিলি বন্ধ করতে না পাবি, তবে আমাদের যুব-বিদ্রোহের সামগ্রিক ও ব্যাপক আয়োজন সম্বন্ধে শত্রুপক্ষ পূর্বেই ওয়াকিবহাল হযে পড়বে। টেলিগ্রাফেব তাব কাটা, পুলিস-লাইনের চাবপাশে গোপনে অপেক্ষা কবা এবং প্রচাবপত্র বিলি করাব মধ্যে সশস্ত্র সংঘাতের মত লোমহর্ষক, চাঞ্চল্যকব ও আডম্বরপূর্ণ বাহ্য দৃশ্য যদিও কিছুই নেই, তবু এই প্রত্যেকটি অংশের গুরুত্ব অনেক বেশি। সামগ্রিক প্ল্যানের জয় পরাজয় প্রত্যেকটি খুটিনাটি অংশেব ওপবেই নির্ভব করছিল। সব কিছুর মধ্যে দু'টি ঘণ্টার জন্য প্রচারপত্রের বিলি বন্ধ করাই বিশেষ অপরিহার্য বলে মনে করেছিলাম। পুলিস-লাইনের চারপাশে যদি ছ'টি দল দু' ঘণ্টা আগে থেকে অপেক্ষা করে অথবা কোন কোন নির্জন স্থানে টেলিগ্রাফ্ তার ছিন্ন করা হয়, তাতেও আগে থেকে ব্যাপক আয়োজনেব বিষয় শত্রুপক্ষের জানা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি একটি প্রচারপত্রও পুলিসের হাতে কোনমতে পড়ে তাতে আমাদের বিপদে পড়বার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। এই কারণে মাস্টারদা দু' ঘণ্টার জন্য প্রচারপত্র বিলি স্থগিত রাখার নির্দেশ পাঠান দু'জন খুব দায়িত্বশীল যুবক-সৈনিকের মারফত—কালীকিঙ্কর দে ও ননী দেব। মাস্টারদা এই দু'জনকে অবস্থার বিশেষ গুরুত্ব বুঝিয়ে সাইকেল দিয়ে বিভিন্ন দলের কাছে খবর পাঠান। কালী ও ননী বুঝেছিল যদি প্রচারপত্র বিলি করা বিকল্প ব্যবস্থা অনুযায়ী বন্ধ করা না হয়, তবে আমাদের সমূহ বিপদ। বলা বাহুল্য, তারা সফলতার সঙ্গে প্রচারপত্র বিলি করার দলগুলিকে মাস্টারদার নির্দেশ সময়মতই পৌঁছে দিতে পেরেছিল। গণেশ ও আমি আলোচনা করে বুঝি যে, খবর পাঠানো হয়েছে এবং সব দলগুলিই সময়মত খবর পেয়েছে।

হিমাংশু ট্যাক্সি আনতে গেছে প্রায় আধ ঘণ্টা হয়েছে। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি কতক্ষণে ট্যাক্সি নিয়ে হিমাংশু ফিরে আসবে। প্রত্যেকটি মিনিট উৎকণ্ঠায় কাটছিল। সবার মধ্যে অস্বস্তি—সবার মধ্যেই একপ্রকার অস্থিরতা—কতক্ষণে

আসবে হিমাংশু— ট্যাক্সি পাবে তো— যদি ট্যাক্সি না পায়, ইত্যাদি স্বাভাবিক প্রশ্নগুলি আমাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এমন সময় একটি অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটে গেল। কোথায় একটি ট্যাক্সি আসবে তা' না, এল কিনা এমন একজন যার উপস্থিতি আমরা তখন কেউ প্রত্যাশা করি নি। দরজায় পাহারায় নিযুক্ত ছিল হরিপদ মহাজন। অথচ বিনা অনুমতিতে, বিনা বাধায়, স্বদেশ রায় সটান ঘরের মধ্যে এসে ঢোকে কি করে? স্বদেশ আমাদেব গুপ্ত সমিতির সভ্য নয়। তার সঙ্গে দেবপ্রসাদ গুপ্তেব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। কয়েকমাস আগে নরেশ আমাকে স্বদেশেব সঙ্গে মিশে তাকে পরীক্ষা করে দেখতে বলেছিল। আমি সম্মত হই নি। অভ্যুত্থানের ছয় মাস পূর্ব হতেই নতুন সভ্য সংগ্রহ আমরা নীতিগতভাবে বন্ধ কবে দিয়েছি। তাই নরেশ স্বদেশ সম্বন্ধে উচ্চধাবণা পোষণ কবা সত্ত্বেও তাকে পরীক্ষা করে দেখে সভ্য পদ দেওয়াব অনুরোধ অমি রাখতে পারি নি। নবেশকে বলেছিলাম সে নিজের দায়িত্বে স্বদেশকে দলে গ্রহণ করতে পাবে। কিন্তু নরেশ দায়িত্ব নিতে সাহস করে নি। স্বদেশকে দলে নেওয়া হ'ল না। আমি স্বদেশকে খুব চিনতাম—বোজই সে গণেশেব বাড়িতে দেবু ও নবেশেব সঙ্গে আসত। অন্যান্য ছেলেদেব সঙ্গেও স্বদেশেব জানাশোনা ছিল। তবুও এই সময় তার হঠাৎ আবির্ভাব আমাদেব ভাল লাগল না। একেবাবে ঘরের ভেতরে হাজিব হয়েছে দেখে আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম। অবশ্য স্বদেশের এতে কোন দোষ ছিল না। সে এই বাড়িতে এইভাবে প্রায়ই এসেছে—বাড়ির অন্দরমহলেও তার অবাধ গতি ছিল। গণেশ ছাডা সেই সময় এই বাড়িতে আর কেউ থাকতো না। রোজের মত স্বদেশ আজও এসেছে—দবজা খোলা পেয়েছে—কেউ তাকে নিষেধও করে নি। তাব দোষ কি? সে কি করে জানবে যে আমরা আজ এই বিশেষ সময়ে তার উপস্থিতি অবাঞ্ছনীয় মনে করছিলাম! স্বদেশ কোনমতে ঘরের মধ্যে প্রবেশের সুযোগই পেত না যদি হবিপদ মহাজন তার পোস্ট ছেড়ে এক মুহূর্তের জন্যও অন্যত্র না যেত। খুব সামান্য একটু ত্রুটি! খুব অল্পক্ষণের জন্য হরিপদ জল খেতে ভেতরে যায়! এরই মধ্যে এই অবাঞ্ছনীয় ঘটনা! সামান্য ত্রুটির জন্যও যে কি বিভ্রাট ঘটে যেতে পারে তা অনুধাবন করা প্রয়োজন। সামান্য ত্রুটির বিরুদ্ধে সংগঠনে আমরা রীতিমত অভিযান চালিয়েছি, তবু ত্রুটির পর ত্রুটি আমাদের হয়েছে। কাজেই "ত্রুটিহীন হওয়া যায না"—এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে, সংগঠনে ত্রুটিবিচ্যুতি হবেই ধরে নিয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার মনোবৃত্তি ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠনের পরিপন্থী। আমাদের শিক্ষণীয় বস্তু—ত্রুটিহীন হতে হলে আরও কত সজাগ কত তৎপর, কত নিষ্ঠা, কত একাগ্রতার প্রয়োজন তা' কেবল জানলেই চলবে না—হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি উপলব্ধির অভাব থাকলে চলবে না—আঘাত আসবে, ত্রুটি হবে, তাই বলে ঘাবড়ে যাওয়াও মারাত্মক ভুল।

স্বদেশ ঘরের মধ্যে ঢুকে যা দেখল তাতে সে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়লো। আমাদের সকলের সৈনিকের পোশাক, প্রত্যেকের কোমরে রিভলভার বা পিস্তল; খাটের উপর পাঁচটি দোনলা বন্দুক ও বহু কার্তুজ খোলা পড়ে আছে। নিমেষের মধ্যে স্বদেশ অবস্থার গুরুত্ব বুঝে নিল। আমরা যে তার উপস্থিতিতে একেবারেই সন্তুষ্ট হই নি, তা' উপলব্ধি করে সে খুব বিব্রত বোধ করছিল। সে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকলের চোখে মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল; গণেশ ও আমি পরস্পর চোখে চোখে তাকালাম, রোষ-কষায়িত দৃষ্টিতে হরিপদর দিকে তাকাচ্ছিলাম। হরিপদ অপরাধীর মত নতশিরে দাঁড়িয়ে, কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। আমাদের কারও মুখে কোন কথা নেই—সবাই নির্বাক। ঘরটি একেবারে নিস্তব্ধ। স্বদেশ যেন আর দাঁড়াতে পারছিল না। সে অবাঞ্ছিত, সে অবহেলিত—বন্ধুদের দ্বারা আজ সে পরিত্যক্ত! ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে সে যেন ভেঙে পড়ছিল।

তার প্রতি আমার কিন্তু একটুও করুণা হ'ল না। আমাদের মনোভাব কর্তব্যে কঠোর ও আপোষহীন! এখনই এর একটা বিহিত করা চাই—কে জানে স্বদেশ কে? সে যদি পুলিসের চর হয়? আমাদের ব্যবহার, আমাদের ভাবভঙ্গি স্বদেশকে যে নিদারুণভাবে আহত ও অপমানিত করছিল, তা' না বোঝবার মত নয়। স্বদেশ ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মুখ খুলল—"আমি এসে কি অন্যায় করলাম?" কেউ উত্তর দিল না। স্বদেশ আর একবার বলবার চেষ্টা করল—"আমি কি অন্যায় করেছি?" এই প্রশ্নেরও জবাব স্বদেশ পেল না। আমি দাঁতে দাঁত চেপে খুব চাপা কণ্ঠে গণেশকে ডাকলাম—"শোন, এদিকে এস।" আমরা দু'জন ভিতরের বারান্দার একটি অন্ধকার কোণে সবার দৃষ্টির বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। গণেশের মুখে কোন কথা ছিল না। সে আমার মনোভাব বুঝতে পারছিল। আমিও বুঝছিলাম সে এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে প্রস্তুত ছিল না। যদি স্বদেশ বন্ধুবেশী কোন পুলিসের চর হয় তবে সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব সহজ। আর যদি তা' না হয়? প্রশ্ন ছিল অনেক। পুলিসের চর হোক্ আর না হোক্ তবু সে তো দলের সভ্য নয়! এতবড় যুব-বিদ্রোহের দায়িত্ব পালন করতে চলেছি। শেষ মুহূর্তে ঘাটে এসে নৌকো ডুববে না তো? আর যেন ভাবতে পারছিলাম না। গণেশকে চাপাকণ্ঠে এই ক'টি কথা বললাম—"না, ওকে যেতে দেওয়া উচিত নয়। বেঁধে রাখি।" গণেশ নির্বাক হয়ে রইল—'না' বলা খুব কঠিন। আমিও বা তার মতের অপেক্ষায় ছিলাম কেন? যদি আমি স্বদেশকে বেঁধে রাখতাম তবে কি গণেশ আমাকে নিষেধ করত? হয়ত ব্যাপারটা খুব দুঃখের হ'ত—তবু স্বদেশকে বেঁধে রাখার সিদ্ধান্ত যদি নিয়ে ফেলতাম, তবে, ঘটনাটি খুব শোচনীয় হলেও কেউ বাধা দিত বলে আমার মনে হয় না।

আমি আর একবার গণেশকে বললাম—"দেরি করা ঠিক হবে না। বেঁধে রাখি।"

দলের সভ্য নাই বা হ'ল,-স্বদেশ যে আমাদের একজন বন্ধু—আমাদের Sympathiser, সভ্য না হলেও সমর্থক তো বটে। আজ সকালেও হয়ত তার সঙ্গে কত হাসি ঠাট্টা গল্পগুজব হয়েছে। এই কঠোর ব্যবস্থা গণেশের পক্ষে অনুমোদন করা খুবই কঠিন ছিল। আমার পক্ষেও যে খুব সহজ ছিল তা নয়। আগে অনেক ঘটনায় মধ্যে বলেছি, মাস্টারদার নেতৃত্বে আমবা তখনকার দিনেও অনেকটা Rational ছিলাম। তাই বার বার প্রশ্ন জাগছিল—যদি সে পুলিসের চর না হয়!

স্বদেশ আমাদের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করে শেষ পর্যন্ত বলল—"আমি ভুল করেছি। আচ্ছা, আমি আসি!" এক পা এক পা করে সে হাঁটতে লাগল। বেঁধে রাখবার প্রস্তাবই মাত্র আমি করেছি। গণেশ অনুমোদন করছিল না—একটি কথাও বলে নি। স্বদেশ চলে যাচ্ছে—যা করবার এখনই করতে হবে। বিদ্যুতের মত আমার চিন্তাধারা বয়ে চলেছিল—স্বদেশ যদি বন্ধুবেশী পুলিসের চরও হয় তবু সোজা গিয়ে কোতোয়ালিতে খবর দিতে পারে না, নিজের শঠতাকে গোপন রেখে তেমন কোন আই, বি, পুলিসকে (যার সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে) এ খবর গোপনে জানাতে হবে; এতে সময় লাগবে। তারপর সেই পুলিস-অফিসার খবর দেবে পুলিস-কর্তাকে; পুলিস-কর্তা সব তথ্য জেনে কোতোয়ালি বা পুলিস-লাইনে খবর দিয়ে সশস্ত্র পুলিস-বাহিনী নিয়ে তবেই আসবে আমাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে। কাজেই খুব কমপক্ষেও দু'তিন ঘণ্টা সময় লাগবেই। এর অনেক আগেই আমরা আক্রমণ সুরু করব।

তখন রাত ৯-১৫ মিনিট। আর পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই আমাদের আক্রমণ সুরু করতে হবে। মনে মনে হিসেব করে বুঝলাম স্বদেশ যদি পুলিসের চরও হয় তবু, তার কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে পুলিস আসবার অনেক আগেই আমাদের অ্যাক্‌শন আরম্ভ হবে। এই কথাগুলি লিখতে বা পড়তে যতক্ষণ লাগছে, ভাবতে তার চেয়ে অনেক কম সময় লেগেছে। চিন্তার গতিকে কোন দ্রুততম রকেটও পরাস্ত করতে পারে না। এক মুহূর্তেই আমি লণ্ডন, নিউইয়র্ক, মস্কো, পিকিং, চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্র সব ভেবে নিতে পারি। এক নিমেষে আমার মনে ঐ সব চিন্তা এসেছে এবং আমি ভাবতে ভাবতেই স্বদেশ গভীর বেদনা ও অপমান নিয়ে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

স্বদেশ হয়ত নিদারুণ অভিমান বুকে নিয়েই চলে গেল। কিন্তু আমাদের মন থেকে অশুভ চিন্তা একেবারে দূর হ'ল না—পুলিস-লাইনে যাওয়ার জন্য ট্যাক্সি এসে পৌঁছবার আগেই যদি পুলিস এসে হানা দেয়! বিচার করে দেখলে পুলিস এসে পৌঁছনোর কোন সম্ভাবনাই ছিল না—তবু সেই অশুভ চিন্তা থেকে আমরা রেহাই পাই নি।

এই বিভ্রাটের মূল দায়িত্ব হরিপদ মহাজনের—সে যদি তার পোস্টে হাজির থাকত তবে নিষেধ করলে স্বদেশ তো আর ঘরে ঢুকত না। হরিপদ তার ত্রুটি বুঝতে পেরে নিজেকে অপরাধী ভেবে একেবারে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়লো। যারা একসঙ্গে প্রথম আক্রমণকারী দলে যাবে তাদের মধ্যে যদি একজনও অবসাদগ্রস্ত বা নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে, তবে তার প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া দলের অন্যদের ওপর প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই তার অপরাধী মনোভাবকে দূর করবার জন্য তাকে উৎসাহ দিয়ে বললাম—"ভুল মানুষেব হয়। ভুল বুঝে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হওয়া উচিত। তুমি তোমার ত্রুটি বুঝতে পেরেছ, তাই যথেষ্ট। এখন এইভাবে মনমরা হয়ে থাকবে কেন? আব একটু পরেই আক্রমণ সুরু কববার জন্য আমাদের সর্বতোভাবে প্রস্তুত হতে হবে। Cheer up!"

এমনিভাবে হরিপদকে তাতিয়ে তুললাম। সবাই এখন উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি—কতক্ষণে হিমাংশু ট্যাক্সি নিয়ে আসবে! চট্টগ্রামে, ১৯৩০ সালে, সর্বসাকুল্যে পঞ্চাশটি ট্যাক্সি ছিল কিনা সন্দেহ, তাও আবার প্রায় ট্যাক্সিই নিখিল-বঙ্গ মুসলিম্ কন্‌ফারেন্সে খাটছে। কাজেই ট্যাক্সি যদি পাওয়া না যায় তবে অবাক হবার কিছু নাই। কিন্তু যে কোন ভাবে ট্যাক্সি একটি পাওযা যাবে না, তাও যেন ভাবতে মন চাইছিল না।

প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের দারুণ উৎকণ্ঠায় কাঠছিল, স্থির থাকতে পারছিলাম না। এক একবার রাস্তার ওপর গিয়ে দাঁড়াচ্ছি আর একদৃষ্টে দূব-পথের দিকে তাকিয়ে আছি যদি কোন মোটরের আলো দেখতে পাই। প্রতিবাব নিরাশ হয়ে ঘরে ফিরে এসেছি। দেখতে দেখতে সময় চলে যাচ্ছে। প্রায় সাড়ে ন'টা বাজতে চলল। এখনও হিমাংশুর দেখা নেই—ট্যাক্সিরও কোন খবর নেই। আমাদের বলা ছিল হিমাংশু যদি শেষ পর্যন্ত ট্যাক্সি নাও পায় তবে একটি ঘোড়ার গাড়ি হলেও যেন নিয়ে আসে। বলা হয়েছিল সাড়ে ন'টার মধ্যে তাকে ফিরে আসতেই হবে। আমাদের আক্রমণের 'জিরো-আওয়ার' রাত দশটা। তাই সাড়ে ন'টা নাগাদও যদি ট্যাক্সি না পাই তবে আমাদের ঘোড়ার গাড়িতেই রওনা হতে হবে। এখন সাড়ে ন'টা বাজতে মাত্র কয়েক মিনিট বাকি।

এই ক'টি মুহূর্ত যেরূপ উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ও অস্থিরতা নিয়ে কাটিয়েছি জীবনে সেরূপ অভিজ্ঞতা আর কখনও হয় নি! কে বুঝবে বা কি করে বোঝাব আমাদের উৎকণ্ঠার পরিমাণ কতখানি! একবার সময় পরিবর্তন করেছি—সবাইকে বলা হয়েছে আক্রমণের পূর্বে দেখা হওয়ার আর প্রয়োজন নেই, যে যার নির্দিষ্ট কাজ করে যাবে—যুগপৎ আক্রমণ হবে রাত্রি দশটায়। এইরূপ অবস্থায় পুলিস-লাইন আমাদের দশটার সময় আক্রমণ করতেই হবে।

দু'তিন মিনিটের বেশি সময় হাতে নেই। ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে অন্তত আধ ঘণ্টা আগে না গেলে সময় মত পৌছনো যাবে না। হিমাংশু কি তবে একটা ঘোড়ার গাড়িও পাচ্ছে না? কি আশ্চর্য? মোটর বা ঘোড়ার গাড়ি না পেলেও হিমাংশু তো চলে আসবে! আমরা সাড়ে ন'টার পর আর এক মিনিটও অপেক্ষা করব না। হিমাংশু আসুক আর নাই আসুক, ঘোড়ার গাড়িও যদি পাওয়া না যায়, আমরা সাড়ে ন'টায় পায়ে হেঁটেই রওনা হব স্থির করলাম।

আমরা রওনা হবার উপক্রম করছি এমন সময় মনে হ'ল যেন মোটরের লাইট দেখা যাচ্ছে। রাস্তাটা একটু বেঁকে গেছে, তাই এক ঝলক আলো যেন চোখে পড়েই আবার হারিয়ে গেল। .মোটরের আলো নাও হতে পারে। তবে কি মোটর আর পাওয়া গেল না! হিমাংশু এল না! এক সেকেণ্ডও নয়— এরই মধ্যে কত কি ভেবে ফেললাম। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আবার মোটরের হেড্‌লাইট দেখা গেল। আশা হ'ল, হিমাংশু নিশ্চয়ই ট্যাক্সি নিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে হ'ল—যদি না হয়? মাত্র পনেরো-কুড়ি সেকেণ্ডের ব্যবধান —তারপরই সন্দেহভঞ্জন হবে মোটর গাড়িটি কার! তবু এই অল্প সময়ের মধ্যেই আশা-নিরাশায় নানারূপ মানসিক প্রতিক্রিয়া হ'তে লাগল।

একেবারে ধৈর্যের শেষ সীমায় যখন পৌছেছি, তখন আমাদের এতক্ষণের আশা-নিরাশা, উৎকণ্ঠা-অস্থিরতার সমাপ্তি ঘটিয়ে একটি ট্যাক্সি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। হিমাংশু ট্যাক্সি থেকে নেমে সোজা ঘরের ভেতর এল। আমাদের হাতে সময় একেবারে নেই। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে কোথায় বেঁধে রাখব অনেক আগেই সেটা ঠিক করে ফেলেছি। হিমাংশুকে বললাম ড্রাইভারকে ঘরে ডেকে আনতে।—"বাবুরা তোমার সঙ্গে ভাড়া নিয়ে কথা বলতে চান। তাঁরা বেশিক্ষণের জন্য তোমার ট্যাক্সিটি ভাড়া করবেন। তুমি একটু ভেতরে এস"—হিমাংশুর কথা শুনে সরল বিশ্বাসে ট্যাক্সি-চালক ভাড়া নিয়ে কথা বলতে ঘরের ভিতর ঢুকলো। যেমনি দরজার মধ্যে সে পা বাড়াল, একজন পাশ থেকে এসে ড্রাইভারের বাইরে পালাবার পথ রুদ্ধ করে দরজা আটকে দাঁড়াল। আর একজন তাকে ভেতরের কামরায় এগোতে ইঙ্গিত করলো। দু'জনকেই খাকী মিলিটারী ইউনিফর্মে দেখতে পেয়ে ও তাদের চালচলন লক্ষ্য করে ড্রাইভার ঘরে ঢুকতে ইতস্ততঃ করছিল। কিন্তু তার ফিরে যাওয়ার পথ ততক্ষণে রুদ্ধ। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেচারা ড্রাইভারকে নির্দেশ মানতে হ'ল।

দ্বিতীয় কামরায় ঢোকার মুখেই গণেশ ও আমি ড্রাইভার সাহেবকে "অভ্যর্থনা" করলাম। আমাদের উপায় ছিল না, কঠোর কর্তব্যের তাগিদে ড্রাইভারকে বেঁধে রেখে ট্যাক্সি নিয়ে চলে যেতে হবে। বড় রাস্তার ওপর গণেশের দোকান।

ড্রাইভার যদি অসম্ভব জেনেও ভয়ে পালাতে চেষ্টা করে বা ধ্বস্তাধ্বস্তি অথবা চেঁচামেচি সুরু করে এবং সেই ক্ষেত্রে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যদি পিস্তলের আওয়াজ হয়ে যায়, তবে আমাদের পক্ষে তা' খুবই অপ্রীতিকর হবে। কারণ, গোলমাল শুনে পথচারীরা যে ছুটে আসবে না কে বলতে পারে? এইরূপ অনিশ্চয়তা ও প্রতিকূল অবস্থার সম্ভাবনা মনে রেখে অতীত অভিজ্ঞতার শিক্ষা অনুযায়ী ড্রাইভারকে সহজে বশ করা ও বেঁধে রাখবার কৌশল প্রয়োগ করা হ'ল।

গণেশ ও আমার ইউনিফর্মের বিবরণ আগেই দিয়েছি। দু'জনের হাতে দু'টি গুলীভরা রিভলভার—আঙ্গুল ট্রিগার স্পর্শ করে আছে। এই মূর্তি দেখে যে কোন নিরীহ লোক তার জীবন-সংশয় মনে করে ভীষণ ঘাবড়ে যেতে বাধ্য। কিন্তু যদি রিভলভার নিয়ে লাফিয়ে ড্রাইভারের ওপর পড়তাম তবে সে চীৎকার-চেঁচামেচি করে বিভ্রাট ঘটাত অথবা তাকে মেরে ফেলা হবে মনে করে একেবারে মরীয়া হয়ে আত্মরক্ষার জন্য প্রতি-আক্রমণ করে বসতো।

ড্রাইভার আমাদের দেখেই হাঁপাতে লাগল। প্রায় চার হাত দূরে দাঁড়িয়ে রিভলভারের মুখ একেবারে অন্য দিকে ঘুরিয়ে ধরে—তাকে মারবার বা আহত করবার ইচ্ছে যে আমাদের একেবারেই নেই তা' প্রথমেই বুঝিয়ে দিলাম। ডান হাতে রিভলভারটি ধরেছি আর বাঁ হাতের আঙুল ঠোঁটের ওপর চেপে রেখে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলাম—"চুপ, চীৎকার করো না।"

তারপর পিস্তলটির মুখ অন্য দিকে রেখে সেটিকে হাতের ওপর ধীরে ধীরে দোলাতে লাগলাম এবং চট্টগ্রামের ভাষায় বললাম—

"ইয়ান্ কি দেইখ্যস্ নি মিঞা?"—(এটা কি দেখেছিস্)। ড্রাইভার কাঁপতে কাঁপতে বলছিল—"হঃ বাউ, হঃ বাউ।"—(হ্যাঁ বাবু, হ্যাঁ বাবু)। তারপর তাকে সম্মোহিত করে ফেলার জন্য বললাম—"আঁরে চিন্নস্ নি, আঁই কন্? আঁর নাম জানস্ নি? অনন্ত সিংহর নাম হুইন্নস্ নি? আঁই অনন্ত সিং।"—(আমাকে চিনেছিস্ আমি কে? আমার নাম জানিস্? অনন্ত সিং নাম শুনেছিস্? আমিই অনন্ত সিং)। আমার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে তার মুখ থেকে কলের পুতুলের মত আপনা থেকে প্রতিবার বেরিয়ে আসছিল—"হঃ বাউ, হঃ বাউ।" তার চোখ-মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, হাত দুটি কাঁধ থেকে সোজা নিচে ঝুলছে—যেন একটুও জোর নেই, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে, পা দুটি থর থর করে কাঁপছে—এখনই সে যেন পড়ে যাবে।

ড্রাইভারকে অভয় দিয়ে সেইরূপ দেশীয় ভাষায় আবার বললাম, যার অর্থ এই—"তোমার কোন ভয় নেই—তোমাকে আমরা মারব না—আহতও করব না। তুমি আমাদের ভাই। তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি বলে খুব দুঃখ হচ্ছে। তোমার

সঙ্গে যদি আগে জানা থাকত, তোমাকে যদি বিশ্বাস করতে পারতাম তবে এইটুকু কষ্টও দিতাম না।"

আমার কথার ফাঁকে ফাঁকে সে কেবল "হুঃ বাউ, হুঃ বাউ" বলে চলেছে। তারপর তাকে আমাদের আসল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বললাম—

"দেখ ভাই, আমবা ডাকাতি করতে যাচ্ছি। তোমাব গাড়ি আমরা নিয়ে যাব। তোমাকে বিশ্বাস করে ছেড়ে দিতে পারছি না - যদি তুমি পুলিসে খবর দাও, তাই তোমার হাত-পা বেঁধে রেখে যাব। আমরা ফিরে এসে তোমাকে ছেড়ে দেব—গাড়িও তুমি ফেরত পাবে। আর, আমরা তোমাকে অনেক টাকাও দেব।" সে কি শুনেছে না শুনেছে বলা কঠিন। মোটামুটি সে বেশ বুঝেছে তাকে আমরা প্রাণে মারব না কিন্তু তার গাড়ি নিয়ে ডাকাতি করতে যাব এবং তাকে বেঁধে রেখে যেতে চাই। এতক্ষণে হয়ত সব অবস্থাটা সে বুঝতে পারলো। প্রাণে মারা হবে না জেনে মৃত্যুভয় থেকে পরিত্রাণ পেল। এখন যেন সে অনেকটা শান্ত। তক্ষুণি আবার চট্টগ্রামের ভাষায় বললাম—"আঁরা আর দেরি করিৎ পাইর্‌তাম ন। চল ভাই চল—এই ঘরৎ আইয়।"—(আমরা আর দেরি করতে পারছি না। চল ভাই চল—এই ঘরে এস)। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত পাশের ঘরে এল। তারপর আমাদের শেষ ইচ্ছা তাকে জানালাম—"তুঁই এঁডে হুতি পড়।"—(তুমি এখানে শুয়ে পড়)। কাঁপতে কাঁপতে সে মেঝেতে শুতে যাচ্ছিল। বিধু একটা মাদুর বিছিয়ে দিল। ঘর থেকে একটা বালিশও এনে তাকে দেওয়া হ'ল। সে জল খেতে চাইল। আমরা তাকে জল দিলাম। তারপর বললাম—"ভাই তোমার হাত-পা আমবা বাঁধব!" সে বুঝেছিল এই শেষ কাজটি না করে আমরা ছাড়ব না। কোন আপত্তি না করে সে তার দু'টি হাত বাড়িয়ে দিল। তার হাত-পা বেঁধে রেখে এবার আমরা রওনা হব।

সাড়ে ন'টা বেজে দু'এক মিনিট হয়ত বেশি হয়েছে—বেরোবার সময় ছ' জোড়া বুটের আওয়াজ আমাদের ফিল্ড-হেডকোয়ার্টারটি (গণেশের দোকান) কাঁপিয়ে তুলল। পদধ্বনি শুনে আমাদের এই নিরীহ ড্রাইভারটি বুঝল এবার আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে চলেছি। ড্রাইভারকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বললাম—"দেখ, পালাবার চেষ্টা করো না। যদি পালাতে চাও তবে গুলী করা হবে। বিধু তুমি পাহারায় থাক। যদি পালাতে চেষ্টা করে তবে তাকে গুলী করবে।"

এই সমস্ত কাজ—অর্থাৎ, ড্রাইভারকে psychologically বশ করে বেঁধে রেখে রওনা হওয়া পর্যন্ত, দু' মিনিটের বেশি সময় লাগে নি। এই বর্ণনা পড়তে যতক্ষণ সময় লাগবে তার চাইতে অনেক কম সময়ে আমরা এই কাজটি শেষ করেছিলাম।

ড্রাইভারের কাছে আমার নাম প্রকাশ করাটা ষড়যন্ত্রমূলক কাজের পরিপ্রেক্ষিতে হয়ত মনে হবে নীতিবহির্ভূত হয়েছে। গণেশের নিজের বাড়িতে ড্রাইভারকে বেঁধে রাখা, অকেজো বন্দুকগুলি বাড়িতে ফেলে যাওয়া; বাড়ির গাড়ি ইউ-রোপীয়ান-ক্লাব আক্রমণ করতে ব্যবহার করা; সদরঘাট-ক্লাবের বাছাই-করা সব ক'টি ছেলের একসঙ্গে অন্তর্ধান, প্রভৃতি ব্যাপার আপাতদৃষ্টিতে ষড়যন্ত্রমূলক কাজের পরিপ্রেক্ষিতে নীতিবহির্ভূত বলে মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার ষড়যন্ত্রমূলক কাজের গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন ছিল আক্রমণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। যুব-বিদ্রোহের পর আমাদের গোপনীয়তা রক্ষার কোন অভিপ্রায় ছিল না—ভারতবাসীকে তখন জানাবার প্রয়োজন মনে করেছিলাম যে, আমরাই সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যুবক-সেনাবাহিনী গঠন করে সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছি।

ড্রাইভারকে যাতে কম কষ্ট দিয়ে তার গাড়িটি নিয়ে যেতে পারি সেই উদ্দেশ্যে আমার নাম বলে তাকে সম্মোহিত করেছি। যেভাবে তার সঙ্গে প্রথম থেকে আমরা ব্যবহার করেছি তাতে সাময়িকভাবে তাকে সামান্য কষ্ট দিলেও সে আমাদের ওপর একেবারেই অসন্তুষ্ট হয় নি। তার প্রমাণ পেয়েছি আমাদের মামলার সময়। সে আমাদের কাউকে সনাক্ত করে নি। পরদিন সকালে গণেশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে সোজা পুলিসের কাছে যায় নি এবং যতদূর সম্ভব পুলিসকে এড়িয়ে চলেছে।

একজন ড্রাইভারকে কাবু করা কি খুব কঠিন কাজ? তা'ছাড়া সেই সময়ে আমরা প্রায় সকলেই প্রচণ্ড শারীরিক শক্তির অধিকারী ছিলাম। আমাদের পক্ষে নিরীহ ও নিরস্ত্র একজন সাধারণ মানুষকে রিভলভারের সাহায্যে ভয় দেখিয়ে কাবু করা কোন কঠিন ব্যাপারই ছিল না। ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে আমরা ড্রাইভার আবদুল রসিদ সাহেবের সঙ্গে ঐরূপ পরিস্থিতিতে যদিও কঠোর ও অমার্জিত ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি তবু আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে তাকে বেঁধে রাখতে বাধ্য হচ্ছি তা' ভালভাবেই বুঝিয়ে দিতে পেরেছি। অতি সাহসী ও শক্তিশালী ব্যক্তিও স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য সহজ কাজকেও জটিল করে ফেলেন। আমাদের পূর্বের অভিজ্ঞতা ছিল বলেই ড্রাইভার সাহেবের সঙ্গে ঐরূপ সহজ কথাবার্তা বলা সম্ভব হয়েছে। আমরা কোনরূপ অতিরিক্ত কষ্ট তাকে দিই নি বা প্রয়োজনাতিরিক্ত একটুও রূঢ় ব্যবহার করি নি। এই সামান্য একটি কাজে শান্ত ধীর-স্থির থাকতে পেরেছি বলেই রসিদ সাহেবের সঙ্গে ঐটুকু রূঢ় ব্যবহার করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তার বন্ধুত্ব হারাই নি।

সরকারীপক্ষের কথা, ইংরেজীতে ছাপানো জাজমেন্টের ৪৩—৪৪ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত করছি—

"How this car came to be in the police lines we learn from Abdul Rashid (P. W. 16). He was employed as driver of taxi No. 20469 by its owner Fajlur Rahaman of Agrabad. On the evening of the 18th April he and his assistant Sultan Ahmed were waiting in the car in the taxi-stand near the Laldighi when about 8-30 or 9 p.m. a Hindu youth whom he did not know before came up and engaging the taxi asked him to drive on. He was about to take his assistant with him but the passenger objected saying there would be no room for him as there would be others coming. So Sultan was left behind."

—জনাব আবতুল রসিদ, ফজলুর রহমান সাহেবের ট্যাক্সি চালাতেন। ১৮ই এপ্রিল সাড়ে আটটা অথবা ন'টার সময় একজন যুবক লালদীঘির ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ড থেকে ২০৪৬৯ নম্বরের ট্যাক্সিটি ভাড়া করে নিয়ে যায়। যুবকটিকে তিনি (ড্রাইভার) চেনেন না বলেছেন। জনাব আবতুল রসিদ তাঁর সহকারীকে সঙ্গে নিতে চাইলে যে যুবকটি ট্যাক্সি ভাড়া করতে এসেছিল সে গাড়িতে আরও আরোহী আছে এই অজুহাতে সহকারীকে সঙ্গে নিতে নিষেধ করে।

হিমাংশুকে আমাদেব বলা ছিল, সে যেন কেবল ড্রাইভাবকেই একা সঙ্গে আনে ; কোন সহকারী যদি ড্রাইভাবের সঙ্গে আসতে চায় তবে তাকে যে কোন প্রকারে হোক্ নিবস্ত করবে। হিমাংশুর বিচক্ষণতার ওপর আমাদের খুব ভরসা ছিল।

জজ সাহেব তারপর লিখছেন—

"Under the direction of his passenger Abdul Rashid drove the car into the Sadarghat Road and was ordered to stop opposite a house on the left hand side of the road about 200 paces from Ezekiel's shop. The passenger entered this house and after a little time came out and asked the driver to come inside as the Babu wanted to speak to him. Abdul Rashid left the car and passed through the door by which he noticed, a man dressed in khaki uniform (shorts, tunic and topi) levelled a pistol at him and ordered him to keep quite......They took him into a small room inside the house and binding his hands and feet......left him lying on the floor. Then they pointed their pistols at his chest and asked if he recognised any of them. Terror stricken, he shook his head. As they went off

they warned him that they were leaving a guard to watch him and shoot him if he made the slightest sound. He next heard them starting up his car outside."

আমি নিজে যে বর্ণনা আগে দিয়েছি মোটামুটি ঠিক তাই আবদুল রসিদের জবানবন্দীতে পাচ্ছি। ইজিকেলের দোকানের ২০০ কদমের মধ্যে সদরঘাট রাস্তার বাঁ দিকে একটি বাড়ির সামনে জনাব আবদুল রসিদ ট্যাক্সিটি আরোহীর নির্দেশ মত থামালেন। সেই আরোহীটি গৃহে প্রবেশ করে আবার তক্ষুণি বাইরে এল ও বাবুরা তার সঙ্গে কথা বলতে চান বলে ড্রাইভারকে ভিতরে ডাকল। জনাব আবদুল রসিদ ঘরে ঢুকে খাকী পোশাক-পরা যুবকদের দেখতে পান। তারা পিস্তল দেখিয়ে আবদুল রসিদ সাহেবকে চুপ থাকতে বলে। তারপর তাঁকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে হাত-পা বেঁধে মেঝেতে শুইয়ে রাখে। সেখানে কয়েকজন তাঁর বুক লক্ষ্য করে পিস্তল টিপ করে জিজ্ঞাসা করে তিনি কাউকে চিনতে পেরেছেন কিনা। ভয়-বিহ্বল আবদুল রসিদ কাউকে চেনেন না বলে মাথা নাড়েন।

জনাব আবদুল রসিদ আমাকে নিশ্চয়ই চিনেছিলেন। আমার নাম অন্তত আমার নিজের মুখে তিনি শুনেছিলেন। তার পরদিন আমাদের নাম চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। আবদুল রসিদ সাহেবের আমাদের চিনতে না পারবার কোন কারণই ছিল না। তা'ছাড়া পুলিস যে তাঁকে জবানবন্দীতে আমাদের নাম স্বীকার করাবার জন্য যথেষ্ট প্ররোচিত করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর সঙ্গে কত অবাঞ্ছিত ব্যবহারই না আমরা করেছি! তবু নিজগুণে আমাদের তিনি ক্ষমা করেছিলেন। তাঁর স্বদেশভক্তি তাঁকে মুক্তি-যুদ্ধের সৈনিকদের প্রতি যে শ্রদ্ধাবান করেছিল তাতে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে? ধন্য জনাব আবদুল রসিদ, আজ এই সুযোগে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পেরে আমিও নিজেকে ধন্য মনে করছি।

তাঁর সম্বন্ধে আরও একটু জানতে পারলে পাঠকবর্গের ভাল লাগবে। তাই মামলার জাজ্‌মেণ্ট থেকে বিশেষ অংশটুকু তুলে দিচ্ছি—"...At the A. F. I. headquarters Mr. Lewis went inside leaving Abdul Rashid to wait in the car but as Mr. Lewis was long in returning he got tired of waiting and went off home."

মিঃ লুইস্ চট্টগ্রামের সহকারী পুলিস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তারপর Eastern Frontier Rifles-এর ব্যাটালিয়ান-কমাণ্ডার নিযুক্ত হন। তাঁরই মোটর গাড়িতে আবদুল রসিদ সাহেবকে বসিয়ে রেখে মিঃ লুইস্ A. F. I. হেডকোয়ার্টার্সে গেলেন। সাহেবের ফিরতে অনেক দেরি দেখে, বসে বসে ক্লান্ত হয়ে, আবদুল রসিদ সাহেব সোজা তাঁর নিজ বাড়িতে চলে গেলেন।

"সামান্য" একজন ড্রাইভার পুলিস সাহেবকে অবজ্ঞা করে চলে গেল! লুইস্ সাহেবের দেরি হচ্ছে আর বসে বসে ক্লান্ত হয়ে জনাব আবদুল রসিদ পুলিস সাহেবকে অতি সহজে উপেক্ষা করে বাড়ি চলে গেল! ইংরেজ শাসনের আমলে 'সামান্য' একজন ড্রাইভারের কী অসামান্য সাহস! আবদুল রসিদের তুলনাহীন স্বদেশপ্রেম দীর্ঘজীবী হোক্! যতদূর মনে পড়ে তিনি আমার চেয়ে বয়সে কিছু ছোটই ছিলেন। আশা করি তিনি আজও বেঁচে আছেন। আমি তাঁকে আমার বিপ্লবী অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ড্রাইভারকে হাত-পা বেঁধে রেখে আমরা ছ'জন গাড়িতে এসে উঠলাম। বিধু, হিমাংশু, হরিপদ, সরোজ, গণেশ ও আমি—প্রত্যেকের পরিধানে পদ-মর্যাদা অনুযায়ী খাকী সামরিক পোশাক ও সঙ্গে রিভলভার বা পিস্তল ছিল।

ট্যাক্সিটি ছিল খুব পুরনো, একেবারে ঝরঝরে, একটি শেভ্রোলে-টুরার। আমরা সবাই মোটর গাড়ি চালাতে জানতাম। তবু মোটর চালাবার ভার আমার ওপর দেওয়া হয়েছিল। আমি ড্রাইভারের আসনে গিয়ে বসলাম। আমার ঠিক পাশে ছিল হিমাংশু! গণেশ বসেছিল পেছনের সীটের ডানদিক ঘেঁষে।

গাড়িতে উঠে দেখি স্টার্ট দেওয়ার চাবিটি নেই। মহা মুস্কিল! আবার ফিরে গিয়ে ড্রাইভার সাহেবকে জিজ্ঞেস করতে হ'ল—"গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার চাবি কোথায়?" উনি জানিয়ে দিলেন চাবি নেই—দুটো তারের মুখ জোড়া দেওয়া আছে, স্টার্ট দেওয়ার সময় তা' খুলে দিতে হবে এবং ইঞ্জিন বন্ধ করবার সময় আবার ঐ তারের মুখ দুটো জুড়ে দিতে হবে। মোটর গাড়ির এইসব সামান্য বিষয় আমাদের জানা ছিল। এক নিমেষে আবার গাড়িতে ফিরে এসে গাড়ি স্টার্ট দিলাম। সহজেই স্টার্ট হ'ল। তখনও দশটা বাজতে প্রায় বিশ-পঁচিশ মিনিট বাকি, যথেষ্ট সময়।

এত পুরনো গাড়ি, প্রথম উঠেই চালানো একটু মুস্কিল। যাঁদের সামান্য গাড়ি চালাবার অভিজ্ঞতাও আছে তাঁরাই জানেন খুব পুরনো গাড়ির অনেক আবশ্যকীয় ছোট-খাটো কলকব্জা ঠিকমত কাজ করে না—তা ছাড়া ক্লাচ্, ব্রেক্, গিয়ার ও এক্সেলেরেটার প্রভৃতি ব্যবহারেরও ঠিক আন্দাজ পাওয়া যায় না। সেই কারণে গাড়িটি খুব ভালভাবে চালাতে পারছিলাম না—জোরে চালাবার কথাই ওঠে না। তবু মোটর গাড়ি তো একটা পেয়েছি! পুরনো গাড়ির ধর্ম—তার অসংখ্য ত্রুটি থাকবেই, তাতে কি আসে যায়? কোনমতে যদি গাড়ির চারটি চাকা ঘোরে এবং শেষ পর্যন্ত দশটার সময় পুলিস-লাইনের গার্ডরুমের কাছে গিয়ে উপস্থিত হতে পারি তবেই যথেষ্ট। এখনও সময় আছে—এভাবে মন্থর গতিতেও যদি এগোতে পারি, তাহলেও ঠিক সময়ে উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে ভাবনার কিছু নেই।

দশটা বাজবার মিনিট দশেক আগে আমরা সাহেবদের বড় পল্টন মাঠের কাছে এসে পৌছলাম। এখান থেকে মোটর গাড়িতে আস্তে গেলেও দু'-তিন মিনিটের মধ্যে পুলিস-লাইনে উপস্থিত হতে পারি। আর, দশ মিনিট আগে যদি এখান থেকে পদব্রজে রওনা হই তবুও ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটাব সময় পুলিস-লাইন আক্রমণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। এই এলাকায় যখন এসে পৌছলাম তখন গাড়ির নানা অবাধ্যতা থাকা সত্ত্বেও একটা অনিশ্চয়তার অশান্তি থেকে বাঁচলাম। ভাবলাম—যদি গাড়ি একেবারে বিগড়েও বসে তবু আমরা আর পরোয়া করি না—যে কোন উপায়ে, প্রয়োজন হলে ডবল মার্চ করেও, ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ধার্য সময়ে আক্রমণ করতে পারব।

গাড়িটির যেন গাঁটে গাঁটে ব্যথা—প্রাণটি যেন ধুক্-ধুক্ করে চলেছে। যে-কোন সময়ে হার্টফেল করবার সম্ভাবনা। গাড়ির এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় যে-কোন প্রতিকূল সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। সত্যি, এতক্ষণ intution—একটা অনুভূতি যেন সুপ্ত-মনে কাজ করছিল। এবার গাড়িটি বিদ্রোহ করলো। কোনমতেই আর এগোবে না। গাড়ি না হয়ে যদি যুদ্ধের ঘোড়া, উট বা হাতী রণ-প্রাঙ্গণে যাওয়ার আগে অবাধ্যতা প্রকাশ করত তবে হয়ত বা ভাবতাম, প্রাণী বলেই তারা আসন্ন মৃত্যু-আশঙ্কায় ভীত ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই জড়পদার্থ গাড়িটিরও কি প্রাণ আছে? সেও কি আতঙ্কগ্রস্ত? না কি তার চালক স্নায়বিক দুর্বলতাব জন্য ঠিকমত চালাতে পারছে না?

রামকৃষ্ণ বিস্ফোরণে দগ্ধ হওয়ার পর, আরও দু'জন যখন বোমা তৈরি করবার সময় বিস্ফোরণে সাংঘাতিকভাবে আহত হ'ল, তখন ডাক্তার জগদাবাবু গোপনে তাদের চিকিৎসা করতে এসে এক সুযোগে আমাদের বলেছিলেন—"এইসব তোমাদের প্রতি ভগবানের একটার পর একটা সতর্ক-বাণীর ইঙ্গিত। তোমরা এই দুর্গম পথ পরিহার কর।" তখন ভগবানে বিশ্বাস করতাম না, তবু তাঁকে বোঝাবার জন্য বলেছিলাম—"ভগবান এইসব বাধা সৃষ্টি করে তাঁর ভক্তদের দৃঢ়তা ও মনোবলের পরীক্ষা করেন।"

এতদিন ধরে কোন বাধাই মানি নি। কোন সন্দেহ নিষেধই আমাদের ধরে রাখতে পারে নি। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' যখন এতদিনে পেরিয়ে এসেছি, তখন আক্রমণের দশ মিনিট পূর্বে সামান্য একটি মোটর গাড়ি আমাদের অটল দৃঢ়তাকে ভেঙে দেবে—তা' কি সম্ভব?

গাড়ি না থাকলে অনেক দূর থেকে সান্ত্রী আমাদের চ্যালেঞ্জ করতে পারে। এই অনিশ্চয়তার দুর্বলতাকে অপসারণ করার উদ্দেশ্যে একটি মোটর গাড়ি যোগাড়ের জন্য এত চেষ্টা করেছি। কিন্তু এই শেষ মুহূর্তে যদি আমাদের পদব্রজেই যেতে হয়, তবে এত চেষ্টা ও পরিশ্রম সবই যে ব্যর্থ!

ভাববার সময় ছিল না। গাড়িটি একেবারে থেমে যেতেই আমাদের সাথীরা সকলে চট্ করে গাড়ি থেকে নেমে মোটরটি ঠেলতে লাগলো। আমি স্টীয়ারিং-এ বসেই ছিলাম। প্রায় পনেরো-কুড়ি হাত তারা মোটরটি ঠেলে স্টার্ট দিতে সাহায্য করলো। গাড়ি স্টার্ট নিল।

সবাই গাড়িতে উঠবে—কিন্তু দেখা গেল সরোজ গুহের হোল্স্টার থেকে তার রিভলভারটি রাস্তায় কোথায় পড়ে গেছে। পাঠকদের মনে হচ্ছে কি বিরক্তিকর পরিস্থিতি! এই অভিজ্ঞতার শিক্ষাই হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। খুব ভাল সার্বিক প্ল্যান অনুযায়ী যত বিপ্লবী অ্যাক্শন বা যুদ্ধ হয়েছে, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করলে জানতে পারা যায় extensive details-এ (বিস্তারিত ছোট-খাটো কাজে) এইরূপ সামান্য সামান্য বিষয়ে নানা ত্রুটি ছিল। এইসব বিচ্যুতি বা বাধাকে ভগবানের "না করাব" ইঙ্গিত মনে করা বা "এইরূপ ত্রুটি কেন আছে"—এই ভেবে অবাস্তবতার জগতে ঘুরে বেড়াবার মানসিক বিকৃতি কোন বিপ্লবীর শোভা পায় না। চারজন যুবকের চার জোড়া চোখের দৃষ্টির আড়ালে সরোজের রিভলভার বেশিক্ষণ আত্মগোপন করে থাকতে পারলো না—রিভলভারটি এক মিনিটের মধ্যেই তারা খুঁজে পেল।

রাত প্রায় দশটা—গাড়ি ঠেলার ব্যাপারে এবং বড় পল্টনের সদর রাস্তার ওপর ইউনিফর্ম পরে ও অস্ত্রাদি নিয়ে রিভলভার খোঁজাখুঁজিতে সকলেই ব্যাপৃত। এই সময় এই রাস্তাটি একেবারে জনমানবশূন্য নির্জন ছিল। সচরাচর এই পথ দিয়ে এত রাত্রে লোক চলাচল করে না বললেই হয়। অবশ্য কোন মোটর গাড়ির এই সময়ে রাস্তা অতিক্রম করা অসম্ভব ছিল না। সাহেব জেলা-কর্তাদের এইদিকেই বাড়ি। তাই আশঙ্কা ছিল হঠাৎ কোন বড় সাহেবের গাড়ি চলে আসতে পাবে। সেইরূপ পরিস্থিতির জন্য আমরা সদাসর্বদা প্রস্তুত ছিলাম। যাই হোক্, এই অল্প সময়ের মধ্যে অবাঞ্ছনীয় কোন ঘটনা ঘটে নি।

এই সময় হঠাৎ একটি ছায়ামূর্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল—ডান দিকে রাস্তার ধারে কে যেন একজন দাঁড়িয়ে আছে। ডান দিকের রাস্তার গা ঘেঁষে একটা ফলের বাগান—নানা ধরণের বড় বড় আম, কাঁঠাল, সুপারি প্রভৃতির গাছ। গাছের ছায়া এসে রাস্তার ওপর পড়েছে। তাই সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। অত্যন্ত ব্যগ্রতা ও অস্বস্তির মধ্যে এতক্ষণ আমাদের দৃষ্টি এই লোকটির ওপর পড়ে নি। যখন স্পষ্ট বুঝলাম সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছে, তখন প্রথমেই মনে হ'ল হয়ত কোন পুলিসের ওয়াচার ভার ডিউটিতে আছে। পুলিস রিপোর্ট থেকে আগেই উদ্ধৃত করেছি, পল্টনের এই স্থানটিতে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য তাদের একটি পোস্ট ছিল। তাই

প্রথমেই পুলিস-ওয়াচার বলে তাকে ধরে নিয়েছি। মনে মনে তক্ষুণি হিসেব করে ফেললাম, যদি সে আমাদের এই সময়ে এইরূপ বেশে দেখে আমরা সরকারে বিরুদ্ধ কোন অ্যাক্‌শনে যাচ্ছি বলে সন্দেহ করে, তবুও সে এই পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে কোন অনর্থ ঘটাতে পারবে না।

সন্দেহভঞ্জন করতে তার সামনে দিয়ে, তাকে ভাল করে দেখে যাব বলে, গাড়িটি খুব আস্তে আস্তে চালালাম। এ কি! এ যে আমাদের স্বদেশ রায়! গণেশের বাড়ি থেকে অপমানিত লাঞ্ছিত হয়ে সে অভিমান ভরে চলে এসেছিল অনেকক্ষণ আগে। এখানে সে এত রাত্রে কি করছে? সে কি তবে পুলিসে খবর দেয় নি? তবে কি সে পুলিসের চর নয়?

এইসব বিস্তারিত ভাববার তখন সময় ছিল না। আমাদের এত চেনা, এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আজ সকাল থেকে এত পর এত অপরিচিত সে কেন হ'ল? স্বদেশও এই অর্থহীন ব্যবহারেব জন্য ব্যথিত ও মর্মাহত। তার সঙ্গে অপরিচিত লোকের মত ব্যবহার কবাটা আমাদেরও কোনমতেই ভাল লাগে নি। তবু কি জানি আক্রমণের এই কয়েক মিনিট আগেও তার সঙ্গে এইরূপ রূঢ় ব্যবহার কেন করলাম? আর হয়ত তার সঙ্গে দেখাই হবে না! তাই শেষ বিদায়টুকু নিলে কি ক্ষতি হ'ত? সে যদি পুলিসের চরও হয়, তবু এই ক'মিনিটের মধ্যে তার পক্ষে আমাদের কোন ক্ষতি করা সম্ভব নয়। আজ লিখছি, কিন্তু তখন এইসব ভেবে দেখবার মত মনের অবস্থা ছিল না।

আমরা তার দিকে তাকালাম। সেও তাকালো। কিন্তু কেউ তার সঙ্গে কথা বললাম না। বিদায়সূচক বার্তা বিনিময় করাও প্রয়োজন মনে করলাম না কেউ। স্বদেশও একেবারে নির্বাক, স্থির—একটি যেন পাথরের মানুষ। তার অন্তরে তখন ঝড় উঠেছে। তার প্রতি এত অবজ্ঞা কেন? কেন তাকে প্রত্যাখ্যান করা হ'ল? সে কোন্ বৈপ্লবিক উপযুক্ততার অধিকারী নয়? কেন তবে তার প্রতি এই অবিচার—এত অশোভন ব্যবহার? শত অভিযোগ, মর্মান্তিক বেদনা ও নিদারুণ অভিমান নিয়ে স্বদেশ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমাদের গাড়ি তাকে অতিক্রম করে চলে গেল! বন্ধুদের সমস্ত উপেক্ষা স্বদেশ মুখ বুজে সহ্য করলো—তার অতলস্পর্শী গভীর স্বদেশ-প্রেমের খোঁজ করবার সময় বা মনের অবস্থা আমাদের তখন ছিল না। ধীরে ধীরে আমাদের গাড়ি পুলিস-লাইন অভিমুখে এগোতে লাগলো। স্বদেশ একদৃষ্টে আমাদের গাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল। তার মনের খবর কে রাখে? আমরা চলে গেলাম।

তখন খুব বেশি হলেও দশটা বাজতে মিনিট দশেক বাকি। মফস্বল শহর। লোক চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। শহরের বাইরের রাস্তাগুলি আরও নিঝুম। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা শহরটি ঘুমিয়ে পড়বে। সব রাস্তায়

ইলেক্‌ট্রিক লাইট নেই। যে রাস্তায় ইলেক্‌ট্রিক আছে সেখানেও আলো খুব উজ্জ্বল নয়। প্রায় প্রতি রাস্তার পাশেই বড় বড় গাছ—জায়গায় জায়গায় খোলা মাঠ। তা'ছাড়া কর্ণফুলী নদীর তীরে চট্টগ্রাম শহরটি যদিও প্রায় সমতলভূমির ওপর অবস্থিত, তবু এই শহরের বৈশিষ্ট্য—তার সারাটা বুক জুড়ে আছে ছোট ছোট সুন্দর পরিষ্কার সাজানো পাহাড় বা টিলা। এইগুলির ওপরে সদর আদালত, সরকারী হাসপাতাল, টেলিগ্রাফ-ভবন, জেলা-শাসকের বাংলো বা ডাক্তার সাহেবের কুঠি, না হয় বিভাগীয় কমিশনারের "প্রাসাদ"। কোন একটি পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে চার পাশের রাস্তাগুলিকে দেখলে মনে হবে যেন বড় অজগর চক্রাকারে এই পাহাড়গুলিকে জড়িয়ে আছে। শহবের মাঝখানে কোন কোন জায়গায় দু'টি পাহাড়ের বুক চিরে রাস্তা বেরিয়ে গেছে। রাত্রে গাছের ছায়া, পাহাড়ের আড়াল, মাঠ, মাঠের চারিপাশের গাছ-গাছড়া—সব মিলিয়ে চট্টগ্রাম শহরের topography গেরিলা-যুদ্ধ বা আমাদের যুব-বিদ্রোহের পক্ষে বাংলাদেশের বহু শহরের চাইতে যে অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত ছিল তা'তে কোন সন্দেহ নেই।

চট্টগ্রাম একটি সামুদ্রিক বন্দর। শহরের দক্ষিণপ্রান্তে কর্ণফুলী নদী, পূর্ব হতে দক্ষিণ প্রান্ত বিধৌত করে পশ্চিমদিকে কলকল রবে ছুটে চলেছে। উত্তরে সারি সারি পর্বতমালা উত্তর কোণ থেকে পশ্চিমে ছড়িয়ে আছে। যুদ্ধে পর্বতশ্রেণী ও নদীর বিশেষ অবস্থান যে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক অবস্থার সৃষ্টি করে তা' আক্রমণের বা আত্মরক্ষার ব্যূহ রচনার অনুকূলে।

চট্টগ্রামের এই প্রাকৃতিক অবস্থার অনেক সুযোগ আমরা নিয়েছি।

আমাদের ফিল্ড-হেডকোয়ার্টার (গণেশের বাড়ি), হেডকোয়ার্টার, (কংগ্রেস অফিস—যেখানে মাস্টারদা থাকতেন), রজত সেনের বাড়ি ও দেবপ্রসাদ গুপ্তের বাড়ি—এই চারিটি কেন্দ্র থেকে টেলিফোন-ভবন, ইউরোপীয়ান ক্লাব, A. F. I. অস্ত্রাগার ও পুলিস-লাইন আক্রমণকারী চারিটি প্রধান দল ঝটিকাবেগে অতর্কিতে আক্রমণ করার জন্য বেরিয়ে পড়েছে। অস্ত্রশস্ত্র, হাতবোমা, যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন মারাত্মক অস্ত্রাদি নিয়ে ধাপে ধাপে স্থান বদলে পথ পরিবর্তন করে গাড়িতে এবং পায়ে হেঁটে বিভিন্ন দলগুলি ইতিমধ্যেই প্ল্যান অনুযায়ী আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুর দিকে সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে।

আক্রমণের প্রধান চারটি লক্ষ্যবস্তুর পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান বোধহয় এক মাইলের বেশি ছিল না। সরকারী ভাষ্যে বলা হয়েছে—

"The Telephone Office, the Police Lines and the A. F. I. Head Quarters stand roughly speaking at the apices of an equilateral triangle, approximately one mile distance from another. The

Telephone Office is situated in the centre of the town while the Police Lines and the A. F. I. Head Quarters are situated on the outskirts—the former to the north of the Golf Course locally known as Paltan maidan and the latter by the side of the road leading from Chittagong to Pahartali." (Judgment of the Chittagong Armoury Raid Case—No. 1).

—সমভুজ ত্রিকোণ ক্ষেত্রেব তিনটি কোণের, এক মাথায় টেলিফোন-অফিস, আর দুটো কোণের সীমানায পুলিস-লাইন ও A.F.I. হেডকোয়ার্টার মোটামুটি এক মাইলের মধ্যে অবস্থিত। চট্টগ্রামের কেন্দ্রস্থলে টেলিফোন-ভবন। পুলিস-লাইন ও A.F.I. হেড-কোয়ার্টারস্ দু'টির অবস্থান শহরের সীমানা থেকে একটু বাইরে। পল্টন ময়দানের (গল্‌ফ্ খেলার মাঠ) উত্তর দিকে পুলিস-লাইন, আর শহরের দক্ষিণে পাহাড়তলী রাস্তাব ধারে বিস্তৃত স্থানে A. F. I. হেড কোয়ার্টার্স।

এই ত্রিকোণ ক্ষেত্রেব যে বাহুটি পশ্চিম দিকে পুলিস-লাইন ও A. F. I. হেডকোয়ার্টারকে সংযুক্ত কবেছে, সেই বাহুর ওপর পুলিস-লাইনের খুব সন্নিকটে কৃষ্ণচূড়া গাছে ঘেবা ছোট্ট নির্জন একটি টিলার উপব সুন্দর সুসজ্জিত ইউরোপীয়ান ক্লাব-গৃহ। এই ক্লাবটিব অবস্থান সম্বন্ধে আমাদের মামলাব জাজ্‌মেণ্টে উল্লেখ আছে।

আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই টেলিফোন-ভবন আক্রান্ত হবে। অম্বিকাদার নেতৃত্বে কালী চক্রবর্তী, আনন্দ গুপ্ত ও আবও তিনজন বন্ধু নতুন শেভ্রোলে গাড়ি কবে টেলিফোন-ভবনের পাহাড়টিব উত্তর দিকে একত্র হয়েছে। টেলিগ্রাফ্-অফিসেব উত্তব দিকের রাস্তা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। এই পথেই কিন্তু টেলিফোন-ভবনে সহজে যাওয়া যায়। তাই আক্রমণ কৌশলের ওপর ভিত্তি কবে এই পথ ব্যবহাব করাই সাব্যস্ত হয়। জনসাধারণের ব্যবহারের পথটি "দুর্গম" বললেও অত্যুক্তি হয় না। ছোট টিলার ওপর খাড়া সিঁড়ি বেয়ে টেলিগ্রাম করতে যাওয়া বিশেষ পরিশ্রম সাপেক্ষ। আমরা অবশ্য টেলিগ্রাম পাঠাবার উদ্দেশ্য নিয়ে যাব না, তবু খাড়া পাহাড়ে পেট্রলের টিন, বড় বড় হাতুড়ি, (Sledge hammer) প্রভৃতি নিয়ে ওঠা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। পেছনের রাস্তাটি অতি নির্জন। দু টি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে এই রাস্তাটি গেছে—তাই পথটির নামও কাটাপাহাড়-রাস্তা। রাস্তার দু'ধারে দু'টি ছোট ছোট পাহাড়—দক্ষিণের টিলার ওপর টেলিগ্রাফ-টেলিফোন-ভবন আর অপর দিকে ফরেস্টার্স অফিস। একটি সুবিধাজনক জায়গা পূর্ব থেকেই চিহ্নিত ছিল যেখানে আক্রমণের ঠিক আগে এই গ্রুপটি প্রস্তুত হয়ে নেবে। ৯-৫০ মিনিটে আক্রমণ হবে আর ৯-৫৫ মিনিটে ধ্বংসকার্য শেষ করা হবে। ইশারায়

হুকুম দিয়ে আকস্মিক আক্রমণ করা হবে। হুইসেল বাজবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া আছে।

৯-৫৫ মিনিটে যখন টেলিফোন-অফিস ধ্বংস করা শেষ হবে তখনই মাস্টারদার সঙ্গে আমাদের চট্টগ্রাম ওয়াটার-ওয়ার্কসের কাছে দেখা করবার সময় ঠিক করা ছিল। ওয়াটার-ওয়ার্কসের কম্পাউণ্ডের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি গেছে তারই ধারে, রাস্তার অপর দিকে, ছোট একটি পাহাড়। সেই টিলার ওপরটা সমতল করে নিয়ে পুলিস-লাইনের অস্ত্রাগার ও ম্যাগাজিন ঘর এবং গার্ড রুম, অর্থাৎ—সশস্ত্র সান্ত্রীদের জন্য ঘর তৈরি করা হয়েছে। ওয়াটার-ওয়ার্কসের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে সশস্ত্র সান্ত্রী পাহারা দেয়—তাদের দৃষ্টি দূর রাস্তার দিকে নিবদ্ধ থাকে। ওয়াটার-ওয়ার্কসের কম্পাউণ্ডটি ঘুরে যে রাস্তাটি শহরের দিকে গেছে তারই কোন একটি বিশেষ স্থানে, সান্ত্রীদের চোখের অন্তরালে, আক্রমণের কয়েক সেকেণ্ড আগে আমাদের দলটির উপস্থিত হওয়ার কথা। সেই বিশেষ চিহ্নিত স্থানটিতে মাস্টারদা এক মিনিট আগে পদব্রজে উপস্থিত হবেন। তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েই আমরা গাড়িতে এগিয়ে যাব আক্রমণ করতে—খুব বেশি হলেও সেই স্থানটি থেকে গার্ড রুমের দূরত্ব দেড়শ' গজের বেশি হবে না।

ঘড়ির কাঁটা ৯-৫৫কে ছুঁতে চলেছে—এতক্ষণে নিশ্চয় টেলিফোন-অফিসের ধ্বংসকার্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—মাত্র কয়েক সেকেণ্ড বাকি। ২৪৪৪ নম্বরের বেবী-অস্টিনটি ধীরে ধীরে কৃষ্ণচূড়া গাছের আড়ালে আড়ালে ক্লাব-গৃহের পাহাড়ের নিচের রাস্তা দিয়ে এগোচ্ছে। মিলিটারী পোশাকপরা আমাদের একজন যুবক-সাথী গাড়িটি চালাচ্ছে। গাড়িতে বোঝাই আছে ব্রীচ্-লোডার বন্দুক, কুড়ল, তরবারি, বোমা ইত্যাদি। গাড়ির গতি মন্থর—আরও মন্থর হয়ে আসছে। বেবী-অস্টিনটিকে অনুসরণ করে আগে ও পাশে এককভাবে এই দলের আরও পাঁচজন গাছের ছায়ার আড়ালে, আক্রমণের ঠিক পূর্বে শেষ মিলিত হওয়ার স্থানটিতে এসে জড়ো হয়েছে। গাড়িটিও সামান্য একটু দূরে এসে থামলো।

আক্রমণের পূর্ব মুহূর্তে প্রত্যেক দলের জন্য বিশেষ বিশেষ jumping off ground (লাফ দেওয়ার জন্য শেষ চিহ্নিত স্থান) ধার্য করা ছিল। সেইমত পায়ে হেঁটে নিজাম পল্টনের বিস্তীর্ণ অন্ধকার মাঠের মধ্যে আমাদের A. F. I. হেড-কোয়ার্টার্স আর্মারী আক্রমণকারী দলের এক অংশ ধীরে ধীরে পেট্রোল, দড়ি, গাঁইতি, মই প্রভৃতি নিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে। এই পায়ে-হাঁটা দলের নেতৃত্ব করবেন, নির্মলদা ও লোকনাথ। ডজ্ গাড়িটি করে নির্মলদারাও নির্ধারিত স্থানে এসে উপস্থিত হলেন।

ইতিমধ্যে ছোট ছোট পাঁচটি দল গাছের আড়ালে অন্ধকারের মধ্যে শেষ একশ'

হু'শ' গজ অতি সন্তর্পণে পাবজে এগিয়ে চলেছে। তারা সিগন্যাল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিস-লাইনে এসে প্রধান-আক্রমণকারী দলের সঙ্গে যোগ দেবে। তাই গোপনে, ব্যারাকের পুলিসদের চোখের অন্তরালে ঝোপ-ঝাড় ও গাছের ছায়ার সুবিধা নিয়ে একেবারে পুলিস-লাইনের কাছে এসে অর্ধচক্রাকারে পজিশন নিল।

চট্টগ্রামের রাজশক্তি তখনও ঘুমোচ্ছে। জানে না তারা—জানবার সম্ভাবনাও ছিল না, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের বৃটিশ দম্ভে বাংলার যুবশক্তি এক প্রচণ্ড আঘাত হানবে। ১৯৩০ সাল, ১৮ই এপ্রিল, রাত দশটা বাজবার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে প্রধান প্রধান তিনটি ঘাঁটির সম্মুখে, আক্রমণের জন্য মিলিত হবার সর্বশেষ স্থানে, আমাদের সৈন্যরা এসে হাজির। ইতিমধ্যে প্ল্যান অনুযায়ী টেলিফোন-অফিস ধ্বংস করার কাজ সুরু হয়ে গেছে। মামলার জাজ্‌মেণ্টে ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেণ্ট এই সম্বন্ধে লিখছেন—

"The photograph (Ex. XXXV) taken by the S. D. O. Telegraphs (P.W. 48) and the enlargement (Ex. CLXX) by P.W. 4 show more fully and forcibly than any witness could describe the extent of the damage done. The telephone switch-board and all the connected apparatus were reduced to a smouldering wreck. Curiously enough, the fire blackened dial of the clock which hung on the wall behind the switch-board, with its hands arrested at 9-50 p.m. (standard time) offers its own silent testimony as to the time at which the outrage was committed." (Judgement of Ctg. Armoury Raid Case No. I).

—৪৮ নম্বর সরকারী সাক্ষী টেলিগ্রাফ S.D.O.-র তোলা পঁয়ত্রিশ নম্বর নির্দশনীয় ফটোগ্রাফ ও ৪ নম্বর সাক্ষীর তোলা বড় ফটো (Ex. CLXX) যে ব্যাপক ক্ষতির সাক্ষ্য বহন করছে তার চাইতে কোন সাক্ষীই অধিক জোর ও সম্পূর্ণতার সঙ্গে তা' ব্যক্ত করতে পারত না। আরও মজার কথা, সুইচ্‌-বোর্ডের পেছনে ঝোলান দেওয়াল ঘড়ির অগ্নিতাপ-দগ্ধ কালচে ডায়ালের ওপরে ৯-৫০ মিনিটের সময় নিবদ্ধ কাঁটা দু'টি তাদের নির্বাক সাক্ষ্যে দুর্ঘটনা কখন ঘটেছিল তার অকাট্য প্রমাণ দিচ্ছে।

টেলিগ্রাফের ডেপুটি সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মিঃ স্কট্‌ সাহেবের কোয়ার্টারের পাশ দিয়ে পেছনের রাস্তা ধরে অম্বিকাদার সঙ্গে কালী চক্রবর্তী, আনন্দ গুপ্ত ও আরও তিনজন বিদ্যুৎবেগে টেলিফোন-এক্সচেঞ্জ ঘরের সামনে এসে পড়লো। এই ঘরটি টেলিগ্রাফ বিল্ডিং-এর উত্তর-পূর্ব কোণে। এই ঘরটির সম্মুখে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ ফুট লম্বা ও দশ ফুট চওড়া একটি বারান্দা সোজা দক্ষিণ দিকে টেলিগ্রাফ গৃহের পূর্বদিকের দেওয়াল

ঘেঁষে চলে গেছে। এই বারান্দাটিই নব্বই ডিগ্রী সমকোণ করে টেলিগ্রাফ অফিস ও ট্রান্সমিশন ঘরের সম্মুখ দিয়ে পশ্চিমে গেছে। এর সমকোণটিতে পজিশন নিলে দু'দিকেই লক্ষ্য রাখা যায়। প্ল্যান অনুযায়ী অম্বিকাদা দু'দিকে দৃষ্টি রাখবার জন্য এই টেক্‌নিক্যাল পজিশন নিলেন। অম্বিকাদার পাশে আর একজন দাঁড়িয়ে দক্ষিণের বারান্দা ও টেলিগ্রাফ ঘরের দিকে লক্ষ্য রাখছে। বাকি চারজন টেলিফোন-এক্সচেঞ্জ ঘরটির ভিতরে ও বাইরে মুহূর্তে নিজ নিজ কাজে লেগে গেল। এই ঘরের দরজা রোধ করে বারান্দার ওপর একজন পিস্তল হাতে দাঁড়ালো।

রাত্রে সুইচ্‌-বোর্ডে মাত্র একজন অপারেটারের ডিউটি। ছোট্ট চট্টগ্রাম শহরে আজ থেকে প্রায় ছত্রিশ বছর আগে তিনশ'র বেশি টেলিফোন ছিল বলে মনে হয় না। তাই রাত্রের ডিউটির পক্ষে একজন অপারেটারই যথেষ্ট ছিল। বলাই বাহুল্য, এই তথ্য আমরা পূর্বেই সংগ্রহ করেছিলাম। আক্রমণের পরিকল্পনাও সেই অনুসারে করা হয়েছে। আনন্দ গুপ্ত তখন খুবই ছোট—মাত্র পনেরো বছর ছ' মাস বয়স। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে—তখনও ফল গেজেটে প্রকাশিত হয় নি। ছোট হলেও সে দু'বছর ধরে শরীরচর্চ্চা করেছে। নানা ধরণের আক্রমণ পদ্ধতি সবার মত তাকেও শেখানো হয়েছে। টেলিফোন-এক্সচেঞ্জ আক্রমণে তার কি ডিউটি এবং অপারেটারকে আহত না করে কিভাবে কাবু করবে, এই বিশেষ শিক্ষায় তাকে পারদর্শিতা অর্জন করতে হয়েছিল।

বিপ্লবী যুবকদের যেমন অনেক সাহস ও বিক্রমের ইতিহাস আছে তেমন আবার অনেক ভীরুতা ও দুর্বলতারও শোচনীয় নজির দেখতে পাওয়া যায়। তাদের আক্রমণ ও আত্মরক্ষার উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয় নি বলে অনেকে বিভিন্ন ঘটনাস্থলে প্রয়োজনের অধিক বলপ্রয়োগ করেছে—এমন কি বিনা প্রয়োজনে তাদের হাত থেকে পিস্তলের গুলী involuntarily (আপনা আপনি) বেরিয়ে গেছে। এইরূপ অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ কর্মচারী, নিরস্ত্র দরোয়ান, কেরানী, গৃহস্বামী, ড্রাইভার—হত বা আহত হয়েছেন। যুবকেরা একেবারে প্রথম যখন কোন সশস্ত্র আক্রমণে অংশ গ্রহণ করে তখন তারা যতই সাহসী হোক্‌ না কেন, যদি আক্রমণ-কৌশলের বিশেষ শিক্ষা না থাকে তবে একপ্রকার স্নায়বিক দুর্বলতায় তাদের আঙুল ট্রিগারে স্থির থাকে না—involuntarily ট্রিগারে চাপ পড়ে অনর্থ ঘটায়। আমাদের নিজেদের সামান্য পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল বলে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার বিপ্লবী রণকৌশল কেবল যুদ্ধের কায়দায় না শিখিয়ে মনস্তাত্বিক ও দৈহিক কৌশলের সমন্বয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। আমার এই অভিমত থেকে যদি কেউ অর্থ করেন যে আধুনিক যুদ্ধে যে-প্রকার "কমাণ্ডো-ট্রেনিং" বা "গেরিলা-ট্রেনিং-এর" ব্যবস্থা আছে সেইযুগে আমাদের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে যেরূপ

সামান্ত ট্রেনিং দিতে সমর্থ হই তা' বর্তমান কালের ঐ বিশেষ রণ-কৌশলের চাইতে শ্রেষ্ঠ, তাহলে ভুল হবে।

বাংলা দেশের অগ্নিযুগের এই অধ্যায়টি আলোচনা করতে গিয়ে এই প্রসঙ্গে আমাদের বিপ্লবী দাদাদের ঔদাসীন্ত ও ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করে আজ এতদিন পরে কারও প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করবার ইচ্ছে আমার নেই। আমার লেখার ধারা যাঁরা প্রথম থেকে অনুসরণ করে আসছেন তাঁরাই বুঝবেন কেবলমাত্র অতীত ইতিহাসের জাবর কাটার মধ্যে এই আলোচনা বা ঐতিহাসিক বিবৃতি নিবদ্ধ রাখার ইচ্ছা আমার নেই। তাই এই প্রসঙ্গে টেলিগ্রাফ-অফিস আক্রমণ ও টেলিফোন-এক্সচেঞ্জ ধ্বংস করার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার আছে তার উল্লেখের প্রয়োজন আছে মনে করেই আনন্দের রণকৌশল শিক্ষার ভূমিকা সম্বন্ধে বলতে হ'ল। বয়সে খুব ছোট হলেও যদি উপযুক্ত শিক্ষা পায় তবে তারা miracle করতে পারে।

আমরাও ভাবতে শিউরে উঠতাম, টেলিফোন-অফিস ধ্বংস করতে গিয়ে নিরীহ টেলিফোন-অপারেটার, টেলিগ্রাফ-পিওন, অফিসের কেরানী, সিগ্‌নেলার প্রমুখ ব্যক্তিরা যদি নিহত বা আহত হন! তাঁরা সবাই নিরস্ত্র! সশস্ত্র হয়ে হঠাৎ তাঁদের আক্রমণ করা হবে খুন করবার জন্য নয়—টেলিফোন-অফিস ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মাত্র। যদি এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবস্তু আমাদের স্থির থাকে তবে সেইরূপ আক্রমণস্থলে একজনও হত বা আহত হবেন কেন? অবশ্য অতি বৃটিশ-ভক্ত কোন ভারতীয় কর্মচারী যদি আমাদের পাল্টা আক্রমণ করে বসেন তবে নিশ্চয়ই আত্মরক্ষা করতে হবে এবং সেইরূপ কোন আক্রমণ আশঙ্কা অনুমান করার সম্ভাবনা থাকলে শত্রুকে আঘাত হানতে সুযোগ দেওয়ার আগেই তাকে নিশ্চল ও শক্তিহীন করতে হবে—প্রয়োজন হলে সেইরূপ ক্ষেত্রে তাকে বা তাদের হত্যা করাও সার্থক রণকৌশল বলেই আমরা গণ্য করব।

এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী সামনে রেখে আমরা টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন-ভবন আক্রমণ এবং ধ্বংস করবার প্ল্যান রচনা করি। লক্ষ্যবস্তুর বাস্তবতা অনুযায়ী আমরা ধরে নিয়েছিলাম যদি ঝটিকাবেগে আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ধ্বংসকার্য শেষ করে চলে আসতে পারা যায়, তবে নিরীহ কর্মচারীদের কেউ আমাদের বাধা দিতে পারবে না—দেবেও না। সেই ক্ষেত্রে একজনকেও হত বা আহত না করে, এমন কি পিস্তলের একটি গুলীও খরচ না করে, চট্টগ্রামের কেন্দ্রীয় টেলিফোন-ভবনটি ধ্বংস করা কি সম্ভব নয়? আমরা বুঝেছিলাম, যদি প্ল্যানটি সুচারু রূপে রচনা করতে পারি এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবস্তুর বাস্তব প্রয়োজনীয়তা ভুলে না গিয়ে বিশেষভাবে উপযুক্ত শিক্ষা নিয়ে চট্টগ্রামের বিপ্লবী যুবকেরা তৈরি হয়,

তবে কাউকে জখম না করেই এই ধ্বংসকার্য সম্পন্ন করা সম্ভব ; এইটি যদি আমরা করতে পারি তবে তা' একটি মহান্ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

এইরূপ চিন্তাধারায় পরিচালিত হয়ে আমরা এই দলটিকে টেলিগ্রাফ্-ভবন আক্রমণ ও ধ্বংস করার জন্য থিয়েটারের স্টেজ-রিহার্সেলের মত শিক্ষা দিয়েছি। থিয়েটারের স্টেজে যেমন দেখতে পাই ঠিক তেমনি গোপন স্থানে আমরা নকল টেলিফোন-ভবন তৈরি করি এবং কে কোন্ পথে যাবে, কে কোন্ স্থানে দাঁড়াবে, কে কি করবে—কে পাহারা দেবে, অপারেটারকে কে অভিভূত করবে, কারা স্লেজ হ্যামার (বড় হাতুড়ি) দিয়ে সুইচ্-বোর্ড ভাঙবে, কখন কে কি ভাবে পেট্রোল ছড়িয়ে দেবে, তারপর কিভাবে সবার নিরাপত্তা বজায় রেখে পেট্রোলে আগুন লাগাবে, আর কিভাবে অম্বিকাদার হুইসেলের সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ আরম্ভ হবে এবং আবার হুইসেলের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস কার্য শেষ করে তড়িৎ বেগে উধাও হবে, এই সবের শিক্ষা তারা নিয়েছে এবং এই নাটকীয় দৃশ্যটি সার্থক করবার জন্য বার বার রিহার্সেল দিয়ে রপ্ত করেছে।

অপারেটারকে আহত বা নিহত না করে অভিভূত করবার দায়িত্ব আনন্দ গুপ্তের ওপর ন্যস্ত করা যে কতখানি কঠিন সিদ্ধান্ত তা' আমরা ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না। সে এই দলটিতে সবার চাইতে ছোট—কেবল এই দলে কেন, যুব-বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আনন্দরা কয়েকজন খুবই অল্প বয়সের ছেলে। তাদের মত ছোট ছেলেদের একজনকে এই দায়িত্ব দেওয়া আমাদের বিবেচনার ওপরেই যে নির্ভর করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আনন্দ তার কর্মদক্ষতার প্রমাণ দিয়ে গৌরব অর্জন করেছে।

মুহূর্তে আনন্দ আর দু'জনের সঙ্গে টেলিফোন ঘরে ঢুকে পড়লো। হাতে রিভলভার—ট্রিগারে আঙুল। অপারেটার সাহেবের পেছনে দাঁড়িয়ে খুব চাপা কণ্ঠে হুকুম দিল—

"হাত তুলুন। ভয় নেই। বাইরে আসুন। Quick!" ভয়ে বিহ্বল অপারেটার থর থর করে কাঁপছিলেন। তাঁর কথা বলার শক্তি ছিল না। কেউ ভয়ে চেঁচায়—তিনি কিন্তু চেঁচান নি। হুকুম শোনা মাত্র মন্ত্রমুগ্ধের মত তিনি আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। ইতিমধ্যে দমাদম হাতুড়ির আঘাতে সুইচ-বোর্ড ভাঙা সুরু হয়েছে। অপারেটার সাহেব আনন্দের ইঙ্গিতে ঘরের বাইরে এলেন। আনন্দের গুলীভরা রিভলভার তাঁর পিঠ লক্ষ্য করে আছে। ঘরের মধ্যে সুইচ-বোর্ড ভাঙার দারুণ শব্দ। উত্তেজনা উৎকণ্ঠা ও স্বাভাবিক স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ার অবধি ছিল না। তবু—তবু আনন্দের হাত থেকে গুলী চলে নি। এইজন্য, কেবল রিভলভার চালানো শিখলেই সব শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না—শিক্ষার সম্পূর্ণতার জন্য চাই মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষার culture।

অপারেটর সাহেবকে ঘরের বাইরে নিয়ে এসে আবার হুকুম দিল—"দাঁড়ান। দেওয়ালের দিকে মুখ করুন। হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকুন। ভয় নেই।"

বেচারা অপারেটর একেবারে কলের পুতুলের মত অক্ষরে অক্ষরে আনন্দের আদেশ পালন করে গেলেন।' তখনও তিনি কি বুঝতে পেরেছিলেন টেলিফোন সুইচ-বোর্ডের প্রতি আমাদের কেন এই আক্রোশ? তিনি কি তখনও ভাবতে পেরেছেন যে, বৃটিশ-সরকার বিপ্লবীদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে আজ চট্টগ্রাম থেকে বিদায় নেবে?

অম্বিকাদা ঐ বারান্দার সমকোণ হ'তে তাঁর কম্যাণ্ডিং পজিশন থেকে সকলকে ভীত-চকিত করে বজ্রকণ্ঠে হুকুম দিলেন—"কেউ চীৎকার করবেন না! যে-যার জায়গায় বসে থাকুন! ভয় নেই!"

রাত্রে নিস্তব্ধতার মধ্যে অম্বিকাদার দৃপ্ত উচ্চ কণ্ঠে টেলিগ্রাফ-অফিস প্রকম্পিত। সবাই ভয়ে নিজ নিজ জায়গায় বসে আছেন। পালানোর চেষ্টা, কোন দিকে ছোটাছুটি বা প্রতি-আক্রমণের অভিপ্রায় তাঁদের কারও ছিল না। সশঙ্কিত প্রাণে প্রমাদ গুণেছেন—হতবাক হয়ে ভেবেছেন, এ কি হ'ল, কেন এই ধ্বংসলীলা?

অম্বিকাদা সব দিক লক্ষ্য রাখছেন এবং মাঝে মাঝে ঘড়ির দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন। গাড়ি থেকে নেমে এই ধ্বংসকার্য শেষ করে আবার গাড়িতে উঠে স্টার্ট দেওয়া পর্যন্ত কত সময় লাগবে সেটা আমরা আগেই রিহার্সেল দিয়ে ঠিক করে নিয়েছিলাম। ধ্বংসকাজ শেষ করে আগুন দেওয়া অবধি, যা মনে আছে, বোধহয় তিন মিনিট সময় ধার্য ছিল। তিন মিনিট অনেকখানি সময়। এরই মধ্যে যে কতখানি কাজ করা যায়, তা' বাস্তবে প্র্যাকটিস্ না করলে বোঝা যায় না। একেবারে প্রথমে, আমাদের আন্দাজে মনে হয়েছিল সুইচ-বোর্ডগুলি ধ্বংস করে আগুন দিতে দশ-পনেরো মিনিট সময় লাগবেই। কিন্তু ঘড়ি ধরে যখন রিহা'র্সেল দিলাম তখন দেখেছি তিন মিনিট সময়ও অনেক বেশি। দু' মিনিটেই তা' করা সম্ভব—কিন্তু, যেহেতু নকল টেলিফোন-ভবনে রিহার্সেল দিয়েছি, তাই আমরা আরও এক মিনিট বেশি সময় হাতে রেখেছিলাম।

আক্রমণ সুরু হওয়ার দু' মিনিট পরেই অম্বিকাদা হুকুম দিলেন—"পেট্রোল ঢাল। আগুন দাও।" পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন দেওয়া হ'ল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। অম্বিকাদা হুইসেল দিলেন—সকলে প্ল্যান অনুযায়ী একত্র হয়ে গাড়ির দিকে দ্রুত এগিয়ে গেলেন।

যাওয়ার সময় টেলিগ্রাফ ডেপুটি-সুপারিনটেণ্ডেন্টের জানালার আড়াল থেকে রাইফেলের একটি শব্দ এলো। অম্বিকাদা মুহূর্তে তার জবাব দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দু'টি শব্দ কাটাপাহাড়ের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রতিধ্বনি তুলে আবার মিলিয়ে গেল।

কোন পক্ষেই কেউ আহত হলেন না। বিশ্লেষণ করে যা' বুঝেছি তাতে মনে হয় দুই পক্ষকেই Blind fire করতে হয়েছে। অম্বিকাদা ঠিক বুঝতেই পারেন নি কোথা থেকে কে বন্দুক ছু'ড়েছে; তাই শব্দ লক্ষ্য করে আন্দাজে তিনি গুলী ছুঁড়েছিলেন। আর শত্রুপক্ষ থেকে যে গুলী চালায়, সে যে ভয়ে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। গুলী করে কাউকে আহত করার ইচ্ছে যত না ছিল, তার চাইতে চাকরীর উন্নতির জন্য রাইফেল ফায়ার করে প্রমাণ রাখবার ইচ্ছেই ছিল অনেক বেশি।

আমাদের মামলার জাজ্‌মেণ্টে লেখা আছে—

"Mr. Scott, the Deputy Superintendent of Telegraphs was in his quarter that night when about 10 p. m. Mr. Horn, the Telegraph Master who also lived in the building, came running to him gave him some information and asked for a rifle. Mr. Scott gave him a rifle and some ammunition."

টেলিগ্রাফ্‌-মাস্টার ছুটে এসে টেলিগ্রাফ্‌-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ স্কটের কাছ থেকে রাইফেল ও টোটা নিয়ে গেলেন। সাক্ষী দেওয়ার সময় স্কট্ আরও বলেছিলেন যে, তিনি একটি ফায়ার করেন এবং তার প্রত্যুত্তরও তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছিলেন।

ভারতবর্ষে আর একটিও এইরূপ নজির আছে কি না আমার জানা নেই। অনেক সামান্য অ্যাক্‌শনেও বিনা প্রয়োজনে কেউ না কেউ নিহত বা আহত হয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট টাউনের সেণ্ট্রাল টেলিফোন-ভবন আক্রমণ ও ধ্বংস করে চলে আসা হ'ল একেবারে বিনা রক্তপাতে! অপারেটর, অন্যজন কর্মচারী, কেউ এগিয়ে এল না বাধা দিতে এবং উত্তেজনাবশতও আমাদের কেউ ওদের কাউকেই আহত করে নি। অপারেটরের প্রতি বাধ্য হয়ে সামান্য একটু রূঢ় ব্যবহার করতে হয়েছে, তবু সম্মানের সঙ্গেই আনন্দ তাঁকে সম্বোধন করেছে। সেইরূপ বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে টেলিফোন-অপারেটর, জনাব আহম্মদউল্লা, আমাদের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেয়েছিলেন তাতেই তাঁর হৃদয় আমরা জয় করেছি। তিনি ইচ্ছে করলে আমাদের দলের কাউকে কাউকে সনাক্ত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা' করেন নি। আমাদের বাড়ির সংলগ্ন বাড়ি ওহাব সাহেবের। তিনি Telegraph Lines Superintendent ছিলেন। আমি ১৯৪৬ সালে মুক্তি পাওয়ার পর যখন চট্টগ্রামে তাঁর সঙ্গে দেখা করি, তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন অপারেটর আহম্মদউল্লা সাহেব আনন্দকে চিনতে পেরেছিলেন। আমাদের মামলা চলা কালে পুলিস তাঁকে গোপনে আনন্দকে চিনিয়ে দিয়েছিল সনাক্ত করবার জন্য। কিন্তু তবু তিনি সেইরূপ "মিথ্যা" সাক্ষী দিতে রাজী হন নি। তিনি এক

কথাই সব সময় বলেছেন—তাঁর মাথা ঘুরছিল, কিছু দেখতে পান নি, তিনি কাউকে চেনেন নি।

জজ্ সাহেব তাঁর রায়ে লিখেছেন—

"... and he became unconscious and did not see what happened after that.... He shouted, he says, but nobody came, so he went to the 'basha' of the telegraph line-man Jonab Ali...."

এইটুকু পড়লেই বোঝা যায়, ইংরেজ জজ আহম্মদউল্লা সাহেবকে বিশ্বাস করেন নি। তাই তিনি উপহাসের ভঙ্গীতে লিখেছেন—

"He shouted, he says..."—সে চেঁচিয়েছে, তাই সে বলল। তারপর দেখতে পাচ্ছি আহম্মদ্উল্লা সাহেব সোজা টেলিগ্রাফ্ লাইনম্যান জনাব আলির বাসায় চলে গেলেন। ইংরেজ জজ সাহেবের যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ আছে বৈকি!

স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষণিক পরিচয়ের মধ্যেও এমন বহু সত্যিকার স্বদেশপ্রেমিকের সন্ধান পাওয়া যায়। আমরা ভাগ্যবান—অপারেটর আহম্মদউল্লা সাহেবকে আমাদের সমর্থনে পেয়েছি। আজ এই সুযোগে আহম্মদউল্লা সাহেবের প্রতি আমার অন্তরের বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

চট্টগ্রামের কেন্দ্রস্থলে ছোট্ট একটি টিলার উপর বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত এই টেলিফোন-ভবনটি। এই টিলার উপরেই সর্বপ্রথম বিদ্রোহের আগুনে টেলিফোন-ভবনের চিতাগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। দেখতে দেখতে আগুনের ছটায় সারা আকাশ লাল হয়ে গেল। বৃটিশ ঘাঁটি টেলিফোন-ভবনটির ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে অম্বিকাদা যুব-বিদ্রোহের প্রথম জয় ঘোষণা করলেন!

দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে কাটা-পাহাড়ের রাস্তা মোটরের লাইটে আলোকিত করে অম্বিকাদাদের দলটি প্ল্যান অনুযায়ী আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য পুলিস-লাইনের দিকে এগোচ্ছে। দশটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে, পুলিস-লাইনের খুব কাছে—পাহারারত সান্ত্রীর দৃষ্টির বাইরে রাস্তার বাঁকে আমাদের সঙ্গে মাস্টারদার দেখা হবে।

ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় আমাদের গাড়ি ওয়াটার-ওয়ার্কসের কাছে এসে পড়লো। হেড্ লাইট জ্বালিয়েই আসছিলাম। রাস্তাটির বাঁকে পূর্ব চিহ্নিত স্থানে মাস্টারদা একজন বডিগার্ডের সঙ্গে উপস্থিত। রাস্তার ধারে বড় একটি গাছের ব্যাক-গ্রাউণ্ডে—মোটরের হেড্ লাইটের আলোতে—আপাদ-মস্তক সাদা পোশাকে সজ্জিত মাস্টারদাকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল। মাথায় তাঁর খদ্দরের সাদা গান্ধীটুপীর মত শক্ত ইস্তিরি করা উষ্ণীষ। টুপিটির সম্মুখভাগের ডানদিকে টাকার সাইজের উজ্জ্বল ধাতু

নির্মিত ভারতবর্ষের প্রতীক। পরনে খদ্দর লম্বা সাদা কোট। কোটের বোতাম-গুলিও উজ্জ্বল ধাতু নির্মিত—বাঁদিকে বুকের উপর ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার প্রেসিডেন্টের জন্য বিশেষ ডিজাইন করা একটি উজ্জ্বল মেডেল শোভা পাচ্ছে—তা'ছাড়া বুকে-পিঠে কালো ভেলভেটের উপর ঝক্‌ঝকে জরীর কাজ করা আমাদের তৈরি বিশেষ ব্যাজটি চোখ ঝল্‌সে দিচ্ছে। এই পোশাকের সঙ্গে মালকোঁচা দিয়ে পরা সাদা ধপধপে ধুতি ও টেনিস খেলার সাদা জুতো পায়ে মাস্টারদার এই অপরূপ বেশ দেখে মনে হচ্ছিল—সমুদ্রে ভাসমান একটি হিমশৈল; তার প্রচণ্ড সংঘাত আজ বৃটিশ রণতরীর সমাধি রচনা করবে—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রভুত্ব খর্ব হবে।

মাস্টারদার পাশে এসে আমাদের গাড়ি থামলো। নিমেষে আমরা ছ'জন নেমে এক সারিতে দাঁড়ালাম। গণেশের কম্যাণ্ডে আমরা ছ' জন মিলিটারী কায়দায় মাস্টারদাকে অভিবাদন জানালাম। মাস্টারদা স্যালুট গ্রহণ করে প্রশ্ন করলেন—"সব ঠিক আছে?" গণেশ উত্তর দিল—"সব ঠিক।"

মাস্টারদা—"এতক্ষণে টেলিফোন-ভবন ধ্বংস হওয়ার কথা। ধ্বংস না হওয়ার কি কোন সম্ভাবনা আছে?

আমি—টেলিফোন-ভবন ধ্বংস না হওয়ার পার্থিব কোন কারণ নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস টেলিফোন-ভবন ধ্বংস হয়েছে।

মাস্টারদা—A.F.I. অস্ত্রাগার আক্রমণকারী দলটির শেষ মুহূর্তে কোন বিচ্যুতির কারণ আছে কি?

গণেশ—না, কোন ত্রুটি আছে বলে আমি মনে করি না।

মাস্টারদা—ইয়োরোপীয়ান-ক্লাব আক্রমণকারী দলের আপোষহীন মনোভাবের পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা কি আছে?

গণেশ—না, না, অসম্ভব! জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ আজ তারা নেবেই।"

খুব সংক্ষেপে এইরূপ দু'চারটি কথা হ'ল। আমাদের সবার মনে তখন প্রশ্ন—টেলিফোন-অফিসটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে তো? যদিও সেইরূপ চিন্তার কোন কারণ ছিল না, তবু সার্বিক পরিকল্পনার মধ্যে টেলিফোন-ভবনের সুনিশ্চিত ধ্বংসের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছি বলেই সেই প্রশ্নে আমাদের মন আলোড়িত হচ্ছিল।

আমরা ছ'জন গাড়িতে উঠে বসলাম। পরস্পর জেনে নিলাম প্রত্যেকের পিস্তল বা রিভলভারের চেম্বারে টোটা ভর্তি আছে কি না। এতক্ষণ চেম্বারে কার্তুজ ভর্তি ছিল বলে সেফ্‌টি ক্যাচ্‌ দিয়ে রেখেছিলাম যাতে আকস্মিকভাবে গুলী ছুটে না যায়। মাস্টারদার কাছে বিদায় নিয়ে, অ্যাক্‌শনের এক মিনিট আগে,

গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। এখান থেকে অস্ত্রাগারের কাছে গার্ডরুমে আমাদের পৌঁছতে এক মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। গাড়ি চলার সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হ'ল, "কাট্‌ অফ সেফ্‌টি"। সবাই আমরা পিস্তল ও রিভলভারের সেফ্‌টি বোতামগুলি টিপে দিলাম। এখন ট্রিগারে চাপ দিলেই গুলী ছুটবে। যদি সেফ্‌টি চাবি খুলতে কেউ ভুলে যায় এবং সেই ভুলের জন্য আক্রমণ করতে গিয়ে ট্রিগার টেপার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার না হয়, তাহ'লে ভেবে দেখুন কি সাংঘাতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে! আমাদের অভিজ্ঞতা ছিল—স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য কেউ কেউ safety catch ভুলে না সরিয়ে রিভলভার ফায়ার করতে ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। সেইরূপ মারাত্মক গাফিলতির দোষে আমরা যেন সশস্ত্র সান্ত্রীর বন্দুকের মুখে বিপদে না পড়ি তার জন্য সবাইকে safety catch খুলে নিতে বলা হ'ল।

গাড়ি পঞ্চাশ-ষাট গজ এগিয়ে যেতেই দেখা গেল টিলার উপর রাইফেলধারী প্রহরী নিঃশব্দে পায়চারি করছে। প্লোপআর্ম অবস্থায় প্রহরীর স্কন্ধে রাইফেল, কটিবন্ধে সঙ্গীনের খাপ, বুকের উপর আড়াআড়িভাবে বেন্ডলিয়ার (কার্তুজের বেল্ট) বাঁধা আছে। পাহারা দেওয়ার সময় বন্দুকে সঙ্গীন চড়ানো ছিল। সঙ্গীনের উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ ফলা অন্ধকারে ঝক্ ঝক্ করছে—প্রতি পদক্ষেপে বৃটিশ প্রভুত্বের দম্ভ প্রকাশ। বুট, পট্টি, খাকী পোশাক, বন্দুক ও বেয়নেটের জোরে দু'শ বছর ধরে ইংরেজ ভারত শাসন করেছে! বৃটিশ বেতনভোগী পুলিস এবং সৈন্য খাকী পোশাক ও বন্দুকের প্রভাবে নেশাচ্ছন্ন হয়ে তাদের স্বাধীন সত্তা হারিয়েছে। বৃটিশ প্রভুত্বের ঔদ্ধত্যে তার বন্দুক ও সঙ্গীন অপরাজেয়—এই দম্ভভরেই নির্ভীক সান্ত্রী পাহারারত! পিছনের গার্ডরুমে বাকি সশস্ত্র পুলিস-বাহিনী হয়ত বিশ্রাম করছে বা ঘুমে অচেতন। সান্ত্রীর বাঁ-পাশে অস্ত্রাগার ও ম্যাগাজিন ঘর দু'টি এতদিন ধরে বৃটিশ পাশবিক শক্তির ঘৃণ্য পরিচয় বহন করে এসেছে—আজ আমাদের বিপ্লবী মন বৃটিশের পাশবিক বলে রচিত বুনিয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এখনই আমাদের সশস্ত্র আক্রমণের মুখে তাদের ঔদ্ধত্য, গর্ব, দম্ভ, সমস্ত ধূলিসাৎ হবে!

সেইদিন সেই সময়ে পাহারায় নিযুক্ত যে সান্ত্রী, তার বিরুদ্ধে আমাদের কোন আক্রোশই ছিল না। আমরা কেউই জানি না তার কি নাম—কি জাত বা কি ধর্ম! হোক্ না সে হিন্দু বা মুসলমান অথবা খৃস্টান—ধর্ম বা জাতির বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ নয়—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই আমাদের সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহ। বৃটিশের সৈনিক-বেশ ও রাইফেলের বিরুদ্ধেই আমাদের পিস্তলের গুলী ছুটবে—আক্রমণের সূচনাতেই বিদ্যুদ্বেগে প্রচণ্ড আঘাত হানতে হবে! পাহারায় নিযুক্ত সান্ত্রীকে পরাভূত করে নিমেষের মধ্যে গার্ডরুম আমাদের দখল করে নিতে হবে।

চকিতে আমাদের ছ'জনের পিস্তল দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হ'ল। প্রত্যেকের তর্জনী পিস্তলের ট্রিগার স্পর্শ করে আছে। সান্ত্রী বন্দুক কাঁধে ছোট টিলার উপর দাঁড়িয়ে সব দেখছে। ঠিক তার সামনেই টিলার নিচে আমাদের গাড়ি এসে থামলো। সোজা দশ-বারো ফুট উঁচুতে টিলার উপরে উঠলে তবেই সমতল জায়গায় সান্ত্রীর সামনাসামনি দাঁড়ানো সম্ভব। মোটর থামার সঙ্গে সঙ্গে ইলেক্‌ট্রিক পরিচালিত কলের মানুষের মত আমরা ছ'জন তড়াক্ করে পজিশানমত নেমে পড়লাম। তড়িৎবেগে গাড়িতে ওঠা ও নামার শতাধিক রিহার্সেল আমরা আগে দিয়েছি। আক্রমণের এই দারুণ সঙ্কটময় মুহূর্তে প্রতি সেকেণ্ডের ছোট ভগ্নাংশও অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান। সান্ত্রী ও গার্ডরুমের পুলিস প্রহরী কোন কিছু আন্দাজ করার আগেই, সান্ত্রীকে তার বন্দুক ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া বা অন্যান্য সেপাইদের সঙ্কেতে খবর জানাবার পূর্বেই পুলিস-লাইনের অস্ত্রাগার ও পুলিস-লাইন আমাদের অধিকার করে নিতে হবে। তাই ক্ষিপ্রতার প্রয়োজন অনেক বেশি।

সান্ত্রী দেখছে আমাদের গাড়ি হঠাৎ এসে থেমে গেল। কোন কিছু ভাববার আগেই সে দেখতে পায় মিলিটারী ইউনিফর্মে খুব উচ্চপদস্থ কয়েকজন সামরিক অফিসার গাড়ি থেকে নামলো। নকল অফিসার, নাকি সত্যিকার উচ্চপদস্থ বৃটিশ সৈনিক, তা সে কি করে বুঝবে! অসময়ে বৃটিশ সামরিক কর্মচারীর এই অপ্রত্যাশিত আগমন কেন? অফিসাররা কি ইন্‌স্পেক্‌শনে এসেছেন? তবে বাঁ-দিকের গাড়ি চলার রাস্তায় মোটরে না এসে খাড়া টিলা বেয়ে তাঁরা উঠছেন কেন? নানা প্রশ্ন, সংশয় ও চিন্তা—বেচারী সান্ত্রীর মনে তখন কি জেগেছিল তা' অবশ্য সে ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। তবে এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা যে সান্ত্রীকে বিচলিত করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের প্রত্যেকের ডান হাতটি ঘুরিয়ে পেছনের দিকে নিজ শরীরের আড়ালে রেখেছি। বলাই বাহুল্য, হাতে ধরা পিস্তল যেন সান্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে সেই উদ্দেশ্যে ডান হাত শরীরের আড়াল করে রাখা। আমাদের পেছনে কি যে লুকোনো আছে সান্ত্রীর তা না বোঝার কোন কারণ নেই। কিন্তু বুঝলেও তখন তার কিছু করার ক্ষমতা ছিল না।

যখন গাড়ি এসে থামলো, তখন থেকে প্রতিটি মুহূর্তের জন্য আমাদের দৃষ্টি সান্ত্রীর উপরেই নিবদ্ধ ছিল। সান্ত্রী ঘাড় থেকে বন্দুক নামিয়ে সামরিক কায়দায় আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে—'Halt! Who comes there!'—এই আদেশ দেওয়ার সুযোগ যেন না পায়, তার জন্য আমরা একেবারে প্রস্তুত ছিলাম। এত কাছে এসে হঠাৎ গাড়ি থামাবার পূর্বে ওয়াটার-ওয়ার্কসের রাস্তা দিয়ে যখন

আমরা আসছিলাম তখন যদি সান্ত্রী আমাদের মোটর থামাতে আদেশ দিত তাহলে আমরা খুবই অসুবিধায় পড়তাম। পঞ্চাশ-ষাট ফুট দূর থেকে সান্ত্রীর আদেশ না মেনে গুলী চালিয়ে লক্ষ্যভেদ করার মধ্যে অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা অনেক বেশি। সেই অবস্থায় যদি প্রথমটা আমাদের গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ত তবে সান্ত্রী ও গার্ডরুমের প্রত্যেকে যে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ পেতো না, তাব নিশ্চয়তা কোথায়? প্রথম আক্রমণ তারা সামলে নিতে পারলে ঘরেব মধ্যে থেকে জানালা দরজা ও দেওয়াল আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করে প্রতি-আক্রমণের প্রচুর সুযোগ পেতো। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার যদি সৃষ্টি হয়, তবে আমাদের প্ল্যান সার্থক না হওয়ার সম্ভাবনা নব্বই ভাগ—বহু অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কা সেইরূপ প্রতিকূল অবস্থাব মধ্যে থাকবেই। কিন্তু সান্ত্রী যখন পূর্বে কোন আশঙ্কা করে নি এবং বিনা বাধায় আমরাও তার ঠিক সামনে টিলার নিচে এসে পড়েছি—সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই যখন দশ-বারো ফুট খাড়াই টিলা বেয়ে উঠেছি, তখন আমাদের জয়লাভে আর কোন সন্দেহ নাই।

সান্ত্রীর উপর ছয় জোড়া চোখ একেবারে নিবদ্ধ। যদি সে তার বন্দুক তুলতে একটুও চেষ্টা করে, তবে দশ ফুট ব্যবধানের মধ্যে একসঙ্গে দুটি পিস্তলের গুলী তার বুক তখনি বিদীর্ণ করবে। গণেশ ও আমি সামনে, আর আমাদের পেছনের সারিতে—বিধু, হরিপদ, সরোজ ও হিমাংশু, লক্ষ্য স্থির রেখে ধাপে ধাপে দ্রুত উঠতে লাগলাম। দশ-বারো ফুট টিলাটি উঠতে পাঁচ-ছয় সেকেণ্ড সময়ও লাগে নি। এই পাঁচ সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে সান্ত্রীর মনে কোন অশুভ চিন্তা এসেছে কি না কে বলবে! তার বুক কেঁপে উঠেছিল কিনা তাই বা কে জানে! সান্ত্রীর থেকে তিন হাতের ব্যবধানে আমাদের দু'জনের পিস্তল (আমার ও গণেশের) এক সঙ্গে গর্জন করে উঠলো। দু'টি গুলী তার হৃদয় ভেদ করে চলে গেল। তার মুখে একটিও শব্দ শোনা গেল না। মূল উপরানো গাছের মত কাঁপতে কাঁপতে সান্ত্রী মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। বন্দুকটি একধারে ছিটকে পড়লো, মাথার পাগড়ী মাটিতে গড়াতে লাগলো। আমাদের একজন মুহূর্তে তার বন্দুক তুলে নিল।

প্রথম পিস্তল ফায়ারের সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠলাম—"হটো! ভাগো"! জান বাঁচাও! গান্ধীজীকা রাজ হো গয়া!" লবণ-আইন-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় পুলিস ও সৈন্যদের মধ্যে খুব প্রচলিত। তাই গান্ধীরাজের অর্থ তাদের পক্ষে বোঝা সহজ—ইংরেজের রাজত্ব গেছে আমরা স্বাধীন হয়েছি। সান্ত্রীকে গুলী করার পর তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে বিশেষ কোন লক্ষ্য না করে দুই তিন লাফে এগিয়ে আমরা গার্ডরুম আক্রমণ করলাম। আমাদের পিস্তল থেকে পর পর আরো পাঁচ ছয়টি ফায়ার হ'ল। বিশেষ কাউকে লক্ষ্য করে গুলী করা হয় নি। গার্ডরুমের

দিকে ছুটে যাওয়ার সময় পুলিসদের ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে ফায়ার করতে করতে এগিয়েছি। লক্ষ্য ছিল কোন প্রহরীই যেন তার রাইফেল তুলে নিতে না পারে। অতর্কিত আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে যেমন "হঠো, ভাগো, গান্ধীরাজ হো গয়া—" বলেছি, তেমনি আবার আক্রমণের প্ল্যান অনুযায়ী আমরা সমস্বরে গগন বিদারী শ্লোগান দিয়ে পুলিস-লাইন মুখরিত করে তুলেছি—'ইনক্লাব জিন্দাবাদ! সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক! Long live Revolution! Down with Imperialism! Up with Revolution! বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্'—এই রণধ্বনি আমরা সঙ্কেত অনুযায়ী প্রথম সুরু করি এবং সেই অনুসারে পুলিস-লাইনের চারপাশে আমাদের ছোট ছোট সাতটি দল গুপ্ত স্থান থেকে অন্ধকারের নির্জনতা ভঙ্গ করে রব তোলে "ইনক্লাব জিন্দাবাদ!" রাত্রে অতর্কিত আক্রমণ, পিস্তলের গুলী, সান্ত্রীর পতন, গার্ডরুমের দিকে ফায়ার ও এক সঙ্গে চারিদিক থেকে পাহাড়ে ঘেরা পুলিস-লাইন প্রকম্পিত করে শ্লোগানের পর শ্লোগান, যে দারুণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তাতে পুলিস, কেবল গার্ডরুম থেকে নয়, পুলিস ব্যারাক থেকেও ভীত ত্রস্ত হয়ে—'যঃ পলায়তি স জীবতি' ভেবে, যেখানে পেরেছে পালিয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গার্ডরুম, ব্যারাক সব শূন্য পড়ে রইল।

আমাদের গুলীতে আর একজন পুলিসও আহত হয়। সে আহত অবস্থায় ভয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। এই ঘটনা পরে মামলার সময় তারই জবানবন্দীতে আমরা জানতে পেরেছি। মামলা চলাকালে আমরা আরো জানতে পারি—অনেকে একেবারে বাড়ি চলে যায়—তিন-চারদিন তারা কেউ শহরে ছিল না। কেউ কেউ দশ-পনেরো দিন বা মাসখানেক পরেও ফিরে এসেছে।

এই আক্রমণ ও গার্ডরুম অধিকার করতে আমাদের সাত সেকেণ্ডের বেশি সময় লাগে নি। তারপর দু' মিনিটের মধ্যেই সমস্ত পুলিস-ব্যারাক ও লাইন ছেড়ে আত্মরক্ষার জন্য কে কোথায় পালিয়ে গেল তার ঠিক নেই। প্রথম জয়ের পরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাতটি দল প্ল্যান অনুযায়ী আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিল। আমাদের সঙ্গে খুব বড় বড় টর্চ লাইট ছিল। টর্চ হাতে পাঁচ-ছ'জন, শত্রুর গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য, আগমন পথে বা মাঠের দিকে পজিশন নিল। প্রথম জয়ের পর এইরূপ সতর্কতার প্রয়োজন ছিল। তার চেয়েও অনেক বেশি প্রয়োজন অস্ত্রাগার ও ম্যাগাজিন গৃহের দরজা ভেঙে সকলকে অস্ত্র সজ্জায় সজ্জিত করা। আগে থেকেই অস্ত্রাগার ও ম্যাগাজিনঘর ভাঙার সব রকম ব্যবস্থাই ছিল। প্রহরীরা পরাস্ত হওয়ার পরই অস্ত্রাগারের দরজার তালার উপর মস্ত বড় বড় হাতুড়ির দমাদম ঘা পড়তে লাগলো। ম্যাগাজিন কক্ষের রুদ্ধ দরজার ভারী ভারী তালার ওপরে মুহুর্মুহু হাতুড়ির আঘাতের দারুণ শব্দ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে। সবল

বাহুর প্রচণ্ড আঘাতের কাছে প্রত্যেকটি ভারী ভারী তালা নিমেষে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হ'ল—ঝন্ ঝন্ শব্দে তালাগুলি টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

খুব সহজেই দু'চার মিনিটের মধ্যে অস্ত্রাগার ও ম্যাগাজিন কক্ষের দরজা ভাঙা শেষ হ'ল। দরজা উন্মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থরে থরে সাজানো মাস্কেট্রী (পুলিস রাইফেল) ও রিভলভারের প্রতি বিপ্লবী যুবকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। কি অপূর্ব দৃশ্য! আমাদের কতদিনের স্বপ্ন আজ সফল হ'ল! সেইদিন আমরা যে আনন্দ অনুভব করেছিলাম সেইরূপ আনন্দ জীবনে আর কোনদিন পাই নি। পুলিস-লাইনের সব অস্ত্রের অধিকারী আজ আমরা! আনন্দে উল্লাসে সকলেই আত্মহারা—অনেকে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলো!

সৈনিক আমরা। অস্থায়ী গণতন্ত্রী বিপ্লবী সরকার গঠন করতে হবে। প্রচুর দায়িত্ব। প্রথম জয়কে যত দূর সম্ভব সুসংবদ্ধ করা চাই। জয়োল্লাস আমাদের বিপ্লবী প্রেরণা সহস্রগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

অস্ত্রাগার ভেঙে ফেলার পর স্বাভাবিক আনন্দ উৎসবের মাঝখানে মন্দ্রগম্ভীর কণ্ঠের কম্যাণ্ড শোনা গেল—"কম্পানি-ফল-ইন!" কম্যাণ্ড দিচ্ছেন গণেশ ঘোষ। তখনকার দিনের ফরমেশন অনুযায়ী দুই সারিতে লাইন বেঁধে সবাই সামরিক কায়দায় দাঁড়িয়ে পড়লো। আদেশ অনুসারে আরও ছ'জন যুবক সবাইকে মাস্কেট্রী ও রিভলভার দ্রুত সরবরাহ করতে লাগলো। ম্যাগাজিন থেকে কার্তুজ সরবরাহ কর'ল অন্য চারজন বিপ্লবী সৈনিক। আমার যতদূর মনে পড়ে অধিকাংশ বিপ্লবী যুবকেরাই দু'টি করে রিভলভার ও একটি মাস্কেট্রী সঙ্গে নিল। আজ মনে নেই, কে একজন দৌড়ে এসে আমার হাতে একটা রিভলভার ও কতগুলো কার্তুজ দিয়ে গেল। দু'এক মিনিটের মধ্যে আর একজন তরুণ বন্ধু ছুটে এসে আমাকে আর একটা রিভলভার দিল। আমার হাতে মাস্কেট্রী ছিল না। লোভ হ'ল—দুটি রিভলভারই আমি সঙ্গে রাখলাম। আমাদের সঙ্ঘের সংগৃহীত 'নয়-সটের' পিস্তলটি আমি কখনও কাছ ছাড়া করি নি —পিস্তলটি আমার খুব প্রিয়। যুব-বিদ্রোহে পিস্তলটির অব্যর্থ গুলী পুলিস-লাইন অধিকার করতে সাহায্য করেছে। পিস্তলটি হোল্‌স্টারে রেখে দিলাম—আর দু' হাতে দুটি খোলা রিভলভার নিয়ে আমি প্রস্তুত রইলাম।

সবাইকে রিভলভার, মাস্কেট্রী ও টোটা সরবরাহ করার পর গণেশ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাঝামাঝি একটা উঁচু জায়গায় উঠে দাঁড়াল। সেইখান থেকে কম্পানিকে সম্বোধন করে মাস্কেট্রী ব্যবহার করার পদ্ধতি ভালোভাবে দেখিয়ে ও বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিল। সবাইকে ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়াতে বলল—সকলের বন্দুকের মুখ উপরের দিকে করে ধরা, কি করে লিভারটি চেপে কার্তুজ ভর্তি করার

চেম্বারের মুখ খুলতে হয়, কার্তুজ কিভাবে চেম্বারে ভর্তি করতে হয়—তারপর লিভারটি চাপ দিয়ে বন্ধ করলেই কি করে স্ট্রাইকিং পিন স্প্রীং-এর সাহায্যে টোটার ক্যাপটিকে আঘাত করার জন্য প্রস্তুত থাকে এবং বন্দুক শক্ত করে Aiming Position-এ ধরার পর টীগারটি টিপে দিলেই যে মাস্কেট্রি ফায়ার করা যায়, তার প্রাথমিক কৌশল গণেশ তাদের শিখিয়ে দিল। তারা সবাই কম্যাণ্ড অনুসরণ করে কাজ করল। গণেশ হুকুম দিল—"Load"। সবাই টোটা ভর্তি করলো। আবার আদেশ দিল—"Aim!" সকলে উপরের দিকে লক্ষ্য করল। তৃতীয় কম্যাণ্ড হ'ল—"Fir" এক সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশটি মাস্কেট্রি গর্জন করে উঠলো। এইভাবে তিনবার তারা ফায়ার করা অভ্যাস করলো।

যদি কেউ ভাবেন এত সহজেই মাস্কেট্রি চালানো শেখা যায় তবে ভুল হবে। আমাদের প্রত্যেকটি সাথীর খুব ভালো করে বন্দুক চালানো শেখা ছিল। তা'ছাড়া, সামরিক কায়দায় কি ভাবে বন্দুক ধরতে হয়, তুলতে হয়, এবং লক্ষ্য করা ও ফায়ার করার পদ্ধতি কি, সেই সম্বন্ধেও পূর্বেই তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আর, অনেক আগে থেকেই বন্দুকের ক্যাটালগ্ থেকে ছবি দেখিয়ে তাদের খুব ভালো করে মাস্কেট্রির ক্রিয়া-কৌশলের বিষয়ও শেখানো হয়েছিল। তবু মাস্কেট্রি হাতে পাওয়ার পর প্রাক্টিক্যালি (হাতে নাতে) ফায়ার করতে তাদের শেখানো হ'ল। চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে, খুব তাড়াতাড়ি এতজনকে এক সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হ'ল ; কিন্তু একটি অ্যাক্সিডেণ্টও হয় নি। সামরিক শিক্ষা পদ্ধতির যেরূপ ধারা আছে, তা' অনুসরণ করলেও তিনমাসের কম সময়ে রাইফেল চালানো শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। মিলিটারীতে শিক্ষার সময় অ্যাক্সিডেণ্ট থেকে বাঁচার জন্য নানা ধরণের সতর্কতামূলক ব্যবস্থার বিধান আছে। কাজেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে গণেশ যে শিক্ষা তাদের দিয়েছিল, তার মধ্যে যে অনেক ত্রুটি ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তবু বিনা অ্যাক্সিডেণ্টে মোটামুটিভাবে মাস্কেট্রি ব্যবহার যে তারা শিখেছিল, তার একমাত্র কারণ, অনেক আগে থেকেই বহুদিন ধরে তারা ব্রীচ্‌লোডার বন্দুক দিয়ে রিহার্সেল দিয়েছে এবং মাস্কেট্রি চালানোর বিষয়েও theoritically অনেক কিছু শিখেছে।

এবার মাস্টারদা হুকুম দিলেন—"বৃটিশ ইউনিয়ন জ্যাক খুঁজে বার করে পুড়িয়ে ফেল।" রাত্রে ইউনিয়ন জ্যাক নামানো থাকতো! মাস্টারদার আদেশের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য ইউনিয়ন জ্যাকের বহ্নি-উৎসব হ'ল। মাস্টারদা হুকুম দিলেন "জাতীয় পতাকা তোলা হোক্।" দু'জন তরুণ বিপ্লবী বীরদর্পে এগিয়ে গেল। বিজয় গৌরবে জাতীয় পতাকা তোলা হ'ল। আমাদের বিউগল্ বেজে উঠলো। গণেশ কম্যাণ্ড দিল—"Load! Aim! Fire!" তিন তিনবার পঞ্চাশটি বন্দুক আকাশের

দিকে মুখ করে এক সঙ্গে গর্জন করে উঠলো। পুলিস-লাইনের প্রায় চারিদিক ঘেরা পাহাড়ের শিখরে শিখরে বন্দুকের গর্জন প্রতিধ্বনিত হয়ে দূর গগনে মিলিয়ে গেল। আবার আর একটি সুর বাজলো বিউগলে—চট্টগ্রামের আকাশ বাতাস আলোড়িত করে আমরা তিনবার রণধ্বনি দিলাম—"বন্দেমাতরম্!" "ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ!" "সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।"

এই ছোট্ট অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হওয়ার পর গণেশ হুকুম দিল—"চারিদিকে পজিশন নাও!" সবাই হুকুম শুনে গার্ডরুম, ম্যাগাজিন ও অস্ত্রাগার ঘিরে পজিশন নিল। তারপর আদেশ হ'ল—"বাইরের দিকে লক্ষ্য রাখ!" তৃতীয় আদেশ—"Lie down!" সবাই হুকুম শুনে শুয়ে পড়লো।

প্রথম গুলী করার পর থেকে এখন পর্যন্ত যে ঘটনার বর্ণনা দিলাম, সে সব ঘটেছে খুব বেশি হলেও নয় মিনিটের মধ্যে। এবারে আর একটি কাজ সুসম্পন্ন করা আমাদের বিশেষ বিপ্লবী দায়িত্ব বলে মনে হ'ল। গুলীবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছে একজন সেপাই। সে ভারতবাসী—অভাবের তাড়নায় পুলিস-কন্‌স্টেবলের কাজ নিয়েছে। তার সঙ্গে তো আমাদের কোন শত্রুতা ছিল না। তবু প্রয়োজনের খাতিরে তাকে আমাদের গুলী করতে হয়েছে। টেলিগ্রাফ্-টেলিফোন-ভবন আক্রমণের সময় যাতে কোন রক্তপাত না হয়, সে জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। ড্রাইভারকে কাবু করার সময় যেন কোন দুর্ঘটনা না ঘটে—কেউ আহত না হয়, তার জন্যও আমাদের সতর্কতার অন্ত ছিল না। কিন্তু পুলিশ-লাইন আক্রমণ করার সময় আমরা সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করেছি। আমরা সশস্ত্র সান্ত্রী ও গার্ডরুমের সশস্ত্র সেপাইদের কোন প্রকার প্রতি-আক্রমণে সুযোগ না দিয়ে অতর্কিত আক্রমণে পুলিস-লাইন অধিকার করতে চেয়েছিলাম। ব্যারাকে প্রায় দু'শ সেপাই উপস্থিত থাকে। এরূপ অবস্থায় একেবারে বিনা রক্তপাতে এই আক্রমণ পরিচালনা করা যুক্তিযুক্ত মনে হয় নি—সম্ভবপরও ভাবি নি। বিশেষ করে, প্রথম আক্রমণের পর্যায়ে যদি আমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু ঘটতো বা কেউ আহত হ'ত, তবে জয়ের ফলাফলে অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা ছিল। তাই সব দিক বিবেচনা করে আগে থেকেই আমরা ঠিক করেছিলাম, বিনা রক্তপাতে পুলিস-লাইন অধিকার করার রণ-কৌশলের পরিবর্তে, যত কম রক্তপাতে সম্ভব চূড়ান্তভাবে পুলিস-লাইন অধিকার করবার চেষ্টা করবো।

এই কারণবশতই সেপাই বেচারীর মৃত্যু ঘটেছে। আমি একেবারে প্রথমেই লিখেছি—আমরা জেল থেকে ঠিক করে আসি, বাংলার অতীত বৈপ্লবিক কর্মসূচীর মত ভবিষ্যতে ভারতীয় সরকারী কর্মচারীদের আমরা আর মৃত্যুদণ্ড দেব না। তাতে ইংরেজ প্রভুদের মোটেই কোন ক্ষতি হয় না। "রায় বাহাদুর", "খাঁ বাহাদুর"

প্রভৃতি উপাধি বিতরণ করে এবং চাকরীর প্রমোশন ও কোন ভারতীয় কর্মচারীর মৃত্যু হলে তার পরিবারকে পুরস্কার ও পেন্‌সন্ প্রভৃতির প্রলোভন দেখিয়ে এই পরাধীন দেশে সরকার-ভক্ত কর্মচারী যোগাড় করা ইংরেজ কর্তাদের পক্ষে কিছুমাত্র শক্ত নয়। ভারতের বুকে বসে ভারতীয়কে দিয়ে ভারতের স্বার্থবিরুদ্ধ ইংরেজের শাসনকার্য পরিচালনার জঘন্য নীতির চাতুর্য বুঝতে হলে কোনো বিশেষ গবেষণার প্রয়োজন হয় না। অতীতে এই সহজ ব্যাপারটি বুঝতে না পেরে বিপ্লবীরা অত্যাচারী ভারতীয় কর্মচারীদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছে—আর মাঝখান থেকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ নিষ্কৃতি পেয়ে গেছে। তাই মূল অত্যাচারীর প্রতি লক্ষ্য রেখে ভবিষ্যতে ভারতীয় কর্মচারীদের অত্যাচার নীরবে সহ্য করে আমরা খাস বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীদেরই বিনাশ করবো বলে স্থির করেছিলাম। বেচারা এই সেপাইটি কোন কারণেই আমাদের টার্গেট ছিল না,—টার্গেট ছিল—খাকী পোশাক, রাইফেল ও অত্যাচারী উদ্ধত বৃটিশ বেয়নেট!

পরাধীন দেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম অবস্থায় সাধারণ সেপাইকেও ইচ্ছায় হোক্ বা অনিচ্ছায় হোক্ প্রাণ দিতে হয়। পরবর্তীকালে জেলে পাহারারত আমার বন্ধু, একজন সেপাই, দুঃখ করে বলেছিল—"বাবু আপনারা পুলিস-লাইন আক্রমণের পূর্বে যদি সেই সান্ত্রীকে আপনাদের অভিপ্রায় জানাতেন, তবে সে আপনাদের সঙ্গে যোগ দিত—আপনাদের গুলীতে তাকে আর প্রাণ দিতে হ'ত না।" বন্ধু সেপাইটি সরল মনেই তার নিজ মনের অভিব্যক্তি এইভাবে আমার কাছে প্রকাশ করেছিল। উত্তরে তাকে আমি বলেছিলাম—"হয়ত আমরা সে প্রহরীকে আমাদের স্বপক্ষে পেতাম, কিন্তু ঐরূপ গুপ্ত আক্রমণ-পরিকল্পনা কি তাকে আগে সাহস করে বলা উচিত হ'ত? সে যদি নিজ স্বার্থে ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতো? বৃটিশের রাজ্য পরিচালন-ব্যবস্থা এমনই চাতুর্যপূর্ণ যে, তাকে পরাস্ত করতে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের স্বপক্ষে ক্ষতি স্বীকার করতেই হবে।" আমাদের বাস্তব যুক্তি বন্ধু সেপাইটি মেনে নিয়েছিল।

আমাদের গুলীতে এই সান্ত্রীর মৃত্যু—same side, স্বপক্ষের ক্ষতি। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের ভাষায়—"মহামানবের মুক্তি সাগরে মানবের রক্তধারা তরঙ্গ তুলে ছুটে যাবে, সেই তো আমাদের স্বপ্ন!" মুক্তিযুদ্ধে এই সান্ত্রীর রুধিরধারায় সিঞ্চিত হয়েছে বাংলার মাটি! তার প্রাণহীন দেহ পুলিস-লাইনে গার্ডরুমের সামনে নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। আমরা ছ'জন সারি দিয়ে মৃত সেপাইয়ের পাশে দাঁড়ালাম—জাতীয় পতাকাযুক্ত ভেলভেটের ব্যাজ গণেশ তার নিজের ইউনিফর্মের বুক থেকে খুলে সম্মানের সঙ্গে মৃত সেপাই-এর বুকের উপর রাখলো। তারপর উঠে এক পা পেছনে সরে এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালো। আমরা ছ'জন গণেশের কম্যাণ্ডে মৃত সৈনিকের প্রতি বিপ্লবী অভিবাদন জানালাম—।

সৈনিক। তুমি আমাদের শত্রু নও। তোমার প্রতি আমাদের কোন আক্রোশ নেই—তবু তোমাকে প্রাণ দিতে হয়েছে—দাসত্বের এই নিষ্ঠুর পরিহাস! পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের মহাযজ্ঞে তোমার প্রাণদান অক্ষয় অমর হয়ে থাকুক!

এই মাত্র যে একজন মৃত সাধারণ ভারতীয় সেপাইয়ের প্রতি আমরা সামরিক কায়দায় স্যালুট দিলাম—তখনও জানতাম না তার কি জাত। মামলার সময় জেনেছি—তার নাম রমণী চক্রবর্তী।

সেই রাত্রে আক্রমণের সময় আমাদের গুলীতে আরও দু'জন কনস্টেবল আহত হয়। গার্ডরুম দখল করার জন্য আমরা ফায়ার করতে করতে ছুটে গেছি। গার্ডরুমের সেপাইরা খাটিয়ার সঙ্গে রাখা মাস্কেট্রীটি হাতে তুলে নেবার কোন সুযোগই পায় নি—"The constable Jaykaran tells a similar story. Aroused by the report of guns, he got up and was stretching out his hand for his rifle when he was shot in the left buttock, whereupon he leapt from the verandah and ran for cover to the jungle west of the doctor's quarters."………(Judgement, Chittagong Armouay Raid Case No. 1).

গার্ডরুমে কনস্টেবল জয়করণ গুলীর শব্দ শুনে তাঁর বন্দুক তুলে নেবার জন্য হাত বাড়ালেন। দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশতঃ তিনি বন্দুক আর খুঁজে পেলেন না। বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন। পালাবার সময় তাঁর পেছনে বাঁদিকে গুলী লাগে—তিনি সামান্য আহত হন।

আর একজন কনস্টেবল পুলিস-লাইনে জখম হন। সেই রাতে গার্ডরুমে তাঁর ডিউটি ছিল না। শ্রীশীতলপ্রসাদ দুবে "নং ১" পুলিস-ব্যারাকে ঘুমোচ্ছিলেন। বন্দুকের শব্দে ঘুম ভেঙে যাওয়াতে তিনি গার্ডরুমের বা ম্যাগাজিনের দিকে ছুটে আসছিলেন—"Constable Sital Prasad Duby who was sleeping in No. 1 barrack was likewise awakened by the firing…as he approached the magazine they turned their torchlights upon him and fired at him. The bullet hit him on the left hand whereupon he ran back to the Police Hospital where he lurked all night until 8 a.am……" (Judgement, Chittagong Armoury Raid Case No. 1).

এক নম্বর ব্যারাক থেকে শ্রীশীতলপ্রসাদ ম্যাগাজিনের দিকে ছুটে আসতেই আমাদের পিস্তলের গুলী তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো। সামান্য আহত হয়ে পুলিস হাসপাতালের কাছে নর্দমা বা ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে প্রাণটি হাতে নিয়ে তিনি সারাটি রাত কাটালেন।

নয় ব্যাটারিযুক্ত বড় বড় টর্চ লাইট হাতে নিয়ে আমরা পাহারা দিচ্ছিলাম। আমাদের দৃষ্টির অগোচরে কোনদিক থেকেই কারো আসা সম্ভব ছিল না। বেচারা শীতলপ্রসাদকে কি বিপদেই না পড়তে হয়েছিল! অচেনা কাউকে দেখলেই এবং আমাদের "ডাকের" জবাব না দিলেই ফায়ার করার হুকুম দেওয়া ছিল। পেছনের দিক থেকে প্যারেড গ্রাউণ্ড পার হয়ে কেউ যেন আসতে না পারে তার জন্য আমরা সব সময়ে টর্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিলাম। হঠাৎ কয়েকজনকে দেখতে পেয়ে আমাদের যুবক সৈনিকেরা ফাযার করে। সরকারী তথ্য—"We may here relate the previous adventures of Mr. Lewis....On being apprised by a constable of the attack on the police lines he went outside and heard firing and shouting in that direction. Arming himself with a pistol and his orderly with a shot gun he set off accross country on foot and emerged on the parade ground at the lives where fired upon. They shouted, 'Dno't shoot, we are police'. Where upon the firing became more intense. They took cover in a ditch there for about three quarters of an hour during which, Mr. Lewis says, firing went continuously from the direction of the reserve office. He could see the electric torchlights and figures moving..." (Judgement, Chittgong Armoury Raid Case No. 1).

—অ্যাসিস্টেন্ট সুপারিনটেণ্ডেণ্ট লুইস্ সাহেব একজন কনস্টেবলের নিকট খবর পেয়ে ঘরের বাইরে এলেন। পুলিস-লাইনের দিক থেকে বন্দুকের আওয়াজ ও চীৎকার শুনতে পেয়ে তিনি আর কালবিলম্ব না করে নিজের পিস্তল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর আর্দালীও বন্দুক হাতে তাঁর সঙ্গী হ'ল। দু'জনে মাঠের ভেতর দিয়ে পুলিস-লাইনের দিকে এগোতে লাগলেন। সাহেবের উক্তি—পুলিস-লাইনের প্যারেড গ্রাউণ্ডে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের লক্ষ্য করে গুলী করা হয়। মিঃ লুইস্ মনে করেছিলেন পুলিসেরা হয়ত আর্মারী পুনরুদ্ধার করেছে। তাই চেঁচিয়ে বললেন—"আমরা পুলিস—আমাদের গুলী কোরো না।" তারপর সাহেবের ভাষ্য হচ্ছে—গুলী আরো তীব্র ভাবে চললো। উপায় না দেখে তাঁরা একটী নর্দমায় পৌনে এক ঘণ্টা লুকিয়ে রইলেন। যতক্ষণ তাঁরা সেখানে ছিলেন, রিজার্ভ অফিসের দিক থেকে গুলী আসছিল ও অনবরত টর্চের আলো এবং লোক-জনকে ঘোরা-ফেরা করতে দেখা যাচ্ছিল।

আর্মারি ও ম্যাগজিন দখল করার পর শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের অনেক তৎপরতা অবলম্বন করতে হয়েছে। অবস্থা খুব সঙ্গীন। সাদা পোশাকে বা ইউনিফর্মে

আমাদের ছোট ছোট দল প্রথম ফায়ারের দু'এক মিনিটের মধ্যেই এসে জড়ো হয়েছে। এখন আমাদের প্ল্যান মাফিক ১০-১০ মিনিটের সময় শেভ্রোলে করে আসবে অম্বিকাদার দল। প্রায় সেই সঙ্গেই নরেশের দলেরও ইয়োরোপীয়ান ক্লাবে নরমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করে বর্তমানে আমাদের হেডকোয়ার্টার—পুলিস-লাইনে এসে হাজির হওয়ার কথা। যে রাস্তা দিয়ে তারা আসবে সেই পথে তাদের অভ্যর্থনা করার জন্য আমরা আকুল উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছি। প্রতি মুহূর্তে আশা করছি এই বুঝি তারা বিজয় সংবাদ নিয়ে এলো। এমন সময় ওয়াটার-ওয়ার্কসের বাঁকে সাদা পোশাকে একজনকে একা আসতে দেখতে পেলাম। এত রাত্রে এখানে একা একা কে আসতে পারে। স্বভাবতই মনে করেছি ব্যারাকের কোন পুলিস রাত্রে বেড়িয়ে ফিরছে। আমাদের দশজন সেন্ট্রি একসঙ্গে বন্দুক লক্ষ্য করলো। দলপতি উচ্চকণ্ঠে আদেশ দিল—"Hands up ! Halt ! who comes there ?"—(হাত তোল! দাঁড়াও! কে ওখানে ?)। আগন্তুক মাথার ওপর হাত তুললো। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—তারপর উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিল—"আমি স্বদেশ—আমি স্বদেশ !" কি! একি! স্বদেশ! আমাদেব স্বদেশ! উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত, অপমানিত স্বদেশ! তাও কি সম্ভব ? স্বদেশ এসেছে এখন অনুনয় করার অভিপ্রায়ে নয়—সে এসেছে তার স্বদেশপ্রেমের দাবি নিয়ে। ভয় দেখানোর জন্য লক্ষ্য করে বা না করেই আমরা তখন চারিদিকে গুলী চালাচ্ছি। যে কোন আকস্মিক কারণে স্বদেশ যে গুলীর মুখে পড়বে না, সে নিশ্চয়তা ছিল না। কিন্তু স্বদেশের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এখন সে নির্ভীক—দলিত সর্পের ন্যায় ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। অপমানের জ্বালায় নিজেই সে এতক্ষণ তিলে তিলে পুড়েছে—এখন বিপ্লবী সাথীদের গুলীভরা বন্দুকের সামনে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে সীমাহীন আত্মপ্রত্যয় নিয়ে! এমনই তার দাঁড়াবার ভঙ্গী, যেন সাথীদের উপহাস করে বলছে' 'যদি এখনও আমাকে সন্দেহ হয়, তবে কে আছ—সাহস করে আমাকে গুলী কর !'

মুহূর্তে আমাদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। সবার মুখে মুখে রব উঠলো স্বদেশ এসেছে! স্বদেশ এসেছে! আনন্দে সবাই উৎফুল্ল! উচ্চকণ্ঠে সকলে জয়ধ্বনি দিল—"স্বদেশ রায় কি জয়! বন্দেমাতরম্!" স্বদেশ রায়ের কাছে তিনজন যুবক বন্ধু এগিয়ে গেল। তাকে বিশেষ অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলো। টিলার উপর ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কেউ তাকে রাইফেল এনে দিল—কেউ এনে দিল কার্তুজের থলি, আবার কেউ দিল রিভলভার।

আমি স্বদেশের কাছে গেলাম। দু'হাতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম—সেও আমাকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করলো। কর্তব্যের খাতিরে তাকে আমি কি ভাবেই না প্রত্যাখ্যান করেছি! মুখে আমার ভাষা ছিল না! স্বদেশ আমার নির্বাক

রিভলভার টেনে নিয়ে স্বদেশের হাতে দিলাম—সে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লো—আমি নিজেকে ধন্য মনে করলাম।

স্বদেশের প্রতি আমরা, বিশেষ করে আমি, অবিচার করেছিলাম। স্বদেশ প্রমাণ করলো আমরা তাকে ভুল বুঝেছি! পাঠকবর্গের হয়ত মনে হচ্ছে স্বদেশের প্রতি আমি ক্ষমাহীন অন্যায় করেছি। কিন্তু আমি তখনও মনে করি নি, এখনও মনে করছি না, স্বদেশের প্রতি আমার অন্যায় ইচ্ছাকৃত। বৈপ্লবিক কর্তব্যের খাতিরে অত্যন্ত বিশ্বাসী কোন লোকও যদি বাদ পড়ে যায় তবু একজন অবিশ্বাসীকে নির্বাচন করার চাইতে তা' শতগুণে শ্রেয়! বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রমূলক কাজের এই অভ্রান্ত নীতির ব্যতিক্রম ভাবা গুরুতর অন্যায়। তা'ছাড়া যে বিপ্লবী—সত্যিকার স্বদেশ প্রেমিক—সে মিথ্যা মান-অপমানের অনেক উর্দ্ধে। সে খাঁটি বিপ্লবী নিরাপত্তার কঠোর নীতিকে শ্রদ্ধা না করে পারেনা। ষড়যন্ত্রমূলক কাজের গুরুত্বের প্রয়োজনে গোপন বিপ্লবীদলে সভ্যপদ দেওয়া যে কতখানি সুকঠিন, তা' স্বদেশ রায়ের মত খাঁটি বিপ্লবী হৃদয়ঙ্গম করেছে—তাই নিজগুণে সে সব সমস্যারই সমাধান করেছে এবং কাউকেই ভুল বোঝে নি।

স্বদেশ আগে সাধারণ ব্রীচ্‌লোডার বন্দুক ব্যবহাব করতে শিখেছিল। তাই তাকে মাস্কেটী ব্যবহার করার প্রাথমিক শিক্ষা দিতে খুব বেশি সময় লাগলো না। দু'জন যুবক সাথী উৎসাহের সঙ্গে তাকে মাস্কেট্রী চালাবার পদ্ধতি শেখাতে লেগে গেল। স্বদেশকে নিয়ে আমাদের ড্রামা প্রায় শেষ হয়ে এলো। এমন সময় গাড়ির তীব্র আলো জ্বালিয়ে অম্বিকাদাবা সদলবলে এসে পড়লেন। মোটরের হেড্‌লাইট দেখে যদিও আমরা ভেবে নিয়েছিলাম ওটা নিশ্চয়ই অম্বিকাদা'দের গাড়ি—তবু আমাদের সেন্ট্রী হাঁকলো—"Halt ! Put off light !"—(থামো আলো নেভাও)। হুকুমমত গাড়ির আলো নিভে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের পরিচয় জানাবার জন্য পূর্বনির্ধারিত কায়দায় তাঁরা মোটরের হর্ন বাজাতে লাগলেন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্লোগান দিলেন—"বন্দে মাতরম্" "ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ", "সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক্!" প্রত্যুত্তরে পাহাড়ে-ঘেরা পুলিস-লাইনে প্রতিধ্বনি তুলে আমারও জয়ধ্বনি দিলাম—"ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ!"

পরিচয় জানার পর হুকুম হ'ল—"Proceed! এগিয়ে আসুন!" শেভ্রোলে গাড়িটি আর্মারির টিলার পাদদেশে এসে হাজির হ'ল। তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে আমরা তাঁদের অভ্যর্থনা করলাম।

মাস্টারদা এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"টেলিফোন-ভবন নিশ্চিহ্ন হয়েছে তো?"

অম্বিকাদা—"টেলিফোন-ভবন এতক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।"

মাস্টারদা—"কোন পক্ষে কেউ হত বা আহত হয় নি তো?"

অম্বিকাদা—"কেউ-ই না—আমরা বা তারা, কেউ না।"

মাস্টারদা—"খুব আনন্দ হচ্ছে। বিনা রক্তপাতে সরকারী টেলিফোন-ভবন ধ্বংস করার নজীর ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

প্ল্যান অনুযায়ী খুব সফলতার সঙ্গে টেলিফোন-অফিস ধ্বংস করা হয়েছে—এই খবর অম্বিকাদার কাছ থেকে জানতে পেরে আমরা খুব খুশি। তাঁরা ছ'জনও মুহূর্তে একটি করে রাইফেল, থলিভর্তি টোটা ও রিভলভার নিয়ে প্রস্তুত হলেন। তাঁদেরও রিভলভার ও মাস্কেট্রী চালাবার প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হ'ল। অন্যান্যদের মত তাঁরাও lying position নিলেন—অর্থাৎ শুয়ে পড়ে পজিশন নিলেন।

পুলিস-লাইন অধিকার করার পর এখানেই আমাদের বিপ্লবী হেডকোয়ার্টার-অবস্থান করবে তা' পূর্বেই ঠিক করা ছিল। অন্যান্য সমস্ত দল—তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পূর্ণ করে, এই হেডকোয়ার্টারে ফিরে আসবে এই স্থির ছিল। টেলিফোন-ভবন ধ্বংস করার পর তারা অক্ষত দেহে ফিরে এসেছে। আমাদের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত লোকনাথ ও নির্মলদাবু দলটিরএ খানে ফিরে আসার কথা নয়। আমরা ঠিক করেছিলাম, যদি পুলিস-লাইন ও A. F. I. হেডকোয়ার্টার, দু'টিই সফলতার সঙ্গে অধিকার করতে পারি তবে আত্মরক্ষার জন্য এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থানের সুবিধা নেবার সুযোগ থাকায়, পুলিস-লাইনই আমাদের সামরিক বিপ্লবী সরকারের প্রধান ঘাঁটি হবে; এবং সেই ক্ষেত্রে আমরাই নির্মলদার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করব—তাঁরা সেইখানেই অপেক্ষা করবেন। আর যদি কোন কারণে, ব্যারাকে উপস্থিত প্রায় দু'শ' সেপাইয়ের প্রতি-আক্রমণের মুখে আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ি, তবে সেইরূপ অবস্থায় A. F. I. হেডকোয়ার্টারে এসে আমরা একত্র হব এবং এইখানেই আমাদের ঘাঁটি স্থাপন করা হবে। এইরূপ নির্দেশ লোকনাথ এবং নির্মলদার উপরও ছিল—তাঁরা যদি কোন কারণে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন তবে পুলিস-লাইনে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। পুলিস-লাইন ও A. F. I. আক্রমণকারী দলের মধ্যে এইরূপ ব্যবস্থা থাকায় ধরে নিয়েছিলাম তাদের খবর না দেওয়া পর্যন্ত সেখানে তারা অপেক্ষা করবেই। তাই পুলিস-লাইনে তাদের আগমন আশা করি নি। আমরা বরং খুব উৎকণ্ঠায় ছিলাম নরেশ, ত্রিপুরা, দেবু, অমরেন্দ্র, ধীরেন ও মনোরঞ্জনের জন্য। তারা হাতবোমা ও মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শত্রুকে বদ্ধ ক্লাব-ঘরে নির্মমভাবে হত্যা করতে গেছে। ক্লাব-হাউসে আক্রান্ত সাহেবের দল যে মরিয়া হয়ে প্রতি-আক্রমণ করবে বা করতে চেষ্টা করবে, তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। আমাদের বাছাই করা যুবক-সাথীরা সেইরূপ বিভিন্ন অবস্থায়

জন্য প্রস্তুত ছিল। প্রতি-আক্রমণ রুখে কি করে নির্মমভাবে তাদের হত্যা করবে —কিভাবে জালিয়ানওয়ালাবাগ-হত্যাকাণ্ডের সমুচিত প্রতিশোধ নেবে তার জন্য এতদিন ধরে অনেক রিহার্সেল দিয়ে তারা আজ শেষ রজনীর ড্রামার জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত হয়েছে।

প্ল্যানের সফলতা সম্বন্ধে অবশ্য আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না। তবু কি জানি এক অজানা অনিশ্চয়তায় মন ব্যাকুল অস্থির হয়ে আছে। কি জানি হয়ত কেউ অক্ষত থাকবে না—হয়ত কেউ-ই বেঁচে ফিরবে না! তাদের ফেরবার সময় হয়েছে। ক্লাব-গৃহটি খুব নিকটে। বড় বড় গাছের আড়ালে মাঠের উপর দিয়ে শ'তিনেক গজ হেঁটে এলেই তারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে; বেবী-অস্টিনটিও মাঠের মধ্যে দিয়ে নিয়ে আসতে পারে। ওয়াটার-ওয়ার্কসের রাস্তার শেষ-মাথায়, যেখান থেকে রাস্তাটি বাঁদিকে ঘুরে দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে, সেই বাঁকের উপর আমাদের সবার চোখ নিবদ্ধ। প্রতি মুহূর্তে আমরা ইয়োরোপীয়ান-ক্লাব আক্রমণকারী দলের প্রত্যাগমন আশা করছি। শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। আমাদের হেডকোয়ার্টারের সভায় তিনদিন ধরে যে জটিল প্রশ্নের আলোচনার পর মাস্টারদা বৃটিশ-শত্রুর অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন, সার্বিক প্ল্যানের সেই বিশেষ অংশের শেষ পরিণতির সংবাদ জানবার জন্য মন ব্যাকুল! নরমেধ যজ্ঞের ভয়াবহ বিভীষিকাময় চিত্র থেকে থেকে শরীরে শিহরণ জাগাচ্ছে!

মনে হ'ল যেন বেবী-অস্টিনের হর্ন সঙ্কেত দিচ্ছে। তখনও তাদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। একটু পরে দেখতে পেলাম তাঁরা পাঁচজন পায়ে হেঁটে আসছে। তাদের গতি খুব ধীর ও মন্থর, অস্টিন গাড়িটিও তাদের সঙ্গে আছে। মনে হ'ল কোন উৎসাহ নেই, উদ্দীপনা নেই—তারা যেন শ্রান্ত, ক্লান্ত ও নির্জীব হয়ে পড়েছে! গাড়িটি বাঁক ঘুরে ওয়াটার-ওয়ার্কসের কম্পাউণ্ডের কোণে এসে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। আমাদের প্রহরী নিয়ম মত হাঁক দিল—"থাম! সঙ্কেত দাও!" সঙ্কেত মত হর্ন বেজে উঠলো। কিন্তু কই "বন্দেমাতরম্ ধ্বনি" তো শোনা গেল না? "ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ" রণহুঙ্কার তাদের কাছ থেকে কেন আসছে না? "সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক্"—প্রতিহিংসার এই বাণী বজ্রনির্ঘোষে প্রতিধ্বনি তুললো না কেন? আমাদের বিজয় উল্লাসের সঙ্গে তারা যোগ দিচ্ছে না, কোথায় যেন কি একটা ঘটেছে! যুবক-সাথীরা মহা উৎসাহে তাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলো।

তাদের সঙ্গে একত্র হওয়ার পর ঘন ঘন রণধ্বনি চট্টগ্রামের আকাশ বিদীর্ণ করে তুললো। ঘুম ভেঙে চট্টগ্রামবাসী এই বৈপ্লবিক রণরোল শুনে হয়ত ভেবেছে কোন

রাজনৈতিক মিছিল বেরিয়েছে বুঝি। তখনও তাঁরা জানেন না—বৃটিশ সরকার আজ চট্টগ্রামে পরাভূত! আজ আমাদের জয়—টেলিগ্রাফ-টেলিফোন-ভবন বিনারক্তপাতে ধ্বংস করেছি, অক্ষত দেহে প্ল্যান অনুযায়ী প্রধান শত্রুঘাঁটি পুলিস-লাইন আমরা অধিকার করেছি; এখনও যখন বিচ্ছিন্নভাবে কেউ A. F. I. আর্মারি থেকে পুলিস-লাইনে এসে পৌঁছয় নি, তখন স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায় সেখানেও আমাদের জয় হয়েছে। তবু আমাদের সার্বিক জয়ের উৎসবে ইয়োরোপীয়ান-ক্লাব আক্রমণকারী দল কেন প্রাণ খুলে যোগ দিতে পারছে না?

মাস্টারদা—"নরেশ, তোমরা একেবারে চুপচাপ কেন? কি হ'য়েছে তোমাদের?"

নরেশ—"কিছু হয় নি। আমরা সবাই দৈহিক সুস্থ; কিন্তু আমরা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে এসেছি।"

মুহূর্তে আমাদের সবার মনে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হ'ল। কি সেই অক্ষমতার কারণ? শেষ মুহূর্তে কি তাদের morale (মনোবল) নষ্ট হয়েছে? তাও কি সম্ভব? আমাদের মধ্যে যাদের উপর সবচেয়ে বেশি আস্থা ছিল—যাদের ভেবেছিলাম—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের উপর নিষ্করুণ প্রতিহিংসা নিতে একটুও হাত কাঁপবে না—তারা কি তবে মৃত্যু-বিভীষিকায় পিছিয়ে এলো? মাস্টারদা ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলেন—"নরেশ তোমরা অক্ষম হয়ে ফিরে এলে? বুঝতে পারছি না! খুলে বল কি হয়েছে?"

নরেশ বলতে লাগলো—"আমরা প্ল্যান মত সবার দৃষ্টির অগোচরে ক্লাব-গৃহের কাছে গেলাম। প্রত্যেকেই হাতে পিস্তল, বোমা, বন্দুক ও সঙ্গে তরবারি, কুড়ুল প্রভৃতি নিয়ে অতর্কিতে ঝটিকাবেগে বিভিন্ন দরজা ও জানালা দিয়ে হলের মধ্যে প্রবেশ করি—কিন্তু আশ্চর্য! হলঘর একেবারে শূন্য! ছুটে পাশের ঘরে গেলাম, সেখানেও কেউ নেই। তারপর একটার পর একটা কামরা খুঁজে দেখলাম কোন ঘরে একজন সাহেবকেও পাওয়া গেল না। সামান্য কয়েকজন বয়, বেয়ারা যারা উপস্থিত ছিল, ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। তাদের সান্ত্বনা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে জানলাম—সাহেবরা আটটা ন'টার মধ্যে সবাই বাড়ি চলে গেছে।" তারপর নরেশ খুব নিরাশার সুরে বললে - "মাস্টারদা, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে পারলাম না।"

মাস্টারদা—"ঐ নিয়ে তোমরা মন খারাপ কোরো না। শহর আমাদের দখলে, প্রতিশোধ আমরা নেবোই।"

সবাই বন্দুক রিভলভার ও প্রচুর পরিমাণে টোটা সঙ্গে নিল। রিভলভার চালাতে তারা সবাই দক্ষ। '৪৫০ বোরের কোল্ট ও ওয়েব্‌লি রিভলভার (আর্মি ও পুলিস-অফিসাররা যা ব্যবহার করে) আমরা আজ প্রচুর পেয়েছি। এই রকম বড়

সাইজের রিভলভার আমাদের দলে আর সংগৃহীত হয় নি। বড় সাইজের আর্মি রিভলভার পেয়ে সকলেই খুব খুশি। তবু নরেশরা খুব অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। অন্যান্য বন্ধুরা তাদের নানা প্রকারে উৎসাহ দিতে চেষ্টা করছে—ক্রমে তারা আস্তে আস্তে অবসাদ কাটিয়ে উঠলো।

এই নিশীথে পুলিস-লাইনের নির্জন পুরীতে আবার একজনকে একা আসতে দেখলাম। তার পরনে মিলিটারী ইউনিফর্ম। তাকে পুলিস বলে ভুল করলে কোন অপরাধ হ'ত না। এই সময়ে আমাদের মধ্যে মিলিটারী ইউনিফর্মে আর কারও আসার কথা নয়। এখন প্রায় বিশ মিনিট অতিবাহিত হয়েছে। এত সময় গত হওয়ার পরে আমাদের মধ্যে কেউ তো আসতে পারে না! তবে এ কে? আমাদের প্রহরীদল হাঁক দিল—"দাঁড়াও! হাত তোল! কে তুমি?" দশটি বন্দুক তাকে লক্ষ্য করে আছে। উত্তর এলো—"আমি কালী!"

কালীকিঙ্কর দে পুলিস-লাইনের কাছাকাছি একটি দলের সঙ্গে থাকবে প্রথমে তাই ঠিক ছিল। পুলিস-লাইনে যাওয়ার জন্য গাড়ি না পেয়ে যখন আমরা দুই ঘণ্টা সময় পিছিয়ে দিই, তখন মাস্টারদা ও অম্বিকাদা দু'জনে কালীকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিলেন। কালীকে সাইকেলে যেতে হবে অনেক দূরে—অন্য তিনজনের কাছে। রাত আটটার সময় থেকে আমাদের প্রচারপত্র বিলি করার কথা। সরোজ ভট্টাচার্যের মারফত প্রচারপত্রগুলি আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন কালী দে-কে ছুটে যেতে হবে প্রায় চার-পাঁচ মাইল দূরে ক্ষীরোদ মহাজনের কাছে। ক্ষীরোদকে বলা প্রয়োজন, প্রচারপত্র রাত দশটার আগে বিলি করা হবে না। সেখান থেকে সেই একই বার্তা বহন করে আবার কালীকে ছুটতে হবে, প্রফুল্ল মল্লিক ও অর্ধেন্দু গুহের সঙ্গে দেখা করে বলতে, যেন রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষার পর তারা প্রচারপত্র বিলির ব্যবস্থা করে। এই গুরুদায়িত্ব মাস্টারদা কেবল তাকেই দিতে পেরেছিলেন, যার উপর তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা ছিল।

কংগ্রেস অফিসের কম্পাউণ্ডে একটি গ্রুপের সঙ্গে পুলিস-লাইন এলাকায় যাওয়ায় জন্য কালী দে অপেক্ষা করছিল। আমাদের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে মাস্টারদা কালীকে ডেকে এই কাজের ভার দিয়ে বললেন—"দেখ, তোমার ওপর কতখানি গুরুতর দায়িত্ব দিলাম। তুমি ইচ্ছা করলে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পার, আবার অ্যাক্‌শনে যাওয়ার মুখে যদি মনে ভয় এসে থাকে তবে, এই যে তুমি যাচ্ছ, আর ফিরে নাও আসতে পার। যাই কর না কেন—বিশ্বাসঘাতকতা নিশ্চয়ই তুমি করবে না—সে বিশ্বাস আমার আছে। তবে শেষ মুহূর্তে ভয়ে যদি অ্যাক্‌শনে যেতে না-ও চাও, তবু এই কাজটুকু নিশ্চয়ই কোরো—সবাইকে খবর দিও যেন রাত দশটার পর প্রচারপত্র বিলি করে। ভরসা করি তুমি আমার

এই বিশ্বাসের অবমাননা করবে না। আরও বিশ্বাস করি, তুমি সময় মত ফিরে আসবে।"

কালী দে মাস্টারদাকে অনুরোধ জানালো তার উপর আস্থা রাখতে। সে বলে গেল সময় মত সে ফিরে আসবেই। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও ঐ তিনজনকে খবর দিয়ে কালী ঠিক সময়ে কংগ্রেস অফিসে ফিরে আসতে পারে নি। সামান্য কয়েক মিনিট আগে সবাই পুলিস-লাইনের দিকে বেরিয়ে পড়েছে। কালী ফিরে এসে দেখলো কংগ্রেস অফিস একদম খালি—এদিকে ওদিকে দু'একটি সাইকেল পড়ে আছে। কালী এখন একেবারে একা! কি করবে? পালাবে? বাড়ি ফিরে যাবে? লক্ষ্মী ছেলের মত লেখা-পড়া করবে? আমরা জানতাম কালী সেই ধরণের দুর্বলচরিত্রের ছেলে নয়। মাস্টারদা কালীকে সবার চাইতে বেশি চিনতেন। তবু তিনি কালীকে সেই ধরণের মনস্তাত্ত্বিক কথা বলেছিলেন। মাস্টারদার ঐ ধরণের বিশেষ ভঙ্গী ছিল কথা বলার। কালী কংগ্রেস অফিসে কাউকে না পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পুলিস-লাইনের দিকে ছুটলো। সে এসেই বুঝেছিল—আমরা ইতিমধ্যে পুলিস-লাইন অধিকার করেছি। আমাদের স্লোগান, মাঝে মাঝে বন্দুকের আওয়াজ, ইত্যাদি পুলিস-লাইনে আমাদের অস্তিত্ব ঘোষণা করছিল। সে বুঝেছিল আমরাই তাকে হুকুম দিয়েছি হাত তুলে দাঁড়াতে। কালী ফিরে আসতে মাস্টারদা খুব খুশি হয়েছেন। আমরা সবাই তাকে আমাদের বিজয় গৌরবের ভাগ দিলাম। সবার মত সে-ও এখন রাইফেল ও রিভলভার নিয়ে প্রস্তুত হয়ে মাটিতে শুয়ে পজিশন নিল।

পুলিস-লাইন অধিকার করার পর থেকে প্রায় আধ ঘণ্টা এইভাবে কেটেছে। এখন পর্যন্ত সব কাজই প্ল্যান অনুযায়ী হয়েছে। প্রচারপত্র বিলি করাও দু'ঘণ্টার জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিল।

ক্লাব আক্রমণ করে আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হ'ল না—কারণ, সাহেবেরা তার আগেই প্রস্থান করেছে। এখন পর্যন্ত আমাদের কেউ আহত হয় নি। আর, শত্রু-পক্ষেও মৃত্যু ঘটেছে মাত্র একজনের। কিন্তু আমরা এখনও জানি না A.F.I. হেডকোয়ার্টারে কি অবস্থা। আর বিলম্ব করা যায় না। তক্ষুনি আমাদের মধ্যে কারো না কারো অগ্রসর হওয়া উচিত। A.F.I. হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতেই হবে। কে যাবে? গণেশ ও আমি দু'জনেই যাবো, নাকি সে পুলিস-লাইনে থাকবে? অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, গণেশের যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না—বিকেল থেকেই তার জ্বর। আক্রমণের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত জ্বরের খবর নেওয়ার কারো সময় ছিল না—গণেশ নিজেও তা উপেক্ষা করেছে। এখন দেখি তার গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। মাস্টারদা ও আমি তাকে বিশ্রাম করতে বললাম। গার্ডরুমের একস্থানে শুয়ে সে বিশ্রাম করতে লাগলো।

আমি তখন খুব ক্লান্ত। একটুও হাঁটতে ইচ্ছে করছে না! কে বলতে পারে firing line-এর সম্মুখীন হ'ব না? প্রথম জয়ের পর একটু বিশ্রাম, একটু নিরাপদ স্থান; আরও একটু দেরি করলে ভালো হয়—এখনই আবার অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বো—হয়ত নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে গিয়েই পড়তে হবে—এইসব সুপ্ত মনের চিন্তা নিজের অগোচরে আমার মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করছিল না, তা' এখন ঠিক বলতে পারছি না। কেন আমি এতক্ষণ দেরি করলাম—কেন আমি প্রথম জয়ের পরেই, পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে রওনা হয়ে গেলাম না? কেন এই বিলম্ব, তার সঠিক কারণ এখন বলতে পারছি না। তবে সামরিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখে আজ মনে হচ্ছে—কালবিলম্ব না করে আমাদের আরও অনেক বেশি তৎপর হওয়া উচিত ছিল।

দেরি যা হওয়ার তা হয়েই গেছে। নির্মলদাদের সঙ্গে লোকবল খুব কম। অবশ্য শত্রুপক্ষেরও তেমন লোকবল সেখানে নেই। তবু চারিদিকে ছোট ছোট টিলার ওপর সুন্দর সাজানো বাংলোগুলিতে উচ্চপদস্থ সরকারী ও রেলের বড় বড় সাহেব-কর্তাদের বাস। তাদের সবার কাছে বন্দুক ও বিভলভার আছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেও ভাবনার কিছু ছিল না—কারণ, সঙ্ঘবদ্ধ হতে তাদের সময় লাগবে—আর সঙ্ঘবদ্ধ না হয়ে তারা এককভাবে প্রতি-আক্রমণ করতে আসবে না। তবু একক ভাবে যদি কেউ আসেও বা—পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা ছাড়া তার আর কোন উপায় থাকবে না। আমার মনে হয় এই যুক্তি থাকা সত্ত্বেও রণকৌশলের দিক থেকে এত বিলম্ব করা অমার্জনীয় ত্রুটি। সকল দিক ভেবে মনস্থির করে নিলাম। আমি গার্ডরুমের টিলার উপর থেকে নিচে নেমে এলাম। আমার সঙ্গে কে যাবে জানতে চাইলাম। সবাই প্রস্তুত। কিন্তু তা তো আর হয় না—তিনজনকে আসতে বললাম। হরিগোপাল বল (টেগ্‌রা), হিমাংশু ও মনোরঞ্জন লাফিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো। আমি স্টিয়ারিং-হুইল হাতে নিলাম। পুলিস-লাইন প্রকম্পিত করে—"ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ," "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্," "বন্দেমাতরম্" শ্লোগান দিয়ে সাথীরা আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানালো এবং আমাদের গাড়ি থেকেও অনুরূপ রণরোল আমাদের জয়যাত্রা ঘোষণা করলো। হেড্ লাইট জ্বালিয়ে গাড়িটি ক্লাব-হাউসের পেছনের নির্জন রাস্তা দিয়ে এগোতে লাগলো।

আমাদের শেভ্রোলে গাড়িটি যখন পুলিস-লাইনের ঢালু রাস্তা দিয়ে নিচে নেমে এলো তখনও ঘন ঘন 'বন্দেমাতরম্' ও 'ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি আকাশ বাতাস মুখরিত করেছে। আমার সঙ্গে তিনজন তরুণ বন্ধু উৎসাহে উদ্দীপনায় মেতে উঠেছে—কটিবন্ধে পিস্তল, হাতে রাইফেল, মুখে তাদের 'বন্দেমাতরম্'। মরণ-পাগলের দল সব সময় মিলিটারী কায়দা কানুন মেনে চলে না। সামরিক কৌশলের সঙ্গে দেশ-প্রেমের

তুর্জয় প্রেরণা হ'ল তাদের বিজয়ী শক্তির প্রধান উৎস। গাড়ি আমি চালাচ্ছিলাম। এই গ্রুপটির নেতৃত্ব তখন আমার হাতে। A.F.I. হেডকোয়ার্টার দখলকারী দলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার দায়িত্ব এখন আমার ওপর। কি নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'ব কে জানে? আমি আমার গাড়ির হেড্‌লাইট নিভিয়ে দিলাম। তরুণ সাথীদের শ্লোগান দিতে বারণ করলাম, খুব সতর্কতার সঙ্গে চুপে চুপে A.F.I. হেডকোয়ার্টারের যত নিকটে উপস্থিত হতে পারি তারই চেষ্টা আমাদের করতে হবে।

এই সংযোগ স্থাপনে বিশেষ রণকৌশলের নির্ভুল প্রয়োগ না হলে অনেকখানি বিপদের সম্ভাবনা। তুই প্রকার সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমরা সচেতন—হয়ত আমাদের জঙ্গীদল জয়ী হয়ে সেখানে ঘাঁটি আগলে বসেছে—আর নয়ত শত্রুরা তাদের পরাজিত করে আবার কোন নতুন বিপদের আশঙ্কায় অতি সতর্কতার সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে আছে। এইরূপ উভয় সম্ভাবনার কথা মনে রেখে আমাদের প্রথমে বুঝে নিতে হবে—A.F.I. হেডকোয়ার্টাব কার দখলে আছে—আমাদের না শত্রুপক্ষের? এই সন্ধিক্ষণে চরম বিপদের আশঙ্কা ছিল—যদি নির্মলদারা আমাদের নিঃশব্দ গোপন আগমনে শত্রুভ্রমে গুলী করার আদেশ দেন তবে স্বপক্ষেরই ক্ষতি। আর আমরা যদি একবার নিঃসন্দেহ হতে পারি যে, এই আর্মারি আমাদের অধিকারে আছে, তবে তক্ষুণি পূর্বনির্ধারিত সঙ্কেতধ্বনি করবো—বিশেষভাবে টর্চের আলো দেখিয়ে ও মোটরেব হর্ন বাজিয়ে আমাদের আগমন জানাবো।

গাড়ির আলো না জ্বালিয়ে কোনরকম শব্দ না করে চুপে চুপে গাছের অন্ধকার ছায়ার সাহায্যে অক্সিলিয়ারী ফোর্সের মিলিটারী ঘাঁটির প্রায় একশ' গজের মধ্যে এসে পৌছলাম। একটু দাঁড়িয়ে অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করে মনে হ'ল আমাদের বন্ধুরাই সেখানে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে—বোঝা গেল এই মিলিটারী ঘাঁটিও আমাদের বন্ধুরা অধিকার করেছে। যখনই বুঝতে পারলাম এখানেও আমরা জয়ী, তখনই নির্ধারিত শ্লোগান দিলাম—টর্চের আলো ও মোটরের হর্নে সঙ্কেত জানালাম। বিজয়ী বন্ধুরা 'ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ,' 'বন্দেমাতরম্' রণধ্বনি দিল। আমাদের সকলের মিলিত রণহুঙ্কার সম্মুখের বাটালি পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো। নিকটবর্তী কয়েকটি পাহাড়ের ওপরে উচ্চপদস্থ সাহেবদের বাংলো। সেই সব বাংলোর ইংরেজ প্রভুরা প্রমাদ গুণছে—ভয়ে দিশেহারা হয়ে নিরাপদ স্থানে পালাবার চেষ্টা করছে। আমাদের এই দলটি যখন লোকনাথদের গ্রুপের সঙ্গে যোগ দিল—তখন আশে-পাশের সবাই বুঝলো, সেখানে আমাদের শক্তি আরো বেড়েছে। রেলের কোয়ার্টার আর বড় বড় সাহেব-কর্তাদের বাংলো ছাড়া সাধারণ লোকের বাস সেখান থেকে অনেক দূরে।

আমাদের রণধ্বনি শেষ হওয়ার পর "লোকনাথের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"Who comes there?" ইংরেজীতে প্রশ্ন, কাজেই-উত্তরও ইংরেজীতে গেল—"General Singh and the party." লোকনাথ ইংরেজীতে আবার বলল—"A few men of enemy camp are hiding there. Take the side track on your left and join us."—(শত্রুপক্ষের কয়েকজন ঐ দিকে লুকিয়ে আছে। তোমরা বাঁদিকের রাস্তায় এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দাও)।

জেনারেল বল (লোকনাথ বল) সেখানকার কম্যাণ্ডার। আমরা তার নির্দেশিত রাস্তা দিয়ে এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলাম। রাস্তার ওপর গাড়ি রেখে প্রায় সাত-আট হাত নিচে নামতে হ'ল। তারপর সমতল মাঠ দিয়ে হেঁটে আর্মারির কাছে এলাম। কেন লোকনাথ আমাদের সোজা রাস্তায় না আসতে হুঁশিয়ার করে দিল এবং কারা সেখানে লুকিয়ে আছে, তার বিশদ বিবরণ আমরা পরে তাদের কাছে জেনেছি। আক্রমণ কিভাবে করা হবে এবং কোন্ রাস্তা ধরে গাড়িটি আর্মারি কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করবে তার প্ল্যান আগে থেকেই করা ছিল—এবং অনেকবার রিহার্সেলও দেওয়া হয়েছিল।

রাত দশটার সময় লোকনাথদের ডজ্ গাড়ি A. F. I. হেডকোয়ার্টারের কম্পাউণ্ডে ঢুকলো। পূর্বপ্রান্তে কম্পাউণ্ডের গেটই একমাত্র প্রবেশ পথ। এই রাস্তা দিয়ে এসে সার্জেণ্ট মেজর ফেরেলের কোয়ার্টার বাঁদিকে রেখে গাড়িটি ডানদিক ঘুরে আর্মারির সামনে এসে দাঁড়ালো। মাখন ঘোষালের হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল। গাড়ি এসে থামার সঙ্গে সঙ্গে লাইট নিভিয়ে দেওয়া হ'ল। মাখন ছাড়া গাড়িতে আরো পাঁচজন ছিল—লোকনাথ, নির্মলদা, রজত, সুবোধ চৌধুরী ও ফণীন্দ্র নন্দী। হেঁটে আসছিল আরও চারজন—শান্তি নাগ, নিতাই, ক্ষীরোদ ও প্রভাস বল। তারাও গাড়িটিকে পেছনে পেছনে অনুসরণ করে দ্রুত এসে পড়লো এবং পজিশন নিল আর্মারীর পূবদিকের কোণে—সার্জেণ্ট মেজরের কোয়ার্টার লক্ষ্য করে প্রবেশ পথের দিকে চোখ রেখে। মাখন ব্রেক কষার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে একজন নেমে গাড়ির পেছনের দরজা খুলে বেশ কায়দা করে দাঁড়ালো—যেন কোন অফিসার গাড়ি থেকে নামছেন।

বারান্দার ওপর সেন্ট্রি বেয়নেটযুক্ত রাইফেল ঘাড়ে পাহারা দিচ্ছিল। জেনারেল বল গাড়ি থেকে নেমে তার দিকে এগিয়ে গেল। সেন্ট্রি প্রায় ছ' ফুট উঁচু বারান্দার ওপর আর্মারির দরজা রোধ করে দাঁড়িয়েছে। লোকনাথ ও সেন্ট্রির মধ্যে ব্যবধান মাত্র দশ-বারো ফুট। লোকনাথের ডান হাতে রিভলভার। হাতেধরা রিভলভারটি পেছনের দিকে লুকানো আছে। লোকনাথের চোখ সেন্ট্রির উপর নিবদ্ধ—সেন্ট্রির কোন উপায়ই ছিল না যে, ঘাড় থেকে রাইফেলটিকে নামিয়ে গুলী

জেনারেল বলের পেছন পেছন দুজন "সৈনিক" খুব স্বাভাবিকভাবেই বডিগার্ডের ভঙ্গিতে এলো। তারা তিনজন উঁচু বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো। সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে যখন জেনারেল বল পা রেখেছে—সেন্ট্রি তড়াক্ করে বুটের গোড়ালীতে গোড়ালীতে ঠোকর দিয়ে এ্যাটেন্‌শান পজিশনে বন্দুকের ওপর চাঁটি মেরে মিলিটারী কায়দায়, কোন সামরিক অফিসার ভ্রমে, লোকনাথকে স্যালুট দিল। সৈনিকের বুটের শব্দ ও বন্দুকের ওপর চাঁটি মেরে সেলাম দেওয়ার আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার পূর্বেই লোকনাথের পিস্তল গর্জন করে উঠলো। ফায়ার করার সঙ্কেত পেয়ে নির্মলদা ও রজতের হাতের দুটি পিস্তল থেকেও এক সঙ্গেই সশব্দে গুলী ছুটে গেল—সেন্ট্রি বারান্দার ওপর লুটিয়ে পড়লো। অন্যান্য পাঠান সেপাইরা যে যেদিকে পারলো ছুটে পালাল। যে সেপাইটি বন্দুক নেওয়ার জন্য বা অদূরে গার্ডরুমের দিকে দৌড়ে যাচ্ছিল—সেও আহত হয়ে মাঠে পড়ে রইল। আর্মারি মুহূর্তে অধিকৃত হ'ল। অন্ধকারের নির্জনতা ভঙ্গ করে তারা দশজন এক সঙ্গে জয়ধ্বনি দিল—"বন্দেমাতরম—ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ।" ঘন ঘন বিজয় নির্ঘোষে আর্মারি প্রাঙ্গণ কাঁপিয়ে তুললো। পিস্তলের শব্দ, বন্দেমাতরম্ ধ্বনি, আহত সেপাইযের আর্তনাদ, কোয়ার্টারের অভ্যন্তরে সাজেণ্ট মেজরকে বিচলিত করে তুলেছে। তিনি ও তাঁব স্ত্রী তখন খাবার টেবিলে উপবিষ্ট ছিলেন। ফেরেল সাহেব তাঁর বেয়ারা আবদুল শোভনকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কিসের আওয়াজ?" বেয়ারা তার নিজের বুদ্ধিতে বলল—"হয়ত কোন পটকা ফেটেছে।" অভিজ্ঞ সার্জেণ্ট মেজর বুঝেছিলেন ওটা পটকা নয়—পিস্তলের শব্দ।

"Sergt. Major Farrell—had sat down to dinner with his wife when suddenly a shot was heard outside. Sergt. Major asked the witness who was waiting at table, what was the noise and Abdul Sovan replied that it was possibly a craker. The Sergt. Major was positive it was the report of a pistol and he went out on the verandah of his quarter"...... ...(Judgement, Chittagong Armoury Raid Case).

আমাদের বন্ধুদের বক্তব্য—সার্জেণ্ট মেজর বীরত্বের সঙ্গে বেরিয়ে এসে সদর্পে হাঁকলেন—"কৌন হ্যায়? ক্যা মাঙ্গতা? What do you want?" দু'শ' বছরের প্রভুত্বের নেশায় উন্মত্ত সাহেব তখনও বুঝতে পারেন নি—বিপ্লবী সৈনিকেরা গান্ধীজীর অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক নয়। সাহেবের মদের নেশা বা প্রভুত্বের উন্মাদনা তখনই টুটলো, যখন হুকুম

হ'ল "Fire! Shoot him. প্রশান্ত নাগের ব্রীচ্‌লোডার বন্দুক [illegible]
আর্মারির পূব-কোণ থেকে সার্জেন মেজরের বুক লক্ষ্য করে গর্জন করে উঠলো। সেই সঙ্গে আরো কয়েকটি পিস্তল সাহেবকে লক্ষ্য করে ফায়ার করা হ'ল। সার্জেণ্ট মেজর রক্তাপ্লুত দেহে আর্মারি থেকে প্রায় বিশ ফুট দূরে তাঁর বাগানে লুটিয়ে পড়লেন।

সার্জেণ্ট মেজর ফেরেল খুব বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায় পুরুষ ছিলেন। তিনি মাটিতে পড়ে গিয়েও বুকে ঘষে ঘষে তাঁব বাড়ির সামনে দাঁড়ানো একটি মোটবের আড়ালে গিয়ে লুকোলেন। সেখান থেকে তিনি খুব চাপা স্বরে তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বললেন—"Darling phone to the police!" আর যায় কোথায়! হুকুম হ'ল—"Charge!" বারান্দার ওপর সঙ্গীন চড়ানো চার-পাঁচটা বাইফেল ছিল। দু'জন বিপ্লবী সৈনিক তক্ষুণি দু'শ' বছরের নৃশংস অত্যাচারের প্রতিশোধ নিল—সার্জেণ্ট মেজরের বক্ষ বেয়নেটের আঘাতে বিদীর্ণ হ'ল!

ইংরেজ রমণী মিসেস ফেরেল করুণ আর্তনাদ করে উঠলেন। করুণ দৃশ্য সন্দেহ নেই! কিন্তু লক্ষ লক্ষ ভারত-রমণীর করুণ ইতিহাস ভোলা যায় না! আমাদের মাতৃজাতির ওপর—সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের এর চেয়ে সহস্র গুণ বেশি পাশবিক অত্যাচারের দৃশ্যের কথা আজ ভুললে চলবে না!

আমরা মনে মনে অনেক ভেবেছিলাম স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শত্রুকে হত্যা করব—জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ নেবো। তবু—তবু আমরা অত নিষ্ঠুর হতে পারি নি। বর্বব ইংরেজের মত অসহায় নারীর গায়ে আঘাত হানতে পারি নি! লোকনাথ উচ্চ কণ্ঠে মিসেস ফেরেলকে সম্বোধন করে বলল—"Stay in. Don't come out—then you are safe."—(ভেতরে থাকুন, বাইর আসবেন না, তাহলে আপনি নিরাপদ!)।

এই সমস্ত ঘটনা দু'তিন মিনিটের মধ্যে ঘটে গেছে। শত্রুপক্ষের দু'টি মৃতদেহ ও একজন আহত হয়ে পড়ে রইল। এখন নির্মলদাদের প্রধান কাজ আর্মারীর দরজা ভাঙা। আর্মারির বাইরে প্রহরীদের ব্যবহারের জন্য মাত্র চার-পাঁচটা রাইফেল ছিল, বন্ধুরা তাই তুলে নিয়েছে। এই বন্দুকগুলি দশ শট ওয়ালা ·৩০৩ বোরের ম্যাগাজিন রাইফেল, যা সৈন্যেরা ব্যবহার করে থাকে। সঙ্গীন সংলগ্ন ম্যাগাজিন রাইফেল ক'টি হাতে নিয়ে আমাদের বন্ধুদের আনন্দের সীমা ছিল না—কিন্তু যখন দেখা গেল একটার সঙ্গেও কার্তুজ নেই, তখন সবাই হতাশায় ভেঙে পড়লো। আমাদের দশজন বন্ধুর সঙ্গে ছিল মাত্র গোটা ছয়েক পিস্তল বা রিভলভার আর হয়ত ছিল গোটা দুই ব্রীচ্‌লোডার বন্দুক। সেপাইদের চারটি ম্যাগাজিন রাইফেল পেয়েও যে কোন কাজে এলো না তাতে নিরাশার যথেষ্ট কারণ ছিল।

কালাবলম্ব না করে তারা আর্মারির দরজা ভাঙবার চেষ্টা করতে লাগলো। বাইরের দিকে খোলা যায় এরকম নিরেট লোহার দরজা ভাঙার কৌশল ও বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থার কথা আগেই লিখেছি। তারা সর্বপ্রথম মোটরের সঙ্গে ও ও দরজার হাতলের সঙ্গে দড়ি বেঁধে হ্যাঁচকা টানে নিরেট লৌহকপাট খোলার কৌশল অবলম্বন করলো। অনুরূপভাবে জাহাজ বাঁধার দড়িটি দিয়ে মোটরের সঙ্গে দরজার হাতলটি বাঁধা হ'ল। মাখন ঘোষাল গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে একটু এগোতেই দৃঢ়বদ্ধ লোহার দরজাটি মুহূর্তে চিচিং ফাঁক—সামান্য একটু টানেই প্রবল শক্তিশালী দরজাটিকে আত্মসমর্পণ করতে হ'ল। আর্মারিতে আমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই মাখন আমাকে বলেছিল—"আমি বুঝতেই পারি নি কখন দরজাটা খুলে গেছে।"

নিরেট লোহার দরজার আত্মসমর্পণের পরও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যেন হার মানতে নারাজ! ভিতর দিকে পাল্লা খোলা যায় এরূপ আরো একটি লোহার বোল্টের দরজা বিপ্লবীদের দিকে তাকিয়ে যেন তাচ্ছিল্যভরে উপহাস করছে! প্রথমে নিরেট লোহার দরজা খুলে যাওয়ার পর বোল্টের দরজার ফাঁক দিয়ে থরে থরে সাজানো দশ-শটওয়ালা আর্মি রাইফেল বিপ্লবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। প্রত্যেকটি রাইফেলের নিচে একটি করে বাক্স আছে। দেখে মনে হয়—এবং আমাদের সংবাদও তাই ছিল—নিচের বাক্সে রাইফেলের টোটা রাখা আছে।

বিপ্লবীদের এতদিনের সাধনার ধন রাইফেল, লুইস্‌গান, রিভলভার ও বাক্সভর্তি অত কার্তুজ আর্মারির মধ্যে সাজানো আছে, আর এই "সামান্য" একটি লোহার বোল্টের দরজা কখনও বাধা সৃষ্টি করতে পারে? দুটি বড় বড় আলতারাফের ওপর দুটি বৃহৎ আকারের তালা যেন তাদের দিকে ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে আছে! রাইফেল চাই—টোটা চাই—কোন বাধাই তারা মানবে না! দরজার তালা ভাঙার সব রকম সরঞ্জামই সঙ্গে ছিল। কিন্তু তারা রাইফেল ও টোটা পাওয়ার জন্য অধীর হয়ে উঠেছে। লোকনাথ রজতকে ডাকলো—"চল রজত একসঙ্গে শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে ছুটে গিয়ে ধাক্কা মারি!" দু'টি বলিষ্ঠ দেহের ধাক্কা বৃটিশ আর্মারির দরজা সহ্য করতে পারলো না—ঝন্ ঝন্ করে সবেগে পাল্লা দুটি খুলে গিয়ে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে আবার ফিরে চৌকাটে আঘাত করলো। খুব অবিশ্বাস্য মনে হলেও—এই বাস্তব সত্য সবাইকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল।

আর্মারির দরজা দু'টি তিন-চার মিনিটের মধ্যে কৌশলে এবং লোকনাথ ও রজতের সিংহবল প্রয়োগে ভাঙা হ'ল। সবাই রাইফেল তুলে নিল। অনেক আর্মি রিভলভার সাজান আছে—তারা প্রত্যেকেই দু'টি করে রিভলভার নিল—

তিনটি লুইস্-গান ছিল—সেগুলিও তাদের অধিকারে এলো। ম্যাগাজিন, রাইফেল ও লুইস্গানের চেম্বারের ছিদ্রের মাপ এক ; তাই ·৩০৩ সাইজের একই কার্তুজ দুটোতেই ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেকটি রাইফেলের সঙ্গে যে বাক্স ছিল, সেগুলি খুলেই সকলে একেবারে বোকা! কোনটাতেই কার্তুজ নেই! এই সব বাক্সে ছিল বেল্ট, পাউচেন, হ্যাভার স্যাক্, ক্রশ বেল্ট প্রভৃতি। সারা আর্মারি ঘরে কোথাও একটিও টোটা ছিল না।

আজ স্বীকার করতে লজ্জা হচ্ছে—তবু আমাদের অমার্জনীয় "অজ্ঞতার ত্রুটি" আজ সবাইকে জানাতে হবে। আমরা কত বিশদভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ সংগ্রহ করেছি—কতদিন ধরে ভেবে চিন্তে ব্যাপক ও বিস্তারিত প্ল্যান করেছি—সাংগঠনিক নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য কত কি-ই না করেছি! আমাদের এতসব রণনীতি, কৌশল ও চাতুর্য কোনটাই কাজে এলো না। আমাদের অক্ষমতা চিরকাল আমাদের ব্যঙ্গ করবে যতদিন ইতিহাসে এই সত্য লেখা থাকবে—'চট্টগ্রামের যুব-বিদ্রোহের নেতারা একটি অতি সাধারণ বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন—তাঁরা জানতেন না আর্মারি ও ম্যাগাজিন সামরিক রীতি অনুসারে কখনও একঘরে রাখা হয় না।' যুব-বিদ্রোহের পর মামলার সময় আমরা এই তথ্য জানতে পারি।

আমরা যখন অক্সিলিয়ারী ফোর্সের আর্মারি সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করেছি তখন যদি এই বিষয়টি আমাদের জানা থাকতো তবে কখনই ঐ বাক্সগুলি দেখে সুনিশ্চিতভাবে অনুমান করতাম না—বাক্সে কার্তুজ আছে। আমাদের সংবাদের ওপর নির্ভর করেই নির্মলদা'দের দল বুঝেছিল—রাইফেলের সঙ্গে রক্ষিত বাক্সগুলি কার্তুজের বাক্স ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপর যখন সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না যে, আর্মারিতে একটিও কার্তুজ নেই, তখন তারা অবসাদে একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। আর্মারি অধিকারকারীদলের সঙ্গে কয়েকটি রিভলভার ও গোটা দুই-তিন ব্রীচ্‌লোডার বন্দুক ছাড়া আত্মরক্ষার জন্য আর কিছুই ছিল না। এদিকে সেখানে পৌঁছতে আমাদের অন্যায়ভাবে অনেক দেরি হয়ে গেছে। পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত অস্ত্র ছাড়া সেখানে এতক্ষণ ধরে প্রতি আক্রমণের সম্ভাবনার মধ্যে থাকা সত্যই তাদের উৎকণ্ঠার কারণ হয়েছিল।

সার্জেণ্ট ব্ল্যাকবার্ন সেইদিন রাত্রে মিঃ কুলেন ও আরো দু'জন জাহাজের অফিসারের সঙ্গে ট্যাক্সি করে পাহাড়তলী ক্লাব থেকে ফিরছিলেন। A. F. I. হেডকোয়ার্টারের গেটে ট্যাক্সিটি থামার পর সার্জেণ্ট ব্ল্যাকবার্ন দেখতে পান কয়েকজন খাকী পোশাক পরা লোক টর্চের আলোতে আর্মারির মধ্যে কি যেন খুঁজছে। তাই দেখে সার্জেণ্টের সন্দেহ হয় এবং তিনি ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কে তোমরা?" সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়া হয়। তারপর

অনেক আগেই পালিয়ে বেঁচেছে। সাহেবকে তাই বাগদাদ সাহা আর উত্তর দিল না—উত্তর দিল তিন-চারটি রিভলভার। সাহেবেরা বুঝলেন অবস্থা বেগতিক। বুদ্ধিমান সার্জেণ্ট—স্টীমারের দু'জন সাহেব সঙ্গীকে নিয়ে দিশেহারা হয়ে ছুটে পালালেন। পালাবার সময় সঙ্গী মিঃ কুলেনের কথা তাঁদের মনে ছিল না, কুলেন সাহেব ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে মরার ভান করে সেখানেই পড়ে রইলেন। সরকারী ভাষ্যে এইভাবে বলা হয়েছে—

"Sergt. Blackburn, lived in a bunglow close to the A. F. I. headquarters buildıng, was returning home from Pahartali Institute in a taxi which he shared with Mr. Cullen and two officers from a ship, then in port. On arrival at the gate of the armoury compound Sergt. Blackburn noticed with surprise that several electric torchlights were being flashed......His shouts of 'who is there', was immediately answered by a revolver shot from the verandah. He then called out for Naik but the only reply was another shot from the same direction. Noticing then that the light of an electric torchlight was moving across the compound towards the car he called on his companions inside the taxi to follow him and started to run back along the road towards Pahartali" (From thc Judgement, in the Chittagong Armoury Raid case).

সার্জেণ্ট ব্ল্যাকবার্ন ট্যাক্সির দিকে আর এগোলেন না। ট্যাক্সি পরিত্যাগ করে তাঁর সঙ্গীকে ডাক দিয়েই পাহাড়তলীর দিকে ছুট দিলেন। সঙ্গী তিনজন তাঁর সঙ্গে পালাবাব সুযোগ নিতে পারলেন না। মিঃ কুলেনের দিকে আরও কয়েকটা গুলীবর্ষণ হওয়াতে তিনি সেখানেই পড়ে রইলেন। জজ সাহেব মামলার রায়ে মিঃ কুলেনের বক্তব্য এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন—

"Mr. Cullen's story somewhat more detailed as he remained longer in the vicinity of the armoury. When the first shot was fired at their taxi on arrival at the gate, he saw seven or eight men on the armoury verendah. Immediately after Blackburn had made off, the two ship's officers followed suit and Cullen was left in the car. He also got out bent on flight but as he did

the roadway and rolled over under the hedge which bordered the armoury compound. Some three or four minutes later he became aware of a beam of light shining over the hedge on to his body and then a shot was fired which lodged in his left hip. Realising his danger and apprehending that worse might ensue, he flung out his arms and lay still as if he had been killed. As he lay there two cars, he says, went swiftly past along the road towards Pahartali. Then he heard the noise as if the door of the armoury was being broken open. Presently he heard two more cars come along the road and heard the raiders rushing to intercept them and more shouting and firing. Just at that time he heard the armoury door being burst open..." (Judgement, Chittagong Armoury Raid case.)

জজসাহেব বলেছন—মিঃ কুলেন আর্মারির কাছাকাছি অনেকক্ষণ ধরে পড়েছিলেন, তাই তাঁর কাছ থেকে অনেক তথ্য জানা যাচ্ছে—সার্জেণ্ট ব্ল্যাকবার্ন ও মিঃ কুলেনের দু'জন সাথী যখন প্রাণ বাঁচাতে ছুট দিলেন, তখন কুলেন সাহেবও পালাবার জন্য ট্যাক্সি থেকে নামলেন, কিন্তু ট্যাক্সি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দিকে লক্ষ্য করে পাঁচ-ছ'টা রিভলভার ফায়ার হয়। হাজার হলেও ইংরেজ—তিনি তৎক্ষনাৎ মাটিতে লম্বা হয়ে সটান শুয়ে পড়লেন এবং গড়িয়ে গড়িয়ে আর্মারি কম্পাউণ্ড সংলগ্ন একটি ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করলেন। তিন-চার মিনিট পর ঝোপটার ওপর টর্চের আলো এসে পড়লো এবং একটা রিভলভারের গুলী তাঁর বাঁ কোমরে বিদ্ধ হ'ল; অবস্থা আরো সঙ্গীন বুঝে তিনি হাত পা ছড়িয়ে মরার ভান করে সেখানেই পড়ে রইলেন। সেখানে শুয়ে শুয়ে দেখলেন দু'টি মোটর পাহাড়তলীর দিকে দ্রুত ছুটে গেল। তখন আর্মারি ভাঙবার শব্দ তিনি শুনতে পাচ্ছেন। তারপর আরও দু'টি মোটরগাড়ি পাহাড়তলীর দিকে যাচ্ছিল। "আক্রমণকারীরা" সেই দুটি গাড়ি রুখবার জন্য ছুটে গেল এবং তিনি গুলীর শব্দ ও চীৎকার শুনতে পেলেন। ঠিক সেই সময়েই আর্মারির দরজা সশব্দে উন্মুক্ত হ'ল বলে তাঁর মনে হয়। ব্ল্যাকবার্ন ও কুলেন সাহেবের বর্ণনা পাওয়া গেল। তারপর সার্জেণ্ট মোর্শেদ আসরে এলেন। তাঁর অনেক বীরত্বপূর্ণ কাহিনী আছে। শত্রুপক্ষের কথাও খুব ভালভাবে জানা দরকার, তাদের কাছ থেকেও আমাদের অনেক শিক্ষা গ্রহণ করবার আছে। যথাস্থানে তা লিখবো। এখন জজসাহেব তাঁর মামলার রায়ে

যা লিখেছেন সেখান থেকেই সার্জেন্ট মোর্শেদের বিবরণ পাচ্ছি। বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়, মোর্শেদও লোকনাথকে ক্যাপ্‌টেন টেট্ বলে বার বার ভুল করেছেন।

—"Segt. Marshead appears to have displayed that night conspicuous courage, resource and presence of mind......when near the gate accross the Pahartali Road he heard fire or six reports in quick succession from the direction of the A.F.I. armoury and immediately after two more shots......The figures were moving about and three or four of them were flashing torchlights about. At first he took them to be members of the Auxiliary Force as they were dressed in khaki and were inside the armoury compound one man among them he noticed in particular who was dressed in khaki wore a khaki topi and same brown belt and appeared to him to be A.F.I. Adjutant, Capt. Taitt. He was bending over a prostrate form on the verandah, and held a revolver in his hand. Marshead mounted his cycle, went along the road to the main gate of the armoury compound which is near the Drill Hall, cycled through it, put his cycle up against the wall of Segt. Blackburn's bunglow and from there walked towards the armoury. As he approached two figures dressed in khaki suddenly appeared on the verandah, one of them being the stout man he had taken for Capt. Taitt. This individual pointed a revolver at him and his companion pointed a rifle or musket at him and they shone a powerful electric torch on him and one of them shouted, 'Hands up'. Marshead did not do so but being still under delusion that they were members of the Auxiliary Force, who were playing a rather crude practical joke on him, cried 'Don't be a silly ass'. The answer was a repetition in a louder and more peremptory tone of the order to put his hands up. He did so, saying, 'All right they're up—what's the matter ?' He was then about 7 or 8 yards off from them. After a pause of a few seconds the man with the torch and revolver whom he still thought to be Capt. Taitt said, 'That is one of them—shoot.' He spoke in English but with an unmistakable Bengali accent. Realising then

that they could not be members of the Auxiliary Force, Marshead ducked and ran back and simultaneously they both fired at him. As he reached the main gate they again fired but again missed. Not stopping to pick-up his cycle he ran along the road and turning up towards Piccadilly Circus, met a car in which was Capt. Carter, the master of a B. I. ship. He asked Capt. Carter to take him to the police lines. By this time he realised that the man who had attempted to shoot him was not Capt. Taitt and he had came to the conclusion that the A.F.I. armoury had been attacked by local revolutionaries and that the stout man in question was one of them, Lokenath Bal, whom he knew by sight," (Judgement, Chittagong Armoury Raid Case).

জজসাহেব যা লিখেছেন তাব সাবমর্ম এইরূপ—সার্জেণ্ট মোর্শেদ বিশেষ সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতির পরিচয় দেন। তিনি পাহাড়তলীর রাস্তা দিয়ে সাইকেলে আসছিলেন। রাস্তাব ওপর থেকে খাকী পোশাকে আর্মারির বারান্দার ওপব সাত-আটজনকে ঘুরে বেড়াতে দেখেন। তাদের মধ্যে একজনকে মিলিটারী পোশাকে ক্যাপ্টেন টেট বলে মনে হচ্ছিল। মোর্শেদ ঘুরে প্রধান গেট দিয়ে ঢুকলেন। ব্ল্যাকবার্ন সাহেবের বাংলোব পাশে সাইকেল বেখে ড্রিল-হলের পাশ দিয়ে আর্মারির দিকে এগোচ্ছেন, হঠাৎ দু'জন লোক এসে তাঁব পথ রোধ করে। তাদের হাতে রিভলভার ও বন্দুক ছিল। তারা মোর্শেদকে মাথাব ওপর হাত তুলতে আদেশ দিল। মোর্শেদের তখনও ধারণা তারা তাঁর সঙ্গে এক প্রকার উগ্র তামাশা করছে। তাই মোর্শেদ বিরক্ত হয়ে বললেন—'যত সব গর্দভ—এ কি হচ্ছে?' এই কথার পর তারা মোর্শেদকে আরও কঠোর স্বরে হাত তুলতে আদেশ করে। মোর্শেদ তাদের আজ্ঞা মেনে নিয়ে হাত তুললেন এবং বললেন—'এই নাও বাবা হাত তুললুম—ব্যাপারখানা কি বলত?' এই সময় মোর্শেদের সঙ্গে তাদের ব্যবধান মাত্র ৭।৮ গজ। টর্চ দিয়ে মোর্শেদকে দেখে একজন হুকুম দিল—'এ ওদেরই একজন—গুলী কর।' যে হুকুম দিল তাকে আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ক্যাপটেন টেট বলে মোর্শেদের ভ্রম হয়েছে। এখন ইংরেজী উচ্চারণে বাংলার টান শুনে মোর্শেদ সুনিশ্চিত হলেন যে, এ টেট নয়। অবস্থা বেগতিক দেখে মোর্শেদ ঝুঁকে পড়ে ছুট দিলেন। তাঁর গায়ে গুলী লাগলো না। সাইকেলটি ফেলে রেখেই তিনি পালালেন। তিনি যখন মেন-গেটে পৌছলেন তখন আরও কয়েকটা ফায়ার হয়েছে। কিন্তু সবগুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। পিকাডিলি সার্কাসের কাছে জাহাজের ক্যাপ্টেন মিঃ কার্টারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। মোর্শেদ

কার্টারের মোটরে পুলিস-লাইনের উদ্দেশ্যে গেলেন। এতক্ষণে সব ব্যাপারটাই তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তিনি বুঝতে পারলেন, এ কাজ এই জেলার বিপ্লবীদের এবং সেই বলশালী ব্যক্তি, যাকে তিনি সামনে দেখেছিলেন, তিনি টেট নন—স্বয়ং লোকনাথ বল।

আর্মারি দখল করার পর এভাবে তাদের সেখানে প্রায় চল্লিশ মিনিট কেটে গেছে। ইতিমধ্যে, অর্থাৎ তিন-চার মিনিটের মধ্যেই, আর্মারির দরজা ভাঙা হয় এবং তারপর এই সব ছোট ছোট ঘটনা ঘটে। এইরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যে আকুল উৎকণ্ঠায় প্রতি মুহূর্তে তারা আমাদের উপস্থিতি প্রত্যাশা করেছে। আর্মারি দখল করার একঘণ্টা পরেও আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছই নি। অথচ সেখানে আমাদের তৎপরতার প্রয়োজন অনেক বেশি ছিল। শত্রুপক্ষ তখনও এইরূপ ব্যাপক আক্রমণের বিষয় অনুধাবন করতে পারেন নি, তাই এই আর্মারির হেডকোয়ার্টারটি আক্রমণ ও দখল করে নেওয়া একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেই প্রথমে তাদের ধারণা হয়েছিল। সেই কারণে ক্যাপ্টেন টেটও একজনের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে একটি ছোট দল সঙ্গে নিয়ে আর্মারির সামনে পাহাড়তলীর রাস্তার ওপর নিজের গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হন। বীরদর্পে গাড়ি থেকে নেমে তিনি ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির সৈনিকদের উদ্দেশ্যে চীৎকার করে বললেন—"তুমলোগ কোন হ্যায়? ক্যা মাঙ্গতা?" প্রত্যুত্তরে জেনারেল বল কঠিন কণ্ঠে জানান—

"Halt, not a step further—or I will shoot you!"

আগেই বলেছি ক্যাপ্টেন টেট প্রায় লোকনাথের মত দেখতে ছিলেন। তেমনি লম্বা-চওড়া ও বলিষ্ঠকায়। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ভারতবাসীকে কথায় কথায় বুটের লাথি মেরে ও হুকুম দিয়ে অভ্যস্ত, সে কেন আজ তাদের আদেশ মানবে? ব্যঙ্গের সুরে ক্যাপ্টেন টেট বললেন "Halt? বাঙালী কুত্তা, Halt?"

আমাদের মামলার জাজ্মেণ্ট থেকে ক্যাপ্টেন টেটের দলের একজন সাক্ষীর জবানবন্দী উদ্ধৃত করছি—

"Then we stood up on the verandah on both sides. I was on the verandah facing the road. I heard Lokenath challenging saying 'Halt'. Then I heard a Saheb's voice, 'Bengali dog, halt'!"

আজ তাদের আর্মারি বিধ্বস্ত। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তির মর্যাদা আজ "ভারতীয় গোলাম"দের পদদলিত! ক্যাপ্টেন সাহেবের তা' একেবারে অসহ্য। অভিজাত্যের দম্ভে উদ্ধত ক্যাপ্টেনের মুখে ব্যঙ্গের হাসি—"বাঙালী কুত্তা, Halt!"

লোকনাথ নিজে আমাকে বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছে—"আমাদের যখন এই-

ভাবে রাস্তার ওপর সামনে দাঁড়িয়ে সাহেবের দল সৈনিকের পোশাকে চ্যালেঞ্জ করলেন, তখন আমার মনে হয়েছিল যদি একবার তারা বুঝতে পারে আমরা ভয় পেয়ে ঘাবড়ে গেছি তবে হয়ত প্রতি-আক্রমণ করবে। তা'ছাড়া তখনও আমি ঠিক করতে পারি নি তাদের পেছনে আরও লোকবল আছে কি না। জানি না কি করে তখন হঠাৎ একটি উঁপস্থিত বুদ্ধি মাথায় খেলে গেল। আমি উচ্চকণ্ঠে শত্রুপক্ষকে শুনিয়ে আমার সৈনিক সাথীদেব উদ্দেশে আদেশ দিলাম—

"Get ready with bombs ! Ready—follow me—charge !"

আমার এইরূপ একটি "বাস্তব-ভান" শত্রুকে সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি ও ভীতিগ্রস্ত করে তোলে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা এক সঙ্গে তিন-চারজন ফায়ার করে সেইদিকে কয়েক পা এগোতেই সাহেবদের অত দুঃসাহস, অত বিক্রম, অত দর্প, অত লম্ফঝম্প সব মুহূর্তে বুদ্বুদেব মত মিলিয়ে গেল। সাহেবগোষ্ঠী ম্যাকবেথের ডাইনী বুড়িদের মত কোথায় যেন স্পিরিটের মত উবে গেল—তাদের পাত্তা আর আমরা পেলাম না। তারা আমাদের লক্ষ্য কবে একটা গুলীও যে ছোঁড়ে নি তার একমাত্র কারণ আমার মনে হচ্ছে—বীরপুঙ্গব সাহেবের দল ভয় কবেছিল গুলী করলে হযত আমরা বোমা ছুঁড়ে সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলব।"

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সিংহের অত আস্ফালন গেল কোথায়? 'বাঙালী কুত্তা' বলে 'বৃটিশ সিংহের' গোষ্ঠী এতদিন ধবে যে ইতব মন ও জঘন্য রুচির পরিচয় দিয়ে এসেছে তারা এখন কতকগুলো ভেড়া ও শেয়ালের মত পালাল কেন? এই হচ্ছে সেই খাঁটি সাম্রাজ্যবাদী-চরিত্র—শক্তের ভক্ত নরমের যম!

বৃটিশ আমলে ভারতের Internal Security Force বিশেষ পদ্ধতিতে সংগঠিত ছিল। বিভিন্ন জাতি—গুর্খা, শিখ, পাঠান প্রভৃতিকে নিয়ে বিভিন্ন রেজিমেণ্ট গঠিত। বৃটিশ। শাসকবর্গ যাদের বেশি অনুগত মনে করেছে তাদেরই মেশিন-গান, আর্টিলারি, ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি প্রভৃতি শক্তিশালী মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত করে তোলে। বিশেষ করে সিপাহী বিদ্রোহের পর, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষে তাদের শক্তি অক্ষুন্ন রাখবার অভিপ্রায়ে, ভারতে অবস্থিত প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক ইংরেজকে নিয়ে বিভিন্ন রেজিমেণ্ট বা ব্যাটালিয়ান গঠন করার এক অপরিহার্য নীতি গ্রহণ করে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের নিয়ে যে সব রেজিমেণ্ট গঠিত হয়েছে সেইগুলির নাম A. F. I. (Auxiliary Force of India), অর্থাৎ, বৃটিশ সরকারের ভারতীয় Regular সৈন্যবাহিনীর সাহায্যকারী শক্তি হিসেবে তারা কাজ করবে। অর্থাৎ, যদি ভারতবাসীকে নিয়ে গঠিত কোন রেজিমেণ্ট বিদ্রোহ করে তবে তাদের দমন করবে এই অক্সিলিয়ারি ফোর্স। সামরিক কূটনীতি অনুসারে বৃটিশ অক্সিলিয়ারি ফোর্সের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ অস্ত্রাদি থাকত।

এইজন্য চট্টগ্রামে পুলিশ-বাহিনীর হাতে তারা দিয়েছে Musketry। এতে প্রতিবারে মাত্র একটা করে গুলী ছোঁড়া যায়; গুলীর পাল্লা দু'শ' গজের বেশি নয়। কিন্তু ম্যাগাজিন্ রাইফেলে একসঙ্গে দশটা কার্তুজ ভর্তি করা যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি ফায়ার করবার ব্যবস্থা আছে। ম্যাগাজিন্ রাইফেলের নলের মধ্যে এমনভাবে প্যাঁচ কাটা থাকে, যার সাহায্যে বিশেষ ধরণের শক্তিশালী কার্তুজ ফায়ারের সঙ্গে সঙ্গে পাক খেয়ে নিকেল করা সীসার গুলী বেরিয়ে যায়, তার পাল্লা হাজার গজের ওপরে। চট্টগ্রামে A.F.I. আর্মারিতে ইংরেজদের জন্য রাখা ছিল প্রায় চারশ' ম্যাগাজিন্ রাইফেল আর তুলনামূলকভাবে ভারতীয় কন্‌স্টেবলদের জন্য ছিল দু'তিন শ' মাস্কেট্রি মাত্র। A.F.I. হেডকোয়ার্টারে পাঁচটি লুইস্‌গানও ছিল। ম্যাগাজিন্ রাইফেলের একই সাইজের কার্তুজ লুইস্‌গানেও ব্যবহার কবা হয়। সেই একই পক্ষপাতিত্ব বশতঃ পুলিস-লাইনে লুইসগান ছিল মাত্র দু'টি।

বৃটিশের সামরিক কূটনীতি ব্যবস্থার আরও অনেক বিশেষত্ব ছিল। সেই যুগে চারটি কম্পানী নিযে সাধাবণতঃ একটি ব্যাটালিয়ান গঠিত হ'ত। প্রায় ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যাটালিয়ান, চাবটি কম্পানী ভিন্ন ভিন্ন রেজিমেণ্ট থেকে আনা হ'ত— তিনটি ভিন্ন জাতের ভারতীয় কম্পানী ও একটি ইংরেজ কম্পানী। ভারতীয় তিনটি কম্পানী একত্রে মিলিত হয়ে বিদ্রোহের অভিপ্রায়ে একযোগে যেন ষড়যন্ত্র করতে না পারে তারই জন্য এই ব্যবস্থা। নিরাপত্তার জন্য প্রত্যেক ব্যাটালিয়ানের সঙ্গে একটি করে ইংরেজ কম্পানীকে যুক্ত করা অপরিহার্য মনে করেছে তাবা। বিভিন্ন জাতের তিনটি ভারতীয় কম্পানী ঝগড়া করুক, ইংরেজ কম্পানী তো আছেই- ঝগড়া মেটাবে!

সেইহেতু চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহে আমরা খাস ইংরেজের অক্সিলিয়ারিফোর্স আর্মারি দখল করা একেবারে অপরিহার্য মনে করেছিলাম। প্ল্যান মত অক্সিলিয়ারি ফোর্স আর্মারি দু'তিন মিনিটের মধ্যেই আমাদের হস্তগত হ'ল। আমি ক্ষুদ্র দলটি নিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা পরে সেখানে উপস্থিত হয়েছি। ইতিমধ্যে প্রথম আক্রমণ ও অস্ত্রাগারটি দখল করার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি ঘটনা ঘটে গেছে। ঐ সব বর্ণনা - যাঁরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন সেই সব বন্ধুদের কাছ থেকেই জেনেছি এবং তা' এখানে লিপিবদ্ধ করলাম। সরকারী লোকদের উক্তি কিছু বিকৃত হলেও ঐতিহাসিক প্রয়োজনে তাও প্রকাশ করলাম।

কেউ কেউ আমাকে বলেছেন আমার A. F. I. হেডকোয়ার্টারের সবগুলি ঘটনার বর্ণনা পড়ে মনে হয় যেন পরস্পর উক্তির মধ্যে অসামঞ্জস্য আছে। তাঁরা আমার কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন—(১) আপনারা তো ঠিক করেছিলেন কোন

সাহেবকেই রেহাই দেবেন না; তবে ব্ল্যাকবার্ন, কুলেন, মোর্শেদ প্রমুখ ইংরেজকে হত্যা করলেন না কেন? (২) কুলেন মৃতের ভান করে পড়ে রইলেন। তিনি এলেন কখন? তার আগেই তো আর্মারি ভেঙে ফেলা হয়েছে। তিনি ছুটো মোটর গাড়ি পাহাড়তলীর দিকে ছুটে যেতে দেখলেন। তারপর আর্মারি ভাঙার শব্দ শুনলেন। আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'তিনটি গাড়ি পাহারতলীর দিকে যাচ্ছিল, সেই সব গাড়িকে রুখতে বিপ্লবীরা ছুটেছে শুনলেন, ইত্যাদি। এইসব কখন কিভাবে ঘটল তা' যেন পরিষ্কার হচ্ছে না। (৩) ক্যাপ্টেন টেটের দলই বা কখন এলো—ব্ল্যাকবার্ন, কুলেন ও মোর্শেদের ঘটনার পূর্বে না পরে—কতক্ষণ পরে?

কারও না কারও যখন মনে হয়েছে ঘটনাগুলি বোঝবার পক্ষে যথেষ্ট পরিষ্কার হয় নি, তখন আরও একটু বিশদভাবে বলা উচিত। ইংরেজ-হত্যা আমাদের প্রোগ্রামে ছিল তা' খুবই সত্য। যারা গুলীর মুখ থেকে বেঁচে গেছে তারা নিষ্কৃতি পেয়েছে আমাদের গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে বলেই। চাঁদমারী প্র্যাকটিস করে দক্ষতা অর্জন করলেও যুদ্ধক্ষেত্র, বিশেষ করে সম্মুখ-সমর, বাস্তবে একটি চাঁদমারী প্র্যাকটিস নয়। চাঁদমারীর লক্ষ্যভেদ এক কথা আর যুদ্ধক্ষেত্রে স্থির থেকে শত্রুর বক্ষ লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়া সম্পূর্ণ ভিন্ন। সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত সৈন্যবাহিনী জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীদের লক্ষ্য করে প্রায় তিন হাজারেরও অধিক ফায়ার করেছে—মৃত্যুবরণ করেছে মাত্র বারোজন বিপ্লবী। পুলিস-লাইনের ছোট্ট জায়গায় বিপ্লবীরা সবাই প্রায় পাশাপাশি শুয়েছিল। দক্ষ ইংরেজ সৈনিক তাদের লক্ষ্য করে দু' শ' গজের মধ্যে মেশিনগান ফায়ার করেছে কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ আহতও হয় নি। বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্র চাঁদমারীর শিক্ষাভূমি নয়—তাই বিপ্লবীরা ফায়ার করা সত্ত্বেও সাহেবরা বেঁচে গেছে।

আর্মারির চল্লিশ গজ উত্তরে পাহাড়তলীর রাস্তা পুব থেকে পশ্চিমে বরাবর চলে গেছে। আর্মারি দখল হওয়ার মিনিট তিন-চারের মধ্যে পাহাড়তলীর দিক থেকে সেই রাস্তায় ব্ল্যাকবার্ন সঙ্গীদের সঙ্গে ট্যাক্সি করে আর্মারি কম্পাউণ্ডের পূর্ব-প্রান্তের মেন-গেট দিয়ে ঢুকে পশ্চিম দিকে আসছিলেন। বিপ্লবীরা তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে ও তাঁকে লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়ে। ফায়ার করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঝুঁকে পড়ে পালিয়ে যান। পালাবার সময় সাথীদেরও ডাক দিয়ে গেলেন তাঁকে অনুসরণ করবার জন্য। জাহাজের দু'জন অফিসার পালাতে সমর্থ হন, কিন্তু কুলেন আর পালাতে না পেরে সেখানেই মৃতের ভান করে পড়েছিলেন। কুলেনের এই কথা কতখানি সত্য, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমি আমার প্রত্যেকটি বন্ধুর কাছে জেনেছি তারা তেমন কোন সাহেবকে পড়ে থাকতে দেখেনি। টর্চের আলো সাহেবের ওপর নিবদ্ধ ছিল আর তিনি মৃতের ভান করলেন এবং পরে গড়িয়ে গড়িয়ে

ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করলেন—এই বৃত্তান্ত আমি বিশ্বাস করি না। কুলেন যখন এই অবস্থায় ঝোপে গিয়ে লুকিয়ে ছিলেন তখন খুব বেশি হলেও প্রথম আক্রমণের পর থেকে মিনিট তিন-চার হবে। এই সময় থেকে আমাদের আসা অবধি—প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিট বা এক ঘণ্টার মধ্যে, তিনি যা' যা' দেখেছেন বা বুঝেছেন তারই বর্ণনা দিয়েছেন। আমি বলেছি চল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা সময় আমাদের এখানে আসতে লেগেছে; তার কারণ, লোকনাথ আমাকে বলেছে এক ঘণ্টারও বেশি দেরি আমরা করেছি। আমাব ধারণা মিনিট চল্লিশের মধ্যেই আমি ছোট একটি দল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হই। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সেরূপ মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

পাঁচজন প্রত্যক্ষদর্শী একই স্থানে একই সময়ে থাকার পর যদি একই ঘটনার বর্ণনা দেয় তবু তাদের বর্ণনাব মধ্যে কিছু কিছু তফাত থাকা আশ্চর্য নয়। সেই কাবণে বর্ণনাগুলিতে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও মোটামুটি সবগুলিই প্রায় ঠিক। পাহাড়তলীব রাস্তা দিয়ে রাত দশটা-এগাবোটাব সময়েও মোটব গাড়ি চলছিল। প্রত্যেকটি মোটর গাড়িকে আমাদের বন্ধুবা রুখতে আদেশ দিয়েছে। কুলেন এই সব মোটরের কথাই উল্লেখ কবেছেন। সেখানে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে থেকে সব সময় তাঁব কানে নানা শব্দ প্রবেশ করেছে। প্রতিবারই শব্দ শুনে কুলেন হয়ত ভেবেছেন—এই বুঝি আর্মারি ভাঙলো! কাজেই ঠিক কখন আর্মারির দরজা সশব্দে ভেঙে পড়লো কুলেন সাহেব তা শুনতেও পারেন আবার নাও শুনতে পারেন।

কুলেন মৃতের ভান করে পড়ে থাকার কিছুক্ষণের মধ্যেই সাইকেল চেপে মোর্শেদ আসেন এবং গুলীর মুখ থেকে তিনিও বেঁচে যান। এই সব ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর ক্যাপ্টেন টেটেব দল সদর্পে রণাঙ্গনে প্রবেশ করে এবং আমার উপস্থিতির কিছু আগে শেয়ালের মত পালায়; কিন্তু কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে মনে কবেই লোকনাথ আমাদের নিরাপদ রাস্তায় গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে বলে।

আমি গিয়েই তাদের অভিনন্দন জানাই—"Hearty congratulations. You have done well."

লোকনাথ—"আমরা অস্ত্র পেয়েছি, বটে কিন্তু একটিও কার্তুজ এখানে নেই?"

নির্মলদা—"এখন কি হবে? এত সব অস্ত্র একটিও কাজে লাগবে না!"

সবার মুখে বিষাদের ছায়া। আমি শুনে তো একেবারে হতবুদ্ধি! তবে ঐ সব বাক্সে কি ছিল—কার্তুজ নয়? আমাদের এতদিনের সংবাদ সংগ্রহ তবে নিষ্ফল হ'ল! আমার মনে প্রবল ঝড় বইছিল। এ কি করে হতে পারে? কার্তুজ গোপনে কোথাও সংরক্ষিত নেই তো? আমি নির্মলদাকে প্রশ্ন করলাম—"সব জায়গা ভালভাবে খুঁজে দেখা হয়েছে?"

নির্মলদা—"হ্যাঁ, প্রতিটি স্থান খুঁজেছি—কোথাও কার্তুজের চিহ্নও নেই।"

আমি—"That's strange ! How that can be ? Are you sure all the nook and corner of the Armoury building has been thoroughly searched ?"

—(অবাক লাগছে ! সব স্থান ভালভাবে খুঁজে দেখা হয়েছে বলে আপনারা কি একেবারে নিঃসন্দেহ) ?

লোকনাথ—"I am sure, all the places have been searched."

দুইহাতে দু'টি রিভলভার নিয়ে আর্মারির সামনের বারান্দার ওপর ধীরে ধীরে পায়চারি করছিলাম। আর্মারির ঠিক দক্ষিণ পাশের কামরায় ঢোকার কাঠের দরজার ওপর মস্ত বড় একটি তালা ঝুলছিল। তখনও এই কামরার ভিতরটা দেখা হয় নি। তালামারা কাঠের দরজার অভ্যন্তরে রাইফেলের টোটা রাখা হয় নি—এইরূপ ভাবা তাদের পক্ষে কিছু অস্বাভাবিক নয়। আমিও ভাবি নি যে ওরই মধ্যে কার্তুজ আছে। তবু ত্রুটি কেন থাকবে ? অনেক আগেই সন্দেহভঞ্জন করা উচিত ছিল। তাই আমি রজত ও মাখনকে প্রশ্ন করলাম—

"Why havn't you broken yet the lock and opened the door ? Immediately break the door open."

—(তোমরা এখনও এই দরজাটি খোল নি কেন ? এক্ষুণি তালা ভেঙে ফেল)।

বলতে না বলতেই তালার উপর দমাদম্ দশ পাউণ্ড ওজনের হাতুড়ির ঘা পড়লো। তালা কোথায় ছিট্‌কে উড়ে গেল। দরজা খুলে দেখি ঘরভর্তি প্লেট, কাপ, গ্লাস, জলের জাগ, ছুরি, কাঁটা প্রভৃতি থরে থরে সাজান। অনেকগুলি ডিস্, কাপ আবার প্যাকিং বাক্সে বোঝাই করা আছে।

আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর নিতান্ত স্বাভাবিক প্রশ্ন, যা দেখা হওয়া মাত্রই আমাকে তাদের করা উচিত ছিল, তা' করতে তারা এতক্ষণ ভুলে গেছে। কার্তুজ না পেয়ে সবাই যে উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিল সেই অবস্থায় স্বাভাবিকতা নষ্ট হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। এই কাঠের দরজাটি ভেঙে কামরার ভেতর বাসনপত্র, কাপ, ডিস্ প্রভৃতি দেখার পর শেষবারের মত আমরা সবাই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকে চেপে রাখলাম। ম্যাগাজিন রাইফেলের কার্তুজ না পাওয়ার অর্থ—চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সামরিক স্ট্র্যাটেজির পরাজয়। যদি ·৩০৩ বোরের কার্তুজ আমরা পেতাম, যদি সাতটি মেসিনগান ও চারশ' ম্যাগাজিন রাইফেল আমাদের হাতে সক্রিয় থাকত, তবে বিদ্রোহের ইতিহাস যে সম্পূর্ণ অন্যভাবে লেখা হ'ত তা'তে আমরা নিঃসন্দেহ।

এত নৈরাশ্যের মধ্যেও নির্মলদা প্রশ্ন করলেন—"পুলিস-লাইন, টেলিফোন-ভবন, ক্লাব-হাউস প্রভৃতি প্ল্যান মত অধিকৃত হয়েছে তো ?"

আমি—"নিখুঁতভাবে প্ল্যান অনুযায়ী সব হয়েছে। কিন্তু ক্লাব-হাউসে কোন ইংরেজকে Good Friday বলে আজ রাত্রে পাওয়া যায় নি। তারা নাকি অনেক আগে চলে গেছে।"

লোকনাথ—"How lucky they are ! Tell me is there any casualty on our side ?"

—(কি ভাগ্যবান তারা ! আমাদেব দিকে কি কেউ হতাহত হয়েছে ?)।

আমি—"No—none even injured."

—(না—এমন কি কেউ আহতও হয় নি)।

লোকনাথ—"Any casualty on enemy side ?"

আমি—"কেবল একজন সেপাই পুলিস-লাইনে প্রাণ হারিয়েছে।"

কথা বলতে বলতে আমরা বারান্দার নিচে মাঠে নেমে এসেছি। এই সময় কিছুক্ষণ বাদে বাদে দুই-একটি মোটর গাড়ি পাহাড়তলীর দিকে যাচ্ছিল। তরুণ বন্ধুবা প্রতিবারেই হাঁক দিয়ে তাদের গাড়ি থামাতে বলছিল। যারা তাদের আদেশ মানছিল না মাস্কেট্রি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই তাদের দিকে ফায়ার করা হচ্ছিল। গাড়ি ক'টি তক্ষুণি নিশ্চল হয়ে গেছে। আমার এখনও মনে আছে, একটা গাড়ির ড্রাইভার স্টিয়ারিং-হুইলের ওপর শুয়ে পড়লো এবং গাড়িটি পেছনের দিকে স্লোপে গড়াতে গড়াতে গিয়ে আর একটি নিশ্চল অবস্থায় পড়ে থাকা মোটর গাড়ির ওপর সজোরে ধাক্কা দিল এবং সঙ্ঘর্ষের ফলে একটার ওপর একটা চেপে বসলো।

অতঃ কিং কর্তব্যম্? কার্তুজ পাই নি—এখন কি কবা যায়? অর্ডার হ'ল—

"Take all the revolvers and as many rifles and Lewis-gun possible. Destroy the rest !"

—(আমাদের সঙ্গে সব ক'টি রিভলভার এবং যতগুলি সম্ভব রাইফেল ও লুইসগান নেওয়া হোক্। বাকি সব ধ্বংস কর)।

খটাখট্ ঠকাঠক্। স্তূপীকৃত রাইফেলের উপর সঙ্গে সঙ্গে অনবরত চারিটি ভারী ভারী হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রায় সব রাইফেল ও তিনটি লুইস্‌গান ভেঙে ফেলা হ'ল। কতকগুলো রাইফেল ও দু'টি লুইস্‌গান গাড়ি দু'টিতে বোঝাই করা হ'ল। তারপর নির্দেশ হ'ল—

"Set the armoury on fire !" পাঁচ-ছ'টি পেট্রোলের টিন খুলে সব স্থানে

পেট্রোল ছড়ান হ'ল। তারপর, পেট্রোল ছিটানোর পর, কিভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে পেট্রোলে আগুন দেওয়া যায় সেইরূপ শিক্ষা অনুযায়ী, সুবোধ চৌধুরী ও রজত সেন আর্মারিতে আগুন ধরালো। দেখতে দেখতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো।

লোকনাথদের ডজ্ গাড়িটি আর্মারি থেকে এগিয়ে গিয়ে পূবদিকের মেন-গেট অতিক্রম করে আমাদের পেট্রোলে গাড়ির সঙ্গে এসে রাস্তার ওপর যোগ দিল। A. F. I. আর্মারি কম্পাউণ্ড পরিত্যাগ করে যাওয়ার সময় সমবেত কণ্ঠে আমরা জয়ধ্বনি দিলাম—"বন্দে মাতরম্, ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ।" ঐ দিকে দাউ দাউ করে আর্মারি জ্বলছে—আগুনের লেলিহান শিখা সারাটা আর্মারি প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে—মাঝে মাঝে আগুনে পুড়ে সশব্দে কি যেন ফাটছে। সেই সব ফাটার শব্দ, বন্দে মাতরম্ ধ্বনি, আগুনের ভয়াবহ দৃশ্য, অল্প স্থানের মধ্যে মৃতদেহের ছড়াছড়ি ও ছ'সাতটি মোটর গাড়ি বিধ্বস্ত অবস্থায় রাস্তার ওপর পড়ে থেকে ছোটখাট একটি রণাঙ্গণের সৃষ্টি হ'ল।

জজসাহেব মামলার রায় লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন—

"Among the Europeans who had come up was Dr. Weldone, Chief Medical Officer of the Assam Bengal Railway. In the armoury compound and on the road adjoining it were six corpse. The constable Jarasindhu Barua was lying dead in the back seat of Mr. Wilkinson's car which was standing near the Drill Hall entrance to the compound, while beside it in the ditch lay his chauffear Birman Thapa badly wounded. A little further along the road another car was standing with a dead man in the driver's seat another dead man in the back seat and lying on the running borad the dead body of an Anglo-Indian. Between the armoury and the Sergt. Major's bunglow, lay the corpse of Sergt. Major Farrell and between the armoury and the sentrie's quarters lay the corpse of one of the A.F.I. sentries. Another sentry Golam Jhilani was found badly wounded. He and Birman Thapa were removed to the Pahartali hospital." (Judgement, Chittagong Armoury Raid Case).

* —তারপরদিন সকালে আসাম-বেঙ্গল রেলের প্রধান ডাক্তার মিঃ ওয়েলডন সেখানে গিয়েছিলেন। আর্মারির কম্পাউণ্ডে ও রাস্তার ওপর ছ'টি মৃতদেহ পড়েছিল। জেলা-শাসক মিঃ উইলকিন্‌সন সাহেবের বিধ্বস্ত মোটর গাড়িটির পেছনের আসনে

কন্‌স্টেবল জয়াসিন্ধুকে মৃতাবস্থায় দেখা যায়। মিঃ উইলকিন্‌সন সাহেবের গাড়ির পাশে এক নর্দমায় তাঁর ড্রাইভার বীরমন থাপা গুরুতর আহত হয়ে পড়ে থাকে। একটু এগিযে অন্য একটি গাড়ির ড্রাইভারের সিটে একটি এবং পিছনের সিটেও আর একটি মৃতদেহ পাওয়া যায়। পাদানীর ওপর আর একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের মৃতদেহ পাওয়া যায়। সার্জেণ্ট মেজর ফেরেলের মৃতদেহ তাঁরই কোযার্টারের সামনে এবং একজন সেণ্ট্রির প্রাণহীন দেহ আর্মারি ও প্রহরীদের কোয়ার্টারের মাঝখানে পড়েছিল। আর একজন সেণ্ট্রি—গোলাম জিলানিকে গুরুতর আহত অবস্থায় বীরমন থাপার সঙ্গে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

আমাদের দু'টি গাড়ি যখন পুলিস-লাইনের দিকে রওনা হচ্ছে, এমন সময় পাহাড়তলী রাস্তাব ওপর, আমাদের প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ গজ সামনে, হেড্‌-লাইট জ্বালিযে একটি মোটর গাড়ি আসতে দেখলাম। সেই সময় আমাদের সবাই গাড়িতে ওঠেনি। যারা তখনও রাস্তার ওপর ছিল তারা একসঙ্গে তিনটি পুলিস মাস্কেট্রি উঁচিয়ে ধরে হুকুম দিল—

"Halt ! Who comes there ?"

উত্তব পাওযার জন্য তিন সেকেণ্ড অপেক্ষা করা হয়েছে; কারণ, সেই সময় আমাদের খোঁজে পুলিস-লাইন থেকে অন্য কোন দল আসবার সম্ভাবনাও ছিল। মোটরের তীব্র হেড্‌-লাইটের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না—কোন্ গাড়ি বা তাতে আরোহী কা'রা তা' বোঝবাব উপায় ছিল না। কিন্তু হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে জবাব না পেলে দেরি করা মূর্খতা। তাই আবার নিশীথের নির্জনতা ভঙ্গ করে আদেশ হ'ল—

"Fire !"

তিনটি মাস্কেট্রি একসঙ্গে গর্জন করে উঠলো। তারপর load ও fire করতে করতে আমাদের চার-পাঁচজন মোটর গাড়ির দিকে ছুটে গেল। আমিও দু'হাতে খোলা রিভলভার নিয়ে দৌড়ে গেলাম।

আমরা চিনতে পারলাম—ম্যাজিস্ট্রেটের মোটর। পেছনের সীটে তাঁর আর্দালীর মৃতদেহ ও আর্দালীর মৃতদেহের পাশে মিঃ উইলকিন্‌সনের দোনলা বন্দুক এবং এক বাক্স কার্তুজ পড়ে আছে। সামনের সীটে ড্রাইভার ছিল। তাকে আমাদের মধ্যে একজন টেনে বার করলো। প্রধান শিকার পালিয়ে গেল—জেলা-শাসক উধাও! কা'র মোটর গাড়ি তা' বুঝে নিতে ঐ যে দু'-তিন সেকেণ্ড সময় নিয়েছি, তারই মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হেড্‌-লাইটের সাহায্যে আমাদের রণসজ্জা দেখে সমূহ বিপদের আশঙ্কায় পেছনের দিকে ছুটে পালিয়েছেন। হেড্‌ লাইটের জন্য আমরা কিছু দেখতে পাই নি। তরুণ বন্ধুরা খুব

উত্তেজিত। সব রাগ গিয়ে পড়লো বেচারা ড্রাইভার বীরমন থাপার উপর। একদিকে হিমাংশু আর একদিকে টেগ্‌রা মাস্কেট্‌ হাতে কঠোর কণ্ঠে বীরমন থাপাকে গুলী করবে বলে ভয় দেখাচ্ছে—"ম্যাজিস্ট্রেট কোথায় গেছে বল—নইলে গুলী করব।" এই বলতে বলতে বীরমনের বুকের মাংসপেশী বাঁ দিক থেকে ডান দিক বিদীর্ণ করে একজনের বন্দুক থেকে গুলী বেরিয়ে গেল। আর এক বন্ধু অন্য পাশ থেকে একেবারে বুক লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়ে আর কি! আমি নিমেষে তাদের দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে খুব তীক্ষ্ণ স্বরে তাদের বিপ্লবী আত্মসম্মানে আঘাত দিয়ে বললাম—

"Stop. What are you doing? He is an Indian. He is a poor driver! How can he say which way the Magistrate has gone?"

—থাম, এ কি করছ? ও তো ভারতবাসী—বেচারা ড্রাইভার একজন! সে কি করে বলবে ম্যাজিস্ট্রেট কোন্‌ দিকে পালিয়েছে?

সঙ্গে সঙ্গে তরুণ বন্ধুরা তাদের বন্দুক নামিয়ে নিল। তারা তাদের ভুল বুঝে লজ্জা পেল। আমার খুব ভাল লেগেছিল—আজও লিখতে গিয়ে খুব আনন্দ পাচ্ছি—সেইরূপ উত্তেজনার মুখেও একজন নিরীহ লোকের প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করতে পেরেছিলাম।

ম্যাজিস্ট্রেটের ড্রাইভার বীরমনের কথা জজসাহেব লিখছেন—

"Birman Thapa, the District Magistrate's chauffear, says that five or six persons dressed in khaki standing by the gate of the armoury compound shouted to them to go back and then opened fire on them and he was hit on the leg and chest and he fell down in the driver's seat. The headlights of the car continued burning until the right one was put out by a bullet. As he lay there, dazed but not unconscious, five or six of the raiders came up and looked into the car and shone an electric torchlight on him. One of them said, 'This is the District Magistrate's driver' and another said, 'kill him'. Then they questioned him who had been in the car and where he was taking them and he replied that he was taking the Shahebs to Pahartali. Then one of them said in Bengali—'He is a liar—kill him' and another pointed a pistol at him and pulled the trigger but as he did so he (Birman) switched round and the bullet only grazed his chest causing a flesh wound. Then they prodded his body with

them said, 'Do not do him any further injury' and they turned and went away. (Judgement, Chittagong Armoury Raid Case. Page—35).

জাজ্‌মেণ্ট কপিতে পাচ্ছি বীরমন বলেছে—পাঁচ-ছ'জন তাকে গাড়ি ফিরিয়ে নিতে বলে ও ফায়ার করে। তার পায়ে গুলী লাগে। বুকের মাংস ঘেঁসে গুলী চলে যায়—ইত্যাদি। হেড্‌-লাইট জলছিল, কিন্তু বন্দুকের গুলীতে ডানদিকের হেড্‌-লাইট চুরমার করে দেওয়ার পর থেকে লাইট নিভে গেল। সে যখন গাড়িতে পড়ে ধুঁকছে, পাঁচ-ছ'জন আক্রমণকারী তার দিকে ছুটে এসে টর্চের আলোতে তাকে দেখলো। তাদের মধ্যে একজন তাকে চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠলো—'একে মেরে ফেল'। 'তারা তাকে প্রশ্ন করে জানতে চাইল, সাহেবদের নিয়ে সে কোথায় যাচ্ছিল। সে জানালো, পাহাড়তলীর দিকে। তারপর একজন বাংলায় বলল—'এ মিথ্যাবাদী, একে গুলী কর।' একজন রিভলভার দিয়ে গুলী করে, কিন্তু সে সরে যাওয়াতে গুলী ঠিকমত লাগলো না—বুকের মাংস ঘেঁষে চলে গেল। তারপর তারা বন্দুক দিয়ে তাকে গুঁতোতে লাগলো এবং রাস্তার ওপর টেনে বার করলো। সে পড়ে গেল। তখন একজন বলল—'ব্যাস্, আর না—একে আর জখম কোর-না।' এই কথা শুনে সবাই চলে গেল। কিন্তু বীরমনের সবকথা ঠিক নয়। আমি প্রত্যক্ষদর্শী এবং এই ঘটনায় নিজে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমি যে বর্ণনা দিয়েছি সেটাই প্রকৃত সত্য ঘটনা।

অক্ষত দেহে জেলা-শাসক, মিঃ উইলকিন্‌সন পালালেন। ফায়ারিং লাইন থেকে কৌশলের সঙ্গে পালাতে পারা পরাজয় নয়—বরং তা successfull retreat—সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ। মিঃ উইলকিনসন সেখান থেকে তৎপরতার সঙ্গে কেবল যে পশ্চাদপসরণ করলেন তা' নয়, জেলা-শাসকের গুরুদায়িত্ব পালন করার জন্যও কর্তব্যে অটল ছিলেন। সেইসব বিবরণ আমি পরে দেব। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বীরত্ব, দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যজ্ঞানকে ইতিহাসে বিকৃত করে হেয় প্রতিপন্ন করতে আমি চাই না। সাম্রাজ্যবাদীদের চরিত্র সঠিক জানতে হলে তাদের দুর্বল বলে অভিহিত করলে চলবে না—তাদের সাংগঠনিক শক্তি ও ব্যক্তিগত সাহসের ইতিহাসও আমাদের জানা উচিত। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমার লেখায় শত্রুপক্ষের তৎপরতা ক্রমশঃ প্রকাশ পাবে।

শেষবারের মত A. F. I. আর্মারিটিকে বিদায় জানিয়ে আমাদের দু'টি গাড়ি পুলিস-লাইনের দিকে অগ্রসর হ'ল। আর্মারির বিরাট অগ্নিকাণ্ডে চারিদিক আলোকিত। গাছের মাথায় পাহাড়ের গায়ে আলোর ছটায় চারিদিক ঝিক্‌মিক্ করে উঠেছে, আর ওপরে আকাশ লাল হয়ে চট্টগ্রামের বিজয়বার্তা ঘোষণা করছে।

মাতরম্!" তবু কেন আমাদের মুখে হাসি নেই? কেন আমাদের মুখ মলিন? লাল আকাশ আমাদের চোখে কেন ফিকে লাগছে? A. F. I. আর্মারি অধিকারের বিজয়-গৌরবে আমাদের মনে আনন্দ নেই কেন? রাইফেল ও লুইস্‌গানের কার্তুজ না পেয়ে আমরা বুঝেছিলাম আমাদের ক্ষতির পরিমাণ কতখানি।

রাত প্রায় বারোটা হবে। পাহাড়েব মাঝখানের পথ ধবে আমাদের গাড়ি দু'টি আগে পিছে চলেছে। রাস্তাটি একেবারে জনশূন্য—নিস্তব্ধ নির্জন। দুটি গাড়িরই হেড্‌লাইট নেভানো। রাস্তা খুবই খারাপ এবড়োখেবড়ো। তাই গাড়ির গতি খুব ধীর ও সতর্কতাপূর্ণ। ইয়োবোপীয়ান ক্লাব-হাউসের ছোট টিলাটিব পশ্চিমদিকেব কোল ঘেঁসে এই রাস্তাটি পুলিস-লাইনের টিলার পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এখান থেকে পুলিস-লাইনের দূরত্ব বোধ হয় দু'শ গজের বেশি হবে না। আমাদের গাড়ি দু'টি একেবারে নিঃশব্দে এখানে এসে পৌঁছলো। সব দেখেশুনে মনে হ'ল আবহাওয়া শান্ত—পুলিস-লাইন আমাদের দখলেই আছে।

পূর্ব-নির্ধারিত সঙ্কেতের মাধ্যমে আমাদের আগমনবার্তা জানালাম। মুহুর্মুহু রণধ্বনি দেওয়া হ'ল, বিশেষভাবে মোটরের হর্ন বেজে উঠলো ও ক্ষণে ক্ষণে হেড্‌-লাইট জ্বালিয়ে-নিভিয়ে সঙ্কেত দেওয়া হ'ল; পুলিস-লাইনেব উপর থেকে বিজয়নিনাদে বন্ধুরা আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। তাদেব সঙ্গে মিলিত হয়ে সমস্বরে গগনবিদারী রণরোল উঠলো—"বন্দেমাতরম্—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!"

আমরা গাড়ি থেকে নেমে পুলিস-লাইনেব টিলার উপব উঠলাম। আজও আমার মনে আছে, যখন আমি সামান্য উঁচু টিলাটির উপর উঠছিলাম তখনও আমাব দু'হাতে দু'টি খোলা রিভলভার। এটা কি nervousness নাকি excitement? আজ চিন্তা করে ঠিক বুঝতে পারছি না, কেন আমি সে সময়ে দু' হাতে দু'টি খোলা রিভলভার রাখা প্রয়োজন মনে করেছিলাম? Nervousness বা excitement ছিল বলে অবশ্য আমার মনে হয় না—খোলা রিভলভার দু'টি হাতে ধরে রাখতেই যেন ভালো লাগছিল। আমি তখন একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। দু' হাতে দু'টি রিভালভার নিয়ে টলে টলে টিলার উপর উঠছি। পা দু'টি একটির সঙ্গে একটি যেন জড়িয়ে যাচ্ছে—হঠাৎ কিসে একটা হোঁচট খেলাম—মনে হ'ল যেন মাটিতে গড়িয়ে পড়বো। তখন নিজের কানে শুনতে পাবার মত স্বগতোক্তি করেছিলাম—"এই অবস্থায় যদি আমি পুলিসের হাতে ধরা পড়ি তবে ক্লান্তিবশে উপযুক্তভাবে আত্মরক্ষা করতে পারবো না—আর তারা জাহির করবে অনন্ত সিংকে দু'টি রিভলভার সহ গ্রেফতার করেছে।" নিজে নিজে বলেছি আর অবজ্ঞাভরে হেসেছি।

টিলার উপর ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারদা আগে এসে সবার কুশল সংবাদ জানতে চাইলেন। নির্মলদা মাস্টারদাকে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন ও আমরা সবাই অক্ষত দেহে ফিরে এসেছি জানালেন। তারপর মাস্টারদাকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করে দিয়ে আমি বললাম—"মাস্টারদা—আমদের জয়ের গৌরব একেবারে ম্লান হয়ে গেছে। A.F.I. আর্মারিতে রিভলভার, ম্যাগাজিন রাইফেল ও লুইস্‌গান আমরা প্রচুর পেয়েছি। কিন্তু আশ্চর্য! সেখানে একটিও রিভলভার বা রাইফেলের কার্তুজ পাই নি!"

মাস্টারদা—"কি? কি? একটি কার্তুজও পাও নি?"

লোকনাথ—"না—একটিও না!"

"তা কি করে সম্ভব হতে পারে?"—এই প্রশ্নটুকু করে মাস্টারদা একেবারে চুপ হয়ে গেলেন। দেখতে দেখতে কথাটা মুখে মুখে আমাদের সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো—"একটি কার্তুজও পাওয়া যায় নি। সব ক'টি লুইস্‌গান ও ম্যাগাজিন রাইফেল একেবারে অকেজো হয়ে রয়েছে।"

অম্বিকাদা অবসাদগ্রস্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন—"এখন কি উপায়? লুইস্‌গান, ম্যাগাজিন রাইফেল আমরা কাজে লাগাতে পারবো না?"

গণেশের তখন খুব জ্বর। সে আর্মারি গৃহের এক পাশে শুয়েছিল। এই নিদারুণ সংবাদে সে উঠে বসলো—আমি তার কাছে রিপোর্ট করলাম—"আমাদের সংবাদ অসম্পূর্ণ! রাইফেলের সঙ্গে রাখা ঐসব বাক্সে কার্তুজ ছিল না—ছিল তাদের হ্যাভারসেক্, ক্রশবেল্ট প্রভৃতি।" গণেশ এই রিপোর্ট শুনে খুব চিন্তিত হয়ে পড়লো।

আগামীকাল প্রাতে চট্টগ্রামের যুবকেরা দলে দলে ভারতীয় গণতন্ত্রীবাহিনীতে যোগ দিতে আসবে! প্রায় চার-পাঁচশ' ম্যাগাজিন রাইফেল অকেজো হয়ে পড়ে রইল! একটি লুইস্‌গানও কাজে আসবে না! কেবল মাস্কেট্রি নিয়ে সজ্জিত কয়েকশ' যুবক শত্রুর প্রতি-আক্রমণের বিরুদ্ধে কতখানি কি করতে পারবে? যুব-বিদ্রোহের রণনীতি ও রণকৌশল নির্ভর করছিল দু'টি অপরিহার্য অনুকূল অবস্থার উপর। যুব-বিদ্রোহের প্রথম পর্যায়ে আমরা আমাদের গোপনে সংগৃহীত অস্ত্র ও সংগঠনের সাহায্যে শত্রুর প্রধান প্রধান ঘাঁটি ও অস্ত্রাগারগুলি দখল বা ধ্বংস করেছি। দ্বিতীয় পর্যায়ে শত্রুপক্ষের ম্যাগাজিন রাইফেল ও লুইস্‌গান প্রভৃতি অধিকার করে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা করা ও আমাদের বিপ্লবী গণতন্ত্রীসরকারকে সুরক্ষিত করার জন্য শক্তিশালী মোর্চা গড়ে তোলার কথা। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের বাস্তব অবস্থা আমাদের ঘোর প্রতিকূলে—উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত অস্ত্র ব্যতিরেকে সুদৃঢ় ব্যূহ রচনা সম্ভবপর নয়।

উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত অস্ত্রের উপর যেমন রণনীতি ও রণকৌশল নির্ভর করে—

তেমনিই আবার অবস্থা অনুযায়ী—বিশেষ করে প্রতিকূল অবস্থায়—রণনীতি ও রণকৌশল প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তিত ও পরিচালিত করা সামরিক নেতৃত্বের প্রধান দায়িত্ব। সেইরূপ সন্ধিক্ষণে মাস্টারদা, নির্মলদা, অম্বিকাদা, গণেশ ও আমার একটি খুব পরিষ্কার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত ছিল। আমাদের ত্রুটি স্বীকার করতেই হবে—আমরা কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করি নি; কোথায় যেন কি একটা প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া কাজ করেছে—আমরা নানা কারণে ইতস্ততঃ করেছি। পরে যথাস্থানে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়ে আলোচনা করব। বর্তমানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট—কার্তুজ না পেয়ে সেই দারুণ সঙ্কটে যখন পরিষ্কার একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল, তখন আমবা তা নিতে অক্ষম হয়েছি।

তরুণসাথীদের মনে দুর্জয় সাহস। তারা সার্বিক প্ল্যানের ধার ধারে না। তাদেব বহু দিনের স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে। তাদের হাতে নাই বা এলো ম্যাগাজিন রাইফেল, নাই বা তারা পারলো লুইস্‌গান ব্যবহার করতে। তারা প্রত্যেকে আজ পেয়েছে রিভলভার, মাস্কেট্রি ও তাতে ব্যবহারের জন্য প্রচুর কার্তুজ। তরুণ বিপ্লবীর হাতে মাস্কেট্রি ও রিভলভারের শক্তি যে কত প্রবল, কত দুর্জয়—কত শত্রুসংহারী —আমাদের দূরদর্শিতার অভাবে তখনও তা আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি। আমাদের তরুণ সাথীদের morale সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন ছিল না। যাদের হাতে দায়িত্ব—কেবল তারাই চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল—ভেবে যেন কিছু ঠিক করতে পারছিল না।

সবাই শুয়ে পজিশান নিয়ে শত্রুর প্রতীক্ষায় আছে। আমি চিন্তামগ্ন হয়ে এক কোণে বসে আছি। নবেশ রায় আমাকে এসে জানালো—"একজন লোক পাগলামির ভান করে এদিকে আসছিল; আমরা তাকে হাতকড়া পরিয়ে বেঁধে বেখেছি। মনে হচ্ছে সে পুলিসের লোক সাদা পোশাকে এসেছে—একে নিয়ে কি করবো।"

নরেশের প্রশ্ন শুনে আমার মনে হয়েছিল—সে আমার অভিমত চাইছে—লোকটিকে কঠোর সাজা বা প্রাণদণ্ড, কোন্‌টা দেওয়া হবে। আমি নরেশকে বললাম—"চল গিয়ে দেখি সে কে।"

ম্যাগাজিন কক্ষের একটি কোণে সে হাতকড়া পরা অবস্থায় বসেছিল। তাকে দেখে শাদা পোশাকে পুলিস বলেই মনে হ'ল—তবু তাকে কোনপ্রকার সাজা দেওয়ার ইচ্ছে হ'ল না—একজন ভারতীয় কন্‌স্টেবলের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি নি। নরেশকে বললাম—"থাক্ সে পড়ে। পরিচয় পেলে তাকে ছেড়ে দিও।"

সে তার কোন পরিচয় দেয় নি। তাকে ছেড়েও দেওয়া হয় নি। আমরা

পুলিস-লাইন ছেড়ে যাওয়ার পর সে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। সত্যি-মিথ্যা বিবরণ সে তার নিজমুখে দিয়েছে এবং আমাদের মামলার রায়ে জজসাহেব লিখেছেন—

"In the busti, Azim met constable Jogendra Ghosh who handed him a pair of handcuffs, saying, that the raiders had captived him and handcuffed him with them...He was returning to barracks about 10-30 p.m...at the wooden bridge in front of the magazine he was challenged and on hearing shouts of 'Bandemataram' threw his tunic and pagri behind him. Fifteen or twenty persons variously dressed and armed with pistols and torchlights surrounded him and questioned him. To the suggestion that he was a policeman he replied with a vehement denial. They then seized him handcuffed him...and threatened to kill him if he made the slightest noise. As he sat, he could hear sounds of firing outside and orders to load and re-load. Later on when all the noise had ceased, he ventured forth from the magazine and finding the raiders gone, sliped the handcuff off his right wrist and ran...The witness has demonstrated before us the Houdini-like facility with which he can slip his hands out of locked handcuffs..." (Judgement, Chittagong Armoury Raid Case).

—যার কথা আমি উল্লেখ করলাম তার নাম যোগেন্দ্র ঘোষ এবং সে একজন কন্‌স্টেবল। সে রাত সাড়ে দশটার সময় ব্যারাকে ফিরছিল। সে বলেছে, বিভিন্ন পোশাক-পরা বিশ-ত্রিশজন লোক পিস্তল ও টর্চ হাতে তাকে ঘিরে ফেলে। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি শুনে সে অবস্থা বুঝতে পারলো। ধোপাখানা থেকে সে তার পাগড়ি ও খাকী পোশাক ধুয়ে আনছিল। বিপদ বুঝেই সে সেগুলি তাড়াতাড়ি পেছন দিকে ফেলে দেয়। আক্রমণকারীরা পুলিস সন্দেহে তাকে প্রশ্ন করে। সে খুব জোরের সঙ্গে পুলিস নয় বলে প্রতিবাদ জানায়। যখন আক্রমণকারীব দল চলে গেছে বলে তার সুনিশ্চিত ধারণা হ'ল, তখন হাতকড়া থেকে তার ডান হাঁত টেনে বা'র করে নিয়ে সেখান থেকে সে পালায়। বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর হুডিনীর মত বদ্ধ অবস্থায় কি করে হাতকড়া মুক্ত হওয়া যায়—এই সাক্ষী (যোগেন্দ্র) আদালতে সর্বসমক্ষে তা প্রদর্শন করেছে।

বহু ঘটনার মধ্যে এইটিও একটি ঘটনা—তাই এইটিরও উল্লেখ করলাম। তা'ছাড়া লোকনাথ ও নির্মলদা আমাকে বলেছিলেন, আমরা প্রথম আক্রমণের

অনেক পরে তাঁদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করি। আমার নিজের মনে হয়েছিল পুলিস-লাইনের প্রাথমিক কতগুলি কাজ সেরে ছোট্ট দলটি নিয়ে আমি খুব দেরি হলেও আধ ঘণ্টার মধ্যেই ওঁদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছি। তবু যেহেতু লোকনাথরা বলেছিল, আমরা তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে অনেক দেরি করেছি এবং যেহেতু রণকৌশলেব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমি নিজেও মনে করি আধ ঘণ্টা দেরি করাও আমাদের পক্ষে অন্যায় হয়েছে, তাই আমি মনে মনে সব সময়ে সঙ্কোচ বোধ করেই এসেছি। সেইজন্য নিজের ত্রুটিই বেশি করে দেখতে চেয়েছি এবং বহুস্থানেই আগে বলেও এসেছি—A. F. I. আর্মারিতে পৌঁছতে আমাদের হয়ত প্রায় এক ঘণ্টা দেরি হয়েছে।

এখানে দেখছি কনস্টেবল যোগেন্দ্র বলেছে, সে বাত সাড়ে দশটার সময় ব্যারাকে ফিরছিল! মাস পাঁচ-ছয় সময়ের মধ্যে সে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং যেহেতু সে ব্যারাকে ফিরছিল তা'তে মনে হয় তার পক্ষে ঠিক সময়টি বলাই অনেক বেশী সম্ভব। এই বর্ণনা থেকে আমার মনে হয় আমরা A.F.I. আর্মারি দখলকারী দলের সঙ্গে আধ ঘণ্টার আগেই মিলিত হয়েছি। পুলিস-লাইন থেকে মোটরে A.F.I. হেডকোয়ার্টারে যেতে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগে না; আর আমি ছোট্ট দল সঙ্গে নিয়ে ওখানে পৌঁছবার পরে যোগেন্দ্র ধরা পড়ে ও বন্দী হয়।

পুলিস-লাইনে আমাদের অনেক সময় কেটে গেল। কিসের প্রতীক্ষায় সময় কাটাচ্ছি? কেন তখনও positive, সুনিশ্চিত, সুস্পষ্ট ও সক্রিয় সামরিক সিদ্ধান্ত নিলাম না? প্রধান-ঘাঁটি সব আমাদের দখলে, টেলিফোন-ভবন বিধ্বস্ত—টেলিগ্রাফ-লাইন বহির্জগৎ হ'তে বিচ্ছিন্ন, দু'টি স্থানে রেল-লাইন ধ্বংস করা হয়েছে, পুলিস কনস্টেবল সব প্রাণভয়ে পালিয়েছে—আমরা জয়ের আমেজে ছিলাম! ম্যাগাজিন রাইফেলের কার্তুজ না পেয়ে যতখানি চিন্তিত হয়েছিলাম ততখানিই আবার আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যেই মগ্ন ছিলাম বলে মনে হয়। আমরা কার্তুজ পাই নি বটে—তারাও তো রাইফেল ও লুইস্‌গান পাবে না। আমাদের কাছে রাইফেল ও লুইস্‌গান যেরূপ অকেজো হয়ে রইল তাদের হেপাজতে কার্তুজও সেইরূপ অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকবে। সৈন্য ও অস্ত্রবল ছাড়া—টেলিফোন ব্যবহারেও বঞ্চিত গুটিকতক ইংরেজ ও উচ্চপদস্থ ভারতীয় কর্ম্মচারী আমাদের বিরুদ্ধে প্রতি আক্রমণের জন্য কতখানি শক্তি সঞ্চয় করেতে পারবে?

মূর্খ আমরা—সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে সচেতেন ছিলাম না। বিনা মেঘে যেন বজ্রঘাত! এ কি? ট্যাট্ ট্যাট্ ট্যাট্। খুব নিকট থেকেই লুইস্‌গান ফায়ার হচ্ছে! অবিরাম ধারায় গুলী চলছে! আর্মারির অবস্থান শত্রু পক্ষের জানা। সেইদিক লক্ষ্য করে তারা খুব কাছাকাছি গোপন

স্থান থেকে মেসিনগান চালাচ্ছে। ঝড়ের মত গুলী এসে আমাদের আশে-পাশে, মাঠে, গাছে, টিলার গায়ে, আর্মারি, গার্ডরুম ও ম্যাগাজিন গৃহের জানালা দরজা ও দেওয়ালে লাগছে। আমাদের সবার position শোয়া অবস্থায় ছিল। টিলাটি খুব বড় নয়। তাই প্রায়োজন মত আমরা extension order-এ ছিলাম না। প্রত্যেকের মধ্যে এক হাত ব্যবধানও ছিল কি না সন্দেহ। যখন হঠাৎ আমাদের চমকে দিয়ে খুব কাছথেকে শত্রুপক্ষ মেসিনগান ফায়ার সুরু করলো, তখন আমাদের মধ্যে দু'তিন জন দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল—তাদের মধ্যে আমিও একজন। ফায়ার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা শুয়ে অথবা দেওয়াল বা চৌবাচ্চার আড়ালে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করলাম।

কখন শত্রুপক্ষ গোপনে এসে position নিয়েছে তা' আমরা জানতে পারি নি। কোথায় তারা অবস্থান করছে তারও সঠিক হদিস পাই নি। শব্দ লক্ষ্য করে আমরা ভেবেছি পূর্ব-দক্ষিণ কোণে ওয়াটার-ওয়ার্কসের দিক থেকে গুলী আসছে—বজ্রকণ্ঠে আমাদের মধ্যে থেকে হুকুম হল—"Aim Water Works—Rapid fire !"—'ওয়টার' ওয়ার্কস লক্ষ্য করে দ্রুত গুলী চালাও।' আমাদের চৌষট্টিটি মাস্কেট্রি একসঙ্গে গর্জন করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রনির্ঘোষে 'বন্দেমাতরম্,' 'ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ' প্রভৃতি রণরোল ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে মাস্কেট্রি ও লুইস্‌গানের আওয়াজ ডুবিয়ে দিল। জানি না সাম্রাজ্যবাদী ফিরিঙ্গীর দল তাতে কতখানি বিচলিত হয়েছিল—কতখানি আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিল। তাদের হৃৎস্পন্দন কি ক্ষণিকের জন্যও বন্ধ ছিল? রক্তপ্রবাহের তীব্র চাপে তাদের কি দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটেছিল? আমাদের Volley fire ও সমস্বরে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি শুনে তাদের হাত কি থর থর করে কাঁপেনি? নইলে চাঁদমারি অভ্যাস করা শিক্ষিত হাতের একটি গুলীও আমাদের কাউকে স্পর্শ করল না কেন?

আমাদের মামলার জাজ্‌মেণ্টে থেকে উদ্ধৃত করছি—

"...They could also hear occasional shots from there so they decided to approach through the Water Works componnd. From the north-west corner of the compound they could see a light from the armoury and figures moving about. So from there Mr. Johnson ordered Barracklough to open fire in short bursts with Lewis-gun. This evoked an intesive fire from the diretion of the armoury and magazine. Most of the bullets passed over their heads but as several came uncomfortably close to them and the position was very exposed, they withdrew to the roof of the Water Works

Engineer's bunglow…" (Judgements, Chittagong Armonry Raid Case).

সেখান থেকে সাহেবের দল বন্দুকের শব্দ শুনেছিলেন। তাই তাঁরা ওয়াটার-ওয়ার্কস কম্পাউণ্ডের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হওয়াই সাব্যস্ত করলেন। ওয়াটার-ওয়ার্কসের উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে আর্মারি এলাকায় তাঁরা আলো দেখতে পান ও কয়েকজন লোককে ঘুরে বেড়াতেও দেখেন। মিঃ জনসন, ব্যারাক্‌লো সাহেবকে ঐদিক লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়তে বলেন। এই গুলীবর্ষণ বিপ্লবীদের উত্তেজিত করে তোলে। তাঁরা আরও তীব্রভাবে আর্মারি ও ম্যাগাজিনের দিক হতে ফায়ার সুরু করে। বেশির ভাগ গুলীই সাহেবেদের মাথার উপর দিয়ে চলে যায় কয়েকটা গুলী তাদের আশে-পাশের স্থানে আঘাত করে। অবস্থা নিরাপদ নয় মনে করে তাঁরা ওয়াটার-ওয়ার্কস ইঞ্জিনীয়ারের বাংলোর ছাদের উপরে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করেন।

আমাদের মাস্কেট্রির গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তাঁদের মাথার উপর দিয়ে গেছে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ, আমরা সবাই আন্দাজে শব্দ লক্ষ্য করে blind fire করেছি—তাই গুলী ব্যর্থ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের এখানে আলো ও কয়েকজন মানুষকে ঘুরে বেড়াতে দেখেও আর্মারি লক্ষ্য করে পাকা শিক্ষিত হাতে লুইস্‌গান ফায়ার করা সত্ত্বেও আমাদের কাউকে স্পর্শ না করে সব গুলী মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়াটা অনেক বেশি আশ্চর্যের। আগে আমি একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি—'তোমাদের তো ইংরেজদের হত্যা করবার সিদ্ধান্ত ছিল, তবে মিঃ ব্ল্যাকবার্ন, মিঃ মোরশেদ প্রমুখ ইংরেজেরা নিস্কৃতি পেলেন কি করে?' তার উত্তরে বলেছি—যুদ্ধক্ষেত্র ও চাঁদমারি প্র্যাকটিস্‌ এক জিনিস নয়। আমরা প্রায় তিন-চারশ' ফায়ার করেছি। তাঁরা লুইস্‌গানে প্রায় তিনটি ম্যাগাজিন ব্যবহার করেছেন, ১৪১ রাউণ্ড ফায়ার করেছেন—কিন্তু সবটাই ব্যর্থ হয়েছে।

আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে গুলী ছুঁড়েছি। আমাদের রণহুঙ্কার এক মুহূর্তের জন্যও স্তব্ধ হয় নি। শত্রুপক্ষ বুঝেছিল তাদের লুইস্‌গান তরুণ বিপ্লবীদের প্রচণ্ড শক্তির কাছে ব্যর্থ হবে। তা'রা রণে ক্ষান্ত হ'ল। কিন্তু তা'রা আবার আক্রমণ করতে চেষ্টা করবে না, এটা আমরা ভাবিনি। তবে তাদের অস্ত্র ও সৈন্যবল কোথায়? A. F. I. হেডকোয়ার্টারের অধীনস্থ পাহাড়তলী ও ডবলমুড়িং জেটীর আর্মারি থেকে তারা বড় জোর দু'টি লুইস্‌গান আনতে পারে। তা'ছাড়া ম্যাগাজিন রাইফেল বা লুইস্‌গান তাদের আর কোথাও ছিল না। সামান্য দু'একটা লুইস্‌-গান নিয়েই মাত্র গুটিকতক ইংরেজ আমাদের প্রতি-আক্রামণ করেছে। তাদের বীরত্ব, সাহস, সামরিক অভিজ্ঞতা ও দায়িত্ববোধকে হেয় বা অবজ্ঞা করে নিজেকেই

প্রবঞ্চনা করা যায়—বাস্তব শিক্ষা নেওয়া হয় না। কিভাবে শুটিতক ইংরেজ একেবারে অসহায় অবস্থায়ও সীমিত শক্তি নিয়ে আমাদের প্রতি-আক্রমণ করতে এসেছিল তার বিবরণ আমি পরে লিখবো।

এই খণ্ডযুদ্ধ মিনিট চার-পাঁচ চলেছে। এই চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুই পক্ষে প্রায় ছয়শ' গুলীবর্ষণ হয়েছে। শত্রুপক্ষ একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেলে মাস্টারদা সাময়িক বিপ্লবী গণতন্ত্রী সরকার গঠন করে একটি proclomation দিলেন। ঘোষণাটি ইংরেজীতে লেখা ছিল, যার মর্ম নিয়ে লেখা হচ্ছে। প্রায় চার বছর আগে গণেশ, অম্বিকাদা ও আমি—তিনজনে মিলে যতদূর সম্ভব recaputulate করে এই ঘোষণাটি আমাদের স্মৃতি থেকে উদ্ধার করেছি। গণেশের হাতে লেখা এই ঘোষণাপত্রটি আমার কাছে আছে। সেইটি নিয়ে দিলাম। মাস্টারদা ঘোষণা করলেন—

"Dear soldiers of Revolution !

"The great task of revolution in India has fallen on the Indian Republican Army.

"We in Chittagong have the honour to achieve this patriotic task of revolution for fulfilling the aspirations and urge of our nation.

"It is a matter of great glory that today our forces have seized the strongholds of the Government in Chittagong. The enemy armoury has been captured ; the Central Telephone Exchange of the town has been destroyed ; external telegraphic communications have been snapped ; railway lines have been removed and goods trains have been derailed ; train communications have been cut off. The enemy force has been defeated. The oppressive foreign Government has ceased to exist. The National Flag is flying high. It is our duty to defend it with our life and blood.

"The Indian Republican Army declares today for universal information and recognition the end of predatory rule and control by the British Imperialist bandits on Indian soil in Chittagong.

"Chittagong is a tiny part of India, but it is hoped and expected the achievement of today will inspire and impel our

countrymen to do likewise everywhere in India and to free our entire Motherland from the unholy cluches of the British bandits before long,

"I, Surjya Sen, President of the Indian Republican Army, Chittagong Branch, do hereby proclaim the existing Council of the Republican Army in Chittagong to form itself into a Provisional Revolutionary Government to carry out the following urgent tasks :—

"(1) To defend and maintain the victory gained today ;

"(2) To extend and intensify the armed struggle for national liberation ;

"(3) To suppress the enemy agent within ;

"(4) To keep the criminals and looters in check ;"

"(5) And to take further course of action what this Provisional Revolutionary Government will decide later.

"This Provisional Revolutionary Government expects and demands full allegiance, loyalty and active co-operation from every true son and daughter of Chittagong. And desires sympathy and active support from all patriots and nationalists and from every person who has the well-being and liberation of India in his or her heart.

"With full confidence in victory in our holy war of liberation !

"No mercy to the British bandits !!

"Death to traitors and looters !!!

"Long live Provisional Revolutionary Government !!!

"BANDEMATARAM !"

বাংলা অনুবাদ মোটামুটি এইরূপ—

"প্রিয় বিপ্লবী সৈনিকবৃন্দ !

"ভারতের বিপ্লবের গুরুদায়িত্ব আজ ভারতীয় গণতন্ত্রীবাহিনীর উপর ন্যস্ত ;

"ভারতবাসীর অন্তরের বাসনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করবার জন্য আমরা স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে চট্টগ্রামে বৈপ্লবিক কর্ম সম্পন্ন করার গৌরব অর্জন করেছি।

"আজ বিশেষ গৌরবের কথা, আমাদের বাহিনী চট্টগ্রামে বৃটিশ সরকারের সুদৃঢ় ঘাঁটিগুলি অধিকার করেছে। শত্রুর অস্ত্রাগার অধিকৃত; শহরের কেন্দ্রীয় টেলিফোন-ভবন বিধ্বস্ত; বহির্জগতের সঙ্গে তারবার্তা বিচ্ছিন্ন; রেল-লাইন উৎপাটিত ও মালবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত। বাহিরের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। শত্রুর সেনাবাহিনী পরাস্ত। অত্যাচারী বিদেশী সরকারের অস্তিত্ব লুপ্ত। জাতীয় পতাকা আজ উচ্চে উড্ডীয়মান। জীবন ও রক্তের বিনিময়ে ইহাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।

"বিশ্বের গোচরার্থে ও স্বীকৃতির জন্য ভারতীয় গণতন্ত্রীবাহিনী চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী দস্যুর শাসন ও শোষণের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করছে।

"চট্টগ্রাম ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র অংশ। তবু আশা ও ভরসা করা যায় আজকের জয় বৃটিশ দস্যুর কবল হতে অচিরে ভারতমাতাকে মুক্ত করবার জন্য ভারতবাসীকে সারা দেশে অনুরূপ বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত করবার উৎসাহ ও প্রেরণা দেবে।

"ভারতীয় গণতন্ত্রীবাহিনী চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি আমি—সূর্য সেন, এতদ্বারা ঘোষণা করছি চট্টগ্রাম শাখার গণতন্ত্রীবাহিনীর বর্তমান পরিষদই সাময়িক বিপ্লবী সরকারে পরিণত হয়ে নিম্নলিখিত জরুরী কাজ সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে—

"(১) আজকের জয়কে সুনিশ্চিত করবার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে;

"(২) ভারতের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামকে আরও ব্যাপক ও তীব্র করে তুলতে হবে;

"(৩) আভ্যন্তরীণ শত্রুদের দমন করতে হবে;

"(৪) সমাজদ্রোহী ও লুণ্ঠনকারীদের শাসনে রাখতে হবে;

"(৫) এবং এই সাময়িক বিপ্লবী সরকারের পরবর্তী নির্দেশগুলি সম্পন্ন করতে হবে।

"আমাদের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার চট্টগ্রামে প্রত্যেক সাচ্চা তরুণ-তরুণীর কাছ থেকে সম্পূর্ণ বাধ্যতা, আনুগত্য এবং সক্রিয় সহযোগিতার আশা ও দাবি রাখে এবং দেশসেবকদের ও যাদের অন্তরে মুক্তিযুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত আছে, তাদের কাছ হতে সহানুভূতি ও সক্রিয় সাহচর্য প্রত্যাশা করে।

"মহান মুক্তিযুদ্ধে সুনিশ্চিত জয়ের অকুণ্ঠ বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করে চল আমরা সমস্বরে বলি—

"বৃটিশ দস্যুর প্রতি বিন্দুমাত্র করুণা নয়!

"বিশ্বাসঘাতক ও লুণ্ঠনকারী দল সমূলে নিশ্চিহ্ন হউক!!

"সাময়িক বিপ্লবী সরকার দীর্ঘজীবী হউক!!!

"বন্দেমাতরম্!"

মাস্টারদা ঘোষণাপত্রটি ধীরে ধীরে জোরের সঙ্গে পাঠ করলেন। ঘোষণাপত্রটি পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কম্যাণ্ড এলো—"In honour of our Provisionat Revolutionary Government—Three Rounds Fire!" আমরা পর পর তিনবার গুলী ছুড়লাম। বিউগল বেজে উঠলো! তারপর তিনবার জয়ধ্বনি দিলাম—'বন্দেমাতরম্!'

একটু আগেই শত্রুব তৎপরতাব প্রমাণ আমবা পেয়েছি। খণ্ডযুদ্ধে তারা পশ্চাদ-পসরণ করেছে—তাদের লুইস্‌গান নিস্তব্ধ। তবু শত্রু নিশ্চিহ্ন হয় নি বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কোন প্রমাণ তখনও আমরা পাই নি। মাস্টারদা আমার সামনে এসে বললেন—"মেশিনগানের বিরুদ্ধে আমাদেব মাস্কেট্রি কি করতে পাববে?" আমি কোন উত্তর দিলাম না—কেবল দাঁতে দাঁত চেপে চুপ কবে রইলাম। ইতিমধ্যে নির্মলদাও কাছে এলেন। তাঁর সেই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন—"ভাইরে ভাই, তারা ব্যায়াগ্‌গুণ ব্যাণ্ড বাজাইষারে mobilise হজ্জে!" (ভাইরে ভাই, ওরা সবাই ব্যাণ্ড বাজিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে)। এবারে আমি আব উত্তর না দিয়ে পারলাম না—"কি যে বলেন নির্মলদা!—কি নিয়ে তাবা mobilised হবে?" নির্মলদা আবার বললেন—"শুনছ না ব্যাণ্ড বাজছে? ঐ শোন—শোনা যাচ্ছে।" আমি অবশ্য তাঁর কথামত শুনতে চেষ্টা করেছি—ব্যাণ্ডের কোন শব্দ আমার কানে পৌঁছয়-নি, তা'ছাড়া ব্যাণ্ড বাজিয়ে mobilised হওয়ার পদ্ধতি আমার কাছে একেবারেই অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। যদি কোন ব্যাণ্ডের আওয়াজ আমি শুনতেও পেতাম, তবু নিঃসন্দেহেই তা কোন বিয়ের বাজনা বলেই মনে করতাম। নির্মলদার কথায় আবার আমি প্রতিবাদ করলাম—"আপনার যতসব উদ্ভট কল্পনা। শহরের টেলি-ফোন ব্যবস্থা নষ্ট হয়েছে, প্রধান অস্ত্রঘাঁটি আমরা ধ্বংস করেছি। এখনই কোন রকম বড় mobilisation করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বাজে চিন্তা ছাড়ুন।" আমি ও নির্মলদা বেশ জোরেই কথা বলছিলাম। সব কথা-বার্তাই গণেশ শুনছিল। মাস্টারদারও পায়চারি করতে করতে আবও তিন-চারবার কাছে এসে বলেছেন বা স্বগতোক্তি করেছেন—"মেশিনগানের কাছে আমরা আর কতক্ষণ? মাস্কেট্রি নিয়ে কতখানি কি করতে পারবো? আমাদের হাতে ম্যাগাজিন রাইফেল যদি থাকতো! লুইস্‌গান যদি একটিও ব্যবহার করতে পারতাম!" আমি তাঁর সব কথাই শুনেছি। চুপ করেই ছিলাম। ভাবতে চেষ্টা করছিলাম—তিনি কি বলতে চাইছেন! মনের মধ্যে কোন সঠিক উত্তর পাই নি।

মাষ্টারদা পায়চারি করতে করতে আমাকে এই সব বলেছেন জেনে অনেকের মনে হবে—মিনিট পাঁচ-সাত আগেও শত্রুপক্ষ থেকে মেশিনগানের গুলী চলেছে, তবু মাস্টারদা পায়চারি করছিলেন, তাও কি সম্ভব? কেবল মাস্টারদা নন—নির্মলদা,

অম্বিকাদা, আমি ও আরো কেউ কেউ বুকে শোয়া পজিশন থেকে বা আড়াল থেকে সরে এসে পায়চারি করছিলাম। অতর্কিতে আবার মেশিনগান চলতে পারে—এইরূপ ধারণা থাকা সত্ত্বেও, কি জানি কেন, সেইদিকে আমাদের ভ্রুক্ষেপ ছিল না। আমার নিজ মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়, তাঁরাও অতর্কিত শত্রু-আক্রমণের কথা ভেবে খুব বিচলিত বোধ করছিলেন না।

মাস্টারদা শেষবারের মত বললেন—"মেশিনগানের বিরুদ্ধে আমাদের মাস্কেট্রি কি করতে পারবে?" ঠিক সেই সময়ে আবার শত্রুর মেশিনগান গর্জন করে উঠলো—ট্যাট্ ট্যাট্ ট্যাট্! সেই একই দিক থেকে যেন গুলী আসছিল! জানি না কেন, সেবারেও আমাদের অনেককে দাঁড়ানো অবস্থায় পেয়েও শত্রুর গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল! মুহূর্তে যে যেখানে পারলাম শুয়ে পড়লাম বা শক্ত আড়ালের পেছনে আশ্রয় নিলাম। আমি আর্মারির একটি পিলারের পেছনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হই। দ্বিতীয়বার শত্রুর অতর্কিত আক্রমণের প্রত্যুত্তরে আমাদের পক্ষ থেকে volly fire ও মুখে অনবরত "বন্দেমারতম্" ও "ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ" ধ্বনি চল্‌লো। আমাদের তুলনায় শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অনেক কম, কিন্তু তাদের আছে লুইস্‌গান; আব আমরা তাদের সেই মেশিনগানের অজস্র গুলীবৃষ্টির জবাব দিচ্ছি মাস্কেট্রি দিয়ে। তবু বেচারা ইংরেজগোষ্ঠী কি আর করে!—"at this juncture, Mr. Farmer ordred Mr. Johnson to go back to the A.F.I. armoury for more ammuniiton." (Judgement, Chittagong Armoury Raid Case).

সাহেবদের কার্তুজ ফুরিয়ে গেল। কাজেই তাদের আবার যুদ্ধ বন্ধ করতে হ'ল। মামলা চলাকালীন সরকারী সাক্ষীদের ভাষ্যে জানতে পেরেছি—সেই ইংরেজ দলটি সেখানে আর বেশিক্ষণ ছিলেন না। খুবই স্বাভাবিক, সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিলেন সেখানে বসে থাকলে তাঁদের বিপদের আশঙ্কা আছে! তারা স্বভাবতই ভেবেছিলেন—আমরা যখন টিলার ওপর থেকে volly fire চালাচ্ছি, তখন হয়ত আমাদের আর একটি ছোট্ট দল হামাগুড়ি দিয়ে লুকিয়ে তাঁদের সামনে উপস্থিত হবে। এইরূপ একটি সম্ভাব্য আশু বিপদাশঙ্কায় সেখানে থেকে প্রস্থান করাই তাঁরা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছিলেন। মিঃ লুইস্ আমাদের মামলা চলাকালে একদিন টিফিনের সময় কথায় কথায় আমাকে এই কথাগুলি বলেছিলেন; সেই দিন মিঃ লুইসের কাছে এই কথাগুলি জানতে পেরে নিজকে আমি শতবার ধিক্কার দিয়েছি। সত্যই—সামরিক কৌশল অনুযায়ী আমাদের যা করা উচিত ছিল, আমরা তা করি নি—আমাদের সাহস ও চরম আত্মবলির অভিপ্রায় সম্বন্ধে যদি কোন

প্রশ্ন নাও আসে, তবু আমাদের সামরিক জ্ঞানের অভাব অস্বীকার করা যায় না।

এবারেও প্রথম খণ্ডযুদ্ধের মিনিট দশ পরে তারা আমাদের আক্রমণ করে আবার ব্যর্থ হ'ল। মেশিনগান আবার একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আশ্চর্য! এবারেও আমাদের কারও গায়ে একটি আঁচড়ও লাগলো না।

এখন আমাদের কি কর্তব্য? আর দেরি করা যায় না। শত্রুপক্ষ যত বেশি সময় পাবে—তত বেশি সুযোগ নেবে। হুকুম হ'ল—"পেট্রোল ঢালো—আগুন দাও!" হিমাংশু ও তার সঙ্গে আরও একজন চারিদিকে পেট্রোল ছড়াতে লাগলো। আবার হুকুম হ'ল—"টিলার নিচে নেমে যাও"। সবাই পুলিস-লাইনের উত্তর-পূর্ব দিক হতে টিলার নিচে নেমে এলো। টিলার দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে শত্রুপক্ষের গুলী আসছিল সেই জন্য উত্তরপ্রান্তে নেমে আসাই যুক্তিযুক্ত। আমাদের দৃষ্টির আড়ালে দক্ষিণপ্রান্তের কোন এক স্থানেই যে তারা মেশিনগান বসিয়েছিল তাতে একটুও সন্দেহ নেই।

নেমে আসার আগে আর একটি হুকুম হ'ল—"যে বন্দী অবস্থায় আছে তাকে ছেড়ে দাও।" সে মুক্তি পেল। আবার আদেশ হ'ল—"লুইস্‌গান তিনটি ভেঙে ফেল।" সঙ্গে সঙ্গে দমাদম হাতুড়ির ঘায়ে লুইস্‌গান তিনটি চুরমার হয়ে গেল।

এবারে হিমাংশু পেট্রোলে আগুন দেবে। সারা আর্মারি, গার্ডরুম ও ম্যাগাজিনরুমে খুব ভালো করে পেট্রোল ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় যে কোন স্থানে আগুন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব জায়গায় পেট্রোলের surface-এ দপ করে একই সাথে আগুন ধরে যাবে। পেট্রোলের মত দাহ্য পদার্থের এইরূপ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে প্রায় সকলকেই বলা হয়েছিল। যারা আগুন ধরাবার জন্য নিযুক্ত হবে তাদের আরও বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, কি করে নিজেকে বাঁচিয়ে দূর থেকে পেট্রোলসিক্ত স্থানে আগুন লাগাতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে রিভলভার বা বন্দুকের গুলীতেও দপ্‌ করে পেট্রোলে আগুন জ্বলে ওঠে। তা ছাড়া অব্যর্থভাবে দূর থেকে অগ্নিসংযোগ করতে হলে ছোট্ট একটি আগুনের বল ছুড়ে দিলে বিস্তৃত পেট্রোলসিক্ত স্থানে মুহূর্তেই যে আগুন জ্বলে উঠবে, তা সকলের মত হিমাংশুরও খুব ভালোভাবে জানা ছিল। তবু অতি উৎসাহী যুবক হিমাংশু উদ্দীপনার মাথায় অতি প্রাথমিক নিয়মটিই ভঙ্গ করে পেট্রোলসিক্ত আর্মারি প্রাঙ্গণে দাড়িয়ে ম্যাচ জ্বালিয়ে আগুন ধরাতে গেল। টিলার ওপর বিস্তৃত স্থান জুড়ে আর্মারি, গার্ডরুম, ম্যাগাজিনরুম, সব ক'টিতেই একসঙ্গে দপ্‌ করে একটি জোর শব্দ হয়ে আগুন জ্বলে উঠলো। হিমাংশুর পোশাক পেট্রোলে বেশ ভিজে ছিল—খুব অসাবধানতার

সঙ্গেই সে বিস্তৃত স্থানে পেট্রোল ছড়িয়েছে। তাছাড়া পেট্রোলসিক্ত এলাকা হতে নিরাপদ স্থানে সরে এসে দূরে দাঁড়িয়ে একটি ছোট্ট অগ্নিগোলক ছুঁড়ে দিলেই আর কোন আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু তা' আর হ'ল না—অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে ভাগ্যদেবী হয়ত বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদী শত্রুর দিকে পক্ষপাতিত্ব করলেন—আমাদের কোন ক্ষতি হবে না, একেবারে অক্ষতদেহে চলে আসব, তা যেন তাঁর আর সহ্য হ'ল না! যাই হোক্, ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না ছিলেন কি ছিলেন না তা অদৃষ্টবাদীদের গবেষণার বিষয়, আমার অভিমত হিমাংশু এইরূপ অসাবধানতার সঙ্গে আগুন দিল বলেই হিমাংশুকে তার শাস্তি পেতে হ'ল। দপ্ করে যেমন সমস্ত আর্মারিতে আগুন জ্বলে উঠলো ঠিক তেমনি হিমাংশুর সমস্ত পোশাকেও চক্ষুর পলকে আগুন ধরে গেল। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে একটি মানুষের সাইজের বৃহৎ একটি মশাল যেন জ্বলে উঠ্‌লো। হিমাংশুকে আর দেখা যাচ্ছিল না। প্রজ্বলিত একটি বৃহৎ অগ্নি-মশাল যেন দিশেহারা হয়ে এদিক-ওদিক ছুটছে। হিমাংশুর আর্তনাদ শুনতে পেলাম। নরেশ ও বিধু দু'জনেই সদ্য পাশ করা ডাক্তার। তারা হিমাংশুর কাছে ছুটে গেল। আগুন নেভাবার সহজ কোন উপায় ছিল না। অন্য কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় বলে তারা হিমাংশুকে মাটিতে শুয়ে গড়াতে বলল। হিমাংশু তাই করে এবং তারাও তাকে তার পোশাকের আগুন নেভাতে সাহায্য করে। আগুন অবশ্য নিভে গেল, কিন্তু প্রায় এক মিনিট ধরে হিমাংশু দগ্ধ হ'ল—ক্ষত কতখানি গুরুতর তা তখনও আমি আন্দাজ করতে পারি নি।

এই শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটবার কয়েক মিনিট আগে আমি শেভ্রোলে গাড়িটি স্টার্ট দিয়ে আর্মারির টিলার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে নিয়ে এসেছি। গণেশের খুব জ্বর। তাকে সঙ্গে করে গাড়িতে নেব এবং নতুন গাড়িটিও আমাদের সঙ্গে রাখা প্রয়োজন মনে করি। হিমাংশু ছুটে এসে গাড়ির পেছনের সিটে উঠে পড়লো ও তার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ এবং মাখনও গাড়ীতে এসে উঠলো, গণেশ আমার পাশে। গাড়িটি চালাচ্ছিলাম আমি। ওয়াটার-ওয়ার্কসের উত্তরপ্রান্তের কম্পাউণ্ড ঘুরে যে রাস্তাটি শহরের দিকে গেছে সেই পথেই আমি গাড়ি নিয়ে খুব ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম। হেড্-লাইট জ্বালানো ছিল। রাস্তাটি খুব ভাঙ্গাচোরা, ইচ্ছে করলেও জোরে গাড়ি চালাবার উপায় ছিল না—তা'ছাড়া যেহেতু এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা, তাই লাইট নিভিয়ে অগ্রসর হওয়াও সম্ভব ছিল না।

মাস্টারদা, অম্বিকাদা ও নির্মলদা প্রধান দলের সঙ্গে রইলেন। তাঁরা তিনজনেই সার্বিক প্ল্যানটি জানতেন—আমাদের শহরে আসতে হবে। চৌষট্টিজনের খাবারের অর্ডার দেওয়া ছিল মকলেশ্বর রহমানের রেস্তোরাতে। এ ছাড়া মোটর গাড়ি নিয়ে হেড্-লাইট জ্বালিয়ে আমরা যে শহরের দিকে এগিয়েছি' তার নির্ভুল পথ নির্দেশ

তাঁরা পেয়েছেন। আর গাড়ি নিয়ে শহরে যাওয়ার অর্থ মাত্র একটি—পূর্ব-নির্ধারিত প্ল্যান কার্যে পরিণত করা। গাড়ি নিয়ে আত্মগোপন করা যায় না—সকলের জানা ছিল নিরাপদে আত্মগোপন করার মত সন্দেহাতীত স্থান শহরে আমাদের ছিল না। কারণ, সব বাড়িগুলি এবং সেই সব বাড়ির ছেলেদের পুলিস আমাদের দলের ছেলে বলে চিনতো। এই কারণে আমরা, অন্তত আমি, এক মুহূর্তের জন্যও ভাবি নি যে সমস্ত দলটি আমাদের অনুসরণ করে শহরে আসবে না।

শহরের উত্তরপ্রান্তে প্যারেড গ্রাউণ্ডের কাছে আনন্দের বাড়ির টিলার নিচে হিমাংশুকে নামিয়ে দিলাম। হিমাংশুর বাড়ি আনন্দদের বাড়ির খুব কাছে। গাড়িতে হিমাংশু পেছনের সিটে ছিল, তাই আমি তাকে ভাল করে দেখি নি বা তার গোঙানির কোন আওয়াজও আমার কানে আসে নি। নিজ ভুলের জন্য হিমাংশুর হয়ত পরিতাপের সীমা ছিল না। সেই কারণেই বোধহয় আগুনে পোড়ার জ্বালাও সে মুখ বুজে সহ্য করছিল। তাকে যখন গাড়ি থেকে নামিয়ে দিলাম তখন সামান্য বৈপ্লবিক বিদায় অনুষ্ঠান বা কোনরূপ বিদায়-অভিনন্দনও কেউ কাউকে জানালাম না। সেইরূপ একটি যুদ্ধের আবহাওয়ায়—প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা, শত্রুর অতর্কিত আক্রমণের প্রতীক্ষা, মৃত্যুর করাল ছায়া যখন চোখের সামনে ভাসতে থাকে, যখন আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের নানা বিষয় ও ধাঁধা মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, তখন মনের সকল প্রকার কোমল আকর্ষণ, স্নেহ, ভালবাসা—সব যেন দূরে সরে যায়। নাগারখানা পাহাড়ে পটাসিয়াম সায়ানাইড খাওয়ার পর মাস্টারদা ও অম্বিকাদাকে যখন মৃত অবস্থায় ফেলে এলাম, তখনও চোখের জল পড়ে নি। রাজেন দাসও চিরবিদায় জানিয়ে নাগারখানা পাহাড়ের কোলে শুয়ে পড়লো—তবু একটি দীর্ঘশ্বাসও ফেলি নি। ফেণীস্টেশনে ফায়ারিং-এর মুখে আনন্দ, মাখন ও গণেশের সঙ্গ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে একা একা পথ চলার সময় তাদের সমূহ বিপদের কথা ভেবেও নীরব কান্নায় আমার বুক ভেঙে যায় নি। মনে হয় রণ-প্রাঙ্গণের ভয়াবহ দৃশ্য বা যুদ্ধক্ষেত্রের আসন্ন বিপদের চিন্তা মানুষের হৃদয়ের সুন্দর সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে বোধহয় সাময়িকভাবে বিনষ্ট করে ফেলে।

হিমাংশুকে গণেশ, আমি বা মাখন কেউই তেমন কিছু সান্ত্বনা দিলাম না—বিদায় সম্ভাষণও জানালাম না। হিমাংশু নীরবে নেমে গেল। তার সঙ্গে আনন্দও নেমে পড়লো। এতক্ষণ আমি নিঃশব্দে গাড়ি চালাচ্ছিলাম। আনন্দের গাড়ি থেকে নেমে পড়া উচিত হয়েছিল বা হয় নি, তা' নিয়ে আমি গবেষণা করবো না। আমার কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—আমি কেন তাকে গাড়ি থেকে নামতে নিষেধ করি নি?

আমার দৃঢ় মত, কোন দ্বিধা মনে না রেখে আনন্দকে তখন আমার পরিষ্কার একটি নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিল। তা' আমি দিতে পারি নি। এইটি আমার অক্ষমতা বলেই আমি মনে করি।

তাদের দু'জনকে নামিয়ে দিয়ে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চললো। ইতিমধ্যে, বলাই বাহুল্য, শত্রুপক্ষ ক্ষুদ্র দলে সংগঠিত হয়েছে। তার প্রমাণ আমরা পুলিস-লাইনে কিছু আগেই পেয়েছি। লুইস্‌গান দিয়ে তারা আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের পক্ষে ভাবা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে, জেলা-কর্তৃপক্ষ তাদের শক্তি অনুযায়ী সংগঠিত হতে চেষ্টা করছে এবং সেই কারণেই যে-কোন সময়ে আকস্মিকভাবে শহরের রাস্তায় তাদের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হতে পারে। বিপদ ও নানারূপ আশঙ্কার কারণ বর্তমান জেনেও আমরা সোজা শহরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। জেলা-শাসকের বাড়ির পাহাড়ের অনতিদূরে আমাদের নিজ বাড়ি। সন্ধ্যার সময় মা-বাবার কাছ হতে বিদায় নিয়ে এসেছি। তাঁরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য তোড়জোড় করছেন দেখে এসেছি। ভেবেছিলাম বাড়ি নিশ্চয়ই খালি থাকবে। আমরা খুব ক্লান্ত। পিপাসায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। গাড়িটি সোজা বাড়ির কম্পাউণ্ডের ভেতর নিয়ে গেলাম। শাসকগোষ্ঠীর কারও সাথে দেখা হ'ল না। অবশ্য সব রকম অবস্থার জন্যই প্রস্তুত ছিলাম। শহর কিন্তু একেবারে খালি। আকস্মিক বিপদের সম্মুখীন হওয়া খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে শাসকবর্গ তাদের চূড়ান্ত পরাজয় হয়েছে বুঝতে পেরে আত্মরক্ষার জন্য যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তাতে কোন সন্দেহ ছিল না।

নিজের বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখি কেউ নেই—বাড়ি একেবারে নির্জন। সব ঘরগুলিতে তালা দেওয়া। কেবলমাত্র রান্নাঘরটিতে তালা ছিল না। রান্না ও খাবার ঘরে ঢুকে কিছু খাবার পাওয়া যায় কিনা দেখলাম। যতদূর মনে পড়ে কিছুই ছিল না। ক্ষুধার চেয়ে তৃষ্ণাই প্রবল ছিল। গ্লাসে গ্লাসে জল খেলাম। তারপর পরিশ্রান্ত হয়ে রান্নাঘরের সিঁড়ির ওপর বসে পড়লাম।

আমরা আসবার পর প্রায় চল্লিশ মিনিট অতিবাহিত হতে চললো। কিন্তু আমাদের প্রধান-বাহিনী তখনও এসে পৌঁছলো না। খুব অবাক লাগলো—নিশীথের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে 'বন্দেমাতরম্‌', 'ইনক্লাব' ধ্বনিতে তখনও চট্টগ্রাম শহর মুখরিত হয়ে উঠছে না কেন? কেন বন্দুকের শব্দ শুনতে পাচ্ছি না? কোথাও তাদের কোন অস্তিত্ব অনুভব করা যাচ্ছে না কেন? ক্রমেই আমরা অস্থির হয়ে পড়লাম। প্রায় এক ঘণ্টা হয়ে গেল তবু তারা শহরে এলো না। তবে গেল কোথায়? নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থেকে আর সময় অতিবাহিত করা সম্ভব নয়।

আমরা আমাদের সামরিক পোশাক পরিবর্তন করলাম। ভারী বুটপট্টি, লেগিং

ও খাকী পোশাক আমাদের বড়ই ক্লান্ত করে তুলেছিল। এই কারণে এবং আমাদের প্রধান-বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হয়ত অনেক খোঁজাখুঁজি করতে হবে, সেই হেতুও ভদ্র বাবুদের পোশাক পরিধান করে আমরা তিনজন আবার মোটরে উঠে পড়লাম। তখন রাত প্রায় তিনটে ; গাড়ি করে খুব তড়িদ্বেগে আবার পুলিস-লাইনের দিকে ছুটলাম। যে কোন আকস্মিক আক্রমণকে প্রতিহত করবার জন্য আমরা প্রত্যেকেই রিভলভার হাতে প্রস্তুত ছিলাম। মিনিট সাতেকের মধ্যেই পুলিস-লাইনের কাছাকাছি এসে পড়লাম। পুলিস-লাইন তখন প্রকাণ্ড এক অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছে। একনাগাড়ে কার্তুজ ফাটছে। প্রচণ্ড শব্দে কয়েকবার বারুদের বিস্ফোরণ হয়েছে পুলিস ম্যাগাজিনে বারুদ দিয়ে কার্তুজ ভর্তি করে নেবার ব্যবস্থা ছিল। তাই ব্ল্যাক-গানপাউডারে বোঝাই করা অনেকগুলি কাঠের বাক্স দেখতে পেয়েছিলাম। সেইগুলি দারুণ শব্দে ফেটে আগুন আরও ছড়িয়ে দিয়েছে। আগুনের ছটায় চারিদিক আলোকিত হয়ে গেছে। পুলিস-লাইনের আশে-পাশে অনেকদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। সেখানে কোথাও আমাদের প্রধান দলের অস্তিত্ব দেখতে পেলাম না। তাই আন্দাজে শহরের বাইরে উত্তর দিকের একটি কাঁচা রাস্তা ধরে মোটরের হেড্‌লাইট জ্বালিয়ে খুব ধীরে ও সতর্কতার সঙ্গে আমরা এগোতে লাগলাম। মনে করেছিলাম সুবিধেমত আশ্রয় নেওয়ার জন্য হয়ত তারা এই দিকে পর্ব্বত শ্রেণী লক্ষ্য করে চলেছে। আর আশা ছিল, হয়ত তারা আমাদের দেখতে পেয়ে সঙ্কেত দিয়ে ডাকবে—সংযোগ স্থাপন করবে।

নিজেদের অক্ষমতাকে ঢাকবার জন্য ভাগ্যকে দোষারোপ করে আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়। আমাদের মোটরের হেড্‌লাইট কি তারা দেখতে পায় নি? অত রাত্রে সেই নির্জন পথে কার বা কাদের মোটরগাড়ি অত ধীরে সেই কাঁচা পথ ধরে চলেছিল—এই প্রশ্ন কি তাদের মনে জাগে নি? গুটিকতক ইংরেজের পক্ষে খোলা রাস্তায় লাইট্ জ্বালিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব জানিয়ে দিয়ে অতজন বিপ্লবীর অন্বেষণে যাওয়া কি সম্ভব? হায় রে! তবু উনষাট জন বিপ্লবী আমাদের মোটর দেখতে পেয়েও সংযোগ স্থাপন করল না কেন, বিশ্লেষণ করে তার জবাব কে দেবে? তারা আমাদের মোটর দেখতে পেয়েও শত্রুর মোটর বলে ভুল করে মাঠে শুয়ে পড়ে পজিশন নিয়েছিল। এই তথ্য আমরা পরে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে জেনেছি।

আমাদের গাড়ি সেই কাঁচা রাস্তা ধরে প্রায় চার মাইল এগিয়ে গেল। তাদের কোন হদিসই পেলাম না। কোথায় যাব? কোন্ দিকে তারা গেছে? এমন কি হতে পারে যে, ইতিমধ্যে অন্য কোন রাস্তা ধরে তারা শহরে প্রবেশ

কিল্লার প্রধান রাজপথ ধরে বসিরহাট পুলিশ-বিট, জেলখানা, কোতোয়ালি ও গুপ্ত পুলিশ বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর সাবদারবাবুর বাড়ির গা ঘেঁষে আমরা ফিরিঙ্গী-বাজারের দিকে এলাম। তখন প্রায় ভোর সাড়েচারটে—কিছুক্ষণের মধ্যেই সকাল হবে। একটি দু'টি কাক ডাকতে সুরু করেছে।

আমরা ফিরিঙ্গীবাজারের শেষপ্রান্তে নদীর ধারে এসে উপস্থিত হলাম। সারা শরীর ক্লান্তিতে ভরা। মানসিক ক্লান্তি আরও অনেক বেশি অনুভব করছিলাম। হ'ল কি? সার্বিক প্ল্যান রূপ গ্রহণ করলো না! এতক্ষণে বিপ্লবী সরকার শহরের বুকে বসে বিপ্লবী প্রোগ্রাম কাজে পরিণত করতো—জেলখানা অধিকার করে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হ'ত, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক হস্তগত করতাম, কোর্টমার্শাল আদালত স্থাপন করার কাজও বাকি থাকতো না। এই পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে আমাদের সার্বিক প্ল্যানের অঙ্গ হিসাবে ছিল। পরিতাপের বিষয় যে, তা' আর কাজে পরিণত হ'ল না।

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বিষয়ে Lenin-এর বিভিন্ন লেখা তখনও আমরা পড়ি নি। তবু সাধারণ বুদ্ধি ও সামান্য জ্ঞান যা' ছিল, তা' দিয়ে সেইদিন যা' বুঝেছিলাম তার আংশিক সমর্থন পরে লেনিনের লেখার মধ্যে পেয়েছি—"The release of prisoners from jail, the confiscation of government funds and necessity of speedy organisation of Courtmartial on the spot, are of considerable importance from the very outset."—Lenin.

সেই যুগের বিপ্লবী ইতিহাস লিখতে গিয়ে Lenin প্রমুখ মহান্ বিপ্লবী নেতাদের বৈজ্ঞানিক লেখা উল্লেখ করে অগ্নিযুগের যে অধ্যায়টি সম্বন্ধে আমি লিখছি, সে'টিকে অধিক জটিল করে নীরস করবার বাতুলতা আমার নেই। এই সম্বন্ধে আমি সচেতন, তবু লেনিনের লেখার সামান্য একটু উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারলাম না, কারণ, মাস্টারদার নেতৃত্বে আমরা বৈপ্লবিক তাগিদে যেরূপ সামরিক প্রোগ্রাম রেখেছিলাম তার ইঙ্গিত Lenin ১৯০৫ সালে লিখে গেছেন। আমাদের বিপ্লবী সরকারের সামরিক প্রোগ্রাম কাজে লাগলো না—সব যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

শহর একেবারে No man's land—ইংরেজ শাসকবর্গ পালিয়েছেন আর আমরা—যারা শত্রুর প্রধান প্রধান ঘাঁটি অধিকার করে সাময়িক বিপ্লবী সরকার ঘোষণা করেছি, তারাও শহরের ওপর অধিকার স্থাপন করলাম না—এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কি হ'তে পারে!

নদীর ধারে মোটরগাড়িটি পরিত্যাগ করে আমরা তিনজন একটি সাম্পান

রওনা হলাম। সেখান থেকে পতেঙ্গা প্রায় বারো-চোদ্দ মাইল হবে। ডবলমুড়িং জেটির পাশ দিয়ে নৌকো করে যাবার সময় আমাদের নদীর ধারের বাসাটি লক্ষ্য করে বুঝেছিলাম যে, মা-বাবা সেই বাসাও পরিত্যাগ করেছেন।

সকাল হয়ে এলো। পূব-আকাশ লাল করে সূর্য উঠছে। নদীর ঢেউগুলি সোনালি আভায় রাঙা দেখাচ্ছে। নদীবক্ষে নৌকোয় ভেসে ভোরের এই মনোরম সৌন্দর্য উপভোগ করবার মত মানসিক অবস্থা তখন কারও ছিল না। আজ থেকে দশ বছর পূর্বে কর্ণফুলী নদীতটে মাস্টারদার ছোট্ট কুটিরে যেদিন আমার প্রথম দীক্ষা হয়, সেইদিনও নদীতীরে দাঁড়িয়ে ভোরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি—মন ব্যগ্র ছিল একটি রিভলভার প্রাপ্তির আশায়। আজ অন্তরে রিভলভার বা আগ্নেয় অস্ত্রের অভাব বোধ করার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু যে নিদারুণ অভাবে অন্তর দগ্ধ হচ্ছে তার উপশম হওয়ার কি কোন সম্ভবনা আছে? আমাদের প্রধানদলের সঙ্গ না পাওয়ার অভাব যে কতখানি গভীরভাবে আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করেছে তা' আমরা ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।

১৯শে এপ্রিল আবার সূর্য উঠেছে। গতকাল ভোবে প্রভাত সূর্যকে নয়ন ভরে দেখেছি। মনে হয়েছিল শেষবারের মত সেই দেখা। কে জানত, আজও বেঁচে থাকব—আবার আজ পূর্ব-দিগন্তের নবারুণ দেখার সৌভাগ্য আমাদের হবে?

আমরা বিজয়ী! সাময়িক বিপ্লবী সবকার ঘোষণা কবেছি। চট্টগ্রামে ইংবেজ সবকারের অস্তিত্ব বর্তমানে লোপ পেয়েছে। এইরূপ একটি অনুকুল অবস্থায় আমাদেব প্রধান-বাহিনী শহরের উত্তরে পর্বতশ্রেণীর অন্তরালে আশ্রয় নিয়েছে—আর আমরা তিনজন—গণেশ, মাখন ও আমি, পতেঙ্গার সমুদ্রতীরে বিশ্রাম নিচ্ছি! এ যেন যুদ্ধ জয়ে সিংহাসন দখল কবে স্বেচ্ছায় তা ছেড়ে দিয়ে বনবাস গ্রহণ! এই করুণ পরিস্থিতির জন্য কে বা কারা দায়ী? এই প্রশ্ন স্বভাবতই সকলের মনে জাগবে। লেখার দায়িত্ব আজ যখন আমি স্বেচ্ছায় নিয়েছি, তখন এই জিজ্ঞাসার উত্তরও আমাকেই দিতে হবে!

কাকেও অসম্মান করা বা কারো প্রতি কোন কটাক্ষ করা আমার প্রভিপ্রায় নয়। তবু বাস্তব ঘটনার প্ররিপ্রেক্ষিতে যদি কিছু বলার একান্ত প্রয়োজন হয়, তবে ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে বিষয়বস্তুটিকে বোঝবার চেষ্টা করাই অধিকতর সমীচীন হবে বলে আমার বিশ্বাস।

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের পর থেকে বহুবার আমি একই ধরণের কতগুলি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। কিন্তু উত্তর বা সাফাই দিতে কখনও চেষ্টা করি নি—নীরব

আছেই, আমিই না হয় সবচেয়ে বেশি অপরাধী! এই ভেবেই কোন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি নি। আজও মুখ বন্ধ করে থাকতে আমার কোন আপত্তি ছিল না—তবে বাস্তব সত্য অনুদ্‌ঘাটিত থেকে যাবে—তাই যে ধরণের কয়েকটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি তার উল্লেখ করে আমার জবাব দিচ্ছি।

(১) হিমাংশু আগুনে পুড়ে যাওয়ার পর কেন আমি গুলী করে তাকে মেরে ফেলি নি?

(২) মোটরে আমরা চারজন হিমাংশুকে নিয়ে কেন শহরে এলাম?

(৩) আমরা কেনই বা গাড়ি করে শহরে গেলাম?

(৪) প্রধান-বাহিনী থেকে কেন আমবা বিচ্ছিন্ন হলাম?

সব কয়টি প্রশ্নই বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখলে খুব সত্যি বলেই মনে হবে; কিন্তু বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে এগুলির অন্তর্নিহিত অসারতা ধরা পড়ে, যেমন—

(১) কোন্ যুক্তিতে হিমাংশুকে গুলী করে মেরে ফেলা উচিত ছিল? সে বেঁচে থাকলে আমাদের কি কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিত? ভবিষ্যতে হিমাংশু কোন স্বীকারোক্তি দেবে কি দেবে না, তাতে আমাদের মাথা ঘামাবার কোন কাবণ ছিল না। আমাদের প্রোগ্রাম ছিল 'মৃত্যু'। সেই কারণেই আমরা নিজেদের বাডির গাড়ি ও license করা বন্দুক বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করেছি; নিজেদের বাডিতে ড্রাইভারকে বেঁধে রাখতেও কুণ্ঠিত হই নি; সেই রাত্রে একই ক্লাবের ছেলেদের একসঙ্গেই উধাও হওয়াও বিপজ্জনক মনে করি নি। তাই হিমাংশুকে মেরে ফেলার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। তা'ছাড়া, তারক ও অর্ধেন্দু বিস্ফোবণে গুরুতর দগ্ধ হওয়ার পর সংগঠনের নিরাপত্তার জন্য আমিই তাদের মেরে ফেলার প্রস্তাব কবেছিলাম। কিন্তু গণেশ সে সময়ে দৃঢ় ও সঠিক নেতৃত্ব দিতে পেবেছিল বলেই আমি একটি অমার্জনীয় বিচ্যুতির হাত হতে মুক্তি পেয়েছি—না হলে সারাজীবন ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেও বিপ্লবীদের কাছে মার্জনা পেতাম না। অর্ধেন্দু ও তারক দুজনেই আরোগ্যলাভ করে সুস্থ হয়ে উঠেছিল—পুলিস-লাইনে অর্ধেন্দু আমাদের পাশে উপস্থিত ছিল। যাকে মেরে ফেলার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলাম সেই অর্ধেন্দুই মেশিনগানের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। এই বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমার মানসিক প্রতিক্রিয়া যা হওয়া সম্ভব, তা উপলব্ধি করার বিষয়—বর্ণনা দিয়ে বোঝানো যাবে না। মহামূল্য অতীত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা আমাকে এমনভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল যে, হিমাংশুকে গুলী করার কথা আমার মনে এক মুহূর্তের জন্যও স্থান পায় নি। তা'ছাড়া গুলী করে হিমাংশুকে হত্যা করার প্রয়োজন কোথায়? তবু বহু লোক কেন যে এরূপ চিন্তা

কাহিনীতে এইরূপ তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন যে, স্বদেশী ডাকাতি করতে গিয়ে কোন ক্ষেত্রে নিজেদের সাথী ভীষণ আহত হয়েছেন—তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আসা সম্ভব নয়—এমন অবস্থায় নিজ সাথীর মুণ্ড কেটে নিয়ে তাঁরা চলে এসেছেন, পুলিসের পক্ষে তদন্ত করা যাতে সহজসাধ্য না হয়। এইরূপ লোমহর্ষক ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে রোমাঞ্চ অনুভব করা যায় সত্য, কিন্তু কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

(২) দ্বিতীয় প্রশ্ন—আমরা হিমাংশুকে নিয়ে চারজন কেন শহরে এলাম ?

আমি অত্যন্ত শারিরীক ক্লান্তি অনুভব করছিলাম। আর কেউ কি সেরূপ ক্লান্ত বা আমার চেয়ে অধিক পরিশ্রান্ত ছিল না ? তারাও নিশ্চয়ই আমার চেয়ে কম শ্রান্ত ক্লান্ত হয় নি। আমি তাঁদের ক্লান্তির কথা অস্বীকার করছি না। নিজের সম্বন্ধে বলতে হচ্ছে বলেই আমার শারীরিক ক্লান্তির কথা উল্লেখ করতে হ'ল। গাড়ি নিয়ে শহরে আসার প্রধান কারণ আমার শারীরিক ক্লান্তি। দ্বিতীয়ত, নুতন মোটরগাড়িটি আমাদের দলের সঙ্গে রাখা প্রয়োজন মনে করেছিলাম। তৃতীয় কারণ—গণেশের অসুস্থতা, তার খুব বেশি জ্বর ছিল ; পরের দিন সকালে তার সারা শরীরে জল-বসন্ত দেখা দেয়। তাই তাকে মোটরে তুলে নিতে হয়েছে। গাড়ি যখন স্টার্ট দিয়েছি তখন হিমাংশু দুর্ঘটনায় পুড়ে গেছে। কারো বলা কওয়ার অপেক্ষা না রেখেই হিমাংশু মোটরে উঠে বসলো। তার সঙ্গে আনন্দ ও মাখনও গাড়িতে উঠেছে। বিশেষ চিন্তা করে বা কারো সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন কাজ করা হয় নি। আপনা থেকেই এই সব ঘটেছে।

(৩) হিমাংশুকে দগ্ধ অবস্থায় শহরে নিয়ে আসার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের শহরে আসতে হবে বলেই গাড়ি নিয়ে এসেছিলাম ; এবং গাড়ি আনছি বলেই গণেশকে গাড়িতে তুলে নিলাম আর দগ্ধ অবস্থায় হিমাংশুকে নিয়ে আনন্দ ও মাখন গাড়িতে উঠে বসলো।

(৪) চতুর্থ প্রশ্ন—কেন আমরা প্রধান-বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম ?—"এটা আমাদের দুর্ভাগ্য" বলে প্রশ্নের উত্তর এড়ানো যায়। কিন্তু ভাগ্যকে দোষারোপ করে সান্ত্বনা হয়ত পাওয়া যায় কিন্তু অক্ষমতাকে ঢাকা যায় না। টিলার ওপর থেকে উনষাট-জন রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়েছে। তাদের গা ঘেঁষে আমাদের গাড়ি ধীরে ধীরে শহরের দিকে গেল। কারো ভুল হবার কথা নয় যে গাড়ি শহরে না গিয়ে অন্যত্র যেতে পারে। আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শহরে আসা ছাড়া অন্যত্র যাওয়ার কোন কথাই ছিল না। যুব-বিদ্রোহের পূর্বে সামরিক স্ট্র্যাটেজী অনুসারে আমাদের পাহাড়ে গিয়ে পজিশান নেওয়ার কথা কখনও আলোচনাও হয় নি। পূর্ব নির্ধারিত

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একবারও আমার মনে হয় নি যে, কোন অবস্থায়ই আমাদের প্রধান-বাহিনী শহরে না এসে পাহাড়ের দিকে চলে যাবে। কিন্তু সত্যই তারা পাহাড়ের দিকে চলে গেল—শহরে এলো না।

কিছুদিন পরে, মামলা চলাকালে যখন তাদের সঙ্গে জেলে আমাদের দেখা হয়, তখন প্রত্যেকের কাছে বিশদভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে চেষ্টা করেছিলাম, কে বা কারা শহর ছেড়ে দূরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বা কিভাবে তাঁরা পূর্ব পরিকল্পনা বাতিল করে নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন?

তাঁদের কাছে সব বৃত্তান্ত শুনে এই বুঝেছি—আমরা চলে যাওয়ার পর তাঁরা সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছেন; অম্বিকাদা, মাস্টারদা ও নির্মলদা তেমন গুরুত্ব দিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন নি। সবার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বুঝেছি ম্যাগাজিন রাইফেলের কার্তুজ না পেয়ে তাঁরা খুব দমে গিয়েছিলেন—অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় অম্বিকাদা অগ্রণী হয়ে সবাইকে বলেন—তাকে অনুসরণ কবতে। সবাই যন্ত্রচালিতেব মত অম্বিকাদাব পেছনে পেছনে গেলেন।

আমার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে—সমস্ত ঘটনা অবিকৃত রেখে উপরে লিখিত চারটি প্রশ্নেব উত্তর দিয়েছি। মোট কথা প্রধান-বাহিনী শহরে না আসার জন্য কার কতখানি দোষ বা কে কতখানি দায়ী, সে হিসাব কে নেবে এবং কি করেই বা নেওয়া যায়? আমি বন্ধুবান্ধবদের কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনেছি। আমার প্রতি কোন অশ্রদ্ধার ভাব না রেখেই তাঁরা অনুযোগ জানিয়েছেন—দল ছেড়ে শহরে চলে আসার জন্য আমিই প্রধানতঃ দায়ী এবং আমার জন্যই এই বিপর্যয় ঘটেছে।

এই অভিযোগের উত্তরে আমার বক্তব্য—প্রথমত, আমি ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করতে পারি নি যে, অসুস্থ গণেশ এবং অগ্নিদগ্ধ হিমাংশুকে নিয়ে আমরা গাড়িতে শহরের দিকে রওনা হবার পর প্রধানদলটি আমাদের অনুসরণ করে শহরে আসবে না। কারণ, শহরে আসা ছাড়া আমাদের আর কোথাও যাওয়ার কোন পরিকল্পনাই ছিল না। আরও একটা কথা, আমরা তো সাহস হারিয়ে ভীরুর মত দল ছেড়ে গ্রামে বা পাহাড়ে পালিয়ে যাচ্ছিলাম না, শত্রুর প্রধান ঘাঁটি শহরের দিকেই গিয়েছি এবং প্রধানদলের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য শহর এবং পাহাড়ের রাস্তায় তাদের খুঁজে বেড়িয়েছি। দ্বিতীয়ত, আমার একার চলে যাওয়ার জন্য এত বড় একটা পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে, নিজেকে এতটা গুরুত্ব দেওয়া আমি অহঙ্কার বলেই মনে করি। আমি যদি তখন দল ছেড়ে এসে অন্যায় করে থাকি, ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করে থাকি, তাহলে শহরে এসে মাস্টারদারা আমার বিচার করতে পারতেন, court martial

করে আমাকে প্রাণদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারতেন। আমার অপরাধের জন্য তাঁদের সহরে না এসে দূর পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার কি কোন যুক্তি আছে? প্রথম আক্রমণের সময় বা মেসিনগানের গুলীতে যদি আমার বা গণেশের মৃত্যু হ'ত, তবে কি আমাদের সমস্ত পূর্ব পরিকল্পনা বাতিল করে বিজয়ী দলের শহরে প্রবেশ না করে সুদূর পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়া সমর্থনযোগ্য হ'ত?

কেউ যদি সমস্ত বাস্তব ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ ও গবেষণা করার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন—গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং—এই দুজনের প্রধানদলের সঙ্গে সব সময় থাকা উচিত ছিল, প্রধান দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া তাদের মারাত্মক ভুল হয়েছে .এবং এই কারণেই এত বড় একটা বিপর্যয় ঘটেছে—যুব-বিদ্রোহ পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে নি, তাহলে, আমাদের দু'জনকে এইরূপ প্রাধান্য দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা বিচার করলে, আমার কিছুই-বলার থাকে না।

কি হলে কি হ'ত এবং বাস্তবে কেন ঐরূপ ঘটলো, এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি কোন ইতিহাসবিদ্ এইরূপ একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তবে তা যাই হোক্ না কেন, আমরা প্রধান দলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম না বলে শহরে না এসে তাঁদের পাহাড়ে চলে যাওয়ার অযৌক্তিকতা থেকে তাঁরা কোন মতেই মুক্তি পান না। 'কেন সেইরূপ ঘটলো'—এ হ'ল এক কথা—আর আমি বা আমরা কেন শহরে না এসে পাহাড়ে আশ্রয় নিলাম, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। আমাদের মধ্যে কে বেঁচে থাকবে বা থাকবে না, কে দুর্বলতা দেখাবে বা দেখাবে না, কে দলত্যাগ করবে বা করবে না, তার ওপর শহরে এসে সাময়িক বিপ্লবী সরকারের সামরিক প্রোগ্রাম কার্যকরী করার দায়িত্ব নির্ভর করবার কথা নয়—'শহরে আসতেই হবে', এই ছিল পাঁচজনের ওপর সমান দায়িত্ব, কারণ সার্বিক প্ল্যান এই পাঁচজনই কেবল জানতাম। একজনের দুর্বলতা বা অক্ষমতার জন্য অন্যের অক্ষমতাকে কি ক্ষমা করা যায়? সমস্ত ঘটনা পর্যালোচনা করে, 'কেন বিপর্যয় ঘটলো', সে সম্বন্ধে ইতিহাসবিদ্ তাঁর নিজস্ব conclusion এইভাবে টানতে পারেন—গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং প্রধান দলের সঙ্গে ছিল না বলেই তা' ঘটেছে। যদি কাউকে এইরূপ প্রাধান্য দিয়ে কেউ ঘটনা বিশ্লেষণ করেন, তবে সেই দায়িত্ব তাঁর নিজের।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওপরে যা সমালোচনা করেছি, তা থেকে মনে হবে আমি কেবল প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি যে, সেইরূপ অমার্জনীয় বিপর্যয়ের জন্য আমি দায়ী নই—দায়ী অন্য কেউ। এইরূপ মনোভাবের ইঙ্গিত যদি আমার লেখার মধ্যে কেউ পেয়ে থাকেন, তবে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। তাই এতক্ষণ পূর্ব বর্ণিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে সমালোচনা করেছি, তাতে আমার নিজ ত্রুটির স্বীকারোক্তি পাওয়া যাবে না। এখন আমার নিজ ত্রুটির স্বীকারোক্তি করছি।

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি আমার অন্তরের কাছে বার বার প্রশ্ন করে এসেছি (১) কেন আমি একটি নির্ভুল নির্দেশ দিয়ে শহরে আসিনি? (২) কেন মাস্টারদাদের বলে আসিনি প্রধানবাহিনীকে নিয়ে যেন আমাদের অনুসরণ করেন? (৩) যতই ক্লান্তি আসুক না কেন, তবু প্রধান-বাহিনী হতে বিচ্ছিন্ন হ'লাম কেন?

আমি নিজেকে কখনও ক্ষমা করি নি—করবোও না। যুব-বিদ্রোহ যে একটি বিরাট রূপ নিতে পারত! সব যেন আমার জন্যই নষ্ট হয়ে গেল! নিজকে নিজের গভীরতম অন্তরের নিভৃতে শত সহস্রবার দায়ী করেছি। মনে হয়েছে, এই অপরাধের জন্য আমি একাই দায়ী! অন্যকে কেন আমি দায়ী করবো? যদি আমি দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে চলতাম—যদি স্পষ্ট নির্দেশ দিতে অক্ষম না হতাম, তবে কি আমাদের পরিকল্পনা এইভাবে নষ্ট হয়ে যেত? আমি—আমিই দায়ী! মনের নিভৃতে বহুবার এইরূপ চিন্তা আমি করেছি। কাজেই নিজ দায়িত্ব এড়িয়ে অন্যের ওপর তা' চাপিয়ে দিয়ে নিষ্কৃতি পাওয়ার ইচ্ছে আমার মোটেই নেই—তবে নির্লজ্জ অহঙ্কার প্রকাশ পেলে স্বভাবতই মনে সঙ্কোচ আসে, সেই কারণে বিপর্যয়ের সব দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে নিয়ে খুব অশোভন বাহাদুরী করার অসারতার মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে না দিয়ে অন্যের অগোচরে আত্মবিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে নিজেকে উপযুক্ত করা অনেক বেশি প্রয়োজন বলে মনে করেছি। আমার এই অক্ষমতার স্বীকোরোক্তি আমাকে ভবিষ্যতের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করুক এই আশা নিয়ে নিজের কথাটুকু বললাম।

এই পরিচ্ছেদেব উপসংহারে আলোচনা ও সমালোচনা যা' করেছি তা' থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে চেষ্টা করবো। "শিক্ষা গ্রহণ করতে চেষ্টা করবো"—কথাটা হয়ত একটু বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে। Paris Commune, Moscow Insurrection, Shanghai Uprising—প্রভৃতি বৈপ্লবিক ইতিহাস ও মহান্ বিপ্লবীদের লেখনী-প্রসূত যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু পেয়েছি, সেই পরিপ্রেক্ষিতে যদি চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ থেকে শিক্ষালাভের প্রস্তাব করি, তবে তা' কারো কারো কাছে হাস্যাস্পদ বলে মনে হতে পারে। তবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মহান্ নেতা লেনিন লিখেছেন—

"......Consequently, to regard a militant revolutionary organisation as something specifically Narodovolist is absurd both historically and logically, because no revolutionary tendency, if it seriously thinks of fighting, can dispense with such an organisation. But the mistake the Narodovolists committed was not that they

strove to recruit to their organisation all the discontented and to hurl this organisation into the decisive battle against the autocracy ; on the contrary, that was their greatest historical merit. Their mistake was that they relied on a theory which in substance was not a revolutionary theory at all, and they either did not know how, or circumstances did not permit them, to link up their movement inseperably with the class struggle that went on within developing Capitalist society. And only a gross failure to understand Marxism (or an 'understanding' of it the spirit of Struvism) could prompt the opinion that the rise of a mass spontaneous labour movement relieves us of the duty of creating as good an organisation of revolutionaries as Zamlya-i-Volya had in its time, and even an incomparably better one. On the contrary, this movement IMPOSES this duty upon us, because the spontaneous struggle of the proletariat will not become a genuine 'class struggle' until it is led by a strong organisation af revolutionaries. ('What is to be done ?'—Lenin).

—(রুশ দেশে জারতন্ত্রের আমলে লেনিন কম্যুনিস্ট পার্টি গঠনের সময় শোধনবাদীদের সঙ্গে আদর্শগতভাবে সংগ্রাম করেছেন। শোধনবাদীদল মার্ক্সবাদের ভোল নিয়ে বিভ্রান্তি ঘটাচ্ছিল—তাদের মতে বিপ্লবী সংগঠন ছাড়াই কম্যুনিস্ট পার্টি গড়ে উঠতে পারে। শোধনবাদীদের সেইরূপ আত্মপ্রবঞ্চনামূলক প্রচারের বিরুদ্ধে লেনিন বলেছেন যে, বৈপ্লবিক প্রবণতার মধ্যে সত্যিই যদি কারও আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও যুদ্ধের ইচ্ছা প্রকাশ পায় তবে কম্যুনিস্ট পার্টির সংগ্রামী সংগঠনকে বিশেষ করে নারদভলিস্ট, অর্থাৎ, সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলে আখ্যা দেওয়া ঐতিহাসিক সত্যতা ও যৌক্তিকতার অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। লেনিন দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করেছেন যে, সশস্ত্র সংগ্রামের সুনিশ্চিত ধারণা যাদের থাকবে তারা নারদভলিস্টদের সংগঠনের মত সংগঠনকে পরিহার করে চলার কথা ভাবতেই পারে না। নারদভলিস্টদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লেনিন বলেছেন যে, অসুখী ও অতৃপ্তের দলকে সংগঠিত করে স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মধ্যে তাদের বিন্দুমাত্র ভ্রম ছিল না; বরং সেটাই তাদের ঐতিহাসিক যোগ্যতার প্রমাণ। তাদের ভুল ছিল Theory-তে অর্থাৎ মতবাদে—যে মতবাদের ওপর তারা নির্ভর করেছে তা একটি বৈজ্ঞানিক বিপ্লবী মতবাদই নয়।

কিন্তু লেনিন তাদের প্রতি খুব সহানুভূতির সঙ্গে জানাচ্ছেন—নারদভলিস্টরা হয় বুঝতে পারে নি বা বাস্তব অবস্থা তাদের বোঝবার অনুকূলে ছিল না বলেই তারা হৃদয়ঙ্গম করে নি যে, কি করে ধনিকসমাজের ক্রমবিকাশের পথে তাদের সংগ্রামকেও অবিচ্ছিন্নভাবে শ্রেণী-সংগ্রামে পরিণত করা সম্ভব। তারপর লেনিন শোধনবাদীদের প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন—মার্ক্সবাদ বুঝতে না পারা তাদের এক মারাত্মক নিষ্ফলতা এবং এই জন্যই স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলন দেখে তারা মনে করে ঝাম্‌লিয়া-ই-ভয়লার, অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদী সংগঠনেব মত সুগঠিত বিপ্লবী সঙ্ঘের আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু লেনিনের মতে ঝাম্‌লিয়া-ই-ভয়লা তাদের সময়ে যেরূপ সশস্ত্র সংগঠন গড়েছে তার চাইতেও অনেক বেশি শক্তিশালী সেই ধবণের সংগঠন কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেও গঠিত হওয়া প্রয়োজন। আরও বিশদভাবে লেনিন বলেছেন—যেহেতু স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলন সত্যিকার শ্রেণী-সংগ্রামে কখনই পরিণত হতে পাবে না, যদি নাকি শক্তিশালী বিপ্লবী সংগঠন নেতৃত্ব দিতে অক্ষম হয়, সেই হেতু এই বৈপ্লবিক কর্তব্য ও দায়িত্ব আমাদের ওপর আবও বেশি কবে ন্যস্ত হয়েছে)।

লেনিনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দিকে লক্ষ্য রেখে আমার মনে হয় চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সামরিক নীতি, কৌশল ও সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনা ও শিক্ষা গ্রহণের অবকাশ আছে। লেনিনের লেখার পরিপ্রেক্ষিতে (Perspective) বিচার করলে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকেও যে আমরা অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা লাভ করতে পারি, একথা মনে ভাবা অনুচিত হবে না। আমি এতসব আলোচনা করার পর উপসংহারে বলতে চাইছি, আমাদের জয়, বিশৃঙ্খলা ও পরাজয়ের জন্য কেউই এককভাবে দায়ী নয়। জয়ের গৌরব ও পরাজয়েব গ্লানি আমাদের সবাইকে সমান ভাগেই ভাগ করে নিতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমি বলতে চেষ্টা করছি কি শিক্ষা পেলাম—

(১) আমাদের প্রাথমিক আক্রমণ-পর্ব খুব নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

(২) আর্মারি গৃহের মধ্যে যে ম্যাগাজিন থাকে না সে সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম বলেই A.F.I. আর্মারির তথ্য সম্পূর্ণভাবে যোগাড় করতে পারি নি। তথ্য অনুসন্ধান সম্বন্ধে এত বড় ত্রুটি থাকা অমার্জনীয় অপরাধ।

(৩) গুড্-ফ্রাইডেতে অত রাত্রে ইউরোপীয়ানরা যে আমোদে মত্ত থাকবে না, সেই তথ্য আমাদের জানা উচিত ছিল।

(৪) সামরিক দূরদৃষ্টির অভাবে আমরা বিপ্লবী-সৈন্যবাহিনীকে আমাদের close command-এ (নিকট আধিপত্যের মধ্যে) রেখেছিলাম, তা না রেখে পুলিস-লাইন দখল করে নেওয়ার পরই শহরের বিভিন্ন ট্যাক্‌টিক্যাল পয়েন্টস-এ তাদের

পাঠানো উচিত ছিল। আমাদের তরুণ বিপ্লবীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে দ্রুত শহরে পাঠিয়ে প্রথম থেকেই একটার পর একটা আক্রমণ যদি আমরা চালিয়ে যেতাম, অর্থাৎ পুলিশ-বিট, বন্দুকের দোকান ক'টি, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, জেলখানা, প্রভৃতি আক্রমণ ও জয় করে নিতাম বা জয়ের জন্য চেষ্টা করতাম, তবে গুটিকতক ফিরিঙ্গী লুইস্‌গান নিয়ে আমাদের আক্রমণ করবার সুযোগ পেত না।

(৫) আমরা পাহাড়তলী ওয়ার্কশপ ও ডবলমুরিং জেটির দু'টি আর্মারির কথাও জানতাম। ইউরোপীয়ান-ক্লাব আক্রমণ করে ইংরেজ হত্যার প্রোগ্রাম সর্বসম্মতিক্রমে যখন গ্রহণ করাই হ'ল, তখন প্রথম জয়ের পর ঐ দু'টি আর্মারি দখল করে নেওয়ার জন্য আমাদের শতগুণ বেশী সক্রিয় হওয়া উচিত ছিল। পুলিশ-লাইন ও A.F.I. আর্মারি দখল করে নেওয়ার পর তখনই দু'টি দল যদি মোটর-যোগে গিয়ে ঐ দু'টি আর্মারি আক্রমণ ও দখল করতো, তবে আমরা ·৩০৩ বোরের কার্তুজ না পেয়েও খুব অসুবিধায় পড়তাম না—সেখানে কার্তুজ পাওয়া যেত। আর সবচেয়ে বড় কথা, শত্রুপক্ষ ঐ দু'টি আর্মারি থেকে মেশিনগান আনবার কোন সুযোগই পেত না।

(৬) প্রধান প্রধান শত্রুঘাঁটি দখল করে নেওয়ার পর জয়ের সুযোগ আমরা পুরোপুরি গ্রহণ করলাম না। আমাদের যখন initiative নেওয়ার কথা তখন close command-এ সর্বশক্তি নিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা সামরিক নীতি অনুযায়ী মারাত্মক ভুল। আর আমাদের সেই ভুলের সুযোগ নিল গুটিকতক শাসক। শত্রুপক্ষ initiative নিয়েছে। তারা দ্রুত কাজ করে গেছে এবং সাহসের সঙ্গে offensive নিয়েছে। Offence is the best defence—আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ রণ-কৌশল। শত্রুপক্ষ অপেক্ষা আমাদের সুযোগ ছিল প্রচুর, তবু তা আমরা গ্রহণ করতে পারি নি।

(৭) এত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন আমাদের force deploy করি নি? আমার মনে হয় সামরিক কৌশল সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা, জড়তা ও ভীরুতাই এই নিষ্ক্রিয়তার জন্য দায়ী। ভয়টা কি? আমরা তো সবাই মরতেই গিয়েছিলাম। যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে সাথীরা। গুলীর মুখেও গেছে সবাই। তবে ভীরুতা কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল? আমার মনে হয় মৃত্যুভয় না থাকলেও—'মৃত্যু তুমি একটু বিলম্বে এস'—এই গোপন ইচ্ছে আমাদের মধ্যে জড়তা ও নিষ্ক্রিয়তা সৃষ্টি করেছিল।

(৮) আমার মনে হয় ছোট ছোট দলে ভাগ করে সবাইকে deploy না করার মধ্যে আর একটি কারণ ছিল—তরুণ বন্ধুদের ওপর পূর্ণ আস্থা আমরা রাখতে পারি নি। সব সময়ে ভয় হয়েছে, পাছে তারা same-side করে বসে—উত্তেজনা

ও উদ্দীপনার মাঝে পরস্পরের মধ্যে হয়ত শত্রুভ্রমে গুলী বিনিময় করে প্রাণ দেবে। কিন্তু সেরূপ ভয় করবার কোন বাস্তব কারণ ছিল কি?

(৯) আমাদের সীমিত সামরিক শিক্ষার দুর্বলতা সম্বন্ধে আমরা সচেতন ছিলাম। আমাদের কেবল যে সামরিক শিক্ষা ও জ্ঞানের স্বল্পতা ছিল তা নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন সশস্ত্র সামরিক অভ্যুত্থানের (Insurrection) নীতিও আমরা জানতাম না। যদি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নীতি, কৌশল ও বিজ্ঞান আমাদের ভাল-ভাবে জানা থাকতো, তবে আমার বিশ্বাস যুব-বিদ্রোহ শতগুণ বেশি সার্থকতা অর্জনে সমর্থ হ'ত।

(১০) যুবক বন্ধুদের গোপনে সামরিক শিক্ষা দিতে হয়েছে। তা'ছাড়া নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষার উদ্দেশ্যে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার পদ্ধতি নিয়ে না পেরেছি manoeuvre করতে, না পেরেছি rehearsal দিয়ে নিজেদের শিক্ষিত করে তুলতে। সেই কারণে তরুণ বন্ধুদের ওপর আমাদের confidence বা আস্থা রাখা বাস্তবে সম্ভব হয় নি—তাই তাদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে শহরে পাঠাতে সাহস করি নি। সশস্ত্র আক্রমণ ও আত্মরক্ষার জন্য যে পরিমাণে শিক্ষিত হওয়া যায়, সেই পরিমাণেই যে আত্মপ্রত্যয় ও সংগঠনের ওপর আস্থা বেড়ে যায়, এই সত্যতা অনস্বীকার্য। আমাদের সংগঠনে এই দুর্বলতা ছিল—আমাদের শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবের জন্য সার্থকতার সঙ্গে যুব-বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটে নি।

(১১) আমরা initiative নিয়ে প্রথম থেকে শত্রুর চলাচল ও গতিবিধি বন্ধ করার ব্যবস্থা করিনি। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও রেল ব্যবস্থার বিলোপ-সাধন করে শত্রুকে সহজে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ দিতে যেমন আমরা চাইনি, ঠিক সেই দিকে লক্ষ্য রেখে প্রধান শত্রুঘাঁটি দখল করার সঙ্গে সঙ্গে শহরের বিশেষ আবশ্যকীয় পথগুলি রুদ্ধ করাও আমাদের অবশ্য কর্তব্য ছিল। আমাদের সঙ্কীর্ণ সামরিক চিন্তা ও উপযুক্ত শিক্ষার অভাবের দরুণ সেটা করে উঠতে পারলাম না বলেই শত্রুরা initiative নিয়েছে ও লুইস্‌গান দিয়ে আমাদের আক্রমণ করার সুযোগ পেয়েছে। তাদের সামরিক শিক্ষা ও সংগঠনশক্তি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল বলেই তারা তা করতে পেরেছে—এই সত্য স্বীকার করতেই হবে। পরে আমি যথাস্থানে ব্যক্ত করবো কিরূপে জেলার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী মুষ্টিমেয় ইংরেজ আমাদের চোখের অন্তরালে সংগঠিত হয়েছে এবং সাহসের সঙ্গে আমাদের প্রতি-আক্রমণ করেছে। শত্রুর কাছ থেকে এই বিষয়ে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

(১২) ·৩০৩ বোরের কার্তুজ না পেয়ে আমরা demoralised হয়েছিলাম, তা অনস্বীকার্য। শত্রুপক্ষ মেশিনগান দিয়ে আক্রমণ করার পর, যাদের ওপর পরিচালনার

ভার ছিল, তারা সকলেই যে কম-বেশি morale হারিয়েছিল সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। বেশির ভাগ তরুণদের morale আমাদের, অর্থাৎ নেতাদের, চেয়ে অনেক উচ্চ ছিল। আমরা morale হারিয়েছিলাম বলে আমাদের হেড-কোয়ার্টারে ঐরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আকস্মিক আক্রমণে শত্রুকে পরাস্ত করার জন্য ছোট্ট একটি দলকে সামরিক কায়দায় গুঁড়িমেরে বুকে হেঁটে গোপনে মেসিন গানের অস্তিত্ব খুঁজে বার করার জন্য পাঠানো আমাদের উচিত ছিল। তা আমরা করতে পারি নি। পরন্তু নিজেরাই পরাজয়ের মনোভাব নিলাম। আমরা বিশৃঙ্খলার মধ্যে আর্মারিতে আগুন দিলাম। নিজের অসাবধানতার জন্য হিমাংশু পেট্রোলের আগুনে পুড়ে গেল, আমরা চারজন মোটরে করে হিমাংশুকে নিয়ে শহরে এলাম, আর বাকি সবাই পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিল। এই সমস্ত ব্যাপারটার মূলে আমাদের অপরিণামদর্শিতা, দ্বিধা ও হয়ত "একপ্রকার মৃত্যুভয়"-ও কাজ করেছে। "এক্ষুণি" যুদ্ধে মরে না গিয়ে "যত দেরি" করে রণাঙ্গনে সেই মৃত্যু আসে—এইরূপ আশু মৃত্যুভয় থেকে সাময়িকভাবে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য "পর্বতযুদ্ধ বা গোরিলা-যুদ্ধের" পথে সুপ্ত মনের তাগিদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে গেলাম।

(১৩) পর্বতযুদ্ধের জন্য আমাদের কোন প্ল্যান ছিল না বলেই আমরা আগে থেকে কোন ব্যবস্থাই করে রাখি নি—প্রয়োজনীয় জামা-কাপড়, আহার্য-বস্তু, জলের ব্যবস্থা, এমন কি অতি আবশ্যকীয় জিনিস—দিঙ্‌নির্ণয়ের জন্য একটি কম্পাসও সঙ্গে ছিল না।

(১৪) এই সমস্ত ব্যাপারটার বিভিন্ন স্তরের ত্রুটি বুঝতে হলে সমর-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আমাদের বিশৃঙ্খলা ও মানসিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বুঝতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। জার্মানীর সামরিক শিক্ষায় দক্ষ, Major General Eswald Banse, 'German Prepares for War' গ্রন্থটিতে লিখেছেন—

"Two fundamentally different phases have, however, to be distinguished here. The FIRST, consisting of mobilisation and deployment, can be planned beforehand and demands lengthy preparation...The SECOND phase, which consists of the approach to the battle, manoeuvres during battle, and the pursuit or retirement cannot be completely determined beforehand, for quite apart from the life of the land and the sudden change for the worse in the means of communications, the enemy also has his little say in the matter, and his ideas remain concealed till the moment when they became facts. The Commander whose mind does not move fast

mobility may have serious, even fatal, effects in the first phase too..." (Emphasis nine).

Major-Gen. Banse যুদ্ধের দু'টি অপরিহার্য ভিন্ন স্তরের (phases-এর) কথা উল্লেখ করে বলেছেন—প্রথম স্তরে mobilisation ও deployment সম্বন্ধে বহু পূর্বেই ব্যবস্থা করা সম্ভব এবং তার জন্য প্রচুর সময় দিয়ে তা করার প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। আসন্ন যুদ্ধের সময়টিকে তিনি দ্বিতীয় স্তর বলেছেন। যুদ্ধে manoeuvre, অর্থাৎ কৌশলে ব্যূহ রচনা ও সৈন্য পরিচালনা করা, এবং শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন বা নিজেদের পশ্চাদপসরণ ব্যাপার আগে থেকে অঙ্ক কষে সম্পূর্ণভাবে ঠিক করে রাখা যায় না। অবস্থানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ সৈন্যেরা পাহাড়, নদী, জঙ্গল ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে এবং পূব নির্ধারিত যাতায়াত ব্যবস্থারও ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এই বিষয়ে কোন পক্ষই আগে থেকে কিছু স্থির করে রাখতে পারে না—তাদের রণ-কৌশলের idea তাদের মস্তিষ্কেই নিবদ্ধ থাকে। মেজর জেনারেল বলেছেন, যদি সৈন্যাধ্যক্ষের মানসিক চিন্তা এইরূপ নতুন নতুন পরিস্থিতিতে খুব দ্রুত চালিত না হয়, তবে সৈন্যবাহিনীব গতি মন্থর হতে বাধ্য। তিনি উপসংহারে দৃঢ় মত প্রকাশ করেছেন—সৈন্যবাহিনীর এইরূপ গতিহীন নিষ্ক্রিয়তা যুদ্ধের প্রথম অবস্থায়ও দারুণ ক্ষতি এমন কি মারাত্মক দুর্যোগ সৃষ্টি করতে পারে।

আমাদেরও ঠিক তাই ঘটলো। আমবা—নেতারা মানসিক নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে ছিলাম। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করতে পারি নি। আক্রমণের প্রথম স্তরে তাই আমরা মারাত্মক অবস্থার সম্মুখীন হলাম। শত্রুপক্ষ তৎপরতার সঙ্গে আমাদের প্রতি-আক্রমণ করলো।

(১৫) আমাব প্রধান শিক্ষা—যাঁরা যুদ্ধে নেতৃত্ব করবেন তাঁদের যতদূর সম্ভব কম শারীরিক পরিশ্রম করা উচিত। শরীর ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত থাকলে দ্রুত চিন্তা করা এবং অনেক ক্ষেত্রে নির্ভুল কার্যক্রম স্থির করতে না পারার সম্ভাবনা থাকে।

মোটামুটি এই কতকগুলি ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আমরা দাযী এবং এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ও চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের ঘটনার মধ্যে থেকে আমরা বিপ্লবী সামরিক অভিযানের কতকগুলি নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। এইসব শিক্ষা যদি প্রয়োগ করা না যায় তবে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সামরিক দিকটার বিপর্যয় ঘটবার সম্ভাবনা।

এই পরিচ্ছেদের শেষে সামান্য বক্তব্য রেখে আমি আমার আলোচনা ও মতামত শেষ করবো। আইরিশ বিপ্লবের আগে লেলোর বলেছেন—

offered by ten men only—even if offered by men armed with stones —any and every such man, who tells that such an act of resistance is premature, imprudent or dangerous, shall at once be spurned and spat at for the remark he thus puts, and recollect that somehow somewhere and by somebody a beginning must be made and that the first act of resistance is always and shall ever be premature, imprudent, unwise and dangerous." (Emphasisnine nine).

—এমন কি মাত্র দশজন লোকও যদি শুধুমাত্র ইটপাটকেল নিয়েই সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে—আর যদি কেউ তোমাকে বলে যে, সেইরূপ সক্রিয় প্রতিরোধ ব্যূহ রচনা অসময়োচিত, অপবিণামদর্শিতাপ্রসূত অথবা বিপজ্জনক, তাহ'লে সেই ধরণের মন্তব্যের প্রতিবাদে তৎক্ষণাৎ তাকে পদাঘাত ও ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান কবতে হবে; এবং স্মরণ রাখতে হবে কাউকে না কাউকে যেভাবেই হোক্ না কেন, কোন না কোন স্থানে প্রথম আরম্ভ করতেই হবে এবং সেই প্রথম সক্রিয় প্রতিরোধ সর্বকালে ও ভবিষ্যতেও যে অপরিপক্ক, অবিবেচনাপ্রসূত, নির্বোধের মত ও বিপজ্জনক কাজ বলে গণ্য হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মাত্র একটি জেলা-শহরে এই ধরণের যুব-বিদ্রোহের এই আমাদের প্রথম চেষ্টা। অক্ষমতার জন্য ভুল-ত্রুটি হয়েছে। প্রথম স্তবেও আমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই প্রথম স্তবের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত কি আমরা করি নি? জালালাবাদের যুদ্ধে মরণজয়ী বীরেরা কি শত্রুর মেসিনগানকে স্তব্ধ করে দেয় নি? শত্রুর বিশাল সৈন্যবাহিনী কি পরাভব স্বীকার করে পশ্চাদপসরণ করে নি? প্রথম স্তরের বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলাব মধ্যে আমাদের যে ক্ষতি হয়েছে, সেই ক্ষতির পূরণ আমরা করেছি জালালাবাদের রণপ্রাঙ্গণে।

আমাদের আক্রমণ কতখানি ব্যাপক ও সফল হয়েছে জেলা-কর্তৃপক্ষ প্রথমটা তা বুঝতে পারেন নি। কর্তৃপক্ষ বলতে আমি এখানে মাত্র গুটিকতক ইংরেজ প্রধানের কথা মনে রেখেছি, যথা—জেলা-শাসক, পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও তাঁর সহকারী, বরিশাল রেঞ্জের D.I.G., A.F.I.HQ.-এর Adjutant ও ক্যাপ্টেন টেট্ প্রভৃতির ছোট ছোট দু'একটি দলকে। আমাদের আকস্মিক আক্রমণের পর তাঁরা সবাই সব খবর একসঙ্গে পান নি। কেউ জানতে পেরেছেন পুলিস-লাইন আক্রান্ত হয়েছে, কেউ জেনেছেন A.F.I. আর্মারি বিপ্লবীরা অধিকার করেছে, আবার কেউ খবর পেয়েছেন টেলিফোন-ভবন বিধ্বস্ত হয়েছে। এইসব খবর টেলিফোনযোগে তাঁদের পাওয়া সম্ভব ছিল না। লোক মারফত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এইসব

[illegible] এবং একস্থানে বিপর্যয়ের খবর শুনেই তাদের মধ্যে কেউ গেছেন ছুটে A.F.I. আর্মারিতে, আবার কেউ গিয়েছেন পুলিস-লাইনে অস্ত্র, পুলিস অথবা অক্সিলিয়ারি ফোর্সের সাহায্যলাভের আশায়। এইরূপভাবে ছোটাছুটি করতে গিয়ে তাঁদের মধ্যে পরস্পরের দেখা হয় এবং তখন আক্রমণের ব্যাপকত্ব বুঝতে পেরে সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন।

তখনও তাঁরা জানেন না যে, বহির্জগতের সঙ্গে টেলিগ্রাফ-লাইনের যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছে। ভাবতে পারেন নি দু'টি স্থানে রেল-লাইন বিধ্বস্ত হয়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ আছে ও বেশ কিছু সময়ের জন্যই বন্ধ থাকবে। চট্টগ্রামের সঙ্গে বহির্জগতের রেল ও টেলিগ্রাফ সংযোগ ছিন্ন হওয়ার সংবাদ তাঁরা না পেলেও তাঁদের সার্বিক নিরাপত্তা যে বেশ বিপন্ন হয়েছে এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, জেলখানা, সদর কোতোয়ালি প্রভৃতি তখনও যদি আক্রান্ত না হয়ে থাকে, তবে এইসব গুরুত্বপূর্ণ স্থান সুরক্ষিত রাখবার দায়িত্বও যে তাঁদের ওপর এসে পড়েছে, এটা তাঁরা ভালো করেই বুঝেছিলেন। ইংরেজ পরিবারবর্গকে কালবিলম্ব না করে নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত করাব প্রয়োজনও তাঁরা উপলব্ধি করলেন।

সমর শিক্ষায় অভিজ্ঞ ও দক্ষ ইংরেজ অবাধে বছরের পর বছর রাজত্ব করেছে। সিপাহী বিদ্রোহের পর, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল রাত্রে চট্টগ্রামে, আসন্ন মৃত্যুর মুখে যেরূপ বিপন্ন বোধ করেছে, এতদিনের মধ্যে ভারতেব অন্য কোন স্থানে তারা আর কখনও সেরূপ বিপদগ্রস্ত হয় নি। তবু এত বিপদের মধ্যেও তারা আমাদেব চাইতে অনেক বেশি ধীর স্থির ছিল—অনেক বেশি তৎপরতাব সঙ্গে কাজ করে গেছে এবং অত্যন্ত সঙ্গীন ও বিপন্ন অবস্থার মধ্যেও দায়িত্ব পালন করতে চেষ্টা করেছে।

শত্রু হলেও, ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীব কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখবার আছে—চটগ্রাম জেলার প্রধান সৈন্য-ঘাঁটি ও পুলিস-ঘাঁটি দু'টি তাদের হস্তচ্যুত হয়ে যাওয়ার পর পরিবারবর্গের সঙ্গে কোন সুদূর প্রান্তে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষার জন্য ব্যূহ রচনা করে তারা বসে থাকে নি। বিপক্ষ শত্রুঘাঁটি তৎপরতার সঙ্গে আক্রমণ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারলে যে আত্মরক্ষার সুযোগ অপেক্ষাকৃত বেশি পাবে, রণ-কৌশলে অভিজ্ঞ ইংরেজদল তা' বুঝেছিল। তাই ওরা সাহস ও তৎপরতার সঙ্গে আমাদের নিষ্ক্রিয়তা ও দ্বিধার সুযোগ নিল।

ইংরেজের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল বলেই তারা ভারতের বুকে যুগ যুগ ধরে অধিষ্ঠিত থাকতে পেরেছে।

Preparation, mobilisation ও **deployment** পর্যন্ত আমাদের সব ঠিক ছিল। তারপর, যুদ্ধের প্রথম স্তরেই বিপ্লবী 'জেনারেলদের' চিন্তা খুব দ্রুত এগোয়নি এবং

দ্রুত চিন্তার সঙ্গে শত্রুপক্ষের অবশিষ্ট ছোট ছোট [illegible]
অধিকার করার ব্যবস্থাও করেন নি।

জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উইলকিন্‌সন খবর পেলেন টেলিফোন-অফিস ধ্বংস হয়েছে, পুলিস-লাইন বিপ্লবীরা অধিকার করে নিয়েছে, তিনি টেলিফোনে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না—কি বিপদ! তিনি তাঁর বন্দুকটি ও একজন আর্দালীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। মোটর নিয়ে ছুটলেন A.F.I. আর্মারিতে। সেখানে তাঁর মোটর আক্রান্ত হ'ল। আর্দালী মারা গেল, ড্রাইভার আহত হ'ল এবং তিনি পালিয়ে আত্মরক্ষা করে চট্টগ্রাম রেল-স্টেশনের ইংরেজ স্টেশন-মাষ্টারকে নিয়ে রেল-এঞ্জিন করে মিঃ টেটের সঙ্গে ডবলমুড়িং জেটির আর্মারিতে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে লুইস্‌গান প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে প্রতি-আক্রমণ করার ব্যবস্থা করলেন।

জজসাহেব আমাদের মামলার বিবরণ লেখবার সময় লিখছেন—

"Mr. Wilkinson......was awakened...He hurriedly dressed and set forth in his car...When they arrived at the Junction known as Piccadilly Circus......they found there a car standing in which were Capt. Taitt and his wife, Mr. Lodge, the District Judge and his wife, and Mr. Wighton and Mr. Farrell. The ladies were sent on to Mr. Bliss's bunglow nearby while the District Magistrate went on to the bunglow of Mr. Johnson also close by, but finding that he had already gone to the A.F.I. Armoury he returned forthwith to Piccadilly Circus where Capt. Taitt was waiting. From there Mr. Wilkinson went on in his car towards the A.F.I. Armoury."

—জেলা-শাসক মিঃ উইলকিন্‌সন খবর পাওয়া মাত্র প্রস্তুত হয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। পিকাডিলী সার্কাস নামক জায়গাটির কাছে এসে তিনি ক্যাপ্টেন টেটের গাড়ি দেখতে পান। গাড়িতে টেটের স্ত্রী, জেলা-জজ ও তাঁর স্ত্রী এবং মিঃ ওয়েটন ও মিঃ ফেরেল (এই মিঃ ফেরেল—সার্জেণ্ট জেনারেল মিঃ ফেরেল নন) উপস্থিত ছিলেন। মিঃ ব্লিসের বাংলো নিকটেই ছিল—সেখানে মহিলাদের পাঠানো হ'ল। জেলা-শাসক মিঃ জনসনের বাড়ি ছুটে গেলেন। ইতিমধ্যে পুলিস-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট A.F.I. আর্মারির দিকে গেছেন শুনে মিঃ উইলকিন্‌সন আবার ক্যাপ্টেন টেটের কাছে এলেন। সেখান থেকে মিঃ উইলকিন্‌সন A.F.I. আর্মারির দিকে এগিয়ে গেলেন।

ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি অনুসরণ করে ক্যাপ্টেন সাহেবের গাড়িও আসছিল।

মিঃ উইলকিন্‌সনের এইরূপ অবস্থা দেখে ক্যাপ্টেন ও তাঁর সাথী আর এগোলেন না। তাঁরা জেলা-শাসকের সঙ্গে চট্টগ্রাম মেইন রেল-স্টেশনে ছুটে এলেন।

জাজ্‌মেণ্ট কপিতে ট্রাইব্যুন্যালের প্রেসিডেণ্ট লিখছেন—

"...By the shots fired by the A.F.I. Armoury raiders, the radiator of Mr. Wilkinson's car was riddled beyond repair and a headlight was smashed and a hole drilled through the back of it.........Capt. Taitt's car was also hit in several places, one or two bullets actually perforating the window screen."

জেলা-শাসক ও ক্যাপ্টেন টেটের গাড়ি দু'টি একেবারে অকেজো হয়ে পড়ে রইল। তবু তাঁরা কর্তব্যে অটল—ছুটে গেলেন রেল-স্টেশনে।

জাজ্‌মেণ্ট কপিতে লেখা আছে—

"At the Chittagong Railway station Mr. Wilkinson and Capt. Taitt commandeered an engine and in it went to the Jettie's armoury from which Capt. Taitt took as many men as he could obtain, while the District Magistrate went aboard a ship and despatched a message by wireless. Then, while the armed party followed by train they both returned to the A.F.I. headquarters by car to find the building on fire and a number of Europeans including Major Baker already assembled there. These set about getting the ammunition out of the magazine into a place of safety. The magazine room in which all the ammunition was kept was a small room at the opposite end of the building from the armoury......which had providentially been completely overlooked by the raiders."

—A.F.I. আর্মারি আক্রমণকারী দল ক্যাপ্টেন টেট্ ও মিঃ উইলকিন্‌সনের মোটরের ওপর অজস্র গুলীবর্ষণ করে। গাড়ি ফেলে রেখে মিঃ উইলকিন্‌সন ও টেট্ রেল-স্টেশনে গিয়ে একটি রেল-এঞ্জিন সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য নিজেদের অধীনে নিলেন। তা'তে করেই তাঁরা জাহাজঘাটের জেটি আর্মারিতে গেলেন। সেখান থেকে অস্ত্রাদি নিয়ে যতজনকে সম্ভব সুসজ্জিত করলেন। ইত্যবসরে ম্যাজিস্ট্রেট নদীবক্ষে কোন একটি জাহাজে গিয়ে বেতারে সংবাদ পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁরা মোটরে করে আবার A.F.I. আর্মারিতে ফিরে এলেন এবং পেছনে ট্রেনে এলো সামান্য সশস্ত্র সেপাই। তাঁরা এসে দেখলেন মেজর বেকার লোকজন নিয়ে ইতিমধ্যে কার্তুজের বাক্স সব নিরাপদ স্থানে সরাচ্ছিলেন।

আর্মারি গৃহের অপর দিকে ছোট একটি কোঠায় কার্তুজগুলি সংরক্ষিত ছিল। তারপর জজসাহেব লিখেছেন—ভগবানের অশেষ কৃপা যে, আক্রমণকারীর দল এই কোঠাটি লক্ষ্য করে নি। চট্টগ্রামের ইংরেজরা সেইদিন সত্যই ভেবেছিল ঈশ্বরের দয়া ছাড়া এইরূপ হতেই পারে না—যদি ·৩০২ কার্তুজ আমাদের হাতে পড়তো, তবে কে বলতে পারে—ইংরেজের রক্তপ্রবাহে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে লেখা হ'ত না? আমরা আজ ভাগ্যকে দোষ দিয়ে আক্ষেপ করতে পারি—এই আমাদের সান্ত্বনা। ইংরেজের দল ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে নি। ভাগ্য ভীরু ও কাপুরুষদের উপহাস করে। Fortune favours the brave! নেপোলিয়ান বলতেন—বীরেরাই ভাগ্যের অধিকারী!

যে সময় অবশিষ্ট যৎসামান্য শক্তি সমন্বয় করে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও ক্যাপ্টেন টেট্ A.F.I. আর্মারি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছিলেন, সেই সময় জেলা-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ও ডি, আই, জি, মিঃ ফারমারের নেতৃত্বাধীনে ছোট্ট আর একটি দল কিভাবে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ করে গেছে তার বিবরণ জাজ্‌মেণ্ট কপিতে পাচ্ছি—

"...*At the same time the Superintendent* of Police Mr. Johnson with Mr. Farmer the D. I. G. hurriedly got into uniform and after despatching constable Jorasindhu Barua to inform the District Magistrate and their orderly constables to warn Capt. Taitt, Adjutant of the Auxiliary Force, and Mr. Lewis, the Assistant Superintendent of Police, proceeded by motor car to the A.F.I. Armoury in the hope of obtaining assistance there. As he approached the A.F.I, armoury and was just about to enter the gate......rapidby coming to the conclusion that this armoury was being attacked as well, he drove at speed straight on towards Pahartali......Some 200 yards further along the road he overtook, running along the road towards Pahartali, three persons, one of whom he discovered to be Sergt. Blackburn of the A.F.I. Headquarters staff......He further elicited from Sergt. Blackburn that the keys of the Pahartali subsidiary A.F.I. Armoury were kept by Mr. Barraclough. So taking Blackburn and his companions inside the car, he got Blackburn to show him the way to Barraclough's house. There Barraclough was aroused and sent with Sergt. Blackburn to open the Pahartali Armoury while Mr. Johnson went on to rouse other Pahartali residents, viz., Messrs

Francis, Thomas, West, Provan, Tyers, etc. Returning with them to the Armoury, rifles and ammunition, etc., were obtained and a Lewis Gun with the gunner Barraclough was placed in Mr. Franci's car while three or four riflemen got into Mr. Johnson's car along with him and Mr. Farmer. They then drove to the A.F.I. Headquarters' Armoury to find the raiders had already left and some Europeans had assembled...The Armoury building was blazing fiercely...Leaving the A.F.I. Headquarters Mr. Johnson and Mr. Farmer went on to visit the Imperial Bank and Kotwali P.S. as they thought that these might have been attacked as well. They took with them the Assistant Snperintendent of Police Mr. Lewis, who in the meantime had arrived at the A.F.I. Headquarters, his orderly, and gunner Barraclough with his Lewis Gun...At the Imperial Bank Messrs Farmer ard Johnson found all was quiet and at Kotwali that the alarm had already been received, so they motored to the European club garage and thence proceeded on foot across the Golf course towards the Police line......"

—খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে D.I.G. এবং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট খাকী পোশাক পরে নিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট, ক্যাপ্টেন টেট্ ও সহকারী পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ লুইস্‌কে সংবাদ দিতে তাঁদের আর্দালী কনেষ্টবলদের পাঠালেন এবং আর কালক্ষয় না করে সাহায্য পাবার আশায় মোটরে A.F.I. আর্মারির দিকে ছুটলেন। A.F.I. আর্মারির কাছে এসে বুঝলেন যে, এই আর্মারিও আক্রান্ত হয়েছে। উপায় নেই দেখে পাহাড়তলীর ছোট আর্মারির উদ্দেশ্যে তীব্রবেগে মোটর ছোটালেন। পথে সার্জেন্ট মিঃ ব্ল্যাকবার্ন ও তাঁর সাথীদের গাড়িতে তুলে নিলেন। মিঃ ব্ল্যাকবার্নের সঙ্গে মিঃ জনসন ব্যারাক্লো সাহেবের বাংলোতে গেলেন। মিঃ ব্ল্যাক্‌বার্ন ও মিঃ ব্যারাক্‌লো সাহেবকে পাহাড়তলীর আর্মারি থেকে অস্ত্রশস্ত্র বার করে নিতে বলে মিঃ জনসন স্বয়ং অন্যান্য ইংরেজ বন্ধুদের হুঁসিয়ার করে দিতে ছুটলেন। লুইস্‌গান ও রাইফেল নিয়ে সজ্জিত হয়ে তাঁরা সবাই A.F.I. আর্মারিতে উপস্থিত হলেন। ইতিমধ্যে আক্রমণকারীর দল প্রস্থান করেছে, আর্মারি দাউ দাউ করে জ্বলছে। পুলিসের অ্যাসিস্টেন্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ লুইসও এসে A. F. I. আর্মারিতে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা সবাই তখন পুলিস-লাইনের দিকে যাওয়া স্থির করলেন। মিঃ জনসন ও ফারমার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও কোতোয়ালিতে সব ঠিক আছে এই খবর

পেয়ে ইউরোপীয়ান ক্লাবের মোটর গ্যারেজের পাশ দিয়ে ও গল্‌ফ্‌ কোর্সের মাঠ অতিক্রম করে বিপ্লবীদের আক্রমণ করতে পুলিস-লাইনে এসে উপস্থিত হলেন।

এর পরের ঘটনা—…"Azim and his companions emerged from the basti near the Water-Works where they met D. I. G. and S. P. and their party. At the same time about twenty Europeans including Capt. Taitt and Messrs Bliss, Lodge, Keating and others arrived from the Tiger Pass direction. It was then 3·30 or 4 a.m. They advanced upon the lines in two parties—one party going through the basti and the other along the road—to find that the raiders had made off.

—কোতোয়ালি-ইনচার্জ আজিম তাঁর এক পার্টি নিয়ে 'দামপাড়া' বস্তি থেকে এসে ওয়াটার-ওয়ার্কসে জনসন সাহেবের দলের সঙ্গে মিলিত হলেন। অন্য দিক থেকে ক্যাপ্টেন টেট্ প্রায় বিশজন ইংরেজকে সংগ্রহ করে টাইগার-পাসের পথ ধরে পুলিস-লাইনের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তখন প্রায় ভোর ৩াটা-৪টা। দুই দিক থেকে দু'টি দল পুলিস-লাইনে এলো। ইতিমধ্যে আক্রমণকারীর দল উধাও হয়েছে।

যখন অতর্কিত আক্রমণে শত্রুপক্ষ প্রায় বিধ্বস্ত, তখনও মরিয়া হয়ে তারা কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে যে পশ্চাদপদ হয়নি তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়—এইরূপ দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। শত্রুকে ছোট ভেবে হেয় প্রতিপন্ন করা যায় বটে, তবে তাতে বিপ্লবী মর্যাদা বাড়ে না, প্রকৃত রণকৌশলও শেখা যায় না।

এত বছর ধরে মাঝে মাঝে আমার কানে এসেছে, কখনও বা কারও লেখা আমার চোখে পড়েছে, তা থেকে বুঝেছি চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের প্রতি অকুণ্ঠ আন্তরিক সমর্থন ও শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও অনেকের হৃদয় ব্যথিত হয়ে গুমরে ওঠে যখন ভাবেন, কেন চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা মাস্টারদার নেতৃত্বে অত অস্ত্র সব ফেলে গেলেন! বাংলার বিপ্লবী তরুণদের ব্যথিত অন্তরের ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসার প্রতি সমবেদনায় আমার অন্তরও বিচলিত হয়, তাই সেই প্রসঙ্গে আমার অভিমতগুলি বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখার জন্য সর্বসমক্ষে উপস্থিত করছি।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে যে সব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি তার মধ্যে এই কয়টি প্রধান—কেন সূর্য সেন গেরিলা-যুদ্ধ শ্রেয় মনে করে প্রধান দল নিয়ে পাহাড়ে চলে গেলেন? যাওয়ার সময় কেন তাঁরা রাইফেল, মাস্কেট্রি, লুইসগান ও অসংখ্য কার্তুজ সঙ্গে নিয়ে গেলেন না? অতগুলি অস্ত্র সেখানে ফেলে আসা কি তাঁদের উচিত হয়েছে? বিপ্লবীদের চির আকাঙ্ক্ষিত অতি মূল্যবান অস্ত্র সব আগুনে পুড়িয়ে

ভস্মীভূত করা হ'ল কেন? বাংলার তরুণ বিপ্লবীরা প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে যখন অস্ত্রের অভাব অনুভব করেছে, তখন কোন্ অধিকারে সেই সব অস্ত্র থেকে তাদের বঞ্চিত করা হ'ল? কেন চট্টগ্রামের বিপ্লবী তরুণদল যুব-বিদ্রোহের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলো না—কেন তাবা ব্রহ্মদেশে থারওর্ডী বিদ্রোহীদের ও তাদের বীর নেতা সাঁয়াসেঁর সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা আগে থেকে করে রাখে নি? আপাতদৃষ্টিতে বিচার করে তরুণ বিপ্লবীদের মনে এ প্রশ্ন হয়ত আসতে পারে, কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করে অভিজ্ঞ বিপ্লবীরাও যখন এইরূপ প্রশ্ন করেন, তখন তার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ জাগে। অবশ্য এই সংশয় থাকা সত্ত্বেও তাদের ভাবপ্রবণতার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার বিন্দুমাত্র অভাব নেই। আমার মনে হয় ভাবপ্রবণতা দিয়ে বিচার করলে বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হয়, আবার তাতে হয় বিভ্রান্তির সৃষ্টি। ভাবপ্রবণতার ওপর নির্ভর করে বিচার-বিশ্লেষণ করলে মিথ্যা যৌক্তিকতার প্রভাবে আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

Anology has its limitations—প্রত্যেক উপমারই একটি গণ্ডী আছে। সেটি মনে রেখেই উপমা স্বরূপ যদি এই ধরণের প্রশ্ন তুলি—১৯০৫ সালে প্রধানতঃ কেবল মস্কোতে ইন্সারেক্শন নিবদ্ধ না রেখে তা কেন অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল না? অথবা, কেন লেনিনের নেতৃত্বে সমস্ত রুশদেশে সেই বিপ্লব পরিচালনা করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা হ'ল না?—তবে কি তা ঐতিহাসিক বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে একান্ত subjective—নিছক ভাবপ্রবণতাপূর্ণ নিজস্ব একটি সাধু ইচ্ছে বলে মনে হবে না?

অগ্নিযুগের এই অধ্যায়টি লিখতে গিয়ে প্রথম থেকে বলে এসেছি বাংলাদেশে বহু বিপ্লবী দল ও পার্টি ছিল; কিন্তু ঐসব সংগঠন সমান স্তরের ছিল না। বাংলা, আসাম ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় একসঙ্গে যুব-অভ্যুত্থানের জন্য মাস্টারদা ও শচীন সান্যাল পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু তা কাজে আসে নি। যতীন মুখার্জির নেতৃত্বে বাংলা তথা ভারতবর্ষে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের জন্য ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্র হয়েছে —তাও স্বপ্নে মিলিয়ে গেল। রাসবিহারী বোসের পরিচালনায় সারা ভারতে সিপাই ও গদর পার্টিকে নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণার প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। এই সব ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে আমরা ঠিক করেছিলাম যে অন্তত একটা জেলাতেও বৃটিশ-পুলিসের চক্রান্ত পরাস্ত করে যতদূর সম্ভব সফলতার সঙ্গে যুব-বিদ্রোহ পরিচালনা করতেই হবে। সেই কারণে অন্যান্য দলের সঙ্গে পরামর্শ করে চট্টগ্রামে যুব-বিদ্রোহ ঘোষণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তা'ছাড়া ছোট শহরে পুলিসের তৎপরতা বেজায় বেড়ে গিয়েছিল; রামকৃষ্ণ, অর্ধেন্দু ও তারকেশ্বর বিস্ফোরণে ভীষণভাবে আহত হওয়ার পর পুলিসের ক্রমাগত অতর্কিত হামলার হাত

থেকে তাদের নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করতে গিয়ে আমাদের সংগঠনের বহু সময় ও শক্তি ক্ষয় হয়েছে; রাত্রে-দিনে আমাদের ব্যস্ততা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, অভিভাবকেরাও আমাদের ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হলেন এবং শেষ পর্যন্ত একজন অভিভাবক তো আমাদের বিরুদ্ধে মামলাই রুজু করলেন! এইরূপ আরও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আমাদের পড়তে হয়েছে। তাই প্রতিকূল অবস্থা ও সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে আমাদের যেটুকু সামান্য শক্তি ছিল তাই নিয়েই প্রস্তুত হতে হয়েছে এবং অতর্কিত কোন বিপদের আশঙ্কায় আর বিলম্ব করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি নি। এইসব কারণে থারওর্ডী বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগের কোন কথাই ওঠে নি—নিজেদের শক্তির পরিধি ছাড়িয়ে কেবলমাত্র কাগজে-কলমে প্ল্যান করার ইচ্ছে আমাদের কখনও ছিল না।

এই বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে দেখলে বোঝা যাবে, প্রচুর অস্ত্র, যা আমরা পেয়েছিলাম, তা' সঙ্গে নিয়ে এসে কিছু করবার ছিল না। বাংলা দেশের অন্যান্য বিপ্লবী সংগঠনের হাতে যদি অস্ত্র তুলে দেওয়ার প্ল্যান আমাদের আগে থেকে থাকতো তবেই তা' করবার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। দ্বিতীয়ত, বাংলার বিপ্লবী দলের মধ্যে অস্ত্র বিতরণ করার প্রশ্নটি যদি বাদও দিই তবু কেবল চট্টগ্রামের তরুণদের জন্য অস্ত্র এনে মজুদ রাখার ইচ্ছে থাকলেও তার জন্য আগে হতে প্ল্যান না করে শেষ মুহূর্তে অস্ত্র নিয়ে আসা সম্ভব হ'ত না। সব অস্ত্র নিয়ে আসা ও ভবিষ্যতে সেগুলির সদ্ব্যবহাব করার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত কবার প্রকৃত ইচ্ছে থাকলে অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত সাঙ্কেতিক বার্তা বিনিময়ের ব্যবস্থা অনুযায়ী সম্পর্ক স্থাপন করতে হ'ত; তাদের চট্টগ্রামে এসে অস্ত্র নিয়ে নিরাপদে রেল বা নদীপথে নিজ জেলায় ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে করে রাখতে হ'ত (সামান্য অস্ত্রাদি স্মাগল্ করতে গিয়ে বা ছোটখাটো স্বদেশী ডাকাতি করতে গিয়ে বন্ধুরা ধরা পড়ে গেছেন; মেছুয়াবাজারের বাড়িতে অস্ত্র নিয়ে যুবক বন্ধুর আসবার খবর পুলিস আগে থেকে জানতে পেরে তাদের গ্রেফতার করেছে—এইরূপ বহু নজির বর্তমান ছিল)। বাংলা দেশের বিভিন্ন দলের এইরূপ সাংগঠনিক দুর্বলতার ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের পরে সদা-জাগ্রত বৃটিশ-পুলিসের সতর্কতাকে উপেক্ষা ও বিভ্রান্ত করে অস্ত্র পাচার করা, গোপনে রাখা, গোপনে শিক্ষা দেওয়া, প্রভৃতির ব্যবস্থা করবার মত নির্ভরশীল সংগঠন না থাকায়, চট্টগ্রামের যুবকেরা সেই বিদ্রোহের রাতে যে সব অস্ত্র পেয়েছিল, এই উপায়ে তার সদ্ব্যবহারের কথা কেবলমাত্র কল্পনাই করা যায়—তা' বাস্তবে পরিণত করা কোন মতেই সম্ভব ছিল না।

বাংলা দেশে একটি বিপ্লবী দলও সেরূপ সুদৃঢ় সাংগঠনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না—এ কথা আমি কিন্তু একবারও মনে করি না। আর তা' মনে করবোও বা

কেন—কারণ, পরে দেখেছি বাংলাদেশে অনেক সফল বৈপ্লবিক কার্য (action) ঘটেছে। কিন্তু সেইসব সংগঠনকে আগে বেছে নেওয়া কি সম্ভব ছিল? কেন আমরা অন্যান্য বিপ্লবী দলের সঙ্গে একত্র হয়ে একটি সুপরিকল্পনা নিয়ে বিভিন্ন জেলায় একই দিনে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ করি নি, তা আমি আগেই বিশদভাবে আলোচনা করেছি। যদি আগে থেকে বিশেষ গবেষণা ও চিন্তা করে এই পরিকল্পনা আমরা বর্জন না করতাম তবে কোন তারতম্য না রেখেই বিভিন্ন দলের সঙ্গে আমাদের গুপ্ত কন্‌ফারেন্সে একসঙ্গে বসতে হ'ত। চট্টগ্রাম-বিদ্রোহের কয়েক মাস আগেই যখন মেছুয়াবাজার দলের হেডকোয়ার্টারের মত বিপ্লবী ঘাঁটিও বিশ্বাসঘাতক ও পুলিসের চক্রান্তে বিধ্বস্ত হওয়ার নজির আছে, তখন কি উপযুক্ত বিপ্লবী দলকে সঠিক বেছে নেওয়া সম্ভব হ'ত? তাই উপযুক্ত সংগঠন বাংলা দেশে থাকা সত্ত্বেও তাদের বেছে নিতে গেলে ভুলের সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। সেই যুগে বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটি ক্ষেত্রেও ভুল করাব চাইতে কোন দলের সঙ্গেই পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা না করাই শ্রেয় মনে করেছিলাম—ভেবেছিলাম সারা বাংলাদেশ জুড়ে বিপ্লবী প্রচেষ্টা সফল করতে গিয়ে অতীতের নিষ্ফলতার পুনরাবৃত্তির চাইতে অন্তত একটি জেলাতেও যুব-বিদ্রোহের নজির স্থাপন করার প্রয়োজন অনেক বেশি।

সব অস্ত্র সঙ্গে না এনে সেখানেই ধ্বংস করে আসা প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উঠতে পারে। সেইসব অস্ত্র এনে কোন গোপন স্থানে—এমন কি পর্বত-গুহা প্রভৃতিতেও কি রাখা সম্ভব ছিলনা? তা' হলে তো বাংলার বিপ্লবী তরুণেরা কোন সময় হয়ত সেইসব উদ্ধার করে আনতো—আপাতদৃষ্টিতে এইরূপ চিন্তার যুক্তি অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যায়, প্রচুর অস্ত্র সেইরূপভাবে সরিয়ে রাখাও বাস্তবে সম্ভব হ'ত না। প্রথমত, আমরা ·৩০৩ বোরের রাইফেল ও লুইস্‌গানের কার্তুজ পাই নি। তাই ম্যাগাজিন রাইফেল ও লুইস্‌গান সবগুলিই অকেজো হয়ে রইল বলে মনে হয়েছে। দ্বিতীয়ত, চারশ' ম্যাগাজিন রাইফেল ষাট জনের পক্ষে বয়ে নিয়ে যাওয়া যে কতখানি দুঃসাধ্য ব্যাপার তা ভেবে দেখা দরকার। তার ওপর যদি ঐ "অসংখ্য" রাইফেল (পিস্তল নয়) গোপনে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হলে পাহাড়ের ওপর ঐসব বয়ে নিয়ে উঠতে চেষ্টা করতে হ'ত, একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে বাস্তবে তা সম্ভব নয় (physically impossible)।

আলোচনার উপসংহারে এখন বলি—যদি ·৩০৩ বোরের কার্তুজের নির্ভুল সংবাদ আমাদের থাকতো, আর যদি পাহাড়ে না গিয়ে সমস্ত শক্তি নিয়ে শহরের বুকে এসে সুদৃঢ়ভাবে আমরা পজিশন নিতাম, তাহলে ১৯শে তারিখ সকালে চট্টগ্রামের তরুণরা বিপ্লবী-বাহিনীতে দলে দলে যোগ দিত। সেই ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই

আশা করা যায় যে, আমরা বাংলার অন্যান্য বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবার অনেক সময় ও সুযোগ পেতাম। তা' যদি নাও পারতাম তবু পোস্টে দাঁড়িয়ে আমাদের মরবার পর বাংলার তরুণরা যাতে অস্ত্রশস্ত্র পেতে পারে তার কোন না কোন বন্দোবস্ত করার সুযোগ যে পেতাম তাতে সন্দেহ নেই। আগেই স্বীকার করেছি আমাদের সামরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাবের জন্য এবং সর্বোপরি আমাদের morale নষ্ট হয়ে যাওয়াতে সঠিক নেতৃত্ব দিতে না পেরে বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিজেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম ও প্রধান-বাহিনী পাহাড়ে গিয়ে পজিশন নিল।

কেন অক্ষম হয়ে পড়লাম তা' নিয়ে আক্ষেপ করা চলে—অক্ষম না হওয়া উচিত ছিল ভেবে subjective mind-এর অভিব্যক্তি প্রকাশ করা যায়, তবু sum-total-এ যা fact তা' fact-ই থেকে যাবে। সেইজন্য চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের প্রথম অধ্যায়ের সফলতা, দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিশৃঙ্খলা ও তৃতীয় অধ্যায়ে জালালাবাদের পর্বতযুদ্ধে আমাদের সম্পূর্ণ জয়ের ইতিহাস আইরিশ বিপ্লবী নেতা লেলোরের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করে দেখতে হবে—তবেই মনে কোন সংশয় বা অভিযোগ থাকবে না।

প্রধান-বাহিনী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার পর আমরা প্রায় ঘণ্টাখানেক শহরে অপেক্ষা করেছি; তারপর ছয় সাত মাইল পাহাড়ের রাস্তা ধরে মোটরের হেড্‌লাইট জ্বালিয়ে তাদের সন্ধান করে বেড়িয়েছি, আবার শহরে ফিরে এসেছি—যদি ইতিমধ্যে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা শহরে এসে থাকে! কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে আর দেখা হ'ল না। আমরা তিনজন—আমি, গণেশ ও মাখন নৌকো করে শহর থেকে দূরে সমুদ্র উপকূলে পতেঙ্গা নামক স্থানে উপস্থিত হলাম। খোলা ধানক্ষেতের মধ্যে একটি খালি আটচালা। সেই আটচালাটিই আপাতত আমাদের আশ্রয়স্থল। চারিদিক খোলা, আশপাশে কোনও লোকজন নেই। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা ও পরবর্তী প্ল্যান করার জন্য বর্তমানে এই পরিত্যক্ত আটচালাটি খুবই উপযুক্ত মনে হ'ল।

রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য কোন অবস্থাপন্ন কৃষক যে এই আটচালাটি তৈরি করেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উপস্থিত আমরা এখানে বিশ্রাম নেব ঠিক করলাম। এখন সকাল প্রায় আটটা। মাখনকে পাঠালাম কিছু চিঁড়ে-দই নিয়ে আসতে। কিছুক্ষণের মধ্যে মাখন চিঁড়ে-দই নিয়ে ফিরে এলো। তৃপ্তি ও আনন্দের সঙ্গে আহার করেছি কিনা তা মনে নেই, তবে আমরা খেয়েছিলাম। গণেশ খুব সামান্যই খেল। দিনের আলোতে খুব স্পষ্ট দেখতে পেলাম তার মুখে কপালে ও হাতে চিকেন-পক্সের গুটি ফুটে উঠেছে।

গণেশকে অত্যন্ত ক্লান্ত ও দুর্বল দেখাচ্ছিল। তবু সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আমাদের

কারও পক্ষেই চুপ করে বসে থাকার উপায় ছিল না। গণেশ জ্বর গায়ে ক্লান্ত শরীরে আলোচনায় যোগ দিল। সবদিক ভেবে চিন্তে আলোচনা করে মোটামুটি এইরূপ একটি প্রোগ্রাম নিলাম—(১) শত্রু সৈন্য এসে পৌছবার আগে, খুব সম্ভব ১৯শে সন্ধ্যায় বা রাত্রে, আমাদের প্রধান-বাহিনী শহরে এসে প্রবেশ করবে। ১৯শে তারিখে রাত্রে বা ২০শে তারিখে সকাল এগারোটা বারোটার আগে শত্রু সৈন্য চট্টগ্রামে এসে পৌছতে পারবে না। (২) তাই আমরা সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে শহরে প্রবেশ করবো। (৩) যদি প্রধান-বাহিনী তখনও এসে না পৌছয় তবে আমরা শহরের একেবারে উত্তর-প্রান্তে আনন্দের বাড়িতে একবার খোঁজ নেব।

আমরা আনন্দ ও হিমাংশুকে আনন্দের বাড়ি টিলার নিচে ১৮ই তারিখ রাত্রে নামিয়ে দিয়ে এসেছি। কাজেই আমাদের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক যে, আমরা প্রথমে সেখানেই আনন্দ ও হিমাংশুর খোঁজ নেব। সেই একই দৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্তি দিয়ে মনে করলাম, আমাদের প্রধান-বাহিনী যদি সরাসরি শহরে প্রবেশ নাও করে, তবু তারা আমাদের অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যে আনন্দের বাড়িতে কাউকে পাঠাবেই ; কারণ, পুলিস লাইন থেকে আসবার সময় আমাদের গাড়িতে আনন্দ ও হিমাংশু ছিল। তা'ছাড়া প্রধান-বাহিনীর সঙ্গে আনন্দের বড় ভাই—দেবপ্রসাদ আছে। উপরন্তু আনন্দদের বাড়িটি একটি টিলার ওপর অবস্থিত এবং এই টিলাটি পর্বতশ্রেণী সংলগ্ন। তারা যে সর্বপ্রথম এই বাড়িটিতেই সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করবে সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ ছিলাম। কারণ, প্রধান-বাহিনী এই বাড়ির খুব কাছে এসে পাহাড়ে আত্মগোপন করে অপেক্ষা করতে পারবে এবং সংবাদবাহককে পাঠিয়ে আমাদের খবর নেওয়া তাদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক ও সহজ হবে বলেই আমরা ধরে নিয়েছিলাম।

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আমরা শহরে প্রবেশ করবো ঠিক করলাম। প্রায় চারটার সময় আবার নৌকো ভাড়া করে শহরের দিকে ফিরে এলাম। প্রায় সূর্যাস্তের সময় মাঝি আমাদের কথামত ডবলমুড়িং জেটির পশ্চিমে নৌকো ভেড়ালে আমরা নদী তীরে নেমে পড়লাম। একটু এগিয়ে একটি গাছের নিচে বসে আমরা তিনজন সূর্যাস্তের অপেক্ষা করছি, এমন সময় প্রায় আট-দশজন যুবক নদীর ধারে বিকেলে বেড়াতে এলো। মনে হ'ল তারা নিকটস্থ অঞ্চলের ছাত্র-যুবক। ওরা সকলে আমাদের তিনজনকে খুব লক্ষ্য করে দেখছিল। আমার মনে হ'ল, আমাদের কাউকে হয়ত ওরা চিনতেও পেরেছে। তবু তারা আমাদের কাছে এলো না। আমরাও মুখ ঘুরিয়ে রাখতে চেষ্টা করলাম, চিনতে পারলেও যেন একটু সংশয় থাকে। যেখানে বসেছি সেখান থেকে তাদের দূরত্ব খুব বেশি নয়। কথাবার্তা স্পষ্টই শোনা যাচ্ছিল। শহরের অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

কানে আসতে আমরা তাদের বাক্যালাপ শুনতে আরও বেশি মনোযোগী হলাম।

তাদের মধ্যে এই ধরণের কথাবার্তা চলছিল—একজন বললে: "শহর একদম খালি, দোকানপাট সব বন্ধ।"

দ্বিতীয়—"কি করে জানলে?"

প্রথম—"আমার কাকা দোকান বন্ধ করে পালিয়ে এসেছে।"

আর একজন—"একজন ইংরেজও শহরে নেই। তাদের ছেলে-মেয়েদের জাহাজে লুকিয়ে রেখেছে। বিকেলে আরও একদল ইংরেজ পরিবার ট্রেনে ডবলমুড়িং স্টেশনে এসেছে। তাদেরও লঞ্চে করে জাহাজে পাঠানো হয়েছে।"

প্রথম—"তাদের অবস্থা একেবারে সঙ্গীন! ইংরেজরা তাদের মেয়েদের জাহাজে পাঠিয়ে পুরুষেরা শহরের বাইরে পাহাড়তলীর উপকণ্ঠে নাকি আত্মরক্ষার জন্য ব্যূহ রচনা করেছে।"

দ্বিতীয়—"তুই কি করে জানলি?"

প্রথম—"আমাদের পাশের বাড়ির লোকেরা বলাবলি করছিল।"

তাদের কথা থেকে মোটামুটি বুঝতে পারলাম—শহর একেবারে খালি, ইংরেজ পুরুষেরা সবাই পাহাড়তলীর সাহেবপল্লীতে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় নিয়েছে, আর নদীবক্ষে মহিলা ও বালক-বালিকাদের নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করেছে।

সূর্য অস্ত গেল। আমরা আর দেরি না করে শহরের দিকে রওনা হলাম। ডবলমুড়িং-এর রাস্তা ধরে রেল-লাইন, তারপর রেল-লাইন ধরে শহরে প্রবেশের অপেক্ষাকৃত কম দূরত্বের পথ অতিক্রম করে সরকারী কলেজিয়েট স্কুল প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হলাম। আমাদের সকলের শ্রদ্ধাস্পদ এবং ছাত্রদের একান্ত প্রিয় হেডমাস্টারমশাই অশ্বিনীবাবুর (৺অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য) কোয়ার্টারের পাশ দিয়ে আমরা তিনজন কোন রকম গোপনতা অবলম্বন না করেই নির্ভয়ে চলেছি। তাঁরই ছাত্র আনন্দ, মাখন, দেবু, সহায়রাম, মতি, রজত, সুখেন্দু, মিহির প্রমুখ ছেলেরা আমাদের দলে ছিল। প্রত্যেকটি ছেলেই তাঁর অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। আমাদের সঙ্গে এখন মাখন আছে। যদি তখন তাঁর দেখা পেতাম তবে খুবই ভাল লাগতো। আমাদের বিশ্বাস ছিল তাঁর মত স্নেহপ্রবণ ও তেজস্বী শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের এইরূপ সাহস, স্বার্থত্যাগ ও স্বদেশপ্রেম দেখে নিশ্চয় খুশি হতেন এবং আমাদের আশীর্বাদ করতেন।

তখনও সন্ধ্যা হয় নি; তবু সমস্ত বাড়ির জানালা দরজা সব বন্ধ। অশ্বিনীবাবুর বাড়ির সামনে দিয়ে পথটি গিয়ে বড় রাস্তায় পড়েছে। সেই কাঁচা পথটি ধরে সোজা পুলিস-ক্লাবের পাশ দিয়ে এসে সদরঘাট হতে পল্টনে যাওয়ার প্রধান

সড়কে পৌছলাম। পথ জন-মানবশূন্য। আমরা শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকণ্ঠ থেকে একেবারে পূর্ব সীমানায় এলাম। এই সাত আট মাইল পথ অতিক্রম করার সময় মনে হ'ল শহরটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে।

আমরা শহরের প্রধান প্রধান সৈন্য ও পুলিস-ঘাঁটি অধিকার করে নেওয়ার পর ইংরেজ কর্তৃপক্ষ খুব তৎপরতা ও সাহসের সঙ্গে সেই রাত্রেই, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই, মেশিনগান নিয়ে আমাদের আক্রমণ করতে পরাঙ্মুখ হয় নি। ইংরেজ সমর-বিশারদেরা যখন বুঝলেন যে, আমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অক্ষত দেহে উধাও হয়েছি, তখন তাঁরা অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কায় আত্মরক্ষার জন্য অবস্থা অনুযায়ী নতুন রণকৌশল গ্রহণ করেন—শহর পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে পাহাড়তলীর সাহেবপল্লীতে ব্যূহ রচনা করা সাব্যস্ত করেন এবং তাঁদের সাহায্যার্থে বাইরে থেকে সৈন্য এসে পৌছবার আগে বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্মুখ-সমর বা তাদের অতর্কিত আক্রমণ পরিহার করে চলার কৌশলই শ্রেয় মনে করেন।

১৯শে তারিখ দিনের বেলা শত্রুপক্ষ নিজেদের বাঁচিয়ে, যেখানে তাদের বিপদের কোন আশঙ্কাই ছিল না সেই সব স্থানে, খুব সামান্য ঘোরাফেরা করেছে। অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কায় সন্ধ্যার আগেই সবাই আবার গা ঢাকা দিয়েছে।

এই সময় আমাদের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার প্রধান-বাহিনীর সঙ্গে অবস্থান করছে শহরের অনতিদূরে পাহাড় অঞ্চলে। ভাগ্যের এমনই পরিহাস! দুই পক্ষের মাঝখানে পড়ে আছে পরিত্যক্ত এই শহর, আর ঠিক যেন লক্ষণ সেন পরিত্যক্ত শহরের মতই এই শহরের বুকের ওপর দিয়ে আমরা তিনজন বখতিয়ার খিলজীর মত শহর জয় করে চলেছি। কোন পথচারী বা আর কোন সঙ্গীই আমাদের ছিল না—বর্তমানে আমাদের বন্ধু বা সহায় মাত্র গুলীভরা পিস্তল। প্রধান-বাহিনীকে তখনও পরিত্যক্ত শহরের বুকে দেখতে না পেয়ে মনে মনে খুব রাগ, ক্ষোভ ও দুঃখ হ'ল। নিজেকে শত সহস্রবার ধিক্কার দিলাম—কেন আমি প্রধান-বাহিনী ছেড়ে এক মুহূর্তের জন্যও চলে এলাম! কেন গণেশ ও আমি প্রধান-বাহিনীর সঙ্গে থেকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শহরে এসে শহর দখল করলাম না।

গত রাত্রে আনন্দ ও হিমাংশুকে যে টিলার নিচে নামিয়ে গেছি সেখানে এসে পৌছলাম। টিলাটির ওপরে আনন্দদের বাড়ি। বাড়িতে তার মা-বাবা, ছোড়দি, ছোটুকোন্ (আনন্দ ও দেবুর ছোট ভাই) এবং বাড়ির পুরোনো ভৃত্য ছাড়া আর কেউ তখনও না থাকাই সম্ভব। জানি না আনন্দ ও হিমাংশু কোথায়! আমরা ধরে নিলাম তাঁরা কেউ সেই বাড়িতে উপস্থিত থাকুক আর নাই থাকুক, তাদের কোন খবর হয়ত সেখানে পাওয়া যাবে—আর তখনও যদি প্রধান-বাহিনীর কাছ থেকে সংবাদ

এসে না পৌঁছয় তবু কিছুক্ষণের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ সংযোগ স্থাপন করতে সেই বাড়িতে আসবেই।

তখন মাত্র সন্ধ্যা সাতটা। চারপাশের অবস্থা ও ভাবগতিক দেখে মনে হ'ল পুলিস এই বাড়িতে হানা দেয় নি। কোনদিকেই শত্রুর চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু টিলার ওপর উঠতে গিয়ে প্রতিটি পদক্ষেপে ভয়ে যেন ভেতরটা শুকিয়ে যাচ্ছিল। শত্রুর অপ্রত্যাশিত আক্রমনকেও হয়ত আগে এতখানি ভয় করি নি। গতকাল রাত্রে যখন পুলিস-লাইন আক্রমণ করতে গিয়েছি তখনও আমার মনে এত শঙ্কা জাগে নি, টিলার ওপর উঠতে গিয়ে আতঙ্কে যেন শিউরে উঠছিলাম। কিসের ভয়? কেন এই আতঙ্ক, কি কারণে হৃদয় দুরু দুরু কাঁপছে? কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমরা আনন্দ ও দেবুর (শহীদ দেবপ্রসাদ গুপ্ত) মা-বাবা ও ছোড়দির সামনে গিয়ে দাঁড়াব! জানি না মাসীমা, মেসোমশাই ও ছোড়দির কাছে আজ আমাদের স্থান কোথায়! যে পরিবার আজ এতখানি ক্ষতিগ্রস্ত—যাঁদের এতখানি বিপদের বোঝা মাথায় নিতে হয়েছে, তাঁরা কি আমাদের ক্ষমা করতে পারবেন? তাঁরা কি আজ এই বাড়িতে আমাদের স্থান দেবেন—তাঁরা কি আরও বিপদের আশঙ্কায় ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়বেন না? তাঁরা কি আমাদের আগের মত সস্নেহ সম্ভাষণ জানাতে পারবেন, নাকি দূর থেকে দেখামাত্র রূঢ় প্রত্যাখ্যান জানাবেন—রাগে, ক্ষোভে, অভিমানভরে মুখ ফিরিয়ে নেবেন? মনের মধ্যে এইরূপ শত শত চিন্তা এসে ভিড় করছে। যতই টিলার ওপর উঠছি ততই এক অজানা ভয়ে বুক কাঁপছে! দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও সাহসে ভর করে আমরা এসে মাসীমা, মেসোমশাই ও ছোড়দির সামনে দাঁড়ালাম।

সে এক অপূর্ব দৃশ্য! কি এক অনাবিল আনন্দ—নির্বাক মহৎ স্বদেশ-প্রেমের কি সে মাধুর্য! আমাদের সব ভুল সব সংশয় সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এক নিমেষেই মিলিয়ে গেল। দু'হাত বাড়িয়ে তাঁরা গর্বের সঙ্গে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন—অকুণ্ঠ আশীর্বাদ করলেন, চট্টগ্রামের প্রতিটি বিপ্লবী সন্তানের মঙ্গল কামনা করলেন—আমাদের সঙ্কোচের আর কোন অবকাশ রইল না। আমরা একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম। এত ক্ষতি, এত বিপদ, এত উৎপীড়ন, নিষ্পেষণের সমস্ত ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কি করে তাঁরা তখনও স্থির ছিলেন জানি না। যখন একটু ভেবে দেখি তখন অবাক হতে হয়, দেবপ্রসাদ গুপ্ত বাড়ির বড় ছেলে সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে—প্রধান-বাহিনীতে থেকে ইংরেজ শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়ে আছে। সে যুদ্ধে প্রাণ দেবে। আনন্দও সক্রিয়ভাবে যুব-বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে। আজ সে বাড়িতে আছে। কাল বা আজ রাত্রেই হয়ত সেও বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে—হয়ত মেশিনগানের মুখে তারও

জীবন চলে যাবে। মা-বাবার কাছে দুটি পুত্রের জীবনের চেয়ে আর বেশি মূল্যবান কি থাকতে পারে? বাড়ির দু'টি ছেলের এই সশস্ত্র অভিযানে অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে আমরাই যে দায়ী, সেই সম্বন্ধে গতকাল রাত্রেই আমাকে তাঁরা অভিমানভরে অনুযোগ জানিয়েছেন—ছোড়দি বলেছিলেন—"দুজনকেই আপনাদের সশস্ত্র সংগ্রামে নেওয়া উচিত হয়নি।" মাসীমা ব্যথিত অন্তরে আবেদন জানিয়েছিলেন—"টুনুকে (আনন্দ) অন্তত নিষ্কৃতি দাও তোমরা!" তখন তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়ার কোন ভাষা আমার ছিল না। কেবল বিবেক আমার অন্তরে অভয় দিয়ে বলে উঠেছিল—"ভয় নেই, চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের আদর্শ পিতা-মাতার অন্তর দু'টি কেন, শত পুত্র বিয়োগের ব্যথাতেও কাতর না হয়ে পুত্রদের বিজয় গৌরবে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে!

বুকে এই আশা নিয়ে আমি আগের দিন রাত্রে মাসীমা ও ছোড়দিকে কোন সদুত্তর না দিয়েই আনন্দের সঙ্গে চলে গিয়েছিলাম। আজকে তাঁরা সেই উত্তর পেয়েছেন। আমাদের তাঁরা ক্ষমা করেছেন। পুত্রের জন্য স্বাভাবিক চিন্তা, বিপদের আশঙ্কা ও চিরকালের জন্য তাদের হারাবার ভয় তাঁদের মনকে বিচলিত করেছে সন্দেহ নেই, তবু তরুণ বিপ্লবীদের স্বাধীনতা যুদ্ধকে তাঁরা আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিগত দিনের ছোট্ট এই ঘটনাটি কোনদিনই ভুলি নি—ভুলবও না। সে আজকের কথা নয়। বৃটিশ সরকারের দুর্দমনীয় শক্তি তখনও বিরাজমান। কতখানি সাহস, কতখানি ধৈর্য্য, কতখানি অত্যাচার ও উৎপীড়ন উপেক্ষা করবার মত মনোবল থাকলে তবে আমাদের মত সশস্ত্র বিপ্লবীদের সেই একটি রাত্রের জন্যও নিজ বাড়িতে স্থান দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল!

এতক্ষণ মাসীমা, মেসোমশাই ও ছোড়দির কথাই বললাম। আনন্দ বাড়িতে ছিল। আমরা এসেছি দেখে সে যেন হাতে স্বর্গ পেল। এতক্ষণ সে যেন অসহায় অবস্থায় সমুদ্রের মধ্যে ভেসে বেড়িয়েছে—কোথাও কোন একটি অবলম্বন পাওয়া যায় কিনা ভেবেছে, কিন্তু নিরাশ হয়ে সময় কাটিয়েছে মাত্র। ভেবেছিল আমাদের কারও সঙ্গেই তার আর যোগাযোগ হবে না। গতরাত্রে কি ভেবে সে হিমাংশুর সঙ্গে নেমে পড়েছিল তার সঠিক কারণ সে কোনদিনই নির্ণয় করতে পারে নি। আমরা যখন চলে গেলাম তার কিছুক্ষণ পরে সে একেবারে অস্থির হয়ে পড়ে—কি করে আমাদের সঙ্গে আবার মিলিত হবে! হিমাংশু তার নিজ বাড়িতে চলে গেল। আনন্দ একেবারে একা। ক্ষণিক ভুলের জন্য অস্থিরতা অনিশ্চয়তাও আশঙ্কার মধ্যে তাকে প্রায় বারো ঘণ্টা শাস্তি পেতে হয়েছে। এখন আনন্দ আমাদের পেয়ে খুব উৎসাহিত বোধ করলো।

আগের দিন রাত্রের অভিজ্ঞতার পরে, মেশিনগানের গুলীর মুখ থেকে একবার

বেঁচে ফিরে এসে আনন্দ আবার মৃত্যুমুখে না গিয়া অন্যত্র পালিয়ে যেতে পারতো, কিন্তু আনন্দ সেই জাতের বিপ্লবী নয়। এখনও আমাদের যুদ্ধের প্রোগ্রাম সম্পন্ন করা বাকি আছে। সে আমাদের সঙ্গে মৃত্যুমুখেই যাবে। আনন্দের বিপ্লবীমনের পরিচয় দিলাম এই কারণে যে, পরে আমরা দেখতে পাব আমাদের কোন কোন তরুণ বন্ধুদের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দেয়—তারা বাস্তব জীবনে একবার মৃত্যু বিভীষিকার সম্মুখীন হয়ে আর সেদিকে যেতে চায় নি—সযত্নে বিপ্লবের পথ পরিহার করেছে। আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছি 'মরণ-পাগল' তরুণের দল অনভিজ্ঞ অবস্থায় যে সাহস নিয়ে বিপ্লবী দলে যোগ দিতে আসে, একবার মৃত্যুর মুখোমুখি হবার পর যুদ্ধে মরতে হলে যে সত্যিই কতটা সাহসের প্রযোজন, তা প্রথম উপলব্ধি করে এবং সেই সাহস না থাকায় একবার মৃত্যু বিভীষিকার বাস্তব অভিজ্ঞতার পর তাদের মধ্যে অধিকাংশই আর কখনও কোন প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষে অংশ গ্রহণ করে না। বাংলা দেশের বিপ্লবীদেব অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করে আজ এই রূঢ় অথচ বাস্তব সত্য অস্বীকাব করা যাবে না—মনের মধ্যে বৈপ্লবিক আদর্শ পোষণ করা সত্ত্বেও এই তরুণদের মধ্যে অনেকেই আর কখনও কোন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে সাহসী হয় নি, নিষ্ক্রিয় হয়ে দলের মধ্যে থেকে আত্মসন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করেছে। ইতিহাস আরও সাক্ষ্য দেয় যে, শুধু তরুণেরাই নয় প্রবীণ বিপ্লবী নেতারা, যাঁরা সমস্ত অন্তর দিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনায়তা উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের মধ্যেও মাত্র কয়েকজন নিষ্ঠাবান বিপ্লবী ভিন্ন আর কেউ কোন সশস্ত্র সঙ্ঘর্ষে অংশগ্রহণ করেন নি, এমন কি আর কখনও রিভলভার বা বন্দুক পিস্তলের সংস্পর্শে আসার সাহসও রাখেন নি। এই সত্য উদ্‌ঘাটন করে আজ আমি কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনতে চাই না। আমাব শুধু এইটুকু অনুরোধ প্রবীণ বিপ্লবী নেতারা যদি নিজ নিজ ত্রুটি-বিচ্যুতি আগামী দিনের তরুণদের জানিয়ে দেন, তবে তাঁরা কারও কাছে ছোট হবেন না, বরঞ্চ তরুণেরা তা' থেকে শিক্ষালাভ করতে পারবে। তরুণদের একান্তভাবে জানা উচিত বইয়ের পাতায় বিপ্লবের চিন্তা আর কার্যক্ষেত্রে সশস্ত্র সংগ্রাম এক নয়—তার জন্য চাই গভীর অন্তদৃষ্টি ও prolonged subjective preparation (দীর্ঘদিনের মানসিক প্রস্তুতি)।

সেই রাত্রে প্রধান-বাহিনীর সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত আনন্দের বাড়িতে অপেক্ষা করাই ঠিক হ'ল। তাদের সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত এই বাড়িতে অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোন কার্যকরী পথও ছিল না। এই বাড়ীতে মাসীমার তত্ত্বাবধানে আমাদের আর কোন ভাবনাই রইল না। মাসীমা, ছোড়দি ও স্বয়ং মেসোমশাই আমাদের রক্ষার ভার নিলেন। স্থির করলেন তাঁরাই পালা করে

সারারাত জেগে পাহারা দেবেন—আমরা অভুক্ত ক্লান্ত, তাই যা পারি কিছু খেয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়ি; তাঁরাই আমাদের আগে থেকে শত্রুর আগমন সংবাদ দেবেন, আর প্রধান বাহিনী থেকে যদি কেউ সংযোগ স্থাপন করতে আসে তবে তো আমাদের তাঁরা ডেকে দেবেনই; তাই দেরি না করে আমরা যেন খাওয়ার পর বিশ্রাম নিই।

তাঁদের আগ্রহ ও যত্ন দেখে আমাদের মনে হচ্ছিল সার্থক আমাদের বিপ্লবী অভিযান। গুলীভরা তুটো করে রিভলভার সঙ্গে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি তা' জানি না। যতই আশা করি না কেন, আশ্চর্য যে, প্রধান-বাহিনীর কোন সংবাদবাহক এই বাড়িতে এলো না। ঘুম ভাঙলে দেখি জানালার ফাঁকে সূর্যের আলো ঘরের মেঝেয় এসে পড়েছে। চট্ করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। চা খাওয়ার ডাক এসেছে। খাবার টেবিলের চারপাশে আমারা চারটি চেয়ারে বসলাম। চা ও খাবার এসে পৌছতে তখনও কিছু বাকি। তাই সময়ের সদ্ব্যবহার করার ইচ্ছে হ'ল। কিছু কেরোসিন চেয়ে নিয়ে আমরা আমাদের আটটি রিভলভার ও পিস্তল পরিষ্কার করতে আরম্ভ করলাম।

সকাল থেকে ছোট্‌কোন্ (আনন্দের ছোট ভাই) টিলার নিচে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল। তখন তার বয়স মাত্র আট নয় হবে। তাকে শেখানো ছিল—যদি পুলিস পার্টিকে দূরে আসতে দেখে তবে সে আগে থেকে চেঁচিয়ে পুলিসের আগমন-বার্তা মাসীমাদের জানাবে। ছোট হলেও ছোট্‌কোন্‌কে এই বিষয়ে নির্ভর করা যেত। তবে এই বাড়িতে পুলিস আসবার কোন কারণ আছে বলে আমরা মনে করি নি। কেন আসবে এখানে? এখানে যে দেবু আনন্দ কেউ নেই সে ধারণা করার মত যথেষ্ট তথ্য পুলিসের কাছে ছিল। তবু আমরা ছোট্‌কোন্‌কে পাহারায় মোতায়েন করেছিলাম।

আমাদের রিভলভার পরিষ্কার করা তখনও শেষ হয় নি—ছোড়দি খাওয়ার প্লেট হাতে দরজায় পা দিয়েছেন, আর তক্ষুণি ছোট্‌কোনের আওয়াজ শুনতে পেলাম —"মা, আসছে! মা, আসছে।" সেই চীৎকার শুনে চা খাওয়া আর হ'ল না। রিভলভার পরিষ্কারের তো কথাই ওঠে না। মুহূর্তে আমরা তৈরি হয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে একেবারে সংলগ্ন পাহাড়ের সারির মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম।

এই বাড়ির টিলার নিচে দাঁড়িয়ে প্রায় তু'শ' গজ বিস্তৃত রাস্তার উভয় প্রান্তে দৃষ্টি রাখা সম্ভব ছিল। ছোট্‌কোন্ পুলিসের ছোট্ট একটি দলকে দেখতে পেয়েই চীৎকার করে জানিয়েছে। প্রায় তু'শ গজ রাস্তা মোটরে এসে টিলার নিচে গাড়ি রেখে পুলিসদের আরও প্রায় একশ' গজ টিলাটি বেয়ে উঠে তারপর বাড়িতে

ঢুকতে হয়েছে। কাজেই পুলিস এসে পৌছবার আগেই আমরা পাহাড়ের কোলে জঙ্গলের মধ্যে অন্তর্হিত হলাম।

এই বাড়ির আধমাইল দূরে পাহাড়ের আড়ালে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঘণ্টাখানেক পরে, প্রায় সকাল দশটায় সাহসে ভর করে আমরা চারজন—মাখন, আনন্দ, গণেশ ও আমি—আবার আনন্দের বাড়ির দিকে অগ্রসর হলাম। যাদের অসহায় অবস্থায় পুলিসের সম্মুখীন হতে দেখে এসেছি, তাদের কি হ'ল জানা প্রয়োজন। এই কর্তব্যবোধের তাগিদে পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে আবার সেই পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলাম।

মাসীমা ও ছোড়দির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম কি যেন দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাঁরা খুব বিচলিত। অত্যন্ত ব্যাকুল, ও হতবুদ্ধি হয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের এক অমঙ্গল আশঙ্কায় একেবারে যেন মুষড়ে পড়েছেন। আমাদের দেখতে পেয়ে তারা খুব অবাক হ'লেন—ভাবতে পারেন নি দিনের আলোতে আবার এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা সেখানে ফিরে আসবো।

ভীত-ত্রস্ত স্বরে তাঁরা আমাদের জানালেন—আনন্দের পিতাকে পুলিস গ্রেফতার করেছে। পুলিস তাঁর কাছে হিমাংশুর নামে ডাক্তারের একটি প্রেসক্রিপসন পেয়েছে এবং হিমাংশুর জন্য যে ওষুধ আনছিলেন তাও পুলিস হাতেনাতে ধরেছে। পুলিস তাঁকে থানায় নিয়ে গেছে।

মাসীমার কি ভয়ানক বিপদ! তাঁর মানসিক অবস্থা শুধু অনুভবই করা যায়, প্রকাশ করা যায় না। বড় ছেলে প্রধান-বাহিনীর সঙ্গে মৃত্যু-প্রতীক্ষায় আছে; দ্বিতীয় ছেলে আমাদের সঙ্গে আসন্ন বিপদের মুখে চরম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে সময় কাটাচ্ছে, আর স্বামী শত্রু কবলিত!

এইরূপ মানসিক অশান্তি, আশু বিপদের আশঙ্কা—এই অবস্থায় তাঁদের কিইবা সান্ত্বনা দেব, কিইবা অভয়বাণী শোনাব! এত বড় বিপদে মাসীমা খুবই বিচলিত হয়েছেন বটে কিন্তু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্যের হানি ঘটে নি—নিজেকে স্থির রাখবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন।

তিনি খুব শান্ত ধীরকণ্ঠে আমাদের বললেন—"তোমাদের আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা ঠিক হবে না বাবা। এখানে থাকলে প্রাণ দিয়েও আমরা তোমাদের রক্ষা করতে পারবো না। তোমরা আর কোন নিরাপদ স্থানে চলে যাও।" বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে আসছিল। চোখ দু'টি জলে ভরে গেল। নিজকে সম্বরণ করে আবেগভরে আবার বললেন—"আমার প্রাণভরা আশীর্বাদ রইল। ভগবান তোমাদের রক্ষা করবেন।" এইটুকু বলে তিনি যেন সব ভাষা হারিয়ে ফেললেন—কেবল সজল নয়নের দৃষ্টিতে তাঁর অন্তরের অফুরন্ত আশীর্বাদ প্রকাশ পাচ্ছিল।

ছোড়দি নির্বাক নিস্তব্ধ। ছোট্‌কোন্ বিমূঢ় বিস্ময়ে চেয়ে আছে। সে যেন সবটুকু বুঝতে পারছিল না। তবে সে বুঝেছে তার দাদারা ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এতেই সে খুব খুশি। তবে মা'র চোখে জল কেন? ছোড়দির চোখ কেন তবে ছল-ছল? ছোট্‌কোন্ একবাব মা'র কাছে আর একবার ছোড়দির কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছিল—"তুমি কাঁদছ কেন মা? ছোড়দি, তুই বা অমন করছিস্ কেন? দাদারা তো যুদ্ধ করবে—ভয় কি—আমাদের স্বাধীন হতে হবে তো!"

একেবারে নির্বাক দর্শকের মত আমবা চারজন এই জীবন-নাট্যের দৃশ্যটি দেখে ও শুনে গেলাম। আমাদের বলবার কিছুই ছিলনা। মাসীমাকে প্রণাম করলাম। আনন্দ—তাঁদেব আদবেব টুন্—মাযেব চরণধূলি মাথায় নিল, দিদির পা স্পর্শ কবে বিদায় নিল। অতি করুণ এই বিদায়ের পালা। ছোড়দির সব ধৈর্য, মাসীমার অসীম আত্মসংববণের ক্ষমতা কোথায় যেন বানেব জলে ভেসে গেল। মাসীমা আর থাকতে পাবলেন না। টুন্‌কে বুকে জড়িয়ে ধবলেন—আর যেন তিনি তাকে ছাড়বেন না। কত স্নেহ-চুম্বন, কত আদব, কত করে বুকে পিঠে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। আনন্দ বিহ্বল হয়ে পড়েছে, আবেগভরে মাকে বলল—"তুমি ভেবো না মা। তোমার আশীর্বাদ পেয়েছি, আব ভয় করি না। তোমার মত মা পেযেছি বলে আজ আমরা গর্বিত। মা, তুমি হাসিমুখে আমাদের বিদায় দাও।" পাছে ছেলেদের অমঙ্গল হয তাই মা চোখের জল মুছে হাসতে চেষ্টা কবলেন।

পেছনের সব টান, সকল আকর্ষণ ছেড়ে আমরা সম্মুখ পানে যাত্রা করলাম। মাসীমা আবার গণেশ ও আমাকে উদ্দেশ করে আকুলকণ্ঠে বলে উঠলেন—"তোমাদের হাতে টুন্ ও খোকাকে (দেবপ্রসাদ গুপ্ত) সঁপে দিলাম। তাদের ভাল-মন্দের সব ভার তোমাদের ওপর রইল। তোমরা বেঁচে থাক। তোমরা জয়ী হও। তোমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ সফল হোক্!"

আমরা তখন আরও দূরে এগিয়ে গেছি। তিনি চীৎকাব করে টুন্‌কে উদ্দেশ করে বললেন—"খোকাকে বলিস্ আমি তার ওপর একটুও রাগ করি নি। তোদের মা বলে আমি গর্বিতা—নিজেকে আজ ধন্য মনে করছি!"

১৮ই তারিখে রাত্রিতে যখন আনন্দের সঙ্গে বেরিয়ে আসি তখনও মাসীমা কাতবকণ্ঠে আমার কাছে "আবেদন" জানিয়েছিলেন—"খোকা আর টুনের ভাল-মন্দের সব ভার তোমার ওপর রইল।" আজ ২০শে তারিখে সকাল বেলা মাসীমা আবার সেই একই করুণ আবেদন জানালেন—"তোমাদের ওপর খোকা ও টুনের ভালমন্দের ভার রইল!" মাসীমার ব্যথিত অন্তরের আবেদনের উত্তর আমার হৃদয়ে ধ্বনিত হ'ল—"বৃটিশ শত্রুর সঙ্গে মরণ-যুদ্ধই আমাদের 'ভাল' আর সেই হ'ল আমাদের

'মন্দ'। কি আমি দিতে পারি তাদের? আমি তাদের দিতে পারি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বিনিদ্র রজনী ও সুদীর্ঘ চলার পথে ক্ষত-বিক্ষত চরণ-যুগল—সর্বশেষে মহৎ আদর্শ পালনের বিনিময়ে দিতে পারি বিজয় গৌরব"—গ্যারিবল্ডির কথাগুলি আমার হৃদয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো।

আমরা পাহাড়ের উঁচু নিচু পথে অনেকদূর এগিয়ে গেলাম। চোখের সামনে শুধু তাঁদের শোক-বিহ্বল গবোজ্জ্বল মুখগুলি ভাসতে লাগলো। দূর থেকে শেষবারের মত দু'হাত তুলে তাঁদের প্রণাম জানালাম। আজ ভাবছি তাঁদের স্বদেশপ্রেমের কাহিনী কি ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে না? কা'রা স্বদেশ-প্রেমের কথা কিভাবে লিখবেন জানি না—তবে দেশবাসী যে এই বিপ্লবী পরিবারের অবদান ভুলবেন না—শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন, সে বিশ্বাস আমার আছে।

দুপুরবেলা আনন্দের বাড়ির টিলাটির আধ মাইলের মধ্যে পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা কোন একটি নিরাপদ স্থানে বিশ্রাম করছিলাম। প্রধান-বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য আমরা আর কি করতে পারি? এই একটি প্রশ্নই আমাদের মনকে আলোড়িত করছিল। গণেশকে চিকেন-পক্স ও জ্বরে বেশ দুর্বল ও ক্লান্ত করেছে। তথাপি গণেশ, বিপ্লবী গণতন্ত্রীবাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার সৈন্যাধ্যক্ষ, এই দায়িত্ববোধ তাকে একেবারে অস্থির করে তুলেছে। প্রধান-বাহিনীর সঙ্গে আছেন চট্টগ্রাম শাখার ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিনীর প্রেসিডেন্ট সূর্য সেন। আমাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। শুধু বসে বসে চিন্তা করলে চলবে না। তাঁদের খুঁজে বার করবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। কোথায় খুঁজবো? এ যে একেবারে অসম্ভব! তবু আমরা বদ্ধপরিকর—খুঁজে বা'র করতেই হবে।

আমাদের ধারণা হয়েছিল, বিপ্লবী বাহিনীর প্রধান অংশ তখনও শহর থেকে দূরে যায় নি, শহরের উপকণ্ঠ থেকে পাঁচ-সাত মাইলের মধ্যেই কোন স্থানে হয়ত শিবির স্থাপন করেছে; এত অল্প সময়ে দুর্গম জঙ্গলপূর্ণ পাহাড়ী পথে খুব বেশি দূর যাওয়া সম্ভব নয়, তা'ছাড়া ওরাও নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও অপেক্ষা করে আমাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করবে। কাজেই যত কঠিন কাজই হোক্ না কেন, বুদ্ধি কৌশল ও একাগ্রতার সঙ্গে ওদের খুঁজে বার করবার জন্য আমাদের চেষ্টা করে দেখতেই হবে।

প্রায় একটা-দেড়টার সময় আমরা চারজন বাজিদ্‌বস্তানের (মুসলমানদের একটি দরগা, কিন্তু সব ধর্মমতের লোকই সেখানে পুজো দিতে যেত) রাস্তা ধরে আরও উত্তরে এগোতে লাগলাম। আমাদের চারজনেরই বাঙালীর পোশাক—ধুতি আর সার্ট। মাখন এবং আনন্দের গায়ের ফর্সা রং ও অল্প বয়স—এই দুই বৈশিষ্ট্যই

পথচারীদের মনে সন্দেহ উদ্রেকের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তবু একরকম বেপরোয়া হয়েই আমরা চারজন যতটুকু সম্ভব সাদা পোশাক পরা পুলিসের C.I.D.-র মত বেশভুষা ও হাবভাবের কতকগুলি বিশেষত্ব বজায় রেখে চলবার চেষ্টা করলাম। C.I.D. পুলিসের মত মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরে সার্টের হাতা গুটিয়ে কলারটাও বৈশিষ্ট্যস্বরূপ উল্টে দিলাম, পেন্সিল ও নোট-বইয়ের মত করে বুক পকেটে কাগজ গুঁজে রাখলাম এবং C.I.D. অনুচরদের মত হাঁটা, চাহনি ও ভাবভঙ্গী সব অনুকরণ করতে চেষ্টা করলাম।

সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পথের ধারে বেছে বেছে ছয়-সাতটি পান-বিড়ির দোকানে দোকানে ঘুরলাম। কখনও পান-বিড়ি কিনেছি আবার কখনও বা দোকানে বসে চা খেয়েছি। কেবল এক দোকানে বিড়ি কিনবার সময় চট্টগ্রামের ভাষায় প্রশ্ন করি—

"হেঁদুর পোয়া ঐ স্বদেশীঅল্ গেল কোঁডে? বড় দূরৎ আইজও যাইত্ ন পারে মত লার। পান-বিড়ি কিননের লাই ইক্যা কন কেউ আইস্যে নি?" (ঐ সব হিন্দুর ছেলে স্বদেশীরা গেল কোথায়? মনে হচ্ছে এখনও খুব দূরে যেতে পাবে নি। পান-বিড়ি কেনার জন্য এদিকে কি কেউ এসেছে?)।

দোকানদার -"ক্যেঁতে কৈয়ম্ বাউ, কোঁডে গেইয়ে। আঁরার দোয়ানত্ তারা কিল্যাই আইব?"—(কি করে বলবো বাবু কোথায় গেছে? আমাদের দোকানে কেন তারা আসবে?)।

দোকানদার আমাদের প্রশ্ন শুনে বোধহয় সন্দিগ্ধ হয়েছিল। সে অবশ্য উত্তর দিয়ে গেল কিন্তু তার চোখ-মুখ দেখে মনে হ'ল আমাদের সম্বন্ধে তার মনে প্রশ্ন জেগেছে—আমরা কারা? আমাদের সাহায্যে আসবে এমন বিশেষ কিছু সে বলতে পারবে বলে মনে হ'ল না, আর আমরাও তাকে বেশি ঘাঁটাতে চেষ্টা করলাম না। তারপর একটি চায়ের দোকানের সামনে বেঞ্চে বসে চা খেতে খেতে আর তিন-চারজনের কথাবার্তা শুনছিলাম। তা'দের কথাবার্তা শুনে বুঝলাম শহর তখনও একেবারে খালি—বাইরে থেকে মিলিটারী এসে পৌছয় নি। কানে এলো একজন বলছে—"বাইরে থেকে তারা প্রচুর সেপাই আনবে, আর তারপর চট্টগ্রাম শহর একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। তখন মজা বুঝবে বাবুরা!" বলাই বাহুল্য, তারা সবাই চট্টগ্রামের ভাষায় কথা বলছিল। যে বলছিল তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আর একজন বলে উঠলো—"কি বলছিস্ মিঞা? তাদের প্রাণে কি কোন ভয়ডর আছে? তারা কি কাউকে পরোয়া করে?"

তাদের মধ্যে এই ধরনের কথা শুনে বেশ মজা লাগছিল। আমরা যতক্ষণ পারি বসলাম—হয়ত কোন নতুন কথা শুনবো বা প্রধান-বাহিনীর সম্বন্ধে তাদের

কথার মধ্যে কোন হদিস পাবো! কিন্তু বেশিক্ষণ সেখানে বসা আমাদের পক্ষে আর সম্ভব হ'ল না। তাদের সবার উৎসুক দৃষ্টি আমাদের প্রতি নিবদ্ধ ছিল এবং তাদের চোখমুখ দেখে যে কেউই বুঝবে যে, এই চারজন আগন্তুককে তারা কোনমতেই "সাধারণ আগন্তুক" বলে মেনে নিতে পারছে না। তাদের মধ্যে একজন আমাদের প্রশ্ন করে বসলো—

"আপনারা কা'রা? কোথেকে এসেছেন? কোথায় যাচ্ছেন?"

এইরূপ প্রশ্নের সম্মুখীন যে হতে পারি, সে সম্বন্ধে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। উত্তর দিলাম—

"আমবা শহর থেকে আসছি। বিদ্রোহীদের খোঁজ পেতে চাই—এই ই আমাদের ডিউটি। যদি কেউ খবর দিতে পারেন সরকার তাঁকে অনেক পুবস্কার দেবেন।"

মনে হ'ল আমাদেব পুলিসেব গোয়েন্দা বলে তাদের মন স্বীকার করে নিতে চাইছে না। আবার ভাবছে, সত্যি যদি আমরা পুলিস হই তবে তাদেব পক্ষে এমন কিছু করা বা বলা উচিত হবে না যাতে বিদ্রোহীদের কোন ক্ষতি হতে পারে। তাই আমাদের উত্তর শুনে একটু থেমে গেল। তারপর আর একজন বলল—

"তাদের সংবাদ কি আমাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব? কোথায় গেছে, কোথায় লুকিয়ে আছে তা' কে জানে?···আচ্ছা শহবের খবর কি? এখনও পল্টন এসে পৌছয় নি?"

সেই ভদ্রলোক এইভাবে কথা বলবার সময় সেখানে আর যা'রা উপস্থিত ছিল, তারা পরস্পরের মধ্যে ফিস্‌ফিস্ করে আমাদের সম্বন্ধেই আলোচনা কবছিল এবং তার দু'একটা কথাও কানে এলো—"এ-উনও স্বদেশী মত লার।"—(এরাও যেন স্বদেশী মনে হচ্ছে)।

আর বেশিক্ষণ সেখানে থাকা উচিত হবে না ভেবে চায়ের দাম মিটিয়ে দিলাম। দাম মেটাবার সময় যার সঙ্গে কথা বলছিলাম তাকে চট্টগ্রামের ভাষায় উত্তর দিলাম, যার অর্থ—'খুব শীঘ্রই বহু সৈন্য আসছে; সারা শহর ছেয়ে ফেলবে। ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদের খবর পেতেই হবে। আচ্ছা, আসি আমরা এবারে।' আমরা আরও তিন-চার জায়গায় 'বিদ্রোহীদের' সম্বন্ধে নানাভাবে কথা তুলেছি। কেউ বা সন্দেহ করেছে, কেউ বা প্রশ্ন করেছে—কে আমরা? এক জায়গায় আমাদের শাসিয়েছে—"হুঁসিয়ার থাকবেন। আপনাদের উদ্দেশ্য জানলে ও খোঁজ পেলে তারা আপনাদের মেরে ফেলবে। আমরা বাবু কোন ঝামেলায় থাকতে চাই না।"

দুপুর রৌদ্রে এইভাবে ঘোরাঘুরি করে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। হেঁটেই বা কি হবে—কোথায় তাদের সন্ধান পাবো?

পুলিস-লাইনের দু'তিন মাইলের মধ্যে এবং পাঁচালাইশ রেল-স্টেশনের আধ মাইল অন্তবর্তী রেল-লাইনের ধারে একটি গাছের ছায়ায় আমরা বসে পড়লাম। কোথায় একটু জল পাবো ? পুকুর, ডোবা, টিউবওয়েল বা কোন চাষীর বাড়ি, কিছুই চোখে পড়ছে না। দূরে ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে যখন জলের সন্ধানে ব্যস্ত, তখন কে জানতো আমাদের কাছেই রয়েছে তৃষ্ণা নিবারণের বস্তু! যেখানে বসেছি তারই কয়েক হাতের মধ্যে দেখতে পেলাম একটি তরমুজ ক্ষেত। প্রচুর তরমুজ। তৃষ্ণা যেন এখন আরও বেড়ে গেল। তরমুজ পেলে যেন এখনই খাই। সামনেই একজন গ্রামবাসী দাঁড়িয়ে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম এই তরমুজ ক্ষেতটি কার এবং অভিপ্রায় জানালাম —আমরা তরমুজ কিনতে চাই। সৌভাগ্য আমাদের, সেই কৃষকটিই তরমুজ ক্ষেতের মালিক। বয়স তাব প্রায় তিরিশ হবে—জাতিতে মুসলমান। তার কাছে আমাদেব তরমুজ কিনবার ইচ্ছে জানালাম। বড় বড় দু'টি তরমুজ সে খুব খুশি মনেই এনে দিল। ন্যায্য মূল্যে আমরা তা' কিনে নিলাম।

তরমুজ দুটো কেটে ছোট ছোট ফালি করে কেউ বসা কেউ বা অর্ধশায়িত অবস্থায় খেতে সুরু করলাম। সেই চাষীভাই সেখানে দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট চিত্তে আমাদের তরমুজ খাওয়া দেখছে। আপন মনে আমরা যে যা' পেয়েছি খেয়ে চলেছি। এমন সময় আমাদের চমকে দিয়ে চাষীভাই বলে উঠলো—"বাউ উইক্যা চাতক্। দেইখ্যন্ নি সিপাই অল্ আইয়ের যে? হেঁদুর পোয়া দেইলেই তারা ধরিব। অঁনরা খাই যাতক্গৈ।"—(বাবু ঐ দিকে দেখুন। দেখেছেন সিপাই আসছে! হিন্দুর ছেলে দেখলেই তারা গ্রেফতার করবে। আপনারা পালিয়ে যান)।

সত্যিই দেখলাম বহু সৈন্য High Port-arms-এর পজিশনে, অর্থাৎ বুকের সামনে আড়াআড়িভাবে দু'হাতে বন্দুক ধরে প্রস্তুত হয়ে চলেছে, যেন কোন আসন্ন শত্রুর সম্মুখীন হবে। প্রত্যেকটি রাইফেলের মাথায় সঙ্গীন চড়ানো। সৈন্যরা রেল-লাইনের ওপর দিয়ে হেঁটে আমাদের দিকে আসছিল। সৈন্যদের প্রতি চাষীভাই যখন আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করলো তখন আমাদের ও তাদের মধ্যে ব্যবধান প্রায় এক শ' গজের মত। কোথায় তাদের গন্তব্যস্থল তা' সঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। তবে আমরা যে তাদের লক্ষ্যবস্তু নই তা' দূর থেকে বুঝতে আমাদের অসুবিধা হ'ল না। তাদেব গতিপথের ধারেই একটা গাছতলায় আমরা বসেছিলাম। আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা আমাদের সন্দেহ করবে না ভাবার কোন কারণ নেই। তা'ছাড়া এই পল্টনের সঙ্গে চট্টগ্রামের পুলিসবাহিনীর কর্মচারীরা যদি থাকে তবে গণেশ ও আমাকে দেখতে পেলেই যে চিনবে তা'তে কোনই সন্দেহ ছিল না। এত সব কথা লিখতে বা পড়তে যা সময় লাগছে তার সহস্র ভগ্নাংশের এক অংশেরও কম সময়ে আমাদের মনে এ সব চিন্তা এসেছে। সৈন্যদের দেখামাত্র আমাদের হৃদয় আসন্ন ভয়ে

কেঁপে উঠলো। এই ভয়-মৃত্যু ভয় নয়। এখন আমাদের চিন্তা, আমাদের পরিকল্পনা—যে কোন উপায়ে প্রধান-বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা। তাই এই অপ্রত্যাশিত বিপদের সামনে পড়া খুবই অবাঞ্ছিত—আশু লক্ষ্যে পৌছবার আগেই যেন সব শেষ হয়ে না যায়—সেই জন্যই ভয়। কিন্তু বিপদ তখন ঘরের দরজায়, আর আমাদের তো বিপদ-সমুদ্রেই বাস, শিশিরবিন্দুতুল্য এই সামান্য বিপদ কি আমাদের মনে সাহসের অভাব ঘটাতে পারে?

সাহস আছে ঠিকই, তবু অজানা আশঙ্কায় বুক কাঁপছে—এইরূপ ক্ষেত্রে বুক কেঁপেই থাকে। কোমরবন্ধের সঙ্গে বাঁধা রিভলভারগুলিকে চাষীভাইয়ের অজান্তে একটু ঠিক করে নিলাম—যেন সময়ে ব্যবহার করতে একটুও দেরি না হয়। সৈন্যদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে চাষীভাই যেরূপ বন্ধুত্বপূর্ণ কাজ করেছে, তার জন্য তাকে মনে মনে অজস্র ধন্যবাদ দিলাম। কিন্তু মুখে তা' প্রকাশ করতে পারলাম না। যতদূব সম্ভব স্বাভাবিকতা বজায় রেখে চাষীভাইকে চট্টগ্রামের ভাষায় উত্তর দিলাম—"সিপাই আইয়ের ত' আঁরাব কি? আঁরা চোর না? ধাইর কেয়া?"—(সেপাই আসছে তো আমাদের কি? আমারা কি চোর? পালাব কেন?)।

মুখে তো খুব বড়াই করে চাষীভাইকে জানালাম সেপাই আমাদের কি করবে, পালাবো কেন - ইত্যাদি। কিন্তু বুঝতেই পারছেন আমাদের অবস্থাটা। মনে মনে প্রমাদ গুণছিলাম—কয়েক মিনিটের মধ্যে সম্মুখ-সমরে আমাদের প্রাণ দিতে হবে! তবে কেবল প্রাণ দেব না—প্রাণ নেবও। সঙ্কটময় মুহূর্তগুলি কিভাবে কেটেছিল তা' লিখে বোঝানো যায় না। সেপাইরা মার্চ করে আসছে। বিশ-ত্রিশ গজ মাত্র বাকি। আশ্চর্য! আমাদের দিকে তাদের একেবারেই লক্ষ্য ছিল না। তারা তো যাচ্ছে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। রেল-লাইনের ধারে সাদা পোশাকে সাধারণ চারজন লোকের মধ্যে বিপ্লবী বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ স্বয়ং ও সহকারীরা যে বসে আছে, তা' তারা কি করে বুঝবে? উদ্যত সঙ্গীন হাতে সৈন্যদল রেল-লাইনের বাঁ দিকে, অর্থাৎ উত্তরে নেমে নিকটস্থ পাহাড়ের দিকে রওনা হ'ল। আমরা বসেছিলাম লাইনের অপর পারে—দক্ষিণে। খুব বেশি হলেও আমাদের থেকে বিশ-পঁচিশ গজ সামনে দিয়ে আমাদের ভ্রূক্ষেপ না করেই তারা পাহাড়ের দিকে বিদ্রোহীদের খোঁজে চলে গেল।

এখন বিকেল প্রায় চারটে-সাড়ে চারটে। বিশ তারিখ বিকেলে যখন আমরা সৈন্যবাহিনী দেখতে পাই, তখন অনুমান করেছি অন্তত চার-পাঁচ ঘণ্টা আগে বৃটিশ সরকারের সৈন্য চট্টগ্রামে এসে পৌছেছে। বিশ তারিখ সকাল পর্যন্ত সামরিক শক্তির Balance of Power আমাদের দিকে ছিল; আমরা যদি তখনও offensive

নিতাম তা'হলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস অবশিষ্ট শক্তি যা' ছিল তা' নিয়ে ইংরেজদের Defensive Position নেওয়া ছাড়া গতি ছিল না।

বিশ তারিখ রেল-লাইনের ধারে বসে পাহাড় অভিমুখে যে সৈন্যবাহিনীকে যেতে দেখতে পাই তার বিবরণ জাজ্‌মেণ্ট কপি থেকে উদ্ধৃত করছি—

"On the morning of the 20th April, a detachment of the Eastern Frontier Rifles consisting of about 120 men under col. Dallas Smith arrived from Dacca accompanied by Mr. Lowman, the Inspector General of Police, and the same day a small detachment consisting of about 30 men of the Surma Valley Light Horse (Auxiliary Force) also arrived. With the help of these reinforcements the local authorities set about the task of locating and capturing the raiders, who, it was suspected, had retired into the jungle clad hills which extend north-eastwards from the police lines. On the afternoon of 20th April, Mr. Lowman, Col. Dallas Smith, Mr. Johnson and Mr. Shooter with a party of about 100 men searched these hills up to Nagarkhana hill about two miles from the lines. On the Nagarkhana hill they found a piece of a black velvet badge with silver embroidery like those found at the police lines, and at the house of Ganesh Ghose and Ananta Singh..." (Judgement, Armoury Raid case No. 1, Page—68).

—কর্নেল ডালাস স্মিথের অধীনে ঢাকা থেকে ইস্টার্ন ফ্রণ্টিয়ার রাইফেলস্ রেজিমেণ্টের একশ' বিশজন সৈন্য কুড়ি তারিখ সকাল বেলা এসে পৌছয়। পুলিসের ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল মিঃ লোম্যান তাদের সঙ্গে এসে পৌছলেন। সেইদিন তিরিশ-জনের আরও একটি ছোট্ট সৈন্যদল—সুরমা ভ্যালি লাইট হর্স (অক্সিলিয়ারি ফোর্স) এসে গেল। চট্টগ্রামের কর্তৃপক্ষ এই সব সৈন্যদের আগমনে নব-শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বিদ্রোহীদের সন্ধান পাওয়া ও তাদের পাকড়াও করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। তাঁরা অনুমান করেন বিদ্রোহীরা পুলিস-লাইনের উত্তর পূর্বে বন-জঙ্গলে আবৃত পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে। কুড়ি তারিখ বিকেল বেলা মিঃ লোম্যান, কর্নেল ডালাস স্মিথ, মিঃ জনসন ও মিঃ স্যুটার একশ'জন সৈন্য নিয়ে নাগারখানা পাহাড় অনুসন্ধান করেন। পুলিস-লাইনের দু'মাইল দূরে এই পাহাড়টি অনুসন্ধান করে রূপালী জরির কাজ করা কালো ভেলভেট ব্যাজ তাঁরা কুড়িয়ে পান। একই রকমের ভেলভেট ব্যাজ কর্তৃপক্ষ পুলিস-লাইনে এবং গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহের বাড়িতেও পেয়েছে।

সরকারীপক্ষের সব বিবৃতি বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করা যায় যে, তাদের অনেক কথাই মিথ্যে এবং বিভ্রান্তিকর। সরকারীপক্ষের মিথ্যাচার উদ্‌ঘাটন করার উদ্দেশ্যে আমি বিপ্লবী যুগের এই অধ্যায়টি লিখছি না। তবে তাদের মিথ্যার স্বরূপ প্রকাশ করবার প্রয়োজন আছে—অন্তত একটি বিশেষ ক্ষেত্রে। জালালাবাদ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রণক্ষেত্র থেকে সেই রাত্রে তাবা পালিয়ে এসেছে—এই স্বীকারোক্তি মামলার সময় তারা দিয়েছে। সেই বর্ণনা আমরা পরে পাবো। যেহেতু তারা জালালাবাদ রণক্ষেত্রে পরাজিত হয়েছে, সেইহেতু একটা মিথ্যা সাফাইয়ের আবরণে এই পরাজয়ের গ্লানি ঢেকে রাখবার জন্য তাদের আপ্রাণ চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। তাদের উক্তি থেকেই জানতে পাচ্ছি—জালালাবাদ পাহাড়ে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তাবা মাত্র চৌষট্টিজন সৈন্য পাঠিয়েছিল। ২০শে এপ্রিল অনুমানের ওপর নির্ভর করে খোঁজাখুজি করবার জন্য যাদের একশ'জন সৈন্য সঙ্গে নেওয়া প্রয়োজন হয়েছে, তারাই আবার যুদ্ধ অনিবার্য জেনে মাত্র চৌষট্টিজন সৈন্য জালালাবাদ রণাঙ্গনে পাঠিয়েছে বলে সত্য গোপনের চেষ্টা করেছে। এই সব তথ্য আমি পরে প্রকাশ করবো।

আর একটি কথা। বিশ তারিখ সকালে ১২০ ও আবার ৩০ জন সৈন্য চট্টগ্রামে এলো এবং মাত্র পঞ্চাশজন সৈন্য শহর তত্ত্বাবধানের জন্য রেখে বাকি একশ'জনকে নিয়ে তারা বিদ্রোহীদের বন্দী করতে গেল—এটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। আমি পরে দেখাবো জেলা-শাসক মিঃ উইলকিন্‌সন নিজ মুখে বলেছেন, শহর আক্রান্ত হতে পারে এই আশঙ্কা করে তিনিই সবাইকে জালালাবাদ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শহরের নিরাপত্তার জন্য ফিরে আসতে আদেশ দিয়েছিলেন। যাঁদের কাছে শহরের নিরাপত্তা সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান, তাঁরা মাত্র পঞ্চাশজন সৈন্য শহরে রেখে আমাদের বন্দী করবার জন্য একশ' সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন—এটা অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য। পরে আমরা যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছি তা' থেকে নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি যে, ২০শে তারিখ সকাল বেলা Eastern Frontier Rifles-এর এক ব্যাটালিয়ান, প্রায় ৭৫০ বা ৮০০ সৈন্য ও Surma Valley Light Horse-এর দু'টি কম্পানি—প্রায় ৩৫০ জন সৈন্য, চট্টগ্রামে এসে পৌঁছয়।

আরও একটা বিশেষ জিনিস বিপ্লবীদের বুঝবার আছে। Internal Security (অন্তর্বর্তী নিরাপত্তা) রক্ষা করার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের কাছে সর্বপ্রধান; এবং সেইজন্যই তাঁরা প্রাদেশিক রাজধানী কলকাতা থেকে কোন সৈন্য অপসারণ করা সমীচীন মনে করেন নি। প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ কলকাতার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কিভাবে এবং কতখানি ব্যস্ত হয়েছিলেন সেই তথ্যও আমি পরে পরিবেশন করবো। চট্টগ্রামে আকস্মিক যুব-বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠায় তাঁরা বিস্মিত হন এবং বিপ্লবীরা কতখানি

প্রস্তুত তা প্রথমে বুঝতে পারেন নি। সেই জন্য আকস্মিক আক্রমণে বাংলাদেশের রাজধানী কলকাতাও যদি বিধ্বস্ত হয়, এই আশঙ্কায় নিরাপত্তার প্রাথমিক নীতি অনুযায়ী ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কলকাতাকে সুরক্ষিত রাখবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। সেইরূপ বিবেচনা করেই তাঁরা ঢাকা থেকে সৈন্য পাঠালেন। ১৯৩০ সালে ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি ছিল অতি সামান্য। প্রধান শহর বা রাজধানী যদি যুগপৎ অতর্কিত আক্রমণে দখল করা যেত, তবে বৃটিশ সরকারকে পরাস্ত করার জন্য সেটি যে কাযতঃ একটি বাস্তব রণনীতি হ'ত, তা' আমাদের অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু অতীতের বহু ব্যর্থতা ও বিশ্বাসঘাতকতার অভিজ্ঞতা থাকায় সেইরূপ ব্যাপক পরিকল্পনা ও সংগঠন গড়ে তুলবার জন্য আমরা যে চেষ্টা করিনি, তা আগেই বলেছি। আমাদের অজ্ঞতার জন্য নয়, অক্ষমতাবশতই সেই যুগে রাজধানী আক্রমণের প্ল্যান করতে পারি নি। সেই পরিস্থিতিতে ভেবেছিলাম, যদি একটি বিপ্লবী দল নিজেদের সীমিত শক্তি নিয়ে গোপনভাবে সব আয়োজন সম্পন্ন করে একটি জেলাও অধিকার করতে পারে, তবে সেই সফলতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতের বিপ্লবীরা ইংরেজ শাসন অবসানের জন্য কলকাতার মত প্রধান শহরে দশটি করে সেইরূপ দুর্ভেদ্য বিপ্লবী সংগঠন কি গড়ে তুলতে পারবে না? সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের যুবকেরা 'ভবিষ্যতের পানে' তাকিয়ে এইরূপ একটি বিপ্লবী দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিল। Example is greater than precepts!—বাস্তব দৃষ্টান্ত নীতিবাক্য থেকে অনেক বেশি কার্যকরী!

এদিকে আমরা তখনও তরমুজ হাতে বসে—আর এক হাতে চাষী ভাইয়ের দৃষ্টির অগোচরে কোমরে রাখা রিভলভারটি অনুভব করছিলাম। সৈন্যরা আমাদের অবহেলা করেই দুর্ধর্ষ বিপ্লবীদের "বন্দী" করবার উদ্দেশ্যে বীরদর্পে নাগারখানা পাহাড়ের দিকে চলে গেল। এই নাগারখানা পাহাড়ই সেই অতীত বিপ্লবী ঐতিহ্য বহন করছে। এই সেই পাহাড় যার পাদদেশে ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে চৌকিদারের সঙ্গে আমার গুলী বিনিময় হয়; এই সেই পাহাড় যার বুকের ওপর আমার রিভলভারের গুলীতে আহত হয়ে রক্তাক্ত কলেবরে লুটিয়ে পড়েছিল দু'জন সেপাই—বীরমোহন ও আলি হোসেন; এই সেই পাহাড় যার প্রশস্ত হৃদয় সেই দিন ভবিষ্যৎ বিপ্লবের দিকে তাকিয়ে মাস্টারদা, নির্মলদা ও রাজেন দাসের পটাসিয়াম সায়ানাইডের সাহায্যে চিরনিদ্রিত দেহকে কোন এক মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রবলে পুনর্জীবিত করে তুলেছিল; এই সেই সৈন্যদল বেষ্টিত পাহাড়, ১৯২৩ সালে একজন সহৃদয় চাষীর সাহায্যে যার দৃঢ় বেষ্টনী ভেদ করে খোকা, অবনী ও আমি বেরিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছিলাম। নাগারখানা পাহাড়ের সেই বিপ্লবী ঐতিহ্য আজও কর্নেল ডালাস স্মিথ ও মিঃ

লোম্যানের সৈন্যদের বিমুখ করলো—শত্রুপক্ষকে সেদিন বিপ্লবীদের পরিত্যক্ত ভেলভেট ব্যাজ কুড়িয়ে পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হ'ল।

চট্টগ্রামের বিস্তৃত গিরিশ্রেণী সম্বন্ধে যাঁদের কিছু ধারণা আছে তাঁরাই বুঝবেন, খুব কাছাকাছিও যদি বন-জঙ্গল ঘেরা পর্বতের আড়ালে অবস্থান করা যায় তাহলে অপর পক্ষ তা সহজে জানতে পাবে না। এই কারণে, একেবারে আন্দাজে পাহাড়ের মধ্যে তাদের খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু ভেবেছিলাম তারা লোকালয়ে কাউকে না পাঠিয়ে পারে না, কারণ, তাদের সঙ্গে আহারের কোন ব্যবস্থা ছিল না। খেতে তো হবেই। তাই আশা করেছিলাম যদি কোন দোকানে তাদের কারও সম্বন্ধে জানতে পারি যে, কেউ সেখানে এসেছে, তবে কাছাকাছি পাহাড় অনুসন্ধান করে দেখার চেষ্টা করবো। কিন্তু সকল চেষ্টাই যখন নিষ্ফল হ'ল, তখন ভাবতে লাগলাম আর কি কবা যায়!

আমাদের কাছে এখন প্রশ্ন হ'ল– আমরা কি কোন পাহাড়ে লুকিয়ে থাকব না-কি গ্রামে কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেব, নাকি আবাব শহরেই ফিরে যাব? শহরে ইতিমধ্যে মিলিটাবী এসে গেছে, কাজেই সেখানে বিপদ মাথায় নিয়ে যাওয়াব ঔচিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন থাকতে পারে—তবুও একটি কাবণে শহরে ফিরে যাওয়াই সাব্যস্ত করলাম। আমরা যুক্তি দিয়ে বুঝেছিলাম, মাস্টাবদাবা আমাদের খোঁজ না কবে একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবেন না। আনন্দের বাড়িতে খোঁজ নেওয়ার জন্য তাঁরা কাউকে পাঠান নি—তাই স্বভাবতই অন্যত্র কোথাও সংবাদ-বাহককে পাঠিযেছেন অনুমান করা যায়। তবে প্রধান বাহিনী থেকে সংবাদবাহক আর কোথায় যেতে পারে? এইরূপ নানা চিন্তা করে স্থিব করলাম সতীদার (সতীভূষণ সেন) সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করবো। তাঁব কাছ থেকে শহরের খবরাখবর পাবো, আব চট্টগ্রামবাসীর প্রতিক্রিয়া কিরূপ তারও একটি বাস্তব চিত্র তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যাবে। সতীদার কাছে যাওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য অবশ্য এটি নয়। আমাদের মনে আশা ছিল, মাস্টারদারা সতীদার কাছে আমাদেব সংবাদ সংগ্রহ করবার জন্য কাউকে পাঠিয়েছেন। তারপর ভেবে স্থির করলাম, যদি শহরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্যও হয তবু সতীদার কাছে একবার যাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

রেল-লাইনের ধারে বসে আর সময় কাটানো নিষ্প্রয়োজন। ধীরে ধীরে শহরের দিকে এগোতে লাগলাম। কাছাকাছি কয়েকজন লোক সেই চত্বরে সৈন্যদের আবির্ভাব দেখেছে এবং আমাদের চাবজনের গতিবিধিও লক্ষ্য করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের দেখে ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে লাগলো—আমরা কারা? কেউ আবার আমাদের অন্যান্য প্রশ্নও করেছে আর আমরাও তাদের যথাযথ উত্তর দিয়েছি। কেউ

সন্তুষ্ট হয়েছে কেউ বা সন্দেহ করেছে। তাদের মধ্যে একজন মাতব্বর গোছের লোক বেশ উত্তেজিত হয়ে আমাদের পরিচয় জানতে চাইলেন। আমাদের কোন কথা তাঁর বিশ্বাস জন্মাতে পারলো না। পঁচিশ ত্রিশ গজ ব্যবধান বজায় রেখে তিনি সমানে আমাদের অনুসরণ করছেন। আমরা একটু জোরে জোরে হাঁটছিলাম। তিনিও দ্রুত হাঁটতে স্থুরু করলেন এবং খুব চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করতে চেষ্টা করলেন। আমরা স্বদেশী, আমরা ডাকাত, আমরা পালাচ্ছি, আমাদের ধরতে পারলে পুরস্কার পাওয়া যাবে—ইত্যাদি বলতে বলতে লোকজন ডাকাডাকি করছিলেন। দেখতে দেখতে তাঁর সঙ্গে প্রায় দশ পনেরোজন যোগ দিল। অবস্থা ক্রমেই গুরুতর হতে চলেছে। তাঁদের সঙ্গে কোন কথা বলে যে কিছু সুবিধা করা যাবে সেরূপ সম্ভাবনা আর ছিল না। সেই পরিস্থিতিতে যত দূর সম্ভব তাঁদের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে দ্রুত কোন পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয় মনে করলাম। শহরের দিকে যাওয়ার পথেও মাঠ দিয়ে মাইলখানেক এগিয়ে গেলে পর্বতশ্রেণীর সংস্পর্শে আসা যায়। তাই সেইরূপ পাহাড়ের সারি লক্ষ্য করে আমরা মাঠের মধ্যে নেমে পড়লাম। সেই উত্তেজিত দলটিও মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলো। এ কি বিভ্রাট! এও যেন ১৯২৩ সালের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে! রেলের টাকা লুঠ করবার পর "সুলুকবাহার" বাসগৃহের দরজা থেকে আমাদের দু'জনকে, পুলিস ও দফাদারদের প্ররোচনায়, একটি ক্ষিপ্ত জনতা বারো মাইল পথ অনুসরণ করেছিল। এও সেইরকমেরই এক অবাঞ্ছিত অবস্থা! সৌভাগ্যের কথা যে, দলটি এই খোলা মাঠে আমাদের বারো মাইল অনুসরণ করবার সুযোগ পায় নি। আমরা মাইলখানেক পথ অতিক্রম করেই একটা পাহাড়ের অন্তরালে প্রবেশ করলাম। তখন সূর্য প্রায় অস্ত যাওয়ার মুখে। তাই সেই ক্ষিপ্ত দলটি নিরস্ত হ'ল আর আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

সন্ধ্যা নেমে এলো। আমরাও ইতিমধ্যে শহরের উত্তর প্রান্তে প্যারেড গ্রাউণ্ডের রাস্তায় এসে পৌঁছেছি। ১৯শে তারিখে দক্ষিণ প্রান্তের কর্ণফুলী নদীর তীর হতে শহরে ঢুকেছিলাম। সেই দিন সন্ধ্যায় জনমানবহীন পরিত্যক্ত শহরের বুকের ওপর দিয়ে আমরা তিনজন হেঁটে বেড়িয়েছি। ২০শে তারিখ সকালে বা দুপুরে মিলিটারীর সমাগম হয়েছে। আজকের সন্ধ্যায় উত্তর প্রান্তের পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করে শহরে প্রবেশ করছি। আজ আমরা চারজন—সঙ্গে আনন্দও আছে। আজও কি শহর গত সন্ধ্যার মত পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকবে?

আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ ছিল। সাবধানতার সঙ্গে শহরের অপেক্ষাকৃত নির্জন রাস্তা ধরে সরকারী কলেজের পাশ দিয়ে বিভাগীয় কমিশনারের বাংলোর পাহাড়ের নিচের রাস্তা অতিক্রম করে সতীদার বাড়ির কাছে নন্দনকাননে এলাম। কিন্তু

মিলিটারী কই? বিভাগীয় কমিশনারের বাংলোতে আলো দেখা যাচ্ছে না কেন? চট্টগ্রামে ইতিমধ্যে মিলিটারী আনা সত্ত্বেও শহরের defined target বর্জন করে চলার রণনীতিই কর্তৃপক্ষ শ্রেয় মনে করেছে। স্টীমার, জেটি, পাহাড়তলীর সাহেব কলোনী নিয়ে চট্টগ্রামে ইংরেজদের সুদৃঢ় ব্যূহ রচনা করা হয়েছিল। সন্ধ্যায় ও রাত্রিবেলায় অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনাকে রোধ করবার জন্য রণ-কৌশল অনুযায়ী বিপ্লবীদের আকস্মিক আক্রমণের সুবিধা ও সুযোগ হতে বঞ্চিত করবার উদ্দেশ্যে তারা কোন বিচ্ছিন্ন target বা লক্ষ্যবস্তুর অস্তিত্ব ২০শে তারিখ রাত্রেও না রাখাই উচিত মনে করেছে। তাই বিভাগীয় কমিশনার তাঁর বাংলো পরিত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে চলে গেছেন।

আমরা একেবারে সতীদার বাড়ির কাছে এলাম। নন্দকাননের ঘরে ঘরেই আমরা অতি পরিচিত। তখন রাত প্রায় সাতটা-আটটা! কিন্তু রাস্তায় লোক নেই। ঘরে আলো জ্বলছে না। সব বাড়ির দরজা বন্ধ। মনে হ'ল সতীদার বাড়ির পাশের বাড়িতে কোন বিয়ের 'উৎসব' চলছে। বিয়েবাড়ি, হৈ-চৈ নেই, দৌড়োদৌড়ি ছুটোছুটি কিছুই দেখা যাচ্ছে না, মিট্‌মিট্‌ করে আলো জ্বলছে। তবু মনে হ'ল প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন পাড়ার লোক নেমন্তন্ন রক্ষা করতে এসেছেন। বাড়ির সামনে কোন গাড়ি-ঘোড়া না থাকায় দূরের কোন নিমন্ত্রিত আসেন নি বলেই মনে হচ্ছিল। তবু এত লোক! কে গিয়ে সতীদাকে ডেকে আনবে? আমাদের কাউকে পরিচিত কেউ দেখবে বলে কোন ভয় ছিল না। কেবল সতীদার কথাই ভাবছিলাম—যদি আমাদের সঙ্গে সতীদাকে কোন গুপ্তচর দেখে ফেলে তবে ভবিষ্যতে আমাদের জন্যই তাঁকে পুলিসের হাতে অযথা কষ্ট পেতে হবে। তাই এত ভাবনা—এত সাবধানতা!

সতীদার কাছে মাখনকে পাঠানোই সাব্যস্ত হ'ল। মাখন বুদ্ধি ও কৌশলের সঙ্গে সতীদার কাছে গেল এবং তাঁকে জানাল যে, আমরা তাঁর জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করছি। সংবাদ পেয়ে সতীদা তক্ষুণি ছুটে এলেন। তিনি সবাইকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানালেন—গভীরভাবে আলিঙ্গন করলেন। আমরা একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম।

সংক্ষেপে আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হ'ল। আমরা কিভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি তার বিবরণ দিলাম, প্রধান-বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য কিভাবে চেষ্টা করেছি তাও বললাম এবং জানতে চাইলাম মাস্টারদার কাছ থেকে কেউ আমাদের খোঁজে তাঁর কাছে এসেছে কিনা। না, তখনও কেউ আমাদের খোঁজে আসে নি। পরে আমরা জেনেছি, প্রধান-বাহিনীর সব খবর দিয়ে আমাদের খোঁজ নিতে দু'জনকে পর পর সতীদার কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তারা কেউ-ই

সতীদার কাছে তো যায়ই নি, এমন কি ফিরে গিয়ে মাস্টারদাদের যে খবর দেবে, তারও প্রয়োজনীয়তা বোধ করে নি। তারা আমাদের সংগঠনের গ্রামাঞ্চলের অংশের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। তাই পুলিস কোন প্রকারে তাদের নাম পরিচয় জানতে পারে নি। আর তারাও পুলিসের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে দিব্যি বাড়ি ফিরে গেছে। আমাদের মামলার সময় তাদের মধ্যে একজনকে জেলে ও কোর্টে আসা-যাওয়ার পথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। ছু' পক্ষ থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার ভুল সংশোধনের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তুর্ভাগ্য আমাদেরই—ভুলের মূল্য দিতে হয়েছে প্রচুর—তবু সংযোগ স্থাপন হয় নি!

সতীদার কাছে চট্টগ্রামবাসীর আনন্দ উৎসাহ ও সমর্থনের কথা শুনলাম। তিনি জানালেন, যাদের সাথেই পাড়ায় কথা হচ্ছে তারাই একবাক্যে বলছে যে, সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজের বিরুদ্ধে এইরূপ সশস্ত্র আক্রমণ আর কখনও হয় নি। তারা চট্টগ্রামের বিপ্লবী সন্তানদের এই মহান্ অবদানের প্রতি হৃদয়ের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তাদের মঙ্গল কামনা করছে, পূজো দিচ্ছে—'তোমাদের স্বার্থ ত্যাগ, আত্মবলি, সাহস ও বিক্রমের আদর্শ যেন বিপ্লবী ভারতকে উদ্বুদ্ধ করে, এই আমাদের একমাত্র কামনা!'

সব মনে নেই। সতীদা আবেগভরে আনন্দে ও উৎসাহে অনেক কথা বললেন। তাঁর কাছে এসে সত্যিই আমরা আরও সজীব হয়ে উঠলাম, প্রেরণা পেলাম। সতীদার কাছে আমাদের পথের প্রয়োজনে টাকা চাইলাম। তাঁর বাড়িতে খরচের জন্য যা ছু'একশ' টাকা ছিল সবই আমাদের এনে দিলেন। আমরা বিদায় নিলাম। যতক্ষণ দেখা গেছে ততক্ষণ তিনি একদৃষ্টে আমাদের দিকে তাকিয়েছিলেন। আমরা চট্টগ্রাম সহরের বুকে মিলিয়ে গেলাম।

প্রধান দলটি এই সময়ে কি করেছে এবারে তার বিবরণ দেবো।

আমরা গাড়ি নিয়ে চলে আসার পর মাস্টারদা, নির্মলদা, অম্বিকাদা ও লোকনাথ প্রধান দলটির সঙ্গে পুলিস-লাইনের কাছে প্রায় বিশ-ত্রিশ মিনিট অপেক্ষা করেন। তাঁরা আমাদের গাড়ি অনুসরণ করে সহরে প্রবেশ করবেন, নাকি আমাদের ফিরে আসবার জন্য সেখানেই অপেক্ষা করবেন, তাই ভাবছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন আমরা হয়ত হিমাংশুকে মাইল দেড়-ছুই দূরে তাদের বাড়ির কাছে নামিয়ে দিয়ে তক্ষুণি ফিরে আসবো। যখন ১৫।২০ মিনিটের মধ্যেও ফিরে এলাম না, তখন তাঁদের মনে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিল—কি করবেন? পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী শহরে প্রবেশ করবেন, নাকি নতুন পরিস্থিতিতে অন্য রণকৌশল গ্রহণ করবেন, তা' নিয়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যে সামান্য আলোচনা করলেন। তাঁদের মধ্যে স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলছিলেন না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা, কিছু মানসিক

নিষ্ক্রিয়তা, কিছু দোলায়মান মনোবৃত্তি! সুস্পষ্ট কোন অভিমত প্রকাশ না পেলেও অধিনায়কদের দু'একটা ছাড়া ছাড়া কথায় সেখানে যারা উপস্থিত ছিল তাদের ধারণা হয়েছিল যে, নেতারা ভেবেছেন তাঁরা এখন এক নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। গণেশ ও আমার অনুপস্থিতি, ম্যাগাজিন রাইফেল ও মেশিনগানের কার্তুজ না পাওয়া এবং শত্রুপক্ষও জেটি এবং পাহাড়তলীর আর্মারি থেকে মেশিনগান ও অস্ত্র নিয়ে ইতিমধ্যে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতি-আক্রমণে সমর্থ—এই অবস্থায় শহরে প্রবেশ করে অসমান শক্তি নিয়ে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত, নাকি চট্টগ্রামের পাহাড় ও বন-জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে "গেরিলা-যুদ্ধ" চালিয়ে শত্রুপক্ষকে অধিকতর ব্যতিব্যস্ত করা অপেক্ষাকৃত শ্রেয়—এই প্রশ্নে তাঁদের মন আলোড়িত হচ্ছিল। কিন্তু স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতে তখনও দ্বিধা।

এইরূপ দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, নিরাশা ও নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে যখন বিপ্লবী বা সামরিক নেতাবা কাল অতিবাহিত করেন, তখন যদি তাঁদেব মধ্যে কেউ এগিয়ে এসে দ্বিধাহীন চিত্তে কোন একটি নির্দেশ দেন এবং তা' যদি নির্ভুল নির্দেশ নাও হয়, তবুও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, উপস্থিত সবাই সেইরূপ ভুল নির্দেশেরও অনুবর্তী হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় আধ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কারও কারও ধারণা ছিল আমরা ফিরে আসবো। সেই ধারণা অনুযায়ী আমরা তখনও ফিরে আসি নি। দ্বিধাগ্রস্ত তাঁদেব মন—কিছু ঠিক করে উঠতে পারছেন না। এমন সময় প্রায় তিনপোয়া মাইল দূরে একটি পাহাড়ে কোন সাহেবের বাংলোর উদ্দেশ্যে কোন একটি মোটর গাড়ি হেড্‌লাইট জ্বালিয়ে পাহাডের অর্ধচক্রাকার রাস্তা দিয়ে ঘুরে ওপরে উঠছিল। সেই সময় মোটরের লাইটের রশ্মি স্বভাবতই গাড়ির মুখ ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাথার ওপর দিয়ে ডান পাশ থেকে বাঁ পাশে চলে গেল। এই মোটরের আলো অতখানি দূর থেকে মাথার ওপর দিয়ে যদি একবার চলে যায়, তাহলে তক্ষুণি সেই গাড়ি থেকে শত্রুপক্ষের কেউ আমাদের দেখে ফেলবে এইরূপ ধারণা আজ নিশ্চয়ই কারও মনে হবে না। কিন্তু বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্র এমনই ভয়াবহ যে, খুব সাহসীদেরও এইরূপ সামান্য অর্থহীন মোটর-লাইট সচকিত করে ভাবাতে পারার জন্য যথেষ্ট—ঐ বুঝি শত্রু আমাদের দেখতে পেল!

প্রধান-বাহিনীর সঙ্গে যারা তখন সেখানে উপস্থিত ছিল, তাদের কয়েকজনের কাছ থেকে আমি পরে জেনেছি এবং আজও এইটি লেখার সময় আমার কাছে ওদেরই প্রথম সারির একজন, কালী দে, উপস্থিত আছে—আমি আজ আবার তার মুখ থেকেও শুনলাম—ঐ মোটরের লাইট দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভেতর ঐরূপ একটি প্রতিক্রিয়া দেখা দিল—তাদের মনে হ'ল শত্রুপক্ষ হয়ত মোটর লাইটের সাহায্যে তাদের অবস্থানটি বুঝতে চেষ্টা করছে এবং তাদের লক্ষ্য করে মেশিনগান চালাবে।

ঠিক ঐরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়ার সময় অম্বিকাদা সবাইকে ডেকে বললেন—"এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। follow me! আমাকে অনুসরণ কর।"

অম্বিকাদার এই নির্দেশ কতখানি নির্ভুল ছিল বা মাস্টারদা ও নির্মলদার তা মেনে নিয়ে প্রধান-বাহিনীর সঙ্গে পাহাড়ে আশ্রয় নিতে যাওয়া কতখানি সঙ্গত হয়েছিল, সে বিচার আমি এখানে করতে বসি নি। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি impersonally—নৈর্ব্যক্তিকভাবে অগ্নিযুগের এই অধ্যায়টি লিখতে। যদি সেভাবে আগাগোড়া লিখে যেতে পারি তবে মনে করবো যে, আমি আমার সীমাবদ্ধ শক্তিতেও কর্তব্য পালনে ত্রুটি করি নি।

সকলেই অম্বিকাদাকে অনুসরণ করলো। অম্বিকাদা দ্বিধাহীন চিত্তে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেইরূপ অনিশ্চয়তা, নিষ্ক্রিয়তা ও দ্বিধাগ্রস্ততার মধ্যে দৃঢ় ও সুনির্দিষ্ট আদেশের প্রয়োজন ছিল। কোন আদেশ যখন এলো না, তখন অম্বিকাদার নেতৃত্ব ও নির্দেশ যে কার্যকরী হবে তাতে আশ্চয হওয়ার কিছুই নেই। তা'ছাড়া সাবিক প্ল্যান মাস্টারদা, নির্মলদা ও অম্বিকাদা ছাড়া ওখানে আর কেউ জানতই না।

রাত প্রায় দেড়টা-দুটো হবে, ওরা সকলে পুলিস-লাইন পরিত্যাগ করে কাঁচা রাস্তা দিয়ে হেঁটে অম্বিকাদাব গতিপথ লক্ষ্য করে মাঠে নেমে পড়লো। প্রত্যেকের সঙ্গে একটি মাস্কেট্টি, দুটো বা একটি করে রিভলভার, হ্যাভারসেক ভর্তি কার্তুজ, তেলের ছোট টিন, কারও কারও সঙ্গে ওয়াটার কেরিয়ার, সবার সঙ্গেই কিছু কিছু ফার্স্ট-এডের ওষুধপত্র ও ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি ছিল। পরনে তাদের বুটপট্টি ও খাকী পোশাক। খাওয়া নেই, তৃষ্ণায় বুক ফাটছে। হাঁটতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। তারা মাঠের মধ্যে দিয়ে মাঝে মাঝে ঝোপঝাড় অতিক্রম করে চলেছে। চলার পথে কিছুরই প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই। এইভাবে এক সময় হঠাৎ তারা একটি বাঁশের বেড়ার সামনে এসে পড়লো। সবাই এত দুর্বল বোধ করছিল যে, এই বেড়া ঘুরে পথ চলার ইচ্ছেও তাদের ছিল না। পরিশ্রান্ত হয়ে সেখানেই সকলে বসে পড়লো।

একটু পরেই বোঝা গেল এই বেড়ায় ঘেরা দুটো মস্ত বড় তরমুজ ক্ষেত তাদের সামনেই রয়েছে। তরমুজের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা যেন আরও অনেকখানি বেড়ে গেল! আর সবুর সইছিল না। কয়েকজন বাগানে নেমে পড়লো ও তরমুজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে সবাইকে সরবরাহ করলো। সকলে মিলে তৃপ্তির সঙ্গে যখন তরমুজ খাচ্ছে, তখন তরমুজ ক্ষেতের মালিক হঠাৎ তাদের দেখতে পায়। এতজন খাকী পোশাক পরা সশস্ত্র যুবক দেখে সে ভীত হয়ে পড়লো। খুব সম্ভব পুলিস-লাইনের গোলমালও তার কানে এসেছে। তবু সেই চাষী মালিক প্রশ্ন করলো—"তোঁরা কন্?"—(তোমরা কারা)। লোকনাথ

জবাব দিল—"আমরা পুলিস, ডাকাতরা এইদিকে পালিয়েছে। আমরা তাদের অনুসন্ধানে চলেছি।" এই কথা শুনে ক্ষেতের মালিক বলল—"বাবু, আপনাদের চিনতে না পেরে আমি ভুল করেছি। আমাকে মাফ করবেন। আপনারা যত পারেন তরমুজ খান। আমি ভেবেছিলাম, বাইরে থেকে কেউ বুঝি তরমুজ চুরি করতে এসেছে।" এই সহৃদয় ক্ষেতের মালিক নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন তারা পুলিস নয়—বিপ্লবী দল।

বেড়ার দরজা কোন্ দিকে লোকনাথ তার কাছে জানতে চাইল। প্রথমে লোকনাথেরা দরজাটি দেখতে পায় নি। সেই চাষী তাদের বেড়ার দরজাটি দেখিয়ে দিল—বাঁশের তৈরি ছোট্ট গেট্ তাদের খুব কাছেই ছিল, তবু আগে চোখে পড়ে নি। তরমুজ খাওয়ার পর ক্লান্ত দেহ নিয়ে তারা যেন আর উঠতে পারছিল না। কিন্তু সেখানে দেরি করা তাদের পক্ষে বিপজ্জনক। ভোরের আগে পথচারীদের আবির্ভাবের পূর্বে চাষীরা লাঙ্গল হাতে এসে যেন তাদের দেখতে না পায়—তেমন কোন পাহাড়ের আড়ালে সারাদিনের জন্য, অন্তত সন্ধ্যা পর্যন্ত, তাদের অপেক্ষা করতে হবে। নির্মলদা সকলকে একরকম জোর করেই তুলে দিলেন। রাত থাকতে থাকতে উপযুক্ত সুরক্ষিত স্থান খুঁজে নিতে হবে। হুকুম হ'ল—"In single file march!"—একজনের পেছনে আর একজন—এমনি করে একটি লাইনে হেঁটে চল।

তরমুজ ক্ষেত অতিক্রম করে তারা আবার রাস্তায় এলো। একটু এগিয়ে রেল-লাইন অতিক্রম করে উত্তর দিকে হাঁটতে লাগলো। তাদের সঙ্গে কোন কম্পাস ছিল না—তবু অনুমান করলো বোধহয় তারা সামান্য কোণাকুণিভাবে পাহাড় লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছে। আরও কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর সবাই একটি পুকুর পাড়ে এসে উপস্থিত হ'ল। পুকুর দেখে সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল। যে যত পারলো তৃষ্ণা মিটিয়ে জল পান করে হাত মুখ ধুয়ে একটু সুস্থ বোধ করলো। এই পুকুর পাড় ধরে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে সকলে একটি পাহাড়ের ওপর উঠলো। পুকুর ধারে মাঠের ওপর একটি ছোট টিনের চালা; দেখেই মনে হয় চাষীরা দুপুরে ঐ চালার নিচে বিশ্রাম করে। সেই জন্য পাহাড়ে ওঠার পর তারা আরও এগিয়ে অন্য আর একটি পাহাড় তাদের বিশ্রামের জন্য মনোনীত করলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে ক্লান্ত দেহে ঘুমিয়ে পড়লো। মাত্র কয়েকজন বিপ্লবী সৈনিক পাহারায় নিযুক্ত ছিল। কয়েক ঘণ্টা একটানা ঘুমের পর সকাল আটটা সাড়ে-আটটায় তারা জেগে ওঠে। আরও হয়ত ঘুমোতো, কিন্তু গায়ের উপর রোদ পড়ায় তাদের ঘুম ভেঙে গেল। মনে হবে কি আশ্চর্য! এত কাণ্ড করবার পর—মৃত্যু, যুদ্ধ, আগুনের ভয়াবহ দৃশ্য, যা নাকি তারা এইমাত্র দেখে এসেছে;

প্রত্যেকের সঙ্গে রাইফেল, প্রতি মুহূর্তে আসন্ন যুদ্ধের আশঙ্কা বিদ্যমান—তবু তারা শান্ত মনে ঘুমোতে পারে! "জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন"—ভয়হীন ভাবনাহীন চিন্তাহীন তরুণ বিপ্লবীরা শান্ত মনে ঘুমিয়ে উঠলো"।

তাদের প্রথম কাজ হ'ল নিজ নিজ মাস্কেট্রি পরিস্কার করা ও তেল দিয়ে চালু অবস্থায় প্রস্তুত রাখা। পাহাড়ের নিস্তব্ধতা ভেঙে কটা-কট্ টিক্-টাক্ শব্দ হতে লাগলো। পাখীরা কলরব করে তাদের অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছিল। মিলিটারীতে এইরূপ অবস্থার বিশেষত্ব কিভাবে বুঝতে ও কাজে লাগাতে হয়, সেই সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি আছে। যদি পাখীরা কোন স্থানে বিশেষভাবে কলরব করে তবে সে স্থানে শত্রুপক্ষের পেট্রলপার্টি, স্কাউট বা সৈন্যদের কোন অংশের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার জন্য নির্দেশ আছে। আবার নিজেদের অস্তিত্ব বিপক্ষ দলের কাছে অপ্রকাশিত রাখার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয় সেই সম্বন্ধেও Jungle Welfare (জঙ্গল যুদ্ধ) বিষয়ক পুস্তিকাতে অনেক উপদেশ আছে। আমাদের সেই সব শিক্ষা ছিল না বললেই হয়। তবু সাধারণ বুদ্ধিতে সদ্য-জাগ্রত বিপ্লবী মন অবস্থানুযায়ী নিজেদের সামলে নিয়ে যে চলবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। নির্জন পাহাড় মাস্কেট্রি পরিষ্কারের সময় ছোট ছোট শব্দে যখন একেবারে মুখরিত হয়ে উঠলো, তখনই আবার ফিস্‌ফিস্ করে মুখে মুখে প্রত্যেকের কাছে নির্দেশ প্রচারিত হ'ল—"খুব আস্তে, বিনা শব্দে রাইফেল পরিষ্কার কর।" মুহূর্তে আবার সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

এই পাহাড়টির উপর গাছপালা ঝোপঝাড় প্রভৃতি খুব কম। তাই ছায়া ছিল না বললেই হয়। পাহাড়ের একেবারে উপর থেকে যদি কিছুটা দক্ষিণে নেমে যাওয়া যায়, তবে সেখানে নির্জনতা ও গোপন অবস্থানের সুবিধে অনেক বেশি। তা'ছাড়া সেই স্থানটি ছায়ায় ঢাকা—অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডাও। ধীরে ধীরে খুব সন্তর্পণে একজন-দু'জন করে তারা সেই ছায়াঘেরা স্থানে নেমে এলো।

লোকনাথ সবাইকে নির্দেশ দিল চার-পাঁচ জন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ঐ স্থানে সুবিধেমত জায়গা বেছে নিয়ে বিশ্রাম করতে। নির্মলদা, মাস্টারদা, অম্বিকাদা সকলের কাছে গিয়ে কথাবার্তা বলে তাদের মনোভাব বুঝেছেন। সবার Morale খুব উচ্চস্তরে আছে—তরুণেরা যুদ্ধের জন্য আকুল প্রতীক্ষায় সময় অতিবাহিত করছে। তখনও তারা সার্বিক প্ল্যান সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তাই ভাবছিল পাহাড়েই তাদের যুদ্ধ করতে হ'বে।

১৯শে তারিখে সকালে দুপুরে ও বিকেলে আমরা তিনজন যখন সমুদ্রতীরে, পতেঙ্গা গ্রামের কাছে অপেক্ষা করছিলাম, তখন আমাদের প্রধান-বাহিনী চট্টগ্রাম শহরের উত্তরে এই পাহাড় অঞ্চলেই অবস্থান করা সাব্যস্ত করে। আমাদের মধ্যে

দূরত্বের ব্যবধান প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ মাইল হবে। এইরূপে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আমরা দুই পক্ষই পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের কথা ভেবে অস্থির হয়েছি। আমাদের কথা আগে জানিয়েছি, এখন তাদের কথা বলছি।

অম্বিকাদা ও নির্মলদার সঙ্গে পরামর্শ করে মাস্টারদা ঠিক করলেন আমাদের খোঁজে একজনকে শহরে পাঠাবেন। শহরের বেশির ভাগ তরুণ বন্ধুরাই পুলিসের চেনা; তাই গ্রাম অঞ্চলের ছেলে, যারা শহরের গ্রুপের সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে মেলামেশা করতো না—সেইরূপ একজন তরুণ বন্ধুকে আমাদের খোঁজ করবার জন্য পাঠানো হ'ল। তার ওপর নির্দেশ ছিল, সে অর্ধেন্দু দত্তের সঙ্গে দেখা করবে; অর্ধেন্দুর সঙ্গে যদি দেখা না হয় বা তার কাছ থেকে যদি খবরাখবর পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তবে সে সতীদার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করবে। তা'ছাড়াও তাকে বলা ছিল, নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী সম্ভাব্য অন্যান্য সব স্থানেই সে যেন আমাদের খোঁজ করে।

সতীদার পরিচয় আমি আগে দিয়েছি। অর্ধেন্দু দত্ত বি-এ ফাইন্যাল পরীক্ষার্থী ছাত্র—তারকেশ্বর দস্তিদারের সহপাঠী। সে চট্টগ্রাম কলেজে পড়তো ও কলেজের খুব কাছেই সুখেন্দু দস্তিদারের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করে সুখেন্দুর ছোট ভাইয়ের গৃহ-শিক্ষক হিসেবে থাকতো। ১৯২৬-এ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আমি সর্ব প্রথম অর্ধেন্দু দত্তের সঙ্গে বিপ্লবী যোগসূত্র স্থাপন করি। তাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতাম —সে যে পুলিসের চর নয়, সে সম্বন্ধে আমি সুনিশ্চিত ছিলাম। মাস্টারদাও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য জানতেন—সে যে কখনও পুলিসের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে না, এই ধারণা তাঁরও ছিল। তবু শেষপর্যন্ত আমরা তাকে যুব-বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করবার জন্য প্রথম সারির পর্যায়ভুক্ত করতে পারি নি। আমার যতদূর মনে পড়ে, অর্থনৈতিক চাপে সে লেখাপড়া নিয়ে বিশেষভাবে ব্যস্ত ছিল—মৃত্যু-প্রোগ্রামের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার মধ্যে তার অনেকখানি ফাঁক ছিল। যদিও আমরা অর্ধেন্দু দত্তকে প্রথম সারিতে নিতে পারি নি, তবু আমাদের বিশ্বাস ছিল, বিদ্রোহের পর যদি শহরে আসা হ'ত তবে ১৯শে তারিখে সকালে অর্ধেন্দু দত্ত নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে অস্ত্র হাতে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিত—তখন আর ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার কোন মোহই তাকে বিরত করতে পারতো না। যুব-বিদ্রোহের পর প্রায় চার বৎসর পর্যন্ত আত্মগোপন করে মাস্টারদা বিপ্লবী সংগঠনের কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন, সেই কাজে অর্ধেন্দু দত্তের অবদান প্রচুর। এই সম্বন্ধে যথাস্থানে বলবো।

অর্ধেন্দুকে আমরা প্রথম সারিতে মনোনীত করতে পারি নি বটে, কিন্তু আবার যাদের প্রথম আক্রমণ চালাবার জন্য বাছাই করেছিলাম তারা প্রত্যেকেই

যে শেষপর্যন্ত তাদের বিপ্লবী সাহস ও বিক্রমের সঠিক পরিচয় দিতে পেরেছে তা' নয়। বিগত ইতিহাস নিরর্থক ও একতরফা হয়ে যাবে যদি আমাদের ত্রুটির বিষয় উল্লেখ না করে কেবল সাফল্যের দিক প্রচার করে ভাবীকালের তরুণদের মন Complacence—আত্মতৃপ্তির মারাত্মক দোষে আচ্ছন্ন করতে সাহায্য করে। অগ্নি-যুগের এই ইতিহাসের সামান্যতম অবদানও যদি শিক্ষার্থে গ্রহণ করার যোগ্য বিবেচিত হওয়ার আশা করি, তবে আমার মনে হয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন প্রয়োজন। অতীত বিপ্লবীদের ত্রুটি দেখিয়ে ব্যক্তিগতভাবে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করা আমার কাজ নয়—তাদেব ত্রুটি আছে, বিচ্যুতির করুণ ইতিহাসও হয়ত পাওয়া যাবে—তবু আইরিশ বিপ্লবী নেতা লেলোরের সুরে সুর মিলিয়ে বলতে হবে—প্রথম অ্যাক্‌শন হয়ত ভুল হবে, হয়ত অনেক ক্ষেত্রে আমরা অক্ষমও হব, তবু সেই অক্ষমতাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইব না। ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে আমাদের অক্ষমতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি সব তুলে ধরবো যাতে তরুণ বিপ্লবীরা যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তব ও ভয়াবহ রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে; যেন বুঝতে পারে মেশিনগানের গুলী ও মৃত্যু-বিভীষিকা অতি সাহসীকেও অনেক ক্ষেত্রে অবসর গ্রহণে সাহায্য করে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমার এই তথ্যটি প্রকাশ করতে হচ্ছে। বাছাই করে এক তরুণ বিপ্লবীকে (যার ছিল মৃত্যুপণ) পাঠানো হ'ল আমাদের দুই অংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের এক পবিত্র বিপ্লবী দায়িত্ব দিয়ে। সে শহরে এলো। অবিশ্বাস্য মনে হলেও একথা অভ্রান্ত সত্য যে, সতীদার সঙ্গে সে দেখা করে নি বা তাঁর দেখা পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। অর্ধেন্দুব সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল কিনা তা আমার জানা সম্ভব হয় নি। কিন্তু সতীদার সঙ্গে সে যে দেখা করে নি বা করতে পারে নি সেই সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত; কারণ, সতীদার কাছ থেকেই জেনেছি, তাঁর কাছে কেউ প্রধান-বাহিনীর সংবাদবাহক হয়ে আসে নি। উপরন্তু পরবর্তী ঘটনা খুবই "অস্বাভাবিক" ও বেদনাদায়ক। এই তরুণ বিপ্লবী যে দায়িত্ব নিয়ে এসেছিল তার কিছুই তো সে করেইনি, অধিকন্তু প্রধান-বাহিনীর কাছেও সে আর ফিরে যায় নি—সে সোজা বাড়ি চলে গেল। তারপর কয়েক দিনের মধ্যে বি-এ পরীক্ষা দিল এবং পাশও করলো। এক সাধারণ নিরীহ নাগরিক সেজে পুলিসের সন্দেহের উর্ধ্বে গতিবিধি বজায় রেখে সে শহরে ঘুরে বেড়িয়েছে। এই নিদারুণ অভিজ্ঞতার মূল্য যে কতখানি তা' কেবল তারাই উপলব্ধি করবে, যাদের ওপর ভবিষ্যতের দায়িত্ব ন্যস্ত আছে।

পাহাড়ের ওপর থেকে একটু নিচে ছায়ায় ঘেরা জায়গাটায় এসে তারা আবার ঘুমিয়ে পড়লো। কয়েকজন অবশ্য প্রহরী হিসেবে যে নিযুক্ত ছিল, তা' বলাই বাহুল্য।

দুপুরবেলা সবাই আরও ক্লান্ত হয়ে পড়লো। তৃষ্ণায় তাদের বুক ফেটে যাচ্ছিল। জল —একফোঁটা জল। এই পাহাড়ে ওঠার সময় তারা একটি পুকুরের ধার দিয়ে এসেছে। সেখানে গেলেই জল পাওয়া যায়। কিন্তু দিনের বেলা লোকচক্ষুর অন্তরালে পুকুরে যাওয়া-আসা সম্ভব ছিল না। অগত্যা তৃষ্ণায় বুক ফাটুক তবু পুকুরে যাওয়া চলবে না। এমন নিদারুণ অবস্থায় তাদের মধ্যে একজনও কেউ ছিল না, যে নাকি গাছের সবুজ পাতা, ঘাস প্রভৃতি চিবিয়ে শুষ্ক মুখ ও গলা ভেজাতে চেষ্টা করে নি। ঘাস, পাতার অতি বিস্বাদ রস স্বাভাবিক অবস্থায় কারও পক্ষে গলাধঃকরণ করা সহজ নয়। কতখানি তৃষ্ণার তাড়নায় অধীর হলে মানুষ লতা, পাতা, ঘাস চিবিয়ে তৃষ্ণার জ্বালা নিবারণ করতে চেষ্টা করে, তা' সাধারণ লোকের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন।

প্রত্যেকে অন্তরে হয়ত নির্দেশ পেয়েছে—জল আমাদের চাই, শত বাধা থাকলেও জলের ব্যবস্থা কেন করা হবে না? কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবে কে? অধিনায়কেরা তখনও ভাবছিলেন—তখনও ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে কাউকে স্কাউটিং করবার জন্য পাঠানো সাব্যস্ত করেন নি। যদি অধিনায়কত্ব বলতে আমরা এই বুঝি যে, কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা প্রবর্তন করে সৈন্য সংগঠন করা এবং যে কোন অবস্থার কাঠিন্যের মধ্যেও সেই সৈন্যরা Discipline মেনে চলতে বাধ্য থাকবে, তবে তা' দুর্বলতাগ্রস্ত জেনারেল-শিপের প্রতীক হতে পারে কিন্তু জেনারেল-শিপের বাস্তব রূপ নয়। প্রকৃত জেনারেল যিনি হবেন তাঁকে সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে দ্বিধাহীন চিত্তে বাস্তব কার্যকরী পন্থার নির্দেশ দিতে হবে। নইলে দুর্বল নেতৃত্বের ফলে জোর করে শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

চির অশান্ত চঞ্চল টেগ্‌রা (হরিগোপাল বল, লোকনাথের কনিষ্ঠ ভাই) সদা adventure প্রিয়—দুঃসাহসিক কাজ করতে সে সব সময় উন্মুখ। এভাবে নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে থাকতে তার ভালো লাগছিল না। কিছু একটা করা চাই। জলের খোঁজে সে যাবে—লোকচক্ষুর অন্তরালেই বুদ্ধি করে বন-জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে সে জল নিয়ে আসবে। টেগ্‌রা তার ঐ ইচ্ছে মনাক (মনোরঞ্জন সেন) জানালো। Undaunted—চিরনির্ভীক মনোরঞ্জন এক কথায় রাজী। তারা দু'জনে সবার অজ্ঞাতসারে অতি সন্তর্পণে ও গোপনে ধীরে ধীরে পাহাড় থেকে নেমে গেল। তারা জলাশয় খুঁজে পেয়েছে এবং প্রাণভরে জল খেয়েছে। সামনেই একটা আম গাছে অনেক আম। কাঁচা আমও তারা পেট ভরে খেয়েছে। তারপর দুটো Water-carrier (জল পাত্র) ভর্তি করে জল ও পকেট ভর্তি করে কাঁচা আম এবং ক'টি বেল সঙ্গে নিয়ে তারা যখন আবার হাসিমুখে সবার সামনে পাহাড়ে ফিরে এলো, তখন তাদের ওপর রাগ করার বা বিরক্ত হওয়ার অবসর কেউই পায় নি। দু'টি মাত্র জল ভর্তি

Water-carrier! এই সামান্য জল প্রায় যাটটি তৃষিত কণ্ঠ সিক্ত করবার পক্ষে নিতান্তই অল্প। দেখতে দেখতে দুটো Water-carrier প্রায় শেষ হয়ে গেল। অবশিষ্ট কয়েকবিন্দু জল, যা তলায় পড়েছিল, নিঃশেষ করার জন্য টেগ্‌রা নিজে Water-carrier-টি তুলে মুখের সামনে নিয়েছে আর ঠিক সেই সময় বালক পুলিন তার পাশে দাঁড়িয়ে করুণ দৃষ্টিতে চাতকের মত কয়েক ফোঁটা বারিবিন্দুর জন্য টেগ্‌রার কাছে অনুরোধ জানালো। টেগ্‌রা সাময়িক হাল্কা আবহাওয়ার মধ্যে অতটা লক্ষ্যই করে নি। সে যেমনি Water-carrier তুলে মুখের কাছে নিয়েছে তখনই লোকনাথ চট্‌ করে টেগ্‌রার হাত ধরে ফেলে খুব তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল—"তোর লজ্জা করছে না? তুই তো আম খেয়েছিস্—জলও খেয়েছিস্। যে জল চাচ্ছে তাকে না দিয়ে জল খেতে তোর কোনো সঙ্কোচ হচ্ছে না?" তার চপলতা ও ঔদাসীন্যের জন্য নিজ প্রয়োজন অপেক্ষা সাথীর প্রয়োজন যে অনেক বেশি—এই সত্য কেন সে উপলব্ধি করেনি—একথা ভেবে মুহূর্তে সে ক্ষোভে, দুঃখে, লজ্জায় একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেল। তক্ষুণি সে দু' হাত বাড়িয়ে পুলিনকে তার Water-carrier-টি দিয়ে দিল।

অনেক ঘটনার মধ্যে সাধারণভাবে নিতে গেলে এইটিও হয়ত খুবই সামান্য ও তুচ্ছ। কিন্তু সত্যিই এটি একটি তুচ্ছ ঘটনা নয়। এই সেদিনও কালী দে'র কাছে আমি আবার এই ছোট্ট ঘটনাটি শুনলাম। সে সেই ঘটনাস্থলেই উপস্থিত ছিল। আজও তার চোখের সামনে ছবির মত এই "তুচ্ছ" ঘটনাটি ভাসছে। সে বর্ণনা দিতে দিতে আবেগভরে বলে গেল—

"...হাজার হলেও লোকাদার আপন ছোট ভাই। টেগ্‌রাই হয়ত সবার চাইতে ছোট ছিল। কিন্তু ছোট ভাইয়ের প্রতি লোকাদা স্নেহান্ধ হন নি। লোকাদার বলিষ্ঠ কর্তব্যবোধ আমাকে অভিভূত করেছিল। আজও আমার চোখের সামনে সেই দৃশ্য বৈপ্লবিক কর্তব্যবোধের এক আদর্শ হয়ে জেগে আছে।

তারপর কালী দে আমাকে জানালো টেগ্‌রা কতখানি লজ্জা পেয়েছিল ও অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল—"লোকাদার কথা শুনে টেগ্‌রা চমকে ওঠে—তার মুখ-চোখ অপরাধীর মত ফ্যাকাশে হয়ে যায়। অসাবধান মুহূর্তেও কোন সাথীর প্রতি কেন তার এই ঔদাসীন্য, কেন এই ভ্রম—তা' ভেবে সে যেন নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিল না! তার স্বগতোক্তি শুনতে পেলাম—'এর চাইতে আমার মরাই ভাল'!"

সঙ্গে যে আম ও ক'টি বেল এনেছিল তা হাতে-হাতে বিলি হয়ে গেল। দেখতে দেখতে কাঁচা আমগুলি, যতই টক বা কষা হোক্ না কেন, নিমেষের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। আমের খোসাও তারা চিবিয়ে খেলো। আমের আঁটিগুলিও হয়ত

শেষপর্যন্ত তারা ফেলে রাখে নি। অম্বিকাদা সবার কাছে ঘুরে ঘুরে জানালেন—আজ রাত্রে, অর্থাৎ ১৯শে তারিখ রাত্রে, তিনি সবার জন্য আহারের ব্যবস্থা করবেন।" নির্মলদা মাঝে মাঝে হাসি-ঠাট্টা ও কৌতুকের ঝুড়ি পরিবেশন করে সবাইকে উৎফুল্ল রাখতে চেষ্টা করছিলেন। অম্বিকাদার কাছ থেকে রাত্রে আহারের আশ্বাস পেয়ে নির্মলদা বেশ একটু রঙ্গ করে বললেন—"আর কি বাই? অম্বিকাদা অন্তরে থাইলে ডর কিয়র? থ্রী চিয়ার্স ফর অম্বিকাদা—রাতুয়া আঁরারে অম্বিকাদা খাওয়াইবো!"—(আর কি ভাই? অম্বিকাদা সঙ্গে থাকলে ভয় কি? রাত্রে অম্বিকাদা আমাদের খাওয়াবেন—থ্রী চিয়ার্স)।

হাসি-ঠাট্টার ভাব তরুণদের খুব ভাল লাগছিল না। টেগ্‌রা তরল পরিবেশের মধ্যে গাম্ভীর্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করে বসলো—"খাওয়া হয়ত নিশ্চয়ই হবে—কিন্তু আমরা যুদ্ধ কখন করবো?" স্পষ্ট প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর কেউ দিতে পারলেন না। অম্বিকাদা হাসিমুখে একটা জবাব দিলেন বটে, তাতে বিপ্লবী অ্যাক্‌শনের সুনির্দিষ্ট পথ-নির্দেশের অভাব ছিল। অম্বিকাদা বললেন—"যুদ্ধ আমরা করবো। কিন্তু শরীর রাখতে হ'লে খেতে তো হবে! কেবল মরলে তো চলবে না, মারতেও তো হবে!"

বিধু ভট্টাচার্য চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুল থেকে পাশ করা ডাক্তার। পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে—গোল্ড মেডেল পেয়েছে। আমাদের মধ্যে কেন, অনেকের মধ্যেই বিধুর মত এইরূপ উচ্চস্তরের রসবোধ সম্পন্ন যুবক কমই দেখা যায়। সে জালালাবাদে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। বিধুর চরিত্রে বিপ্লবী প্রেরণা ও হাস্যরসের যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল, তা' সচরাচর চোখে পড়ে না। এ রকম আর কারও সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য আমার অন্তত আগে আর হয়নি। বিধুর হাস্যরস এত natural এবং এত সুন্দর ছিল যে, সামান্য কথাও যখন সে বলতো তখন সেই বাচনভঙ্গী, বক্তব্যের বিশেষ স্থানে হঠাৎ থেমে পড়া, অন্যের হাসির খোরাক যুগিয়ে অদ্ভুত রকমে নিজের গাম্ভীর্য বজায় রেখে বিভিন্ন উপমা ও প্রবাদ-বাক্য ঠিক স্থানে ও ঠিক সময়ে সুন্দর করে বলবার পদ্ধতি আমাদের চমৎকৃত করতো। আমি জানি আমার লেখার মধ্যে বিধুর কয়েকটি কথা যথাযথভাবেও যদি পরিবেশন করি, তাতেও সত্যিকারের স্বাদ আমি পাঠকবর্গকে দিতে পারবো না—কারণ, তাতে বিধুর বাচনভঙ্গী, গলার স্বর, চোখমুখের cynchronised অভিব্যক্তি, মাপা হাসি, কল্পিত রাগ, অভিমানের ভান, প্রভৃতির television চিত্রের অভাব থেকে যাবে।

নির্মলদা, অম্বিকাদা ও টেগ্‌রার কথার মাঝখানে বিধু কুমিল্লার ভাষায় বলল—"হঃ, মরুম যখন, তখন খাইয়া-দাইয়া মরণই ভাল। অম্বিকাদা কইছে, মাইরা মরণের

লাগি। ব্যাস, মরণের আগে থামুও, তাগো মারুমও।" বলার মধ্যে এত রস ছিল যে, সবাই সেখানে হেসে উঠলো। কিন্তু বিধু এই কথাগুলি বলেই একেবারে চুপ। সবাই হাসলো, হাসলো না একজন—টেগ্‌রা। তার স্বগতোক্তি সবাই শুনতে পেল—"মেরেই মরব—তবে সবার আগে মরবো। খাওয়া হোক্ আর নাই হোক্—চাই যুদ্ধ।"

খুব নিচু স্বরে টেগ্‌রা কথাগুলি বললেও—'যুদ্ধ চাই'—এই কথাটি নাগারখানা পাহাড়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে ধ্বনিত হ'ল। বিপ্লবীদের অন্তর উদ্বেলিত ও ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো। প্রত্যেকের হাতের রাইফেল দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হ'ল। প্রত্যেকের মন বলে উঠলো—'যুদ্ধ চাই।' ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, শ্রান্তি, ক্লান্তি সব মুহূর্তে বিদায় নিল, সবার মধ্যের নির্জীব ভাব কেটে গেল। সকলেই সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো।

সন্ধ্যা হয়ে এলো। তখনও আমাদের খাঁবার নিয়ে সেই যুবক বন্ধু ফিরে এলো না। কি করে ফিরবে—সে যে তখন আবার নির্বিঘ্ন নিশ্চিন্ত নিরীহ নাগরিক জীবনে ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখছে। পরীক্ষা দিয়ে বি এ পাশ করতে তো হবে!

রাত প্রায় আটটা সাড়ে-আটটার সময় নির্দেশ হ'ল পাহাড়ের ঢাল দিয়ে সবাই যেন নিচে নেমে আসে। এই নাগারখানা পাহাড়ের পাদদেশে তারা একজনের পাশে একজন দাঁড়ালো। কতজন উপস্থিত গণনা করা হ'ল। তখন তারা মাত্র আটান্ন জন।

সবাই উপস্থিত, কেউ পেছনে পড়ে নেই। রজত (সেন) সবার আগে ঝোপঝাড় এড়িয়ে বা কোন জঙলা জায়গার বাধা কেটেকুটে পরিষ্কার করে পথ দেখিয়ে চলেছে। এই সেই রজত, যে লোকনাথের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক ধাক্কায় A. F. I. আর্মারির লৌহ কপাট ভেঙ্গে চুরমার করে।

রজতের শারীরিক শক্তি ও তদুপরি দম দলের সবার চাইতে বেশি। শরীরচর্চা ও খেলাধূলাতে রজত যেমন দক্ষ ছিল, তেমনি আবার চিত্রাঙ্কনেও তার নিপুণ হস্তের তুলি তাকে শিল্পীর মর্যাদা দিয়েছিল। সে যখন মাত্র দশম শ্রেণীর ছাত্র, তখন একবার বাংলার লাট স্যার স্ট্যান্‌লী জ্যাক্‌সন তাদের স্কুল (সরকারী কলেজিয়েট স্কুল) পরিদর্শনে আসেন। সেই সময় বালক রজত দু' মিনিটের মধ্যে লাটসাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতিকৃতির পেন্সিল স্কেচ্ করে তাঁকে উপহার দেয়। বলা বাহুল্য, রজতকে শিল্পচর্চার জন্য লাটবাহাদুর একটি বৃত্তি মঞ্জুর করেন এবং কলকাতা আর্ট কলেজে সে যদি কখনও ভর্তি হয় তবে তাকে সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়ে যান।

রজতের পিতা চট্টগ্রামের প্রখ্যাত উকিল—শ্রীরঞ্জনলাল সেন।

রজত আগে আগে—আর সবাই তাকে অনুসরণ করে পাহাড়ের নিচে মাঠে নেমে

এলো। এখানে অম্বিকাদা আবার তাদের Fall-in করালেন। পাহাড়ের রাস্তায় চলার সময় তারা অল্প-কতদূর গিয়েই একবার করে গুণে গুণে দেখছিল সকলেই উপস্থিত কিনা। বন-জঙ্গল, উঁচু-নিচু জায়গা, রাত্রের অন্ধকারে ঘোরা পথে চলা, প্রভৃতি কারণবশতঃ সব সময়েই তাদের ভয় ছিল যদি কেউ কোথাও হারিয়ে যায় বা পেছনে পড়ে থাকে।

পাহাড়ের নিচে মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে গণনা শেষ হলে পর অম্বিকাদা তাদের শুয়ে বিশ্রাম নিতে বললেন। সেখান থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে বাজিদ্-বস্তান দরগা—একজন ফকির সাহেবের সমাধিস্থান। এটি হিন্দু-মুসলমান সকলেরই তীর্থক্ষেত্র। পাহাড়ের উপরে দরগায় যাবার পথে একটি বিশেষ নামকরা পুকুর আছে। পুকুরটি প্রায় হাজার বছরের পুরনো। এই পুকুরে শত শত কাছিম ও মাছ একসঙ্গে বসবাস করে। কেউ এই পুকুরের মাছ বা কাছিম ধরে না। প্রত্যেকেই এই তীর্থস্থানের পুকুরটিতে মাছ ও কাছিমের অপূর্ব সংমিশ্রণের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। মুড়ি, কলা, প্রভৃতি নিয়ে মাছ ও কাছিমদের ডাক দিলে তারা জল থেকে ভিড় করে শান-বাঁধান মস্ত বড় সিঁড়িতে উঠে এসে খাবারগুলি খায়। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! এই পুকুরের সৃস্টির ইতিহাস আমি বলতে পারবো না। আমার কাছে ফকির সাহেবের দরগার আকর্ষণ কোনদিনই ছিল না; তবে এই পুকুর যে বিশেষ ধরনের ঐতিহ্য বা বৈচিত্র্য যুগ যুগ ধরে বহন করে এসেছে, তা' দেখে আমি একসময়ে মুগ্ধ হয়েছি। বাজিদ্‌বস্তান দরগা নাগারখানা পাহাড়ের উত্তরে সংলগ্ন একটি পাহাড়ের ওপর অবস্থিত।

আমাদের প্রধান-বাহিনীকে অম্বিকাদা যেখানে শুয়ে বিশ্রাম করতে বলেছেন, সেখান থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে, দরগার পাহাড়টির নিচে, আরো একটি জলাশয় আছে। লোকেরা এই পুকুরের জল খাওয়ার জন্য ব্যবহার করতো। আমাদের ৈনিক বন্ধুরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে এই পুকুরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়েছে ও যে যত পারে জল খেয়েছে। অতি গোপনে ও সন্তর্পণে তাদের সমস্ত গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করতে হয়েছে। তাই তাদের ওপর যতদূর সম্ভব গা ঢাকা দিয়ে বিশ্রাম করবার আদেশ ছিল। অনেকে এই সময়টুকুর ভেতরেই বেশ ঘুমিয়ে পড়েছে। অম্বিকাদা, নির্মলদা, লোকনাথ ও মাস্টারদা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে ব্যস্ত। তখনও কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে তাঁরা পৌছতে পারেন নি।

অমরেন্দ্র নন্দী শেষবারের জন্য সবাইকে জিজ্ঞেস করলো—"আর কেউ জল খেতে চাও—আর কেউ পুকুরে যাবে?" দু'চারজন তখনও ঘুমে অচেতন। অমরেন্দ্রর ডাক শুনে দু'একজন জেগে উঠলো। তারা অমরেন্দ্রর সঙ্গে গিয়ে জল খেয়ে ফিরে এলো।

সবার জল খাওয়া, হাত-মুখ ধোয়া, প্রভৃতি শেষ হওয়ার পর অম্বিকাদা নিয়মঘরে ঘুরে ঘুরে সবাইকে বলে গেলেন—"Be ready, be ready!" তারা সবাই ঝোলা, রাইফেল, রিভলভার, কার্তুজ, প্রভৃতি নিয়ে তৈরি হ'ল—এখনই আবার মার্চ সুরু করতে হবে। লোকনাথ ও অম্বিকাদা এবার সবার আগে আগে পথের নির্দেশ দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। বাজিদ্‌বস্তান দর্‌গার গা ঘেঁষে যে রাস্তা উত্তরে গেছে, সেই পথ ধরে তারা হেঁটে চলেছে। এই সময় অম্বিকাদা বেছে বেছে কয়েকজনের কাছে জানতে চাইলেন—ফতেয়াবাদ থানা এলাকা কে চেনে এবং ফতেয়াবাদে কার বাড়ি? ফতেয়াবাদের একজন এগিয়ে এলো; তাকে পাশে নিয়ে অম্বিকাদা চলছিলেন। সেই তরুণ যুবক রেল-লাইন ধরে ফতেয়াবাদের দিকে সবাইকে পরিচালিত করছিল। অম্বিকাদা তাকে বললেন সে যেন তার বসতবাড়ি ও রেল-স্টেশনের কাছে না গিয়ে দূর দিয়ে ঘুরে যায়। সেই নির্দেশ অনুযায়ী আবার তারা মাঠে নেমে পড়লো এবং রেল-স্টেশন ও পরিচিত গ্রামটি এড়িয়ে মার্চ করে চললো।

অম্বিকাদা ফতেযাবাদের সেই তরুণের কাছে প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন 'লাইল্যার হাট' সে চেনে কিনা। এই প্রসিদ্ধ হাটটি সম্বন্ধে তাঁর জানা ছিল। অম্বিকাদা ফতেয়াবাদের সেই ছেলেটির সঙ্গে নির্মলদা, লোকনাথ, রজত এবং ও আরও একজনকে টাকা দিয়ে এই হাটে পাঠালেন যা খাবার পাওয়া যায় তাই নিয়ে আসতে।

রাত তখন প্রায় দুটো। পাঁচজনেরই মিলিটারী পোশাক—হাতে রাইফেল এবং প্রত্যেকের কোমরে রিভলভার। তারা পাঁচজন জনমানবহীন নির্জন হাটে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। রাত দুটোর সময় হাট বসে না। তাই রাত্রে হাট দেখে মনে হয় যেন একটি পরিত্যক্ত শ্মশান। দূরে দূরে ছাড়া ছাড়া দোকানঘর আছে—সবগুলোরই দরজা বন্ধ, সকলেই ঘুমোচ্ছে।

লোকনাথ তাদের মধ্যে একজন দোকানীকে ডাকাডাকি করে ঘুম থেকে ওঠালো। সেই দোকানদার এই পাঁচজনকে সৈনিকবেশে দেখে প্রথমে ঘাবড়ে গেল। সভয়ে জিজ্ঞেস করলো—"কি চান?" লোকনাথ দোকানীকে দেখে বেশ বুঝতে পেরেছে যে, সে তাদের সৈনিকবেশ দেখলেও ঠিক ইংরেজ সরকারের সৈনিক বলে মনে করে নি। তবু লোকনাথ বলল—"আমরা বিস্কুট, পাঁউরুটি, কলা, চিঁড়ে প্রভৃতি কিনতে এসেছি। তোমার দোকানে যা আছে সব দাও।" দোকানী প্রশ্ন করলো—"এত খাবার কি হবে? কোথায় নেবেন? কি ভাবে নেবেন?"

লোকনাথ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—"আমরা পুলিস। হাটহাজারী হাই-স্কুল মাঠে আমরা ক্যাম্প করেছি। আমরা ডাকাতদের ধরতে এসেছি। তাদের খবর

পেলে দেবে—পুরস্কার পাবে।" ইতিমধ্যে দোকানীর সঙ্গে আরও ছ'জন এসে জুটলো। তারাও লোকনাথদের আপাদমস্তক খুব মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষণ করতে লাগলো। পুলিস বলে তাদের ধাপ্পা দেওয়া খুব সহজ নয়। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ—স্নান নেই, খাওয়া নেই, নিদ্রা নেই—তা'ছাড়া সুন্দর ইস্ত্রি করা পোশাকের বদলে কাদা-মাটি মাখা খাকী পোশাক তাদের পরিধানে, তাই পুলিসের দল যে তারা নয়, সেরূপ অনুমান করা দোকানীদের পক্ষে খুব শক্ত ছিল না। ইংরেজ সরকারের পুলিস নয় বলে বুঝলেও দোকানীদের মধ্যে কেউ কি সাহস করে প্রশ্ন করবে তাদের মনের সংশয় দূর করবার জন্যে? না, সেইরূপ মনোবাঞ্ছা কারও যদি থাকেও, তা' তার গোপন মনেই সমাধি লাভ করেছে। দোকানীরা জিনিস বিক্রি করবে লভ্যাংশ পাবে—তাদের অত খবরে কাজ কি? তারা আর কোন প্রতিবাদ করা বা অত রাত্রে ঘুম থেকে উঠে চাহিদা অনুযায়ী মাল বিক্রি করতে প্রস্তুত নয়—এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করে পাঁচজন রাইফেলধারী সৈনিকের অপ্রিয়ভাজন হওয়া সুবিবেচনাপ্রসূত নয় বলেই মনে করলো।

হাসিমুখে উৎসাহের সঙ্গে তারা দু'টি বড় বড় ঝুড়ি নিয়ে এলো। তারপর দোকানে যা ছিল—সব রকম বিস্কুট, পাঁউরুটি, কলা, চিঁড়ে, প্রভৃতি ঝুড়িতে বোঝাই করে দিল। মূল্য মাত্র আঠারো টাকা। সবার কাছে আজ হয়ত অবাক লাগবে আঠারো টাকায় কতটুকু খাদ্যবস্তুই বা তারা পেয়েছিল! সে সময়ে চার আনায় কুড়িটা ডিম, তিন বা চার পয়সায় এক সের দুধ, তিন পয়সায় একটা ফুলকপি, চার-পাঁচ আনায় বড় ইলিশ মাছ পাওয়া যেত। আঠারো টাকার বিনিময়ে তারা বড় বড় দুই ঝুড়ি ভর্তি বিস্কুট, কলা প্রভৃতি নিয়ে রওনা হ'ল।

দোকানীরা ভদ্রতা করে পৌছে দেওয়ার জন্য এগিয়ে এলেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঁচজন বিপ্লবী সৈনিক খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে বিশ্রামরত সাথীদের কাছে ফিরে এলো।

এতক্ষণ একটি পুকুরের সন্নিকটে সুপুরী বাগানে অম্বিকাদা ও মাস্টারদার নেতৃত্বে প্রধান-বাহিনীটি অপেক্ষা করছিল। খাবারের ঝুড়ি দেখে তরুণ সাথীরা আশ্বস্ত হ'ল। কেউ কেউ আনন্দে অম্বিকাদাকে থ্রীচিয়ার্স জানালো, অম্বিকাদা সবাইকে নিজ নিজ স্থানে বসে থাকতে বললেন। চারজন যুবক খাবারগুলি সকলকে ভাগ করে দিল। গ্রুপে গ্রুপে খাওয়া সেরে পুকুরে গিয়ে জল খেয়ে ও হাতমুখ ধুয়ে সকলে আবার মার্চ করার জন্য প্রস্তুত হ'ল।

এখন রাত প্রায় তিনটে। চৌধুরীহাট স্টেশনের পাশে এই পাহাড়টি বাকি রাত-টুকুর জন্য ও পরের দিন, ২০ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত, নিরাপদে অপেক্ষা করবার মত উপযুক্ত কিনা তা' নিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে অম্বিকাদা আলোচনা করলেন। তাঁরা

সাব্যস্ত করলেন—আরও এগিয়ে যেতে হবে এবং স্টেশন থেকে যতদূর সম্ভব ব্যবধান রেখে তাদের সেইদিনের জন্য আস্তানা ঠিক করতে হবে।

এরপর তারা স্টেশনটি পাশে রেখে সামনের দিকে আরো প্রায় আধ মাইল এগিয়ে গেল এবং বাঁ দিকের মাঠে নেমে সামনের পর্বতশ্রেণী লক্ষ্য করে চলতে লাগলো। এক ঘণ্টার মধ্যে কোন একটি পাহাড় তাদের বেছে নিতে হবে। ভোর হওয়ার আগে নির্জন ও নিরাপদ পাহাড়ের অন্তরালে তাদের ক্যাম্প করতেই হবে।

প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রায় আধমণ করে বোঝা! অধিকাংশ ছেলেদেরই কিইবা বয়স! তবে বয়সের তুলনায় প্রায় সকলেরই দেহ অনেক বেশি সুস্থ-সবল—ডন-কুস্তি করা শক্ত শরীর। তবু যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরাই কেবল বুঝতে পারবেন যে, যত শক্তির অধিকারীই হোন না কেন, অতখানি ওজন সঙ্গে নিয়ে দুরূহ দুর্গম গিরিপথ, ভাঙাচোরা মাঠের রাস্তা ও বন-জঙ্গলের বাধা সরিয়ে মার্চ করা কতখানি কষ্টসাধ্য। এক ঘণ্টার মধ্যে এইরূপ নানা বাধা অতিক্রম করে খুব বেশি দূর অগ্রসর হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। খুব বেশি হলেও তারা এই এক ঘণ্টার মধ্যে দু' মাইল পথের বেশি এগোতে পারে নি। ১৯শে তারিখ শেষরাত্রে মাত্র এই দুই মাইল পথ অতিক্রম করতে তারা যে কঠিন ও নিদারুণ অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, তা' তাদের প্রত্যেকের জীবনে বিপ্লবী সামরিক অভিযানের বাস্তব শিক্ষার এক মূল্যবান সঞ্চয়।

জল, বিস্কুট ইত্যাদি কিছু কিছু খেয়ে যাত্রা আরম্ভ করলেও একশ' দু'শ গজ যেতে না যেতেই আবার তারা তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছে। তবু তাদের চলতে হয়েছে, চলেওছে। শারীরিক সহ্যশক্তি সকলের সমান ছিল না। কেউ কেউ খুব কাতর হয়ে পড়েছে। তবু সম্মুখপানে তাদের গতি অব্যাহত রাখতে হয়েছে। সবার জিভ গলা শুকিয়ে গেছে। একটু গলা ভিজিয়ে নেবার জন্য সামনে লতা-পাতা, যে যা পেয়েছে তাই চিবিয়েছে। তাতে কিইবা হয়—কতটুকু তৃষ্ণা মেটানো যায়! বরঞ্চ পিপাসা আরো বেড়ে গেছে। এমন সময়, এইরূপ নিদারুণ তৃষ্ণার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে, একজন সাথী তার বন্দুক পরিষ্কার করবার মোবিল তেলের ছোট্ট টিনটি খুলে মোবিল গলায় ঢেলে দিল! কি ভীষণ অবস্থা! মোবিল-তেল কি তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে? তার মুখ জিভ গলা বুকের ভেতর যেন কেউ আগুন লাগিয়ে দিল! সব যেন পুড়ে যাচ্ছে! সে আর চলতে পারলো না—ঢলে পড়লো। ফিস্-ফিস্ করে মুখে মুখে সেই নিদারুণ খবর সবার কাছে চলে গেল। ক্ষণিকের জন্য মার্চ বন্ধ হ'ল। দু'জন ডাক্তার সাথী—নরেশ ও বিধু, তার কাছে ছুটে গিয়ে ফার্স্ট-এড দিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু কি দিয়ে ফার্স্ট-এড দেবে? গলায় আঙুল দিয়ে বমি করালো, বাতাস করে যেটুকু সম্ভব সুস্থ করতে চেষ্টা করলো।

কেউ একজন গাছের সবুজ পাতা নিংড়ে রস বার করে তাই তার মুখে দিল। ফার্স্ট-এড কতখানি কাজে লেগেছিল জানি না—তবে তাকে সবল সুস্থ করে তোলার জন্য বার বার তাকে বলা হ'ল—"শক্ত হও," "ভেঙে পড়ো না," "বিপ্লবের দুর্গম পথ এইতো মাত্র সুরু," "ক্ষুধা তৃষ্ণা বিনিদ্র রজনী ও রক্তঝরা চরণই তো আমাদের একমাত্র পাথেয়—একমাত্র সাথী!" সাথীদের কণ্ঠে এইসব উৎসাহবাণী তার কানে ধ্বনিত হতে লাগলো। নিদারুণ তৃষ্ণা, ক্ষণিকের দুর্বলতা ও অবসাদ বিপ্লবী প্রেরণার কাছে পরাজয় স্বীকার করলো—মোবিল সেবনের প্রতিক্রিয়া ও দুর্বলতা কাটিয়ে বন্দুকে ভর দিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো। আবার সে সজীব হয়ে উঠেছে—তাকে সাথীদের সাথে যেতেই হবে।

ফিস্‌ফিস্ করে আবার তাদের কাছে মার্চ সুরু করবার অর্ডার গেল। মার্চ আরম্ভ হ'ল। আর বেশি দূর এগোনো গেল না। ভোর হয়ে আসছে—তার আগেই লোকচক্ষুর অন্তরালে তাদের 'ক্যাম্প' পাততে হবে। প্রায় আধমাইল পাহাড়ের ঢাল দিয়ে এগিয়ে তারা আর একটি পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলো। পাহাড়ের ওপর উঠেই সবাই বসে পড়লো—কেউ কেউ একেবারে শরীর টান করে শুয়ে পড়লো। তাদের মধ্যে সবল সুস্থ যুবকদের একটি ছোট্ট দলকে নরেশ রায়ের চার্জে দেওয়া হ'ল। নরেশ বেছে বেছে দু'জন করে নিয়ে বহুদুর পর্যন্ত দেখা যায় এমন গোপন স্থানে তাদের পজিশন্ নিতে বলল। শত্রুর আগমনবার্তা যেন আগে থেকে জানা যায় তাই এই ব্যবস্থা। প্রহরী মোতায়েন হ'ল আর অন্য সাথীরা সবাই ক্লান্ত হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লো।

২০শে তারিখ—রোদ উঠেছে। এখন সকাল প্রায় এগারোটা। এমন সময় আনন্দের বাড়িতে অতর্কিতে পুলিস হানা দিয়েছে আর আমরা চারজন আনন্দের বাড়িরই আধমাইলের ভেতর পাহাড়ের আড়ালে বসে সময় কাটাচ্ছি।

ওদিকে এই সময় অম্বিকাদা ফতেয়াবাদের ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন, সে তার বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর আনতে পারে কিনা। কি ধরণের খবর আনতে হবে সেইরূপ ধারণাও অম্বিকাদা তাকে দিলেন—কোন সৈন্যের গতিবিধি এইদিকে আছে কিনা, শহরে সৈন্য এসে পৌছেছে কিনা ইত্যাদি এবং এই সংক্রান্ত অন্যান্য যে কোন খবর পাওয়া যায়।

মাস্টারদা জানতে চাইলেন—'যে কোন খবর' বলতে অম্বিকাদা কি বলতে চাইছেন? অম্বিকাদা তখন তাকে বুঝিয়ে বললেন—"তুমি খোঁজ করে দেখবে ট্রেন লাইন-চ্যুত হয়েছে কিনা—এখনও ট্রেন চলাচল বন্ধ আছে কিনা।"

তখন বেলা প্রায় বারোটা। অম্বিকাদা তাকে পাঁচ টাকার একটি নোট দিলেন এবং চারটার সময় খবর নিয়ে ফিরে আসতে বললেন; আসবার সময় যদি পারে

তরমুজ প্রভৃতি ফল নিয়ে আসবার কথাও বললেন। টেগ্‌রা তার সঙ্গে যেতে চাইছিল। অম্বিকাদা টেগ্‌রাকে যেতে নিষেধ করলেন। সে একাই গেল। টেগ্‌রা তাকে যাবার সময় বলল—"ফেরবার সময় সঙ্গে কিছু লবণ নিয়ে আসবি।" একা একজনকে এমনি করে পাঠানো, বিশেষ করে এই তরুণটিকে, অম্বিকাদার উচিত হয়েছিল কিনা সে বিচার আমি করবো না। তবে এই তরুণটিও কোন খবর নিয়ে আর ফিরে আসে নি।

২০শে তারিখ সারাটা দিন যখন তারা পাহাড়ের ওপর কাটাচ্ছে, তখন আমরা তাদের পরিত্যক্ত নাগারখানা পাহাড়ের কাছে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি—চা ও পানের দোকানে তাদের খোঁজ নেবার চেষ্টা করছি। তারপর কর্নেল ডালাস্ স্মিথের ফোর্সের সম্মুখীন হওয়ার পর এবং আমাদের পরিচয় জানবার জন্য ঔৎসুক্যে অধীর কয়েকজন লোকের হাত হতে মুক্তি পেয়ে আমরা চারজন রাত প্রায় সাতটার সময় শহরে সতীদার কাছে এসেছি। আমাদের প্রধান-বাহিনী প্রায় সেই একই সময়ে —২০শে তারিখে রাত্রি সাতটা-আটটা নাগাদ, পাহাড়ের নিচে মাঠে নেমে এসেছিল।

দ্বিতীয় সংবাদবাহকও ফিরে এলো না। ২০শে তারিখে রাত্রে শহরে আমাদের চারজনেরও যেমন কোন আশ্রয় বেছে নিতে হবে, ঠিক তেমনি প্রধান-বাহিনীরও সেই রাত্রেই অন্য কোন পাহাড়ে ক্যাম্প স্থানান্তরিত করতে হবে। পাহাড়ের নিচে নেমে এসে নিয়মমত গুণতি করা হ'ল—এখন তারা সাতান্নজন।

দু'জন সংবাদবাহকের মধ্যে প্রথমজনের মারফত মাস্টারদা আমাদের যুব-বিদ্রোহের একটি বাস্তব রিপোর্ট সংক্ষেপে লিখে সতীদার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন সতীদা হয়ত কোন সূত্র ধরে জাতীয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে সেই রিপোর্ট প্রকাশ করতে পারবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সতীদার কাছে সেই রিপোর্ট গিয়ে পৌঁছল না।

শহরের যেরূপ অবস্থা আমরা নিজেরা দেখেছি, তাতে পুলিসের সম্পূর্ণ অপরিচিত এমন একটি ছেলে সতীদার কাছে অনায়াসে আসতে পারতো। কতখানি মানবিক দুর্বলতার শিকার হলে পরে একজন দীক্ষিত বিপ্লবীও এতখানি শঙ্কাগ্রস্ত হতে পারে, এইরূপ অভিজ্ঞতার আগে তা ভাবাই যেত না। প্রাণের মায়া বড় মায়া! বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছে তথাকথিত বিপ্লবী জোয়ানকে প্রথম সুযোগেই সমস্ত দলকে বিপদের মুখে ফেলে পালাতে অনুপ্রেরণা দেয়। দু'জন সংবাদবাহক প্রথম সুযোগেই সরে পড়লো।

এ তো গেল ঠিক লোক বাছাই না করার ভুল। তা'ছাড়া গেরিলা-বাহিনীর স্কাউটিং প্রভৃতির প্রাথমিক নিয়মও আমাদের জানা ছিল না। গেরিলা-যুদ্ধের

নীতি অনুযায়ী কোন স্কাউট বা সংবাদবাহককে প্রধান-বাহিনীর গতিবিধি, অবস্থান বা তাদের হেডকোয়ার্টার কখন কোথায় আছে, তা কোনমতেই জানতে দেওয়া হয় না। এইরূপ নিয়ম অনুসরণ করার বিশেষ কারণ অনুমান করা একটুও কঠিন নয়। কোন সংবাদবাহক বা স্কাউট যদি শত্রুর কবলে পড়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবু যেন বিরুদ্ধপক্ষ প্রধান-বাহিনীর অস্তিত্বের খোঁজ না পায়, তারই জন্য গেরিলা-নীতি অনুসারে সংবাদবাহকেব প্রধান-বাহিনীর অবস্থান না জানা উচিত। এই নীতি যদি তারা অনুসরণ করতো তবে তাদের স্কাউটদের নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিল যে, কোন একটি পরিচিত নির্দিষ্ট স্থানে কয়েকটি বিকল্প সময়ে তারা যেন উপস্থিত হয়। সেই ক্ষেত্রে প্রধান-বাহিনী তাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ গোপন রেখে বাছাই কবা কোন একজনকে সংবাদবাহকেব সঙ্গে যোগাযোগ করতে পাঠাত। তাবপব তাকে হেডকোয়ার্টাবে নিয়ে আসতো। বলাই বাহুল্য, সংবাদ-বাহকের সঙ্গে শত্রুপক্ষেব আর কোন লোক গোপনে প্রতীক্ষা করছে কিনা, তা দূর থেকে স্পষ্টই দেখা যায় এমন একটি নির্দিষ্ট স্থান ধার্য করা হ'ত। যদি এইরূপ ব্যবস্থা তাঁরা করতে পারতেন, তাহলে স্কাউটদের বারোটার সময় পাঠিয়ে চারটার সময় ফিবে আসার জন্য নির্দেশ দিতেন না। এত অল্প সময়ের মধ্যে দশ-বারো মাইল পথ গিয়ে ফিরে আসা, বিশেষ করে সংবাদ সংগ্রহ করে ফিরে আসা, কোনমতেই সম্ভব নয়। স্কাউটিং-এর পদ্ধতি সম্বন্ধে আগে যা বললাম, সেই নিয়ম অনুসবণ কবে যদি বাছাই করা কোন সাথীকে সংবাদ সংগ্রহ ও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পাঠানো হ'ত এবং এই দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য যুক্তিসঙ্গত সময় ধার্য করা হ'ত, তবে হয়ত স্কাউটিং-এর উদ্দেশ্য সফল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আমাদের এই বিষয়ে শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবের জন্যই স্কাউটিং যেটুকু হয়েছে তাতে সুফল তো পাওয়া গেলই না বরং ক্ষতিই হ'ল—কারণ, সেই দু'জনও হয়ত সবার সঙ্গে থেকে যুদ্ধে যোগ দিত—অনিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রলোভনে বৈপ্লবিক পথ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে যাবার সুযোগই পেত না।

২০শে তারিখ রাত্রেও তারা পুকুর পাড়ে বসে দই, চিঁড়ে, কলা প্রভৃতি দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করেছে। তারপর প্রস্তুত হয়ে আবার পাহাড়ের পথে মার্চ করেছে। সেদিন কিন্তু তরুণদের মধ্যে গুঞ্জন দেখা দিল। তাদের মধ্যে নরেশ, বিধু, ত্রিপুরা, রজত, মনা, দেবু প্রমুখ যুবক বিপ্লবীরা প্রশ্ন তুলল—"কেন আমরা পাহাড়ে পাহাড়ে বন-বাদাড়ে স্নান-আহার-নিদ্রা সব ছেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি? আমাদের কি প্ল্যান? কি আমাদের উদ্দেশ্য?"—নেতারা এইসব প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন। ক্রমেই যে তরুণদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ছে তা' বেশ বোঝা যাচ্ছিল। আজ তারা শহর থেকে আরো দূরে, উত্তরে মার্চ করতে প্রস্তুত ছিল না। তাদের ইচ্ছে শহরে প্রবেশ করতে

হবে—শত্রুকে আগে আক্রমণের সুযোগ না দিয়ে প্রথম আঘাত তারাই হানবে। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ না করে অলসভাবে সময় কাটানোর প্রতিক্রিয়া তাদের মনে তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে। অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হতে লাগলো। ২০শে তারিখ রাত্রে তাঁরা স্থির করল যে, শহরের দিকেই তারা ফিরে যাবে।

তখন রাত প্রায় বারোটা-একটা হবে। প্রধান-বাহিনী শহরের দিকে এগোতে লাগলো। দুর্গম পথ অতিক্রম করে সবাই এগিয়ে চলেছে। সেই বুকফাটা তৃষ্ণার জ্বালায় সকলেই ভীষণ কাতর। তবু আজ তাদের মনের প্রতিক্রিয়া অনুরূপ—কর্মসূচী স্থির আছে—আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের শেষ চেষ্টা হবে; তারপর তারা আর অপেক্ষা করবে না, আক্রমণ কবার জন্য শহরে প্রবেশ করবে।

ভোর হতে বেশি বাকি নেই। সামনে খুব উঁচু একটি পাহাড় দেখা যাচ্ছে। দেখে মনে হয় ঘন বনে ঢাকা অতি উঁচু এই দুর্গম পাহাড়ে কোন লোকই ওঠে না। নিরাপত্তার কথা ভেবে এই পাহাড় যত দুর্গমই হোক্ না কেন, তার ওপর ক্যাম্প স্থাপন করাই উচিত বলে তারা মনে করলো। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিপ্লবীদল এই পাহাড়ের প্রাকৃতিক কাঠিন্য ও আপাতদৃষ্টিতে দুঃসাধ্য খাড়া পথ দেখে বিচলিত হ'ল না। বরং তরুণদের adventure স্পৃহা বেড়ে গেল। দুর্গম পাহাড়ে তাবা উঠবেই। সঙ্গে আছে প্রায় আধ মণ করে বোঝা। Where there is a will: there is a way! —ইচ্ছে থাকলে পথ খুঁজে পাওয়া যাবেই।

বীরদর্পে খাড়া উঁচু পাহাড়ে তারা উঠতে লাগলো। কোন সময় এমন স্থানে পা দিয়েছে যে, পা পিছলে অনেকদূর নিচে গড়িয়ে পড়েছে। কোন সময়ে আবাব ছোট ছোট চারা গাছ বা সামান্য লতা ধবে স্থির থাকতে চেষ্টা করেছে; কিন্তু অনেক সময় চারাগাছ উপ্‌ড়ে এসেছে এবং লতা ছিঁড়ে গেছে। এত বাধা সত্ত্বেও তারা দমে নি। অসাধ্য সাধন করতেই হবে। সামান্য অভিজ্ঞতার পর তারা উপায় উদ্ভাবন করলো কি করে পাহাড়ের খাড়াই পথ বেয়ে উঠবে। তাদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ তারা মাটি কেটে বা শক্ত গাছেব শেকড় ধরে ভাল করে পজিশন্ নিল। তারপর একজন তার রাইফেলের একদিক এগিয়ে দিল সাথীর হাতে, যে নাকি কয়েক ধাপ ওপরে পজিশন্ নিয়ে বসেছে। সাথী তাকে টেনে তুললো। পর পর ওপরের দিকে বিশেষ বিশেষ অসুবিধাজনক স্থানে বলিষ্ঠ সাথীরা আগে থেকে ঐরূপ দৃঢ় নির্ভরশীল-পজিশন্ নিয়ে পরে এক একজনকে তারা ওপরে তুলে আনলো।

পাহাড়ের ওপরে ওঠার পর আবার গণনা হ'ল। সবাই এসেছে। এবার ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে তারা বিশ্রাম করতে লাগলো। পালা করে পাহারা দেওয়ার জন্য প্রহরী নিযুক্ত হ'ল। ক্লান্ত দেহে কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্যান্য সকলেই ঘুমিয়ে পড়লো।

এই পাহাড়টি ফতেয়াবাদের দক্ষিণে মাইল দু'য়ের মধ্যে হবে। সকাল প্রায়

আটটা বেজেছে। একে একে তারা ঘুম থেকে উঠলো। দিনের আলোতে এখন এই পাহাড়ের অবস্থান ঠিক মত বোঝা গেল। তারা যতখানি খাড়াই পথে পাহাড়ে উঠেছে পশ্চিম দিকে পাহাড়টি ততখানি খাড়াই নয়। খুঁজে খুঁজে তারা দেখতে পেল পাহাড়ের নিচে সরু একটি জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে। সেই সরু জলস্রোত ধরে তাদের মধ্যে কেউ এই স্রোতের উৎপত্তিস্থান খুঁজে বার করলো। পাহাড়ের ওপর থেকে শীতল জল ঝরণার মত ঝরে পড়ছিল। তারা ছোট ছোট দলে সবাই গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে জল খেয়ে এলো।

এই পাহাড়ে ওঠার আগে মার্চ করার সময় তারা তরমুজ ক্ষেত অতিক্রম করে যাচ্ছিল। প্রত্যেককে বলা হয়েছিল একটি করে ছোট বা মাঝারি সাইজের তরমুজ যেন সঙ্গে নিয়ে আসে। সকাল আটটা ন'টার সময় তাদের কিছু খাওয়া-দাওয়া করা দরকার। সঙ্গে তরমুজ আছে ভাবনা কি! তাতেই সকালের ব্রেক্‌ফাস্ট হবে— নাই বা হ'ল চা, ডিম আর টোস্ট। কিন্তু দুর্গম পথ চলাকালে এবং শেষপর্যন্ত খাড়া পাহাড়ে ওঠার সময় তারা তরমুজ ফেলে দিয়েছে। একে তো অস্ত্রশস্ত্র ও কার্তুজের বোঝা, তার ওপর তরমুজ বয়ে আনা তাদের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। রাইফেল, কার্তুজ যে তাদের প্রাণের চাইতেও প্রিয়!

অস্ত্রের বিনিময়ে তরমুজ ফেলে আসাই তারা শ্রেয় মনে করলো।

এখন যখন সবাই জানতে পারলো যে, তাদের সঙ্গে তরমুজ আনা হয় নি, তখন অম্বিকাদা খুব চটে গেলেন। সবাইকে তিরস্কার করতে লাগলেন—"আশ্চর্য! এ কি করে তোমাদের পক্ষে সম্ভব হ'ল? খাওয়ারও প্রয়োজন আছে। শক্তি বজায় রাখতে হবে; নইলে শত্রুর সঙ্গে লড়বে কি করে? এখন কি খাবে? তরমুজ না এনে তোমরা অন্যায় করেছ।"

তরুণ বিপ্লবী কেউ বলে উঠলো—"আমরা তরমুজের চেয়ে বন্দুকে অধিক প্রয়োজনীয় মনে করেছি।"

অম্বিকাদা—"আমি বন্দুক ও তরমুজ, দুই-ই প্রয়োজনীয় মনে করি।"

নির্মলদা একটু হেসে আবহাওয়া হাল্কা করে দেওয়ার জন্য অম্বিকাদাকে উদ্দেশ করে চট্টগ্রামের ভাষায় বললেন—"অম্বিকাদা, অওনে কি যে কওন! ছোড ছোড পোয়াউন্ তিন দিন ধরি খাওন্ নাই, সেয়ান্ নাই, ঘুম নাই—তও কোনমতে হাঁডি আই পাহাড়ত্ উইঠ্যে যে কত ন; তার উয়োর আর তরমুজ কেয়া নআইন্‌ল, ইয়ান এগ্‌গুয়া কথা হইল যে না? তরমুজ লই হারা রাস্তা হাঁডিলে তারা পথৎ মরি থাইলে অওনর তরমুজ কনে খাইত ......?"—(অম্বিকাদা আপনি যে কি বলেন! ছোট ছোট ছেলেদের তিনদিন ধরে স্নান-খাওয়া নেই, তবু কোনমতে যে তারা পাহাড়ের ওপরে পৌছতে পেরেছে এই কত না; তার ওপর কেন তরমুজ আনলো

পড়ে থাকতো তবে আপনার তরমুজ কে খেত ?)।

নির্মলদা এত সুন্দর করে কথাগুলি বলেছেন যে, সকলেই খুব উপভোগ করেছে। সবাই হেসে উঠলো—অম্বিকাদাও সবার সঙ্গে হাসলেন।

এমন সময় নরেশ রায় সকলকে খুব অবাক করে দিয়ে জানালো, তাদের সঙ্গে ছোট ও মাঝারি ধবনের দশটি তরমুজ আনা হয়েছে। মধুর খবরটি শুনে সকলের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। নরেশ দশটি তরমুজ অম্বিকাদার সামনে এনে দিল। অম্বিকাদা নরেশের খুব প্রশংসা করলেন। তারপর অম্বিকাদা সযত্নে ফালি ফালি করে নিজ হাতে প্রত্যেকের জন্য এক টুকরো হিসেবে দশটা তবমুজ কাটলেন।

বালক টেগ্‌রা—সদা উচ্ছল, সদা সজীব। সব সময় সে চায় নতুন কিছু কবতে –একটু adventure! অম্বিকাদা যখন তরমুজ ফালি করছিলেন তখন সে এক টুক্‌রো তরমুজ তাঁর দৃষ্টিব অগোচরে সরিয়ে ফেললো। তাব সমবয়সী কয়েকজনের কাছে এইরূপ নিখুঁতভাবে হাত সাফাইয়ের বিষয় জানিয়ে সে খুব আনন্দ পেল। বন্ধুরাও খুব খুশি- তারা এখন দেখবে অম্বিকাদা কি করেন।

সবাইকে দিতে গিয়ে তরমুজের টুক্‌বো একটি কম হওয়াতে অম্বিকাদা একেবারে রেগে আগুন। তিনি খুব কঠিন ভাষায় বললেন—

"আমি জানতে চাই কে না জানিয়ে তরমুজের টুক্‌রো নিয়েছে? শৃঙ্খলা ভঙ্গের এইটি অত্যন্ত নিকৃষ্ট অপরাধ। আমি চাই, যে না জানিয়ে তরমুজ নিয়েছ সে স্বীকার করবে।"

অম্বিকাদাকে আর বলার সুযোগ না দিয়ে টেগ্‌রা জানালো—"আমি নিয়েছি। আমি অপরাধী। আমাকে শাস্তি দিন।"

অম্বিকাদা খুব রেগেছেন। টেগ্‌রার ঐরূপ উপেক্ষার ভাব দেখে তিনি আরও রেগে গেলেন এবং লোকনাথকে কঠোর আদেশ জানালেন—

"লোকনাথ! তুমি টেগ্‌রাকে গুলী কর। বিপ্লবীদের কাছে উচ্ছৃঙ্খলতার কোন স্থান নেই তোমার ভাই বলে টেগ্‌রাকে তুমি আস্কারা দেবে না। তাকে এক্ষুণি গুলী কর।"

অম্বিকাদা ব্যাপারটাকে খুব seriously নিয়েছেন। কঠোর discipline তিনি impose করতে চাইছেন। হাল্কা পরিবেশ ক্রমেই যেন গাম্ভীর্যে পরিণত হ'ল। ব্যাপারটা ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করলো—লোকনাথ অম্বিকাদাকে উত্তর দিল—

"আমার ভাই বলে টেগ্‌রা অন্যায় করেও ক্ষমা পাবে—এইরূপ ধারণা করা

আপনার ভুল। বিচার করুন। যদি টেগ্‌রার প্রাণদণ্ডের হুকুম হয় তবে আমরা তাকে গুলী করবো।"

অবস্থা আরও জটিল হ'ল যখন সবাইকে স্তম্ভিত করে বুক টান করে টেগ্‌রা সোজা অম্বিকাদার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বুকের ওপরের জামা সরিয়ে ফেলে স্ফীত বক্ষে চাপড় দিয়ে অম্বিকাদাকে আহ্বান জানালো—

"আপনার সামনে এই আমি বুক পেতে দিলাম। আমি অপরাধ করেছি গুলী করুন। সোনা ভাই (টেগ্‌রা লোকনাথকে এই নামে ডাকত) দাঁড়িয়ে কেন? গুলী কর।"

ব্যাপার খুবই সামান্য। তবু রাগের মাথায় ছোট জিনিসও এতদূর গড়িয়ে যাওয়াতে সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লো—কি জানি যদি কোন অনর্থ ঘটে যায়! আবহাওয়া থম্‌থমে হয়ে উঠেছে, ঝড়ের পূর্বাভাস যেন! সবাই স্তব্ধ বিস্ময়ে অপেক্ষা করছে—এখনি কি ঘটবে!

টেগ্‌রা যখন ড্রামা একেবারে চরমে নিয়ে গেছে, তখন অম্বিকাদার রাগ যত বেগে যতখানি চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল, ঠিক ততখানি দ্রুতগতিতে নেমে এলো, মুহূর্তে তাঁর সব রাগ একেবারে জল হয়ে গেল। অম্বিকাদা টেগ্‌রাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি সস্নেহে তাকে সম্বোধন করে বললেন—"ওরে বাবা, তুই তো আমার চেয়েও বেশি রেগেছিস্। আচ্ছা, আমি কি তোদের ওপর রাগ করতে পারি—গুলী করতে পারি—এই তোর মনে হ'ল? তোদের ওপর রাগ করবো না তো কার ওপর রাগবো? দুষ্টু ছেলে - দুরন্ত ভাইটি আমার!" খুব স্নেহভরে অম্বিকাদা টেগ্‌রার পিঠে হাত বোলাতে লাগলেন।

এই ছোট নাটকের এইরূপ সুন্দর পরিসমাপ্তিতে সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, খুশি হ'ল। তরমুজ খাওয়া সুরু হ'ল। সকলেই খুব তৃপ্তির সঙ্গে তরমুজ খেল। কেবল খেল না টেগ্‌রা। নির্মলদা তাকে অনেক সাধাসাধি করলেন—তবু সে তরমুজ খাবে না! টেগ্‌রা সহজ হতে পারছিল না। সে ভাবতেও পারে নি একটু সামান্য মজা করার জন্য এই অতি তুচ্ছ ব্যাপারটিতে তাকে এত লাঞ্ছনা সহ্য করতে হবে। যদি সে একবারও বুঝতো সে একটা অপরাধ করতে যাচ্ছে, তবে কি সে একটি তরমুজের টুক্‌রোতেও হাত দিত বা তাই নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মজা করার চেষ্টা করতো! তার অভিমান হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সকলেই তরমুজ খাবে আর সবার ছোট টেগ্‌রা খাবে না—এটাই সকলের কাছে অতি নিদারুণ মনে হচ্ছিল।

এই জটিল অবস্থার সমাধান করলেন স্বয়ং অম্বিকাদা। দূর থেকে এতক্ষণ তিনি টেগ্‌রাকে নিরীক্ষণ করছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি টেগ্‌রার কাছে গিয়ে বললেন—

আমি অপরাধ করেছি। তুই আমাকে ক্ষমা করতে পারবি না?" টেগ্‌রা একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লো। অম্বিকাদা বললেন—"আমি এখন পর্যন্ত তরমুজ খাই নি। চল্ এইটি দু'জনে ভাগ করে খাই।" টেগ্‌রার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তারা দু'জনে তরমুজ খেল। সবাই এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে মুগ্ধ! বিপ্লবী কাঠিন্যের মধ্যে এই বৈচিত্র্য তাদের কাছে মরুভূমির মাঝে মরুদ্যান বলেই মনে হয়েছে।

২০শে তারিখ রাত্রি আটটার কিছু আগে আমরা সতীদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শহরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। দুপুর ও বিকেল পর্যন্ত প্রধান-বাহিনীর সংবাদের কোন সূত্র না পাওয়ায় আমরা ঠিক করেছিলাম শহরে গিয়ে সতীদার সঙ্গে দেখা করে রজতের বাড়িতে গিয়ে উঠবো। রজতের বাড়িতে আশ্রয় নিতে আমরা কেন আকৃষ্ট হয়েছি, তার একটু ইতিহাস এখানে বলা দরকার।

শহীদ রজত সেনের বাবা রঞ্জনলাল সেনের বাড়িটি কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত। এই ঐতিহাসিক বাড়িটির প্রতিটি ঘর, প্রতিটি কোণ, প্রতিটি বালুকণা শহীদ রজত সেনের আত্মবলিদানে পূত ও ধন্য। রজতের সাহস, বিক্রম ও প্রাণদানের অপূর্ব দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ সমস্ত পরিবারটির সক্রিয় সমর্থনে আমরাও সার্থক ও ধন্য! শহরের দক্ষিণ প্রান্তের এই বাড়িটির মতই আবার উত্তর প্রান্তের পর্বতশ্রেণী সংলগ্ন ছোট্ট একটি টিলার উপর অবস্থিত শহীদ দেবপ্রসাদ গুপ্তের বাসভবনটিও যুব-বিদ্রোহের অমূল্য ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দেবপ্রসাদের বাড়ির পেছন দিকের ছোট ছোট পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে যেমন আত্মগোপন করার সুবিধে ছিল, তেমনি এই বাড়ির অবস্থান নদীকূলে হওয়াতে নৌকো করে আসা-যাওয়া খুব সহজ ছিল। রজতের মা, বাবা, ছোট ছোট সব ভাইবোনেরা সকলেই আমাদের সমর্থক। রজতেব বাবা আগে অবশ্য আমাদের বিপ্লবী কার্যকলাপের কিছুই জানতে পারেন নি, কারণ আমরা তাঁর কাছে সব সময় বিশেষ গোপনীয়তা অবলম্বন করতাম।

রজতের বাবা রঞ্জন সেনের সঙ্গে প্রায় সমস্ত সরকারী উচ্চপদস্থ জেলা-প্রধানদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। তিনি ছিলেন টাউন ক্লাবের সভাপতি—যে টাউন ক্লাবের সভ্যেরা সবাই পুলিস, সরকারী কর্মচারী অথবা তাঁদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব। রঞ্জনবাবু আমাদের সকলের মেসোমশাই—রাশভারী লোক, তা'ছাড়া তিনি যে পরিবেশে থাকতেন, তাতে আমাদের সন্দেহ ও আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু আমাদের জীবনের অনেক ছোটখাটো অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলাম,—আপাতদৃষ্টিতে অবস্থা যতই প্রতিকূল থাকুক না কেন, এমন সব ক্ষেত্রেও সুযোগ আসে যা প্রতিকূল অবস্থার পরিবর্তনও সম্ভব করে তোলে।

রজতের মা—আমাদের সকলের মাসীমা! তিনি আমাদের সশস্ত্র প্রস্তুতির

বিষয় জানতেন। তবে চট্টগ্রাম শহরের সব বড় বড় ঘাটিগুলো আক্রমণ ও সমস্ত শহরটি দখল করবার পরিকল্পনার কথা তাঁর জানার কথা নয়। এমন কি তা রজতের পক্ষেও জানা সম্ভব ছিল না।

রজত যখন প্রথম আমাদের সংস্পর্শে আসে তখন সে গভর্নমেণ্ট কলেজিয়েট স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। ছাত্র হিসেবে রজতের তুলনা ছিল না। রজত বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমাদের বিপ্লবী দলের সভ্য হ'ল। রজতও টাউন ক্লাবের সভ্য। বড় বড় ফুটবল ম্যাচে রজত অংশগ্রহণ না করলে তাদের চলে না! সাব-ইন্‌স্পেক্টর সিদ্দিক দেওয়ান এবং হেম গুপ্তও খুব ভাল খেলোয়াড়। রজতের সঙ্গে তাদের খুব বন্ধুত্ব। যখন-তখন তারা রজতের বাবার কাছে আসতেন এবং ক্লাবের তাগিদে প্রেসিডেণ্ট রঞ্জনবাবু প্রয়োজন হ'লেই রজতকে কোতোয়ালিতে বা পুলিস-ক্লাবে সেই খেলোয়াড় পুলিসদের কাছে পাঠাতেন।

স্বনামধন্য সুবিখ্যাত চক্ষু-চিকিৎসক পবলোকগত ডাক্তার কিরণ সেন রঞ্জনবাবুব নিজের ছোট ভাই। রজত কাকু কিরণ সেনের অত্যন্ত প্রিয়। রজতকে উচ্চ শিক্ষার্থে তিনি বিলাত পাঠাবেন স্থিব হয়েছিল।

এই হ'ল বজতের পাবিবারিক পবিচয়। তার চাবদিকের বিপ্লব-পরিপন্থী পরিবেশের মধ্যেও সে তার বিপ্লবী সাথীদের সঙ্গে অচল অটল হয়ে রইল। আমাদেব সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিন ঘনিয়ে এলো। আমাদের বৈপ্লবিক শিক্ষা-পদ্ধতিও সেই সঙ্গে বদলে গেল। অস্ত্র-শিক্ষা আবন্ত হ'ল। হাত-বোমা ছোঁড়ার কায়দা ও আত্মরক্ষার বিভিন্ন উপায় শিক্ষা দেওয়া হ'ল। মোটর গাড়ি চালানো, ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতিও প্রায় সকলকেই শিখতে হ'ল। রজত এই সমস্ত বিষয়েই সুদক্ষ ও আশ্চয রকম পারদর্শিতা লাভ করলো। বিপ্লবী সভ্যদের মধ্যেও সকল বিষয়ে পারদর্শী যুবক খুবই বিরল। তাদের মধ্যে রজতের মত যুবক আরও বিরল।

বিপ্লবী সংগঠনের দায়িত্ব অত্যন্ত কঠোর। বৃটিশ সরকারের ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চকে পরাস্ত করে গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলতে ও সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য অনেক বিশ্বাসী বন্ধুকেও আমাদের অবিশ্বাস করতে হয়েছে। চট্টগ্রাম শহরে ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ সালে আক্রমণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের চতুর্দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়েছে, এবং সেই কারণেই অনেক বিশ্বাসী সদস্যকেও সন্দেহের চোখে দেখেছি। বিপ্লবী পরিকল্পনাকে জয়যুক্ত করে তোলবার জন্য আমাদের সাংগঠনিক শ্লোগান ছিল—"ভুলক্রমে একজন অবিশ্বাসীকে নিগূঢ় পরিকল্পনার কেন্দ্রস্থলে গ্রহণ করার চেয়ে হাজার জন অতি বিশ্বাসী তরুণ বিপ্লবীকে প্রত্যাখ্যান করাও শতগুণে শ্রেয়।"

নিরাপত্তার জন্য এইরূপ কঠোর নীতির অনুসরণ না করে আমাদের উপায় ছিল

না। রজতকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেও আবার বিভিন্ন প্রতিকূল বিপ্লবী পরিবেশের জন্য তার প্রতি আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়েছিল। রজতের অগোচরে খুব সতর্কতার সঙ্গে তাকে সর্বদা অনুসরণ করবার জন্য আমি, মনোরঞ্জন, মাখনও দেবুকে নিযুক্ত করেছিলাম এবং বেশ কিছুদিন ধরে তাদের এই কাজ আমিই পরিচালনা করি। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোর গুরুদায়িত্ব যাকে দেবার আমাদের ইচ্ছে, তাকেই সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা করে নিতে হবে। রজত সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ল।

রজতের বৈপ্লবিক শিক্ষা তার বাড়ির সবাইকে, এমন কি ছোট ছোট ভাই-বোনেদেরও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তারা তাদের অজান্তেই বিপ্লবী আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিল। রজতের মা হাসতে হাসতে রজতকে বলেছিলেন—"তোকেই যদি স্বাধীনতা-সংগ্রামে উৎসর্গ করতে পারি, তবে তোর এই সামান্য অভাব আমি পূরণ করতে পারব না?"—এই বলে সেদিন পুত্রের হাতে গলার হারটিও খুলে দিয়েছিলেন ; সেই মায়ের কাছে এবং সেই বাড়িতে আমাদের স্থান হবে না, তা আমরা একবারও ভাবি নি। মাসিমার অকুণ্ঠ সমর্থন ও সাহায্য তো পাবই তা'ছাড়াও রজতের বাড়িটি নানা দিক থেকে আমাদের পক্ষে সুবিধেজনক।

রজতের বাড়ির কম্পাউণ্ড অনেক বড়। বাড়িটি দোতলা। দোতলায় দু'টি ঘর। রজতের ঘরটি প্রায় সব সময়েই আমাদের দখলে থাকতো। আমাদের গোপন সভা, রিভলভার-পিস্তলের ব্যবহার ও পরিষ্কার করা, ইত্যাদি প্রতিটি কাজ এই ঘরটিতেই হ'ত। পুলিসের সন্দেহের সম্পূর্ণ বাইরে এই বাড়ির বৈপ্লবিক অস্তিত্বটি বজায় ছিল কেবলমাত্র সরকারী মহলের সঙ্গে রঞ্জনবাবুর ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকার জন্যেই। পুলিস কি করে সন্দেহ করবে, শ্রীরঞ্জন সেনের বাড়িতে তাঁরই ছেলের (যে টাউন ক্লাবের সভ্য) সহযোগিতায় এবং তার মায়ের সম্পূর্ণ সমর্থনে বৈপ্লবিক প্রস্তুতির অনেক রকম কাজই আমরা সেই বাড়িতে চালিয়ে যাচ্ছি?

সবদিক ভেবে চিন্তে আমরা ২০শে তারিখ রাত্রে রজতের বাড়ি যাওয়া ও সুযোগ-সুবিধা থাকলে সেখানেই আশ্রয় গ্রহণ করা স্থির করি। কিন্তু নন্দনকানন থেকে (যে স্থানে সতীদাকে ছেড়ে এলাম) রজতের বাড়ি প্রায় মাইল দুই হবে। এই দু'টি মাইল একেবারে শহরের বুকের ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। কোতোয়ালির আই, বি, ইন্‌স্পেক্টারের বাড়ির সম্মুখ দিয়ে হেঁটে গেলাম। কে কোথায়? কোন বাধাই পেলাম না। তখন রাত প্রায় আটটা। রজতের বাড়ির পেছনে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের সঙ্গে রজত নেই। সেই একই প্রশ্ন—কি অবস্থায় মাসিমাকে আমরা পাবো? রজতের বাবার সামনে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। কে জানে বাড়ির অবস্থাই বা কি? রজত তার বাবার বন্দুক নিয়ে

এসেছে এবং এই আক্রমণে আমরা তা' ব্যবহারও করেছি। কি জানি পুলিসের কোন উৎপাত ইতিমধ্যেই তাদের বাড়িতে হয়েছে কি না! এই সব ভেবে চিন্তে স্কাউটিং করে দেখে আসবার জন্য প্রথমে মাখনকে মাসিমার কাছে পাঠানো হ'ল।

মাখন খুব সন্তর্পণে পেছনেব দরজা দিয়ে অন্যেব দৃষ্টির অগোচরে ঢুকলো। খুব অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলাম– কি জানি কি হবে! যদি কেউ দেখে ফেলে? যদি মাসিমা উপস্থিত না থাকেন? আর যদি সে মেসোমশায়ের সামনে গিয়ে পড়ে? কিন্তু মিনিট তিনেকের মধ্যেই মাখন ফিরে এলো এবং একটু দূর থেকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হাতের ইসারায ডেকে সে ঘুরে আগে আগে চললো। আমরা তাকে অনুসবণ করলাম। মাসিমা সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে। মুখের ওপর আঙুল চেপে ইসারায় বললেন—"কোন শব্দ যেন না হয়।" তাঁর নির্দেশে আমরা খুব চুপি চুপি দোতলায় রজতের ঘরে চলে গেলাম।

ধীর পদক্ষেপে ও অতি সন্তর্পণে যখন রজতের ঘরে এসে পৌছলাম, তখন দেখি দোতলার দু'টি ঘরই সম্পূর্ণ খালি করে রাখা হয়েছে। মেসোমশাই, মাসিমা, ছোট ছোট ভাই-বোনেরা সকলেই নিচতলায়। কি আশ্চর্য ব্যাপার! মাসিমা কি কোন কারণে রজত ও তার সাথীদেব আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন?

কিছুক্ষণের মধ্যেই মাসিমা আমাদেব জন্য রাত্রেব আহারেব প্রচুর ব্যবস্থা করে নিয়ে এলেন। মাসিমাকে আমরা সবাই প্রণাম করলাম। তিনি আমাদের প্রাণভরা আশীর্বাদ জানালেন। মাসিমা আমাদেব কাছ থেকে সব খবর শুনলেন—কি করে দলচ্যুত হয়ে পড়লাম এবং সাথীদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্থাপনের আর সুযোগ হ'ল না। রজত প্রধান-বাহিনীর সঙ্গে আছে জেনে আশ্বস্ত হলেন, কিন্তু আমাদের অজান্তে যেন একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন।

আমাদের নিজেদের মধ্যে এবং মাসিমার সঙ্গেও ফিস্ ফিস্ করে কথা হচ্ছিল, যাতে নিচতলায় কেউ টের না পায়। মাসিমা আমাদের কড়া হুকুম দিলেন, আমরা ওপরের ঘর থেকে কোন কারণেই যেন নিচে না যাই—খাওয়া-দাওয়া, স্নান, বাথরুম সব কিছুই ওপরে হবে এবং তিনি একাই এই সব ব্যবস্থা করবেন।' আবার সকালে আসবেন—এই কথা জানিয়ে তিনি নিচে চলে গেলেন। আমরা চারজনও সারাদিনের ক্লান্তির পর নিজ নিজ রিভলভার সঙ্গে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমাদের মনে হয়েছিল রঞ্জনবাবুর বাড়ি পুলিস খুব শীঘ্রই খানাতল্লাস করবে না এবং আমরাও হয়ত অপেক্ষাকৃত নিরুদ্বেগে এখানে থাকতে পারবো।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরেটা দেখলাম। সব ঠিক আগের মতই আছে, কেবল নেই রজত—এই বাড়ির বড় ছেলে। মাসিমা আমাদের জন্য চা, ইত্যাদি নিয়ে এলেন। আমরা খুব তৃপ্তির সঙ্গেই খেলাম; কিন্তু কেবল মনে

হাচ্ছল অন্য সবার কথা—তারা কোথায়—কিভাবে আছে। মাসিমা নিচে থেকে ঘুরে এসে জানালেন মেসোমশাই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান—আমাদেব অনুমতি চাইছেন। যিনি আমাদেব আশ্রয়দাতা, যাঁব ছেলে আমাদের বিপ্লবী সংগঠনেব গৌবব, যাঁব স্ত্রী ভাবতেব একজন শ্রেষ্ঠা বীর নারী—তিনি অনুমতি চাইছেন আমাদেব সঙ্গে দেখা কবতে। আমরা সসম্ভ্রমে মাসিমাকে বললাম—"আপনি মেসোমশাইকে এক্ষুণি পাঠিযে দিন। তাঁকে বলুন তাঁর বিপ্লবী সন্তানবা তাঁব আশীর্বাদেব অপেক্ষায় আছে।"

মেসোমশাই এই প্রথম আমাদেব প্রকৃত স্বরূপ জেনে আমাদেব সঙ্গে দেখা কবতে আসছেন। বজত যে আমাদেব একজন প্রধান বিপ্লবী সাথী তাও তিনি বর্তমানে জেনেছেন। কি প্রতিকূল পবিবেশেব লোক তিনি। কে জানতো ভারতের স্বাধীনতাব জন্য তাঁব অন্তবেব এই গভীব অনুভূতিব কথা? মেসোমশাই এসে আমাদেব বুকে জডিযে ধরলেন—অন্তবেব পুঞ্জীভূত আবেগ কত সহস্রভাবে যে তিনি ব্যক্ত কবলেন তা' আমি ভাষায় প্রকাশ কবতে পাববো না। সেদিন সেই মহান পুরুষ এতদিনেব মিথ্যা আববণ উন্মোচন কবে আমাদেব সামনে এসে দাঁডালেন তাঁর সত্যিকাবেব দেশপ্রেমেব পবিচয নিযে। তাঁকে আমাদের বিপ্লবী অন্তবেব শ্রদ্ধা জানালাম, কিন্তু তাও যেন তাঁব অস মান্য ব্যক্তিত্বেব কাছে ম্লান হয়ে গেল। ইণ্ডিয়ান বিপাব্লিকান আর্মিব চট্টগ্রাম শাখাব একজন ফিল্ড-মার্শাল ও একজন জেনাবেল, রজতেব বাবা রঞ্জনলালেব কাছে যে অতি ক্ষুদ্র, তাঁর আকাশচুম্বী দেশভক্তির কাছে তাদেব স্বদেশপ্রেম যে অতি সামান্য, তাঁব আত্মত্যাগের মহিমা যে কোন বিপ্লবীব তুলনায যে কিছুমাত্র কম নয়—এই সত্য সেদিন অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলাম।

আনন্দমঠেব সেই মহামন্ত্র—"আমাদেব ঘর নাই, বাডি নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, আমরা জানি জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গবীয়সী"—বিপ্লবী-যুবকদেব উদ্বুদ্ধ কবেছিল। রঞ্জনলাল—'সবকাবী মহলের বন্ধু' এবং আপাতদৃষ্টিতে সেই পরিবেশের মধ্যেই মানুষ; তবু বাডি ঘর, বিষয়-সম্পত্তি ও স্ত্রী-পুত্রের কোন আকর্ষণ বা মোহ স্বদেশপ্রেমেব চেতনা থেকে তাঁকে বিচ্যুত কবতে পাবে নি।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগাব আক্রমণেব দ্বিতীয় দিনই আমাদের জীবন্ত বা মৃত ধরবার সাহায্যের মূল্য হিসেবে সবকাব আমাব এবং গণেশের মাথাপিছু পাঁচ হাজার টাকা করে এবং আনন্দ ও মাখন—প্রত্যেকের জন্য এক হাজাব টাকা কবে পুবস্কার ঘোষনা কবেছিলেন। তখনকার দিনে আমাদের চারজনের বিনিময়ে রঞ্জনলাল, 'সরকারী মহলের বন্ধু' রঞ্জনলাল, অনায়াসে বারো হাজাব টাকাব মালিক হতে পারতেন। এমন কি সেইরূপ কোন প্রতারণার উদ্দেশ্য আমাদের কাছে সম্পূর্ণ গোপন রেখেও

তিনি পুলিসকে আমাদের সংবাদ দিতে পারতেন—রঞ্জনলালের সেই সুবিধেরও অভাব ছিল না। স্বদেশপ্রেমের কষ্টিপাথরে রঞ্জনলালের সঙ্গে তথাকথিত স্বদেশ-প্রেমের ধ্বজাধারী অনেক রথী-মহারথীদের তুলনা করলে, তাঁদের অনেককেই অতি জঘন্য তস্কর বলে প্রতিপন্ন হতে হবে—অন্তত তাঁদের নিজেদের বিবেকের কাছে।

মেসোমশাই আমাদের কাছে অস্ত্রাগার আক্রমণের মোটামুটি বিবরণ শুনলেন। রজত যে তার ভূমিকা অক্ষরে অক্ষরে সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছে, সেইজন্য তিনি অত্যন্ত গর্বিত। চট্টগ্রামের বিপ্লবী যুবকদের এই সার্থক সশস্ত্র অভিযানকে তিনি অভিনন্দন জানালেন। চট্টগ্রামের যুবকেরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক ঐতিহাসিক গৌরবোজ্জ্বল বৈপ্লবিক অধ্যায় সৃষ্টি করেছে—এই আনন্দেই তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন।

আমাদেব মধ্যে এই ধরনের কথাবার্তা চলছিল। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! রজতের ছোট ভাইবোনেরা বাড়ির কম্পাউণ্ডে খেলা করছিল; মাসিমা পথের দিকে নজর রাখাব দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাদের। আবার সেই ঘটনা—আনন্দের ছোট ভাই যেমন "মা আসছে" বলে চীৎকার করে পুলিসের আগমনবার্তা জানিয়েছিল, আজ সেইরকম চীৎকার দেওয়া রজতের ভাইবোনদের পক্ষে সম্ভব ছিল না; পুলিস খুব কাছেই এসে পড়েছে। ছুটে গিয়ে তারা মাকে খবর দিল। তক্ষুণি মেসোমশাই একটি ছোট টেবিল টেনে ঘরের মাঝখানে আনলেন। বাড়ির ওপরের প্রধান ঢালু ছাদের নিচে একটি ঘর-জোড়া কাঠেব পাটাতন এবং সেই পাটাতনের ওপবে ওঠবার জন্য একটি চতুষ্কোণ ফাঁক ছিল। এক গজ চতুষ্কোণ তক্তা কেটে সেই ফাঁকটির একটি ঢাকনি করা ছিল। এই ঢাকনিটি সরিয়ে ভেতরের ছাদের ওপরে লুকোনো যায় এবং সাধারণতঃ বাড়ির এই ফাঁকা স্থানটিতে ঘরের অনেক জিনিসপত্র রাখা হ'ত। আমরা এই ফাঁকা জায়গায় আমাদের অস্ত্রশস্ত্রও লুকিয়ে রাখতাম। মেসোমশাই যেমনি টেবিলটি এই চতুষ্কোণ তক্তার ঢাকনির নিচে রাখলেন, তক্ষুণি আমরা একের পর এক এই ঢাকনি সরিয়ে ঐ ফাঁকা স্থানটিতে আশ্রয় নিলাম। মাখন ও আনন্দকে কাঠের ছাদের এক কোণে পজিশন্ নিতে ইঙ্গিত করলাম। আমি ও গণেশ এই ঢাকনির ওপর চেপে বসলাম। প্রত্যেকের হাতে দুটো করে গুলীভরা খোলা রিভলভার—ট্রিগারে আঙুল ঠেকানো আছে। সমস্ত ব্যাপারটা সম্পন্ন করতে আমাদের এক মিনিটের বেশি সময় লাগলো না। মেসোমশাই টেবিলটি আবার ঘরের কোণে ঠেলে রেখে নিচে তাঁর চেম্বারে চলে গেলেন। আমরা আমাদের লুকোনো 'পজিশন্' থেকে ছোট্ট ছোট্ট ছিদ্র দিয়ে বাইরের সব দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু বাইরে থেকে আমাদের দেখতে পাওয়ার কোন

সম্ভাবনা ছিল না। তবে পুলিস ঘরে প্রবেশ করে যদি একবার উপরের দিকে তাকায় তাহলে এই ছিদ্র পথে পাশের ঢাকনিটি তাদের চোখে পড়বেই।

সার্জেণ্ট কেলী ও ৪৯নং বেঙ্গল রেজিমেণ্টের প্রাক্তন সৈন্য, বর্তমানে ডি, আই, বি,—স্যার শচীন ভৌমিক, একদল সশস্ত্র পুলিস নিয়ে ছুটে এসে বাড়িতে ঢুকলেন। সেপাইরা সবাই ফায়ারিং পজিশনে রাইফেল হাতে এবং কেলী সাহেব ও শচীনবাবু, দু'জনেই হাতে খোলা রিভলভার নিয়ে আগে আগে এলেন। প্রায় ১৫।২০ জন সেপাই সমস্ত বাড়িটি ঘিরে ফেললো এবং আরও প্রায় দশজন সেপাই নিয়ে শচীনবাবু ও কেলী সাহেব রঞ্জনলালের চেম্বারে প্রবেশ করলেন। আমরা তাঁদেব কথাবার্তা সব শুনতে পাচ্ছিলাম। দু'এক মিনিট কথা শোনার পর বুঝতে পারলাম তাঁরা রজতের বাবাকে নিয়ে সমস্ত বাড়ি তল্লাসী করতে সুরু করেছেন। প্রতিটি মুহূর্ত ক্রমেই সঙ্কটপূর্ণ ও ভয়াবহ হয়ে উঠতে লাগলো। এবার মনে হ'ল নিচের সব ঘর দেখা শেষ করে ওপরে আসছেন। সিঁড়ির ওপর বুটের আওয়াজ ক্রমেই স্পষ্টতর হতে লাগলো। মাঝে মাঝে শুনলাম শচীন ভৌমিক বলছেন—"আপনি আগে চলুন!" কানে এলো মেসোমশায়ের কণ্ঠস্বব—"আসুন, আসুন—ওপরের দু'টি ঘর দেখুন," ইত্যাদি। আমবা বুঝতে পারছিলাম কি ভীষণ মানসিক অবস্থা তাঁর! কি নিদারুণ সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছেন তিনি!

প্রথম ঘরটাতেই আমরা ছিলাম। কিন্তু প্রথম ঘরটাতে তিনি যেন কোনমতেই আগে পা বাড়াতে পারলেন না—তবুও তো আসন্ন মৃত্যু হতে বাঁচবার এক মিনিট হলেও বেশি সময় পাওয়া যাবে! দ্বিতীয় ঘবটি দেখবার পর এই শেষ ঘরটিতে সামনেব দরজা দিয়ে পুলিসের পেছনে মেশোমশাই ঢুকলেন! কি মর্মান্তিক ও করুণ দৃশ্য! মেসোমশাইকে সম্পূর্ণ অসহায় ও অত্যন্ত অসম্মানজনক অবস্থায় দেখলাম। তাঁর পিঠ লক্ষ্য করে শচীন ভৌমিক ও কেলী সাহেবেব দু'টি রিভলভার উদ্যত। এই অবস্থায় তাঁকে সামনে রেখে, তাঁর আড়ালে বীরপুঙ্গব দু'জন এবং উদ্যত রাইফেল হাতে সেপাইবা মিলিটারী কায়দায় এই ঘরে প্রবেশ করলো।

একবার—যদি একবার ভুলক্রমেও ওপরের দিকে তাদের মধ্যে কেউ তাকাতো, তবে যে কি ঘটতো তা' আজ বলতে পারছি না। নিঃশ্বাস বন্ধ করে আমরা প্রতিটি মুহূর্ত গুনছি! আমাদের হাতেও উদ্যত রিভলভার। মেসোমশাইকে দুই দিকের দু'পক্ষের উদ্যত রিভলভারের মুখে দেখে আমাদের সমস্ত শরীরে ঘাম ঝরছিল। যদি সংঘর্ষ হয় তবে তাঁর কি হবে! সূক্ষ্ম যুক্তি দিয়ে বেশি ভাববার সময় বা মানসিক অবস্থা ছিল না। খুব সম্ভব হয়ত ফেণী-স্টেশনের সংঘর্ষের মতই গুলী চালাতাম (এই সংঘর্ষের কথা আমি পরে বলবো)। আমরা মেসোমশাইকে বাঁচিয়ে গুলী ছুঁড়লেও তারা কি মেসোমশাইকে মৃত্যুর হাত হতে রেহাই দিত?

পড়তে যতক্ষণ সময় লাগছে তার আগেই সকলে এই খালি ঘরটি ঘুরে দেখে চলে গেল। কি আশ্চর্য! কেউ ওপরে নজরই দিল না! সবাই ব্যস্ত, যদি আশেপাশে বা পেছন থেকে হঠাৎ কেউ তাদের দিকে গুলী ছোঁড়ে! তাই তাদের দৃষ্টি ছিল রঞ্জনবাবুর দিকে ও চারপাশে। মেসোমশাই হাজার হলেও উকিল—অভিনয় করলেন চমৎকার! সবাইকে বোকা বানিয়ে বিদায় দিলেন। সেই সঙ্কটের মধ্যে পড়লে জানি না ক'জন এমন মাথা স্থির রেখে সাফল্যের সঙ্গে বিপদকে পরাস্ত করে জয়ী হতেন!

দুপুরবেলা মাসিমা আমাদের খাবার আনলেন। খাওয়ার পর মেসোমশাই আবার এলেন পরামর্শ করতে—আমাদের ভবিষ্যৎ প্ল্যান নিয়ে। কিছুক্ষণ কথা বলবার পর, প্রায় দুটোর সময়, আবাব আব একদল পুলিসকে দৌড়ে বাড়ির দিকে আসতে দেখা গেল। আমরা আবাব সেই কাঠের ছাদে আশ্রয় নিলাম—কিন্তু এবাবে পুলিস এই বাড়িতে না এসে পাশের বাড়িতে ঢুকলো। এক ঘণ্টা পরে মেসোমশাই ও মাসিমা-দু'জনেই এলেন। তাঁদের দু'জনের চোখ ছলছল। আমাদেব এখানে থাকা উচিত হবে না, তা' তাঁদের জানিয়েছিলাম। আমবা কোথায় যাব, কি করে বিপদের পর বিপদ থেকে বাঁচবো, কি করেই বা প্রধান-বাহিনীব সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হবে, আমাদেব ভবিষ্যৎ কি--ইত্যাদি চিন্তায় তাঁরা অস্থিব হযে পড়েছিলেন। বেশি বোঝাবার কিছুই ছিল না। তাঁবা বুঝেছিলেন যে এর একমাত্র পরিণতি মৃত্যু! অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর জন্য কাতব হওয়া বাতুলতা। তাই তাঁদের দৃঢ় মনোবল হাসিমুখে বিপদ ও মৃত্যুভয়কে জয় করতে সাহায্য করলো!

মেসোমশাই আমাদের কিছু টাকা দিলেন সঙ্গে রাখবার জন্য। সন্ধ্যার একটু পরে আমরা তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। তাঁরা সন্তানদের এইরূপ অনিশ্চিত জীবন-মরণ সমস্যার মধ্যে বিদায় দিতে বাধ্য হচ্ছেন, তাই তাঁদের চোখে জল। পিতা-মাতা নিজ পুত্রের কথা না ভেবে পারেন না; কিন্তু পুত্রের সাথীদেরও এই দুর্যোগে বিদায় দিতে মায়ের বিগলিত স্নেহেব করুণ উচ্ছ্বাস আমাদের অভিভূত করলো। আমরা প্রণাম করলে তাঁরা আমাদের সবাইকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। গদগদ কণ্ঠে বললেন—"এ জীবনে হয়ত তোমাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না, রজতকেও হয়ত আর দেখতে পাবো না; পরজন্ম আছে কি না জানি না, তবে প্রার্থনা করবো পরজীবনে আমরা যেন আবার তোমাদেরই পাই......।" আমরা রাস্তার বাঁক ঘুরে তাঁদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেলাম।

২১শে তারিখ, সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটা। এই সময় আমাদের প্রধান-বাহিনীও

প্রতিদিনের মতই পাহাড় থেকে নিচে নেমে এসেছিল তাদের পরবর্তী দিনের পরিকল্পনা নিয়ে। প্রধান-বাহিনীর কথা এখন স্থগিত রেখে আমাদের চারজনের কথা আর একটু বলি। ২১শে তারিখ রাত্রে চট্টগ্রাম শহর আর শত্রু-পরিত্যক্ত নয়—সৈন্যদের হাতে চলে গেছে। সৈন্যরা বেছে বেছে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি পাহারা দিচ্ছে আর মোটরযোগে সারা শহর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

ফিরিঙ্গী বাজার—শহরের মধ্যে একটি বিশেষ অঞ্চল। আমাদের এখন এই অঞ্চল তো অতিক্রম করতেই হবে, তা'ছাড়াও শহরের আরও আশঙ্কাজনক স্থান পেরিয়ে তবেই আমরা গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারবো। আমরা ভেবে-চিন্তে স্থির করলাম, জেটি ও ডবলমুড়িং-এর স্টেশনের কাছে "ঢেবার" তীরে রেলের ক্লাস-কোয়ার্টারে দীনেশের কাছে যাব। দীনেশ চক্রবর্তী আমাদের দলের একজন সভ্য। দীনেশ ও তার দাদা একসঙ্গে থাকতো। তা'রা দু'ভাই ছাড়া কোয়ার্টারে অর্থাৎ তাদের বাসায় আর কেউ থাকতো না। ঢেবা একটি মস্তবড় দীঘি—সকলে "লেক্" বলতো। দীনেশের দাদার কোয়ার্টারটি ঢেবার একেবারে উত্তর-পূর্ব প্রান্তে। তার দাদা রেলে সামান্য পোস্টে চাকরি করতেন। দীনেশের সঙ্গে গণেশরই বেশি জানা-শোনা ছিল।

রজতদের বাড়ি থেকে খুব সর্টকাট্ রাস্তা ধরেও যদি দীনেশের বাড়ি আসতে হয়, তবু আমাদের প্রায় সাড়ে তিন মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি হাঁটা সম্ভব ছিল না। চতুর্দিকে লক্ষ্য রেখে খুব সন্তর্পণে আমাদের পথ চলতে হচ্ছিল। শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা যতদূর সম্ভব বর্জন করে চলেছি। গলি-ঘুঁজির পথ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ কারণ, সৈন্যেরা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতেই টহল দেবে ধরে নেওয়া কঠিন নয়। গলি ও নির্জন রাস্তায় অত অল্প সময়ের মধ্যে সৈন্যদের ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। কারণ, শহরের মূল ও প্রধান সামরিক ঘাঁটিগুলি এবং প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবার আগে, সামরিক নীতি অনুযায়ী, সৈন্যদের চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে সামরিক শক্তিকে কোনমতেই খর্ব করা যায় না। চট্টগ্রামে সমর-বিশারদেরাও ২১শে তারিখ রাত্রিবেলা পর্যন্ত এই মূল সত্যের ব্যতিক্রম করতে সমর্থ হন নি।

তাদের সেই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ নিলাম আমরা। প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ পথ বর্জন করে চলেছি। তবু পথ অতিক্রম করার সময় মাঝে মাঝে প্রধান রাস্তাও আমাদের পার হতে হয়েছে। আমাদের বিশেষ সতর্কতার জন্যই হয়ত সেই রাত্রে অতর্কিত আক্রমণ থেকে আমারা বেঁচেছিলাম। পথ চলার সময় কোন একটি নিরাপদ স্থানে আগে দাঁড়িয়ে, অনেকদূর পর্যন্ত দেখে নিয়ে যখন বুঝেছি সৈন্য-বাহিনীর মোটর আসছে না বা টহলদারী কোন সৈন্যদলের আসবার সম্ভাবনা কম এবং যদি

সৈন্যদল আসতেও থাকে তবু তাদের পৌঁছবার আগেই আমরা বড় রাস্তার সামান্য কিছুটা অতিক্রম করেই টুক্ করে কোন একটি গলিতে ঢুকে পড়তে পারবো, তখনই সেইরূপ বিপদসঙ্কুল পথ আমরা দ্রুত পেরিয়ে গেছি।

এইভাবে প্রায় চার মাইল পথ আসতে আমাদের বেশ দেরি হয়ে গেল। এখন রাত প্রায় সাড়ে ন'টা বা দশটা হবে। ঐ ঢেবা লেকের তিন পাশে সারি সারি ক্লাস কোয়ার্টার—সবগুলিই যেন ইতিমধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে। শেষের দিকে আমরা এক পোয়ামাইল পথ ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে একেবারে শেষপ্রান্তে, উত্তর-পূর্ব কোণে দীনেশের কোয়ার্টারের সামনে এসে উপস্থিত হলাম। প্রত্যেকটি কোয়ার্টারে দু'টো করে ঘর, সামনে একটু বারান্দা, রান্নাঘর, স্নানের ঘর ও মাঝে উঠোন; সবটাই উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রতিটি কোয়ার্টারে প্রবেশপথ মাত্র একটি—কাঠের দরজা, ভেতর থেকে বন্ধ করার ব্যবস্থা আছে।

আমরা যখন এসে পৌঁছলাম, দীনেশের কোয়ার্টারের প্রবেশদ্বার ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। আমরা দু'জন—গণেশ ও আমি বিশেষ পরিচিত, আনন্দ খুব ছোট, তাই সবদিক বিবেচনা করে মাখনকে পাঠানো হ'ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাখন দীনেশকে ডেকে নিয়ে এলো। দীনেশ আমাদের দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। সে নিজে কি কববে, কি কবতে পারে এবং আমরাই বা কি চাই জানবার জন্য দীনেশ ব্যস্ত হযে পড়লো। তার সঙ্গে কথা বলে ঠিক হ'ল—আমরা বাইরে মাঠে একটু অপেক্ষা করবো, সে বাড়িতে গিয়ে রান্নাঘরটির দরজা খুলে রাখবে আর উঁচু দেওয়াল-ঘেরা কম্পাউণ্ডের প্রবেশপথও ভেজানো থাকবে এবং আমরা কিছুক্ষণ পরে একেবারে নিঃশব্দে ধীরে ধীবে রান্নাঘরে গিয়ে আশ্রয় নেবো—তার দাদা যেন কোন-মতেই টের না পায়। তারপর সময়মত সে একবাব এসে তার দাদার অজান্তে গেট বন্ধ করবে এবং রান্না-ঘরের দরজায় বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে আগে যেমনটি ছিল ঠিক তেমনি করে রাখবে।

রান্নাঘরটি অব্যবহৃত হয়ে পড়েছিল। দুই ভাই, কারও রান্না করার বালাই নেই—হোটেলেই খেত। বড় ভাই সকাল ন'টার মধ্যে চাকরিতে বেরিয়ে যান। তারপর দীনেশই বাড়ির একমাত্র কর্তা। কিন্তু দীনেশের দাদা যতক্ষণ উপস্থিত আছেন ততক্ষণ তাঁর অগোচরেই সব কিছু আমাদের করতে হবে—একটু হাঁচি বা কাশি, তাও চলবে না। পাশের ঘরে শোনা যাবে মত সামান্য খুট্‌খাট্ শব্দও দীনেশের দাদার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। জুতোর মচ্‌মচ্ আওয়াজ তাঁর কানে গেলে কিসের শব্দ তা' অনুসন্ধান করতে আসতে পারেন। এইসব অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও আমরা চারজন দীনেশের নির্দেশ মত চুপি চুপি জুতো খুলে পা টিপে টিপে চোরের মত রান্নাঘরে প্রবেশ করলাম। গেট ও রান্নাঘরের দরজা দু'টিই ভেতর

থেকে ভেজিয়ে দিলাম। সময়মত দীনেশ দাদার পাশের খাট থেকে বাথ্‌রুমে যাবার ভান করে বেরিয়ে এসে গেট বন্ধ করলো এবং রান্নাঘরেও বাইরে থেকে যেমন থাকে তেমনি, তালাটা লাগিয়ে দিল। প্রথমপর্ব এইভাবেই শেষ হ'ল।

যতদূর মনে পড়ে খাওয়া-দাওয়া মাসিমার ওখানে যা' সেবে এসেছি, তারপর সেই রাত্রে খাওয়াব ব্যবস্থা আর কিছুই হয় নি। দীনেশ বোধহয় একঘটি ভর্তি জল রেখে গিয়েছিল। ধরে নেওয়া যায় যে, এখন আমরা নিরাপদেই আছি। নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোলে ক্ষতি কি?—কেবল যেন হাঁচি-কাশি দিয়ে নির্জনতা ভঙ্গ না করি! পরিশ্রান্ত ছিলাম, কাজেই ঘুমোবার ইচ্ছেও ছিল খুব; কিন্তু কার সাধ্য ঘুমোয়! মস্ত বড় বড় মশা বন্ বন্ করে সারা ঘবে ঘুরছে—আজ যেন তাদের সামনে এক বিবাট ভোজের আয়োজন! প্রাণভবে চার-চারটি মানুষের রক্ত খাবে—কত তাদের আনন্দ! কিন্তু এদিকে আমাদের প্রাণ যায় আর কি! না পারি ঘর ছেড়ে অন্যত্র যেতে, না পাবি মশা মারতে—আওয়াজ হবে। এত বড় বড় মশা আমি নাগারখানা বা ফেণীর পাহাড়েও দেখি নি। কি মুস্কিল! পাখা ছিল না, তার ওপব সব ক'টি জানালা-দরজা বন্ধ ছোট একটি ঘবে চারজনের একসঙ্গে থাকাও যেন তথাকথিত "ব্ল্যাক্ হোল" ট্র্যাজেডির বিভীষিকাময় গল্পের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। সারা রাত মশা তাড়াবার জন্য সবাইকে দু'টি হাত সমানে নাড়তে হয়েছে। ক'দিন ধরে তো শরীর-চর্চার নাম নেই—কাজেই বেশ exercise হ'ল গোটা রাত ধরে!

কোনমতে রাত কাটলো। সূর্যের আলো জানালা ও দরজার ফাঁকে ঘরের মেঝেতে পড়েছে। দীনেশের দাদা ঘুম থেমে উঠেছেন। তাঁদের দুই ভায়ের কথোপকথন সবই শুনতে পাচ্ছি। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা হয়েছে, যদি কোন কারণে আমাদের চারজনের অস্তিত্ব তিনি জানতে পারেন! তিনি নিশ্চিত আমাদের কিছু ক্ষতি করবেন, সেরূপ ভাবার কারণ না থাকলেও কোনরূপ ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না মনে করেই আমাদের অস্তিত্ব তাঁর কাছ থেকে গোপন রাখবার জন্য এতখানি সতর্কতা! তিনি আমাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে যদি জেনেও ফেলতেন, তবু একা আমাদের আটটি রিভলভারের বিরুদ্ধে কিছু করবার সাহস করতেন বলে মনে হওয়ার কোন কারণ নেই! কিন্তু তিনি জেনেও যদি না জানার ভান করে শেষ-পর্যন্ত অফিসে গিয়ে পুলিশে খবর দেন—এইরূপ আশঙ্কাতেই সতর্কতা অবলম্বন না করে উপায় ছিল না।

দীনেশের দাদা অফিসে গেলেন। দীনেশ এখন বাড়ির সর্বময় কর্তা। সে রান্না-ঘরের দরজা খুলে দিল। আঃ কি যে আরাম! বন্ধ ঘরে বাতাস এসে ঢুকলো—এতক্ষণ পরে যেন সহজে একটু নিঃশ্বাস নিতে পারলাম। আমরা সবাই পর পর

হাত-মুখ ধোয়া, স্নান, বাথরুমের কাজ, ইত্যাদি শেষ করলাম। দীনেশ ঘাট ভাত চা ও সেই সঙ্গে পাঁউরুটি প্রভৃতি খাবার আনলো। আমরা সকালের চা, টোস্ট, ইত্যাদি খেলাম। তারপর দীনেশের অনুপস্থিতে আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম ঠিক করলাম।

২২শে তারিখের সকাল। যুব-বিদ্রোহের প্রথম গুলী চলেছে ১৮ই তারিখ রাত দশটায়। তখনও কি কেউ জানতো ২২শে এপ্রিল—১৯৩০ সাল, ভারতের গগনে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের বিজয় গৌরবের ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লেখা হবে? কে ভেবেছিল আজই বিকেলে জালালাবাদ রণাঙ্গনে তরুণ সাথীরা তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত ইংরেজ শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে? তখনও কি বুঝেছি, সেই একই রাত্রে ফেণী রেল-স্টেশনে সশস্ত্র পুলিশ ও মিলিটারী বেষ্টনী ভেদ করে আমরা চারজনও সফলতার সঙ্গে বেরিয়ে আসবো? ২২শে এপ্রিল বিপ্লবীদের একটি শুভ দিন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গৌরবময় মুহূর্ত।

সকালে চা খাওয়ার পর আমরা আলোচনা করে নিম্নরূপ প্রোগ্রাম গ্রহণ করলাম—

(১) শহর মিলিটারীর দখলে। বর্তমান অবস্থায় বাধ্য হয়ে আমাদের খণ্ড-যুদ্ধ বা শত্রুর ছোট ছোট ঘাঁটিপথ দখল এবং ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য রণকৌশল প্রয়োগের উপায় নেই।

(২) প্রধান-বাহিনী ২১শে তারিখ রাত্রি পর্যন্তও শহরে প্রবেশ না করায় আমরা একটিমাত্র সিদ্ধান্তেই উপনীত হলাম যে, তারাও শেষপর্যন্ত গ্রামের অভ্যন্তরে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আশ্রয় নেবে এবং বিভিন্ন ছোট ছোট বৈপ্লবিক আন্দোলন চালাবে।

(৩) ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে শত্রুকে আক্রমণ করবার রণ-কৌশল যখন আমাদের গ্রহণ করতেই হবে, তখন অন্তত গণেশ, লোকনাথ ও আমার কর্মক্ষেত্র কলকাতা হওয়াই শ্রেয়। আমাদের পক্ষে চট্টগ্রামে লুকিয়ে থেকে বৈপ্লবিক কাজ পরিচালনা করা খুবই কঠিন। তা'ছাড়া আমাদের গোপন অস্তিত্ব প্রকাশ পেলে অন্যদের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা। এই কারণে কলকাতার মত প্রধান নগরীতে আমাদের মত স্বল্প পরিচিত লোকের লুকিয়ে থেকে বৈপ্লবিক অ্যাক্‌শন করার সুযোগ অনেক বেশি।

(৪) সর্বোপরি বাংলার রাজধানীতে নতুন ধরণের বৈপ্লবিক অ্যাক্‌শন হওয়া উচিত। নতুন ধরনের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ বলতে আমাদের মনে

কয়েকটি পরিকল্পনাই ছিল। তার মধ্যে একটি প্রবল হচ্ছে ছিল—ইংরেজের অত্যাচারের জবাবে বা বিশেষ কোন দাবি আদায়ের জন্ম বাংলার লাট, চীফ্ সেক্রেটারী অথবা চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট প্রমুখের মধ্যে কাউকে না কাউকে hostage (কোন সর্তের বিনিময়ে বন্দী) রেখে বৃটিশ সরকারের নিকট চরমপত্র দাখিল করা। অতর্কিত আক্রমণে যদি তেমন কাউকে একবার বন্দী করে নিয়ে আসা যায়, তবে তাঁকে লুকিয়ে hostage রাখার সমস্যাটিকে যে খুব সহজেই সমাধান করা যাবে, সে বিশ্বাস আমাদের ছিল। আস্ত গ্রেনাইট ব্লক বা ল্যাণ্ড-মাইন দিয়ে সুরক্ষিত কোন বাড়িতে hostage-কে আবদ্ধ রেখে, সেই বাড়ির ওপরে সাইন-বোর্ড দিয়ে জানানো হবে—'আমাদের প্রহরী সদাসর্বদা ইলেকট্রিক সুইচ্ ও রিভলভার হাতে পাহারা দিচ্ছে; যদি সরকার সর্ত পালন না করেই hostage-কে উদ্ধারের কোন প্রকার চেষ্টা করেন, তবে তাঁকে জীবন্ত পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই—তাঁর চূর্ণ-বিচূর্ণ বিক্ষিপ্ত দেহ নিয়েই তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।'

এইরূপ পরিকল্পনার চিন্তাই তখন করেছি, বাস্তবে রূপায়িত করবার কোন চেষ্টা হয় নি। প্রায় দেড় বছব পরে আমাদের মামলা চলা কালে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির বিনিময়ে চট্টগ্রাম জেলা-শাসককে hostage রাখবার জন্ম এক বিস্তারিত প্ল্যান আমরা অর্ধেন্দু গুহের (আমাদের মামলার সময় অর্দ্ধেন্দুর বিরুদ্ধেও মামলা চলছিল এবং ডিনামাইট-ষড়যন্ত্রের সেই প্রধান নেতা) মারফত মাস্টারদার কাছে পাঠাই। এই সম্বন্ধে পরে আমি যথাস্থানে লিখবো।

মোটামুটি এইরূপ কতকগুলি প্রশ্ন আলোচনা করার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, সেইদিন সন্ধ্যার সময় কলকাতা অভিমুখে রওনা হব। আমাদের জন্ম কতগুলি জামা-কাপড়, বিছানা, তেল, সাবান, Safety Razor, ছাতা, ঘটি ও সর্বোপরি একটি হ্যারিকেন-লণ্ঠন যোগাড় করতে দীনেশকে বলা হ'ল। বুঝতে কারও হয়ত অসুবিধে হচ্ছে না, কেন আমরা হ্যারিকেন-লণ্ঠনটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিলাম। সন্ধ্যার সময় আমরা গ্রামবাসী যাত্রীর ছদ্মবেশে ট্রাঙ্ক রোড অতিক্রম করে প্রধান স্টেশনের দু'তিনটি স্টেশন পরে, ভাটিয়ারী হতে ট্রেনে চাপবো ঠিক করেছিলাম। টহলদার সৈন্সের সম্মুখীন হওয়া খুবই স্বাভাবিক, এইরূপ পরিস্থিতিতে একটি প্রজ্বলিত হ্যারিকেন সমস্যা সমাধানে অনেকটা হয়ত সাহায্য করবে। বলা বাহুল্য, আমরা দীনেশকে ভালভাবেই বুঝিয়ে বলেছিলাম যে, জিনিসগুলি যেন কোনমতেই নতুন না হয়—সবগুলি পুরোনো হলেই খুব ভালো।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে একটু ঘুমিয়ে নিলাম। চারটার সময় দীনেশ সব

জিনিসপত্র সংগ্রহ করে আনবে এবং বাংলার রাজধানী কলকাতায় [illegible] আগুন জ্বালাবার উদ্দেশ্যে আমরা ২২শে এপ্রিল সন্ধ্যায় যাত্রী সেজে চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করে যাত্রা করবো—যদি সম্ভব হয় তবে বাংলার লাটকে hostage রেখে ইংরেজদের চরম পত্র দিয়ে দাবি করব—'ভারত ছাড়, নইলে তোমাদের মৃত্যু!'

২১শে এপ্রিল সকাল ন'টা-দশটার সময় ফতেয়াবাদের কাছে কোন একটি উঁচু পাহাড়ে প্রধান-বাহিনীকে ছেড়ে এসেছি। সেই সূত্র ধরে আবার তাদের কথা সুরু করছি। আমরা যখন ২১শে তারিখ সকালে রজতের বাড়িতে নিশ্চিতমৃত্যুমুখে —অবাঞ্ছিত সশস্ত্র সংঘর্ষ থেকে অত্যাশ্চর্যভাবে নিষ্কৃতি পাবার জীবন্ত নাটকে লিপ্ত, তখন সদা সজীব দুরন্ত বালক টেগ্‌রা (হরিগোপাল বল) ও তার সমবয়সী সাথীদের অদম্য উৎসাহ ও স্বতঃস্ফূর্ত চপলতায় সেই গিরিচূড়া প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

সকালে তাদের তরমুজ পর্ব সমাপ্ত হবার পর মাস্টারদা, নির্মলদা ও অম্বিকাদা আর একবার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের শেষ চেষ্টা করে দেখা মনস্থ করলেন। এখন পর্যন্ত সংবাদ সংগ্রহের জন্য যাদের পাঠিয়েছেন তারা কেউ ফিরে আসে নি। তাই খুব বাছাই করে দু'জনকে এক সঙ্গে পাঠাবেন স্থির করলেন। মাস্টারদা ও নির্মলদা পাহাড়ের ওপরে বিশ্রামরত ছোট ছোট গ্রুপের কাছে গেলেন এবং তাদের প্রত্যেকের কাছে বললেন—"আমরা এমন দু'জনকে চাই, যারা 'পারি নাই' বলে ফিরে আসবে না। গণেশ, অনন্তদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতেই হবে।" প্রত্যেক যুবকসাথী তক্ষুণি রাজী—তাদের মধ্যে একজনও 'পারব না' বলেনি—সকলেই যেতে প্রস্তুত। মাস্টারদা, নির্মলদা ও অম্বিকাদা সকলের মধ্যে 'অমরেন্দ্রনন্দী ও অপর একজন যুবককে বেছে নিলেন।

অমরেন্দ্র ও তার সঙ্গী যুবকটির উপর বিচ্ছিন্ন দুটি অংশের যোগাযোগ স্থাপনের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হ'ল। এরা দু'জনে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে এই মহান দায়িত্ব পালনে এগিয়ে গেল। সবাই তাদের বিপ্লবী অভিবাদন জানালো। তারাও প্রত্যাভিবাদন জানিয়ে পাহাড় থেকে নেমে গেল।

তখন সকাল প্রায় দশটা। আবার নেতারা সেই ভুল করলেন। অমরেন্দ্রদের বলা হ'ল তারা যেন সন্ধ্যে সাড়েছ'টা বা সাতটার মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরে আসে। আট ন' ঘণ্টার মধ্যে বারো-চোদ্দ মাইল পথ অতিক্রম করে শহরে গিয়ে আমাদের খোঁজ-খবর নিয়ে আবার এতটা পথ ফিরে আসা বাস্তবে কোনমতেই সম্ভব ছিল না। এদিকটা বিচার না করেই তাদের সাতটার মধ্যে ফিরে আসবার নির্দেশ দিয়ে scouting duty-তে পাঠানো হ'ল।

অমরেন্দ্ররা চলে যাওয়ার পর অম্বিকাদাও আর একটি কর্তব্য নিয়ে ফতেয়াবাদ

গ্রামে যাওয়া মনস্থ করলেন। আজ তিনি সকলকে বাঙালীর খাদ্য—ভাত খাওয়াবেন। ১৮ই তারিখে মধ্যাহ্নভোজনের পর, আজ ২১শে তারিখ সকাল দশটা-এগারোটা পর্যন্ত কারো পেটে ভাত পড়ে নি। সব সময় জলও পায়নি—লতা-পাতা নিংড়ে রস খেয়েছে। তরমুজ, বিস্কুট, চিঁড়ে প্রভৃতি একবেলা খেয়ে এই দীর্ঘ সময় তারা অর্ধাহারে কাটিয়েছে। আজ রাত্রে অম্বিকাদা তাদের ভোজনের ব্যবস্থা করবেন—ভাত। এ যেন ভাবতেও আনন্দ হচ্ছে—কেবল আনন্দ নয় পাকস্থলীর অভুক্ত মাংসপেশীগুলিও উদ্‌গ্রীব ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে—কতক্ষণে তারা ভাত পেয়ে তৃপ্ত হবে!

আগেই বলেছি এই পাহাড়টি ফতেযাবাদের কাছে। ফতেয়াবাদ গ্রামাঞ্চল অম্বিকাদার নখদর্পণে—এখানে তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও দলের সমর্থকেরা অনেকেই ছিলেন। অম্বিকাদা প্রথমে একজনের বাড়ি গিয়ে উঠলেন। সেখানে তিনি তাঁর লম্বা দাড়ি ও গোঁফ কামিয়ে ফেললেন। তাঁকে এখন দেখে সহজে চেনা যায় না। চেহারা ও বেশ পরিবর্তন করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কারণ ফতেয়াবাদে অনেকেই তাঁকে চেনে। আত্মগোপন কবে গ্রামের লোকের চোখে ধূলো দিয়ে অম্বিকাদা ফতেয়াবাদে কয়েকজন আত্মীয়ের কাছ থেকে প্রায় শ'খানেক টাকাও যোগাড় করলেন।

তারপর দু'জন বিশ্বস্ত যুবক কর্মীকে ভার দিলেন বাজার করে আনতে ও প্রায় ষাটজনের মত খিচুড়ি রান্না করতে। তিনি আরো বন্দোবস্ত করলেন যাতে তারা বিশেষ স্থানে ঠিক রাত আটটার সময় খিচুড়ি নিয়ে উপস্থিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে কাজটি খুব সহজ; কিন্তু বিচার করে দেখলে অনুমান করা যাবে কতখানি দায়িত্ববোধ, বিচক্ষণতা ও নির্ভুল কর্মী নির্বাচনের ক্ষমতা থাকলে পরে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করা যায়। যদি কোথাও একটু ভুল থেকে যেত, তবে রাত আটটার সময় কারও খিচুড়ি খাওয়া হ'ত না—হ'ত চারিদিক থেকে অতর্কিতে গুলী-বৃষ্টি!

এখন মাত্র দুপুরবেলা, রাত আটটা হতে এখনও অনেক বাকি। অম্বিকাদা এখুনি আবার পাহাড়ে ফিরে যাবেন। তিনি ঐ দু'জন কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে চিঁড়ে, চিনি, কলা প্রভৃতি পাহাড়ের প্রাদদেশ পর্যন্ত বয়ে আনলেন। সেখান থেকে তাদের বিদায় দিয়ে স্থির করলেন, পাহাড়ের ওপরে গিয়ে এইসব খাবার জিনিসগুলি নিয়ে যেতে কাউকে পাঠাবেন। অম্বিকাদা পাহাড়ের ওপরে উঠে সাথীদের সঙ্গে মিলিত হলে সবার মধ্যে গুঞ্জন ও কলরব উঠলো—"বাঃ বাঃ, অম্বিকাদাকে একেবারে চেনাই যাচ্ছে না!" "বা রে! অম্বিকাদার দাড়ি-গোঁফ কোথায় গেল?" "চেনা পুলিসও অম্বিকাদাকে এখন চিনতে পারবে না।" "এখন পুলিস চিনুক বা না চিনুক তা'তে কি আসে যায়"—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অম্বিকাদার একেবারে নতুন চেহারা দেখে সকলেই হাসলো—আনন্দ উপভোগ করলো। অম্বিকাদাও তাদের আনন্দে যোগ দিলেন। ইতিমধ্যে দু'জন সাথী চিঁড়ে, চিনি, কলা প্রভৃতি সব নিয়ে এলো। আগ্রহ ও তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া হ'ল। সবার জন্য আহারের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন বলে অম্বিকাদার মনে আনন্দের সে কি উচ্ছ্বাস! সকলকে সন্তুষ্ট করে তিনি যেন কৃতজ্ঞবোধ করছিলেন।

এবার অম্বিকাদা তাঁর যাদুকরের ঝুলি থেকে আর একটি অতি মনোরম খাদ্য বার করলেন। কি সেটি—রসগোল্লা? কেক্, সন্দেশ, কাবাব?—এ সবের চেয়েও অনেক সুস্বাদু, রসাল—চট্টগ্রামে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র 'পাঞ্চজন্য'! আজকের পাঞ্চজন্য। এতদিন তারা খবরের কাগজ চোখেও দেখেনি—কোন খবরও শোনেনি! জলের অভাবে তৃষ্ণা, অন্নের অভাবে ক্ষুধা তাদের পীড়া দিয়েছে, আবার দৈনিক খবরাখবর হতে বঞ্চিত হয়ে প্রতি মুহূর্তে মনের অতৃপ্ত বাসনার জ্বালা অনুভব করেছে। 'পাঞ্চজন্য' পেয়ে সবাই খবর জানতে ব্যগ্র হয়ে উঠলো। কাগজটি প্রত্যেকের হাতে হাতে ঘুরতে লাগলো। ২১শে তারিখের খবরে তারা জানতে পারলো—শহরে কার্ফু বলবৎ আছে; বাইরে থেকে প্রচুর ফৌজ এসে পৌঁছেছে; বিদ্রোহীদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এখনও কোন সংবাদ নেই। খবরের কাগজটি পড়ে ও অম্বিকাদার মুখ থেকে শহরের সংবাদ জেনে তারা নিশ্চিত হ'ল—আমাদের সঙ্গে তখনও পযন্ত শত্রুপক্ষের কোন সংঘর্ষ হয় নি বা আমরা তাদের হাতে বন্দীও হই নি। অমরেন্দ্র ও আর একজন সাথী গেছে আমাদের চারজনের খোঁজে। কাজেই সকলেরই আশা হ'ল তারা হয়ত আমাদের সন্ধান পাবে এবং আজ আমাদের সঙ্গে প্রধান-বাহিনী মিলিত হলে এই মিলিত শক্তি আজই হয়ত আবার শহরে শত্রুঘাঁটি আক্রমণ করতে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে!

আগেই বলেছি আমাদের খবর না পেয়ে, বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে যুবক সাথীদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে—তা'রা অনাহারে অনিদ্রায় পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াবে, নাকি সর্বশক্তি নিয়ে শহরে প্রবেশ করে যুদ্ধ করবে—স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রাণ দেবে। আজ দুপুরে 'পাঞ্চজন্য' পত্রিকার খবর দেখার পর বিপ্লবী-যুবকরা বুঝতে পারলো শত্রুপক্ষ এখন আর অসহায় অবস্থায় নেই। তা'রা বাইরে থেকে সৈন্য আমদানী করেছে। বিপ্লবী বাহিনীর এখন যুদ্ধ করতে হবে আরও হাজারগুণ বেশি সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে। তবু যুদ্ধ করতেই হবে। যত বেশি দেরি হবে ততই তাদের defensive যুদ্ধ ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। তারা যদি আগে সাহসের সঙ্গে অতর্কিতে আক্রমণ করতে পারে, তবে হয়ত অপেক্ষাকৃত বেশি সুবিধে পাবে। রজত, মনা, বিধু, দেবু, নরেশ, ত্রিপুরা, টেগরা, সুবোধ চৌধুরী প্রমুখ বিপ্লবী যুবকেরা এই নিয়ে আলোচনা করছিল।

ত্রিপুরা (আমাদের বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার ত্রিপুরা সেন) মাস্টারদার কাছে গিয়ে বলল—"মাস্টারদা, আর বেশি অপেক্ষা করা আমাদের উচিত হবে না। আমরা যত দেরি করবো, শত্রুপক্ষ তত বেশি যুদ্ধের সুবিধা পাবে। আমাদের আজই শেষরাত্রে অতর্কিতে শহরে প্রবেশ করে আক্রমণ চালাতে হবে। আপনি এই বিষয়ে চূড়ান্ত নির্দেশ দিন।"

সহাস্য বদনে মাস্টারদা ত্রিপুরাকে উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ; আজই আমরা শহরে শত্রুঘাঁটি আক্রমণ করতে চেষ্টা করবো। আমিও তোমার সঙ্গে একমত। Offence is the best form of Defence—আক্রমণই সবচেয়ে প্রকৃষ্ট প্রতিরক্ষা। Defensive যুদ্ধ আমাদের পক্ষে মারাত্মক রকমের ভুল হবে। নিশ্চিন্ত থাক, এখনই আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।"

ত্রিপুরা যখন মাস্টারদার সঙ্গে আজই আক্রমণ চালাবার কথা বলছিল, তখন টেগ্‌রা (হরিগোপাল বল) নির্মলদার কাছে গিয়ে প্রাণের বিপ্লবী আবেগ জানালো—"নির্মলদা, যুদ্ধের আর কত বাকি? বিলম্ব সইছে না। প্রতিটি মুহূর্তে মনে হচ্ছে আমরাই আগে আক্রান্ত হ'ব। যত বেশি দেরি করবো, তত বেশি জড়তা ও নিষ্ক্রিয়তা আমাদের গ্রাস করবে। আজই রাত্রে আমরা শত্রুঘাঁটি আক্রমণ করতে যাব তো?"

পনেরো বছরের বালক টেগ্‌রা ঠিকই বুঝেছিল যে, যতই দেরি করবে ততই নিষ্ক্রিয়তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। যুবকেরা জানতো প্রবল শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিণতি মাত্র একটি—আত্মসমর্পণ নাহয় সুনিশ্চিত মৃত্যু। আত্মসমর্পণের কথা যখন ওঠেই না, তখন যুবকদের মনে মৃত্যু-সংকল্প ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধে প্রাণ দেবে—এই তো ছিল তাদের স্বপ্ন, তবে দেরি কেন? দেরি করা মহা ভুল হয়েছে। আজই রাত্রে শত্রুশিবির আক্রমণ করতে হবে। নির্মলদা খুব স্নেহভরে টেগ্‌রাকে সম্বোধন করে জানালেন—"ভাই, তোমরা মরণ-পাগলের দল নিষ্ক্রিয় কেন থাকবে? তোমাদের সঙ্গে আমাদেরও নিয়ে চল। তোমরা তরুণেরাই আজকের মরণ-অভিযানে নেতৃত্ব দেবে।"

নির্মলদা টেগ্‌রাকে কেবলমাত্র উৎসাহ দিলেন তা' নয়, মরণ-অভিযানের যোগ্যতা যে ছোটদেরই সবচেয়ে বেশি, তা' নির্মলদা অন্তর দিয়ে বুঝেছিলেন। নেতাদের এখন সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। মাস্টারদা, অম্বিকাদা, নির্মলদা ও লোকনাথ কিছুক্ষণ আলোচনা করে স্থির করলেন তাঁরা শহরে প্রবেশ করে অতর্কিতে আক্রমণ চালাবেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার পর সবাইকে "Form-up" করতে আদেশ দেওয়া হ'ল। অর্ধ-চক্রাকারে তারা সবাই এসে সামনে দাঁড়ালো। দ্বিতীয় আদেশে সবাইকে বসতে বলা হ'ল। সবাই বসে পড়লো। সবার হাতে রাইফেল ও কোমরে

রিভলভার বাঁধা আছে। মাস্টারদা তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সবাই ভাবলো মাস্টারদা শহরে ইংরেজদের ঘাঁটি আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত তাদের কাছে ঘোষণা করবেন। কিন্তু মাস্টারদা সেই ঘোষণার আগে সবাইকে সম্বোধন করে বললেন—

"ভাই সব! ১৮ই এপ্রিল আমরা আক্রমণ করতে যাওয়ার পূর্বে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের মনোভাব জাগিয়ে তুলেছিলাম। আমরা প্রত্যেকে মৃত্যুপণ করে প্রোগ্রাম নিয়েছিলাম। আজ আবার আমাদের প্রত্যেককে শপথ নিতে হবে—'মৃত্যু আমাদের পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।' আমি প্রত্যেকের কাছে প্রশ্ন রাখছি, ভেবে বলবে—মৃত্যু উপেক্ষা করে প্রবল শক্তিশালী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যদের সঙ্গে মরণ-পণ যুদ্ধ করতে সত্যিই কি সকলে প্রস্তুত?"

মাস্টারদার প্রশ্ন শেষ হতে না হতে পঞ্চান্নটি রাইফেল বিপ্লবীদের হস্তে দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হ'ল; পঞ্চান্নজন বিপ্লবী নওজোয়ান অধর দংশন করে এক বাক্যে দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিল—

"শপথ করছি—ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাই।

শপথ করছি—প্রোগ্রাম আমাদের মৃত্যু।

শপথ করছি—আমরা ইংরেজ মেরে মরবো।"

সমস্ত পাহাড়টা যেন নড়ে উঠলো। বিপ্লবের প্রচণ্ড শক্তি যেন আগ্নেয়গিরির গিরি-গহ্বর হতে ফেটে পড়ে সমস্ত শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেবে! মাস্টারদা ধীর শান্তভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। কোনরকম উচ্ছ্বাস বা ভাবান্তর তাঁর মধ্যে দেখা গেলনা। সকলেই শান্ত—একেবারে নিস্তব্ধ। তারপর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মাস্টারদা প্রতিটি কথায় জোর দিয়ে ধীরে ধীরে আবার বলতে লাগলেন—

"সবার মধ্যে চূড়ান্ত সংগ্রামের মনোভাব দেখে আমি খুশি হয়েছি। যুদ্ধ করতে যে আমরা পিছপাও নই, তা আমাদের জানা আছে। তবু মানসিক প্রস্তুতির কোন শেষ নেই। যুদ্ধের জন্য যত বেশিভাবে মানসিক প্রস্তুতি করা যায় ততই ভাল। তাই আমি আবার বলছি, সবাই যেন আমরা মানস চক্ষে যুদ্ধ-ক্ষেত্রের ভয়াবহ-দৃশ্য একবার দেখতে চেষ্টা করি—মৃত্যুর বিভীষিকা, মরণযন্ত্রণায় আর্তনাদ, মেশিনগান থেকে গুলীর বৃষ্টিধারা, চারিদিকে রক্তস্রোত! শত্রুর প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে পঞ্চান্নটি মাস্কেট নিয়ে সামঞ্জস্যহীন যুদ্ধ—আমাদের সুনিশ্চিত মৃত্যু। তাই আমি আবার দ্বিতীয়বার সুযোগ দিচ্ছি—খুব ভাল করে নিজের মনকে বিচার করে দেখ। যাদের মনে একটুও দুর্বলতা আছে, তারা এখনই মনস্থির কর। নইলে অভিযানের মুখে ফিরে আসা যাবে না—তখন একজনের কাপুরুষতা অন্যকে আচ্ছন্ন করতে পারে। সাহসীদের সাহস ভীরুকে যত না সজীব করে তুলতে সমর্থ হয়, তার চাইতে

একজনের কাপুরুষতা সমস্ত সৈন্যের morale নষ্ট করে দিতে পারে। তাই আবার আমি সবাইকে বলছি নিজেদের মন তলিয়ে দেখ। এখনও সময় আছে—ভেবে উত্তর দাও—কি চাও?"

প্রত্যেকের হাতে মাস্কেট্রি ঝন্ ঝন্ করে উঠলো। সবার স্ফীত বক্ষ উন্নত শির। সমস্বরে আবার উত্তর এলো—"আমরা প্রস্তুত!"

আশ্চর্য! মাস্টারদা তবু কি যেন ভাবলেন। তারপর তিনি আবার বললেন —"আমি সবার কাছে দু'টি প্রস্তাব রাখছি। আমি চাই, যার যে প্রস্তাবটি গ্রহণ করার ইচ্ছে, সে সেইটি দ্বিধা ও সঙ্কোচহীন চিত্তে গ্রহণ করুক। আমার প্রথম প্রস্তাব—শত্রুর প্রবল সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে অসমান যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে স্বাধীনতার রক্তাক্ত বিপ্লবের সৌধ নির্মাণ করা। দ্বিতীয় প্রস্তাব—অসমান যুদ্ধ পরিহার করে আত্মগোপন করা এবং সময় ও সুযোগ নিয়ে শত্রুকে অতর্কিত আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত করা। যারা আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব মেনে নিতে চাও তারা কোন সঙ্কোচ কোর না। কেউ কিছু মনে করবে না—এখনও সময় আছে, যাদের ইচ্ছে দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রহণ করে নিজেদের দায়িত্বে চলে যাও এবং ভবিষ্যতে বুদ্ধি করে সংগঠিত হয়ে যেভাবে পার শত্রুকে আঘাত হানবে।...যারা যেতে চাইছ—যাও।"

কেউ নড়লো না। যে যেখানে ছিল সেখানেই বসে রইল। অতএব সকলে যে প্রথম প্রস্তাবের জন্যই প্রস্তুত তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। মাস্টারদা সবাইকে জানালেন—"যত শীঘ্র সম্ভব শহরে ইংরেজের ঘাঁটি আক্রমণ করতে হবে—প্রস্তুত থাক। সাহস, বিক্রম—সিংহবিক্রম চাই।"

শহর আক্রমণ করার একটা সামরিক প্ল্যান তাদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির হ'ল। হাতে সময় খুব কম। শুধু প্ল্যান একটি থাকলেই চলবে না, তাকে বাস্তব রূপ দিতে হবে। 'আক্রমণ করা হবে'—এইটি General plan, কিন্তু 'কিভাবে আক্রমণ পবিচালনা করা হবে'—সেটিই হচ্ছে Concrete plan, এই প্ল্যানটিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য এইভাবে নেতাদের মধ্যে প্রশ্ন ও উত্তর বিনিময় হয়—

মাস্টারদা—"আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা initiative হারিয়েছি।

নির্মলদা—তবু প্রতিকূল অবস্থায়ও কতখানি সুযোগ নেওয়া যায় তার উপায় খুঁজে বার করতেই হবে।

নরেশ—এখন আমাদের ভেবে ঠিক করতে হবে শহরে আমরা এক সঙ্গে close command-এ প্রবেশ করবো, নাকি ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে 'সুড়ঙ্গ পথে' প্রবেশের কৌশল গ্রহণ করবো?

নির্মলদা—এতে কোন দ্বিমত হতেই পারে না। ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে শহরে প্রবেশ করার জন্যই সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে।

অম্বিকাদা—"আমার মনে হয় প্রথমে আমাদের স্থির করা উচিত কোন্ পথে আমরা শহরে প্রবেশ করবো।

বিধু—অম্বিকাদা ঠিকই বলছেন। কোন্ পথে প্রবেশ করবো, তা' যেমন ঠিক করা প্রয়োজন তেমনি আবার, আমার মতে, স্থির করা উচিত আমাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু কি বা কোন্‌গুলি ?

লোকনাথ—কোন্ পথে প্রবেশ করবো এবং কোন্ কোন্ শত্রুঘাঁটি আক্রমণ করবো তা' সত্যিই স্থির করা প্রয়োজন; কিন্তু তার চাইতেও শত্রুর সম্ভাব্য শক্তির পরিমাণ এবং কোথায় কিভাবে তারা সৈন্য সমাবেশ করেছে তা' জানা অনেক বেশি আবশ্যক। যদিও তা' সঠিক জানা সম্ভব নয়, তবু সেই সম্বন্ধে আগে একটি বাস্তব ধারণা করা উচিত। সেই সঙ্গে আমাদের নিজস্ব শক্তিরও বাস্তব উপলব্ধি থাকলে তবেই আমরা একটি সঠিক প্ল্যান রচনা করতে পারি।

মাস্টারদা—আমরা ·৩০৩ বোরের কার্তুজ পাই নি। আমাদের কাছে লুইস্‌গান বা ম্যাগাজিন-রাইফেল নেই। কিন্তু খুব সহজেই ধরে নেওয়া যায়, ইতিমধ্যে শত্রুপক্ষ শহরে প্রচুব সৈন্য সমাবেশ করেছে। সরকারী গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত ঘাঁটি—জেলখানা, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, কোতোয়ালি, জেলা-প্রধানদের বাড়ি, রেল ও কোর্টের সবকারী ট্রেজারী প্রভৃতি নিশ্চয়ই সৈন্যেরা পাহারা দিচ্ছে। এও ধরে নেওয়া যায় যে, তারা শহরের সমস্ত বড় বড় রাস্তা, বিশেষ করে বাইরে থেকে শহরে প্রবেশের সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে।

অম্বিকাদা—আমরা মাস্টারদার কাছ থেকে শত্রুপক্ষের ও আমাদের নিজস্ব শক্তি সম্বন্ধে ধারণা করবার মত একটি বাস্তব চিত্র পেলাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয় আমরা একটিমাত্র শত্রুঘাঁটি বেছে নিয়ে একটি পথেই সকলে অনুপ্রবেশ করি।

লোকনাথ—আমার মনে হচ্ছে অম্বিকাদা সকলকে একসঙ্গে close command-এ রাখতে চাইছেন। close command-এ সবাইকে রাখবার যুক্তি হয়ত আছে; তবু আমার মনে হয় একসঙ্গে একপথে সকলের শহরে প্রবেশ করা ভুল হবে। শত্রুকে বিভ্রান্ত করা খুব প্রয়োজন। শত্রুপক্ষ যদি একটিমাত্র টার্গেট পায় তবে তাদের পক্ষে আমাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা খুব সহজ হবে এবং একটি টার্গেটকে বিধ্বস্ত করাও অনেক সুবিধে। তা'ছাড়া শত্রুর সঠিক অবস্থান যখন আমরা জানি না, তখন কোনমতেই মাত্র একটি দলে আমাদের চলা উচিত হবে না।

আমাদের দু'টি দলে ভাগ হয়ে দু'টি ভিন্ন পথে শহরে প্রবেশ করা উচিত—অন্তত একটি বিকল্প ব্যবস্থাও থাকা উচিত।"

এইরূপ আলোচনা তাদের মধ্যে আরো কিছুক্ষণ ধরে চলে। কেবল নেতারাই আলোচনায় অংশগ্রহণ না করে নরেশ ও বিধুর সঙ্গেও পরামর্শ করা তাঁরা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। নরেশ ও বিধু প্রস্তাব করে ছ'জন করে নয়টি গ্রুপ করা হোক্—একটি গ্রুপে অবশ্য সাতজন থাকবে। তাদের মতে এই নয়টি দলই স্বাধীনভাবে আক্রমণ চালাবে এবং ছোট ছোট পুলিস-ঘাঁটিও তারা আক্রমণ করবে। এতে সৈন্যদের ছড়িয়ে দিতে শত্রুকে বাধ্য করা হবে এবং সেই ক্ষেত্রে শত্রুঘাঁটি আক্রমণ করার সুযোগও বেশি পাওয়া যাবে।"

যাই হোক্, সব দিক বিবেচনা করে—অস্ত্রবল, শারীরিক দুর্বলতা, অপরিণত বয়স প্রভৃতির জন্য চূড়ান্তভাবে নিম্নলিখিত সামরিক প্ল্যানটি গৃহীত হ'ল—

(১) মাত্র দু'টি শত্রুঘাঁটি তারা আক্রমণ করবে—একটি জেল-খানা ও অপরটি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক। একটিতে যদি অসমর্থ হয় তবু যেন অপরটিতে সফল হতে পারে, তার জন্য ক্ষমতা অনুযায়ী এই দু'টি টার্গেট ঠিক করা হ'ল।

(২) শহরে প্রবেশের জন্য দু'টি ভিন্ন প্রবেশপথ ধার্য হ'ল—ইউরোপীয়ান পল্টনের রাস্তা ও প্যারেড গ্রাউণ্ডের পথ।

(৩) চোদ্দজন করে তিনটি ও তেরোজনকে নিয়ে একটি গ্রুপ হ'ল। এই চারটি গ্রুপের অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন—লোকনাথ, নির্মলদা, অম্বিকাদা ও মাস্টারদা। এই চারটি দলের মধ্যে তরুণদের এমনভাবে বাছাই করে নেওয়া হয়েছিল যা'তে প্রত্যেকটি গ্রুপ প্রায় সমান effective হয়।

(৪) দু'টি রাস্তার প্রত্যেকটিতে দু'টি চোদ্দজনের গ্রুপ যাবে। একটি গ্রুপের পেছনে সমর্থন দেওয়ার জন্য আর একটি থাকবে। দু'টি গ্রুপই একটি নির্দিষ্ট পথ দিয়ে যাবে, একসঙ্গে কাজও করবে কিন্তু পথ চলাকালে তারা আলাদাভাবে থাকবে।

(৫) দু'টি গ্রুপ জেলখানা আক্রমণ করবে এবং সব কয়েদীকে মুক্ত করে দেবে।

(৬) অন্য দু'টি গ্রুপ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক আক্রমণ করে দখল করবে।

(৭) ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও জেলখানায় আক্রমণ চলাকালে বা আক্রমণ সমাপ্ত হওয়ার পরে, এই দুই গ্রুপ সময় ও সুবিধেমত, আদালত-ভবনের পরী পাহাড়ের (Fairy Hill) ওপর সংযোগ স্থাপন করবে।

(৮) সর্বশেষে তারা 'পরী পাহাড়ের' ওপর ইংরেজের বিরুদ্ধে শেষ যুদ্ধের জন্য ব্যূহ রচনা করবে এবং সেই পোস্টেই তারা শহীদের মৃত্যু বরণ করবে।

এখন বিকেল প্রায় তিনটে। আরও পাঁচ ঘণ্টা তাদের এই পাহাড়ের ওপর অপেক্ষা করতে হবে। ধীরে ধীরে সময় অতিবাহিত হতে লাগলো। সূর্য অস্ত গেল। ছ'টা বাজলো, সন্ধ্যে সাতটা হতে চললো, কিন্তু কই অমরেন্দ্র এখনও তো ফিরে আসছে না? তা'রা খুব আশা করেছিল অমরেন্দ্র হয়ত আজ অসাধ্য সাধন করে ফিরে আসবে। রাত যখন আটটা বেজে গেল, তখন আর আশা নেই জেনে, ধীরে ধীরে সকলে হতাশ হয়ে পাহাড়ের নিচে নেমে এলো।

২১শে তারিখ রাত আটটার সময় তারা ফতেয়াবাদের নিকটে এই পাহাড়ের নিচে নেমে এসেছে; প্রায় সেই একই সময়ে আমরা চারজনও রজতের বাড়ি ছেড়ে মাসিমা ও মেসোমশায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শহরের পথে চলেছি।

পাহাড়ের নিচে নেমে এসে তারা গুণে দেখলো সবাই উপস্থিত কিনা। আর একটু পথ এগিয়ে তারা এক পুকুরের পাড়ে বসলো। অম্বিকাদার ব্যবস্থা অনুযায়ী দু'জন কর্মী দু'টি বড় বড় ঝুড়ি ভর্তি করে খিচুড়ি নিয়ে এলো। এতদিন এত ঘণ্টা পরে সকলেই অতি তৃপ্তির সঙ্গে খিচুড়ি খেয়ে সামনের পুকুর থেকে আকণ্ঠ জল পান করলো।

এখন আর দেরি করা চলবে না। তাদের শহরের দিকে যেতে হবে। মার্চ সুরু হ'ল। পথ হয়ত সহজেই অতিক্রম করা যেত, কিন্তু এতদিন বাদে পেটে ভাত পড়ার জন্য একটুতেই তারা পরিশ্রান্ত বোধ করতে লাগলো। একটু পথ হেঁটেই বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বসতে হচ্ছিল। বিশ্রাম করতে বসার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ দু'টি যেন আপনা হতেই বন্ধ হয়ে এসেছে—তারা অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। অবশ্য বলাই বাহুল্য, যাদের পাহারা দেবার কথা ছিল তারা কর্তব্যে অটল ছিল। সেদিন রাত্রে মার্চ করবার সময় তারা তিনবার বিশ্রাম করেছে ও ঘুমিয়েছে। এই কারণে সেদিন তাদের গতিও খুব মন্থর। রাত থাকতে থাকতে শহরে পৌছনো যে সম্ভব হবে না, তা' অধিনায়কেরা বুঝেছিলেন। তা'ছাড়া যদিও বা শেষরাত্রে শহরে প্রবেশ করা সম্ভব হয়, তবু এতখানি শারীরিক দুর্বলতা নিয়ে আক্রমণ চালানো উচিত হবে না। তাই সেদিন ভোর রাত্রে শহরে প্রবেশ না করে অন্য কোন পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে, ২২শে তারিখেও সারাদিন বিশ্রাম নেওয়ার পর সন্ধ্যায় বা রাত্রে প্ল্যান অনুযায়ী শহরে ইংরেজদের ঘাঁটি আক্রমণ করতে যাওয়াই ঠিক হ'ল।

ভোর হতে আর বেশি বাকি নেই। দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই কোন একটি পাহাড়ে আশ্রয় নিতে হবে। এখনই দূরে দেখা যাচ্ছে কোন কোন চাষী লাঙল কাঁধে বেরিয়ে পড়েছে। আর দেরি করলে অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। তাই সম্মুখের একটি পাহাড়েই তারা খুব দ্রুত উঠতে লাগলো। পাহাড়ের ওপরে ওঠার

পর কিছুক্ষণের মধ্যেই সকাল হয়ে গেল। এই পাহাড়টি 'ঝরঝরিয়া বটতলী'র এক মাইলের মধ্যেই অবস্থিত। তারা তখনও জানে না যে, এই 'ঝরঝরিয়া বটতলী'তেই কর্নেল ডালাস্ স্মিথ ও ডি, আই, জি, মিঃ ফারমার সৈন্যবাহিনীর একটি ক্যাম্প স্থাপন করেছেন। এক মাইলের ব্যবধানে শত্রুর মুখোমুখি যে পাহাড়ে তারা ২২শে তারিখ ভোর বেলা আশ্রয় নিল, সেই পাহাড়ের পজিশন্ সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মরক্ষার অনুকূলে ছিল না।

পাহাড়টি অপেক্ষাকৃত নিচু। তার উত্তর ও পূর্বের সংলগ্ন পাহাড় দু'টির উচ্চতা জালালাবাদ পাহাড়ের চেয়ে অনেকটা বেশি। শত্রুরা যদি ঐ দু'টি পাহাড়ের ওপর মেশিনগান নিয়ে পজিশন্ নেয় তবে আমাদের ঘায়েল করতে তাদের অনেক বেশি সুবিধে হবে। তা'ছাড়া "Round Cover"-এর আড়ালে আত্মরক্ষার সুবিধে নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য এই পাহাড়ের ওপর বড় বড় গাছ খুব বেশি ছিল না। আরো একটি কারণে জালালাবাদ পাহাড়টির সামরিক সুবিধে আমাদের চাইতে শত্রুপক্ষের অনেক বেশি ছিল—এই পাহাড়ের পাদদেশ থেকে মাত্র আধ মাইলের মধ্যেই রেল-লাইন; যে-কোন সময়ে শত্রুপক্ষ ট্রেনযোগে হঠাৎ প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করে ফেলতে পারে। চট্টগ্রামে সাঁইত্রিশ বছর আগে পুলিসের ট্রাক, ট্যাক্সি বা মোটর গাড়ি ছিল না বললেই চলে। কাজেই ট্রেনযোগে বা হাঁটা-পথে ছাড়া সৈন্য ও পুলিসের বড় সমাবেশের কোন উপায় ছিল না। এই পাহাড়ের পাদদেশে রেল-লাইন থাকায় শত্রুপক্ষ সৈন্য সমাবেশের সুবিধে পাবে বোঝা সত্ত্বেও তারা আরো দূরে আরো দুর্গম পথের স্বাভাবিক অবরোধের সুবিধে গ্রহণ করতে পারা যায় মত অন্য কোন পাহাড় বেছে নিতে পারলো না—কারণ, ভোরের আলো দেখা দিয়েছে, লাঙল কাঁধে চাষীরা বেরোতে সুরু করেছে।

২২শে এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে তাদের খাওয়ার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। পাহাড়ের নিচে ছোট্ট একটি পুকুর। ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটাবার জন্য এই জলাশয়ের জল ভিন্ন সারাটা দিন ও সন্ধ্যে পর্যন্ত তাদের অন্য কিছু জোটে নি। ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা অনুভব করলেও তার অনেকখানি উপশম হয়েছে যখনই তারা ভেবেছে, আজই সন্ধ্যের সময় তারা শহর আক্রমণ করবে। মাত্র এই দিনটুকু বাকি—তারপর মৃত্যুর সঙ্গে তারা পাঞ্জা লড়বে। থেকে থেকে রোমাঞ্চ অনুভব করেছে, কখনও বা হৃদয় কেঁপে উঠেছে, মাঝে মাঝে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে, সময় সময় হৃদয়তন্ত্রীতে রণ-সঙ্গীত ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে—আজই রাত্রে মরণ-পণ যুদ্ধ—তারপর সব শেষ! মরণ-যুদ্ধের প্রতীক্ষায় পঞ্চান্নজন নির্ভীক বিপ্লবী জালালাবাদ পাহাড়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা নিয়ে অপেক্ষা করছে!

আমরা যেমন ২১শে তারিখ সকাল বেলা রজতের বাড়িতে পুলিসের সঙ্গে আসন্ন

সংঘর্ষের হাত থেকে বেঁচে গেলাম, ঠিক তেমনি ২১শে তারিখে আমাদের প্রধান-বাহিনীও শত্রুপক্ষের ব্যাপক আক্রমণ পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। আমরা এতক্ষণ প্রধান-বাহিনী ও আমাদের চারজনের কথাই বলেছি, 'বিদ্রোহীদের' বিরুদ্ধে সরকারীপক্ষ কিভাবে তাদের শক্তি সমাবেশ করছিল এইবার সে সম্বন্ধে কিছু বলবো। তা'ছাড়া শত্রুপক্ষের তথ্য থেকেও জানা যাবে কিভাবে তারা আমাদের প্রধান-বাহিনীকে ধরতে এসে নিজেদের দীর্ঘসূত্রতার জন্য বোকা বনেছে।

আমাদের মামলার ছাপানো জাজ্‌মেণ্ট থেকে উদ্ধৃত করছি—"...That same day (21st April) Abdul Gaffur, S. I. Hatazari P. S. on receipt of certain information went to the hills to the west of Chowdhury Hat railway station (about 12 miles from Chittagong on the Chittagong–Nazir Hat branch line) and on his way up the hill, known Badulla hill, he found lying on the path through the jungle two of those silver embroidered black velvet badges, a partly burned stocking and langote and at the top of the hill the skins of water melons and some torn paper bags which appeared to have contained eatables, lying on flattened and trodden thatching grass.

"The Badulla hill and its neighbours form part of the same range which extends north-east from the poiice-lines and is about 4 or 5 miles north of Jallalabad hill. The S. I. was descending the hill by the south side about 4-30 or 5 P. M. (he had ascended by the north side) when on his way down he met Waijuddi who had gone that afternoon to graze his cattle near his Sankhola (thatching grass patch) in the hills. His cattle followed a path by the side of a hill stream into an open space surrounded on three sides by the hills and he went after them to find to his astonishment about 60 or 70 Hindus, sitting down aud some walking about. Some of them were wearing khaki shirts and shorts and other ordinary white shirts and dhooties. Beside them a number of guns were piled under a tree. They asked him whre he was going and he replied that he had came to look after his cattle. To his query as to why they had come there, they replied that they had come from Calcutta for shikar."
—হাটাজারি থানার পুলিস সাব-ইন্‌স্পেক্টার আবদুল গফুর কিছু সংবাদ পেয়ে

চৌধুরীহাট রেল-স্টেশনের পশ্চিমের পাহাড়ের ওপর অনুসন্ধান করতে গেলেন। চট্টগ্রাম-নাজিরহাট ব্রাঞ্চ রেল-লাইনের ওপর, শহর থেকে বারো মাইল দূরে চৌধুরীহাট রেল-স্টেশন। যে পাহাড়ে আবদুল গফুর গেলেন সেটি 'বাদুল্লা পাহাড়' নামে পরিচিত। পাহাড়টিতে ওঠার পথে তিনি কালো ভেলভেটের ওপর রূপালী জরীর কাজ করা দু'টি ব্যাজ, আগুনে সামান্য পোড়া মোজা, একটি লেঙট্ এবং সেই পাহাড়ের শিখরে তরমুজের খোসা ও পায়ে মাড়ানো কাগজের খাবার ঠোঙা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল দেখতে পান।

বাদুল্লা পাহাড় সংলগ্ন পর্বতমালা পুলিস-লাইনের উত্তর-পূর্ব কোণ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং বাদুল্লা পাহাড়টি জালালাবাদের চার পাঁচ মাইল উত্তরে। ঐ সাব-ইন্‌স্পেক্টার উত্তব দিক দিযে পাহাড়টিতে উঠেছিলেন এবং সাড়ে চাব বা পাঁচটার সময় নামলেন দক্ষিণপ্রান্ত দিয়ে। এই সময় একজন চাষী, ওয়েজুদ্দির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ওয়েজুদ্দি তাব শণক্ষেতেব পাশে গরু চবাতে গিয়েছিল। পাহাড়ী সরু জলস্রোতের পাশে গরু চরাবাব সময গরুব পালকে অনুসরণ করে সে তিনদিক পাহাড়ে ঘেরা একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ে। সেখানে ষাট-সত্তরজন খাকী পোশাক পরিহিত হিন্দুকে দেখে এবং সেখানেই একটি গাছের নিচে স্তূপীকৃত রাইফেল দেখে চাষী ওয়েজুদ্দি একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়ে। খাকী পোশাক পরিহিত লোকদের মধ্যে কারও কারও পরনে ধুতি-সার্ট এবং তারা কেউ বসে কেউ বা দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের মধ্যেই একজন ওয়েজুদ্দিকে জিজ্ঞেস করে যে, সে কোথায় যাচ্ছে। উত্তরে সে জানায়, গরু চরাতে এসেছিল। তারপর ওয়েজুদ্দিও তারা কোথেকে আসছে প্রশ্ন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পায় যে, কলকাতা থেকে তারা শিকারে এসেছে।

তখন প্রায় বিকেল পাঁচটা। ঘণ্টা দুই তিনের মধ্যেই এই পাহাড়টি ছেড়ে অন্যত্র যেতে হবে। এইরূপ পরিস্থিতিতে তাঁরা এই কৃষককে গ্রেফতাব করে আটকে রাখবেন, নাকি ছেড়ে দেবেন? কৃষকটি যদি কোন ক্ষতি করতে চায়, তাহলেও শত্রুপক্ষ তার কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে আক্রমণ করবার উদ্দেশ্যে সৈন্য সমাবেশ করে এ পর্যন্ত এসে পৌছবার অনেক আগেই তাঁরা এ স্থান ত্যাগ করে চলে যাবেন—এই কারণে কৃষকটিকে বন্দী না করে তাঁরা ছেড়ে দিলেন।

সরকারী ভাষ্য থেকে জেনেছি যে, কৃষকটি সেখান থেকে ছাড়া পাওয়ার পর পুলিসকে সংবাদ দেবার জন্য কোন থানায় যায় নি। সে "সোয়েম" ঘাস কাটবার জন্য তার "শাঁখোলা"তে যায়—(সরকারী ভাষ্যে লেখা আছে "সোয়েম ঘাস" ও "শাঁখোলো,"—এই শব্দ দু'টির অর্থ আমার জানা নেই)। সেখানে তার সঙ্গে সাব-ইন্‌স্পেক্টার আবদুল গফুরের দেখা হয়। আমাদের মামলার রায়ের সরকারী ভাষ্যে এইরূপ লেখা আছে—

"From there he went up the hill to his 'sankhola' to cut 'soem' grass and on his way back met the S. I. Abdul Gaffur who questioned him if he had come across any Sawdeshi Hindus in the jungle. Waijuddi told him what he had seen and pointed out the place to him."—ওয়েজুদ্দি সোয়েম ঘাস কাটবার জন্য পাহাড়ের ওপরে তার শাঁখোলায় গেলে, সেখানে থেকে ফেরবার পথে এস, আই, আবদুল গফুরের সঙ্গে তার দেখা হয়। আবদুল গফুর সাহেব তার কাছে জানতে চাইলেন জঙ্গলের দিকে কোন হিন্দু স্বদেশীকে দেখা গেছে কিনা। ওয়েজুদ্দি যা দেখেছে তাই বলে এবং অঙ্গুলি নির্দেশে স্থানটিও দেখিয়ে দেয়।

এই সংবাদের গুরুত্ব যে কতখানি, তা বুঝতে সাব-ইন্‌স্পেক্টারের খুব বেশি সময় লাগে নি। এই সংবাদ উচ্চ কর্তৃপক্ষকে আগে যে দিতে পারবে তার ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা প্রচুর! কাজেই ধরে নেওয়া যায়, আবদুল গফুর যত দ্রুত সম্ভব এই অমূল্য সংবাদ ডি, আই, জি, মিঃ ফারমার সাহেবের কাছে পাঠানো যায়, তার সব রকম ব্যবস্থাই করলেন। মিঃ ফারমার যথা সময়েই আমাদের প্রধান-বাহিনী ২১শে তারিখে বিকেল পাঁচটায় যে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল, তার খবর পেয়ে গেলেন। কিন্তু বিকেল পাঁচটার সংবাদ এস, পি, মিঃ জনসন এবং ডি, আই, জি, মিঃ ফারমারের কাছে যখন পৌঁছলো, তখন রাত প্রায় আটটা। এই সংবাদ পেয়ে ডি, এম, মিঃ উইলকিন্‌সন, কর্নেল ডালাস্‌ স্মিথ, মিঃ ফারমার, মিঃ জনসন, এ, এস, পি, মিঃ স্থটার ও মিঃ লুইস্‌, সুর্মা ভ্যালি লাইট হর্স-এর কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন রবিন্‌সন এবং এ, এফ, আই, ব্যাটালিয়ানের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন টেট্‌ মিলিত হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কর্মপন্থা স্থির করলেন।

এঁদের মধ্যে যা আলোচনা হয়েছিল তার গল্প আমাদের মামলার সময় আমি একজন ভারতীয় অফিসারের মুখে শুনেছিলাম। এই অফিসারটি আলোচনা চলাকালীন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন কর্তাব্যক্তিদের আলোচনার কথা কি শুনেছিলাম আজ, এত বছর পরে, তার হুবহু বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে যতটুকু মনে আছে তা' লিখছি—২১শে তারিখে এই প্রথম প্রধান-বাহিনীর সংবাদ পাওয়ার পর, শত্রুপক্ষ কি ব্যবস্থা ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিল তা বোঝবার পক্ষে এটুকু লেখাই যথেষ্ট।

শত্রুপক্ষ দুই অংশে তাঁদের সমর শক্তিকে বিভক্ত করেন। শহরের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য অর্ধেক সৈন্য রাখা হ'ল এবং অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে "বিদ্রোহীদের" বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে আর একটি কমাণ্ড গঠন করলেন। তারপর উপস্থিত কর্তৃপক্ষদের মধ্যে এই ধরনের আলোচনা হ'ল—

A. S. P. Mr. Lewis : "আমার মনে হচ্ছে অনেক দেরি হয়ে গেল। এখন প্রায় রাত দশটা। এতক্ষণে বোধহয় 'Raiders'-রা উধাও হয়েছে।

D.I.G. Mr. Farmer : ঠিকই বলেছ লুইস্। আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেল। আর দেরি না করে এক্ষুণি বেরিয়ে পড়তে হবে।

Col. Dallas Smith : Dusk-এ (সন্ধ্যের সময়) আক্রমণের সুযোগ আমরা ইতিমধ্যেই হারিয়েছি। তা'ছাড়া অজানা পাহাড়ে রাত্রে অভিযান চালাতে সৈন্যদের অনেক বেশি অসুবিধে হবে। 'Raiders'-রা চট্টগ্রামের পাহাড়ে পথ-ঘাট জানে বলেই রাত্রির অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে আমাদের বিরুদ্ধে অনেক বেশি সুবিধে নেবে। তাই আমরা রাত্রে আক্রমণ করবো না। ভোরের একটু আগে (Dawn-এ) তাদের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বো।"

সকলেই কর্নেল সাহেবের প্ল্যান মেনে নিলেন। এর অনেক পূর্বে, পুলিসসাহেব সংবাদ পাওয়ার এক ঘন্টার মধ্যেই, সিদ্দিক দেওয়ান (S. I.) এবং আবদুল গফুরকে মোটর যোগে চৌধুরীহাট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের ওপর নির্দেশ ছিল বাদুল্লা পাহাড়ে বিপ্লবীদের গতিবিধি সম্বন্ধে তারা যেন যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখতে চেষ্টা করে। রাত প্রায় দশটা-সাড়ে দশটার সময় Surma Vally Light Horse ও Eastern Frontier Rifles-এর সৈন্যবাহিনীর এক বিরাট অংশকে ট্রেনযোগে চৌধুরীহাট স্টেশনে যাওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হ'ল।

তাদের কথায় আমরা এখানে মাত্র এইটুকু পাচ্ছি --

"A force consisting of some 50 men of the Eastern Frontier Rifles and a Lewisgun section of the A. B. Railway Battalion, A. F. I. under the command of Col. Dallas Smith accompanied by the D.I.G. (Mr. Farmer), the A. S. P. Mr. Lewis and Dr. Weldon left Cittagong by train and arrived about 4 or 4-30 a. m. at Choudhuryhat, where they were met by Abdul Gaffur and Siddik Dewan who had returned there by motor car."—(Judgment Chittagong Armoury Raid Case No. 1).

—Eastern Frontier Rifles Regiment-এর মাত্র ৫০ জন সৈন্য এবং A. B. Railway Battalion-এর একটি লুইস্‌গান Section সঙ্গে নিয়ে ডালাস্ স্মিথ, ফারমার, লুইস্ ও ডাক্তার ওয়েল্ডন্ সাহেব সেই রাত্রেই ট্রেনযোগে ভোর চারটে বা

সাড়ে চারটের সময় চৌধুরীহাটে এসে পৌছলেন। সেখানে তাঁরা সাব-ইন্স্পেক্টর সিদ্দিক দেওয়ান ও আবদুল গফুরের সাক্ষাৎ পেলেন। এরা দু'জনে মোটরযোগে সেখানে উপস্থিত হয়।

যেটুকু সৈন্য সমাবেশের উল্লেখ সরকারী তথ্য হ'তে পাচ্ছি, তা' থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, তাঁরা ২১শে তারিখ ভোরে আমাদের প্রধান-বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলেন। তবে মাত্র পঞ্চাশ-ষাটজন বিপ্লবীর বিরুদ্ধে প্রচুর সৈন্য সমাবেশের উল্লেখে কেমন যেন একটু লজ্জা বোধ হয়। তাই যে অনুপাতে সৈন্য সংখ্যা সঙ্গে নিয়ে গেছেন বলে তাঁরা জানাচ্ছেন, তা' সম্পূর্ণ অসত্য। আমাদের পক্ষে ভারতীয় ইন্স্পেক্টার ও সাব-ইন্স্পেক্টারদের মারফত তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে এবং এই বিষয়ে আমাদের সংগৃহীত রিপোর্টটিও অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত ও সত্য। তাঁরা প্রধান-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন ভেবে সুরমা ভ্যালি লাইট হর্স রেজিমেণ্টের একটি কম্পানি ও ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের আর একটি কম্পানিকে সঙ্গে নিলেন। তা'ছাড়াও ভিকার্স মেসিনগানের একটি Section এবং চারটি লুইস্‌গান Section তাঁদের সঙ্গে ছিল। তখনকার বৃটিশ আর্মি ম্যানুয়াল অনুযায়ী, ১৫৬ জনকে নিয়ে একটি কম্পানি গঠিত হ'ত।

২০শে তারিখ বিকেলে তাদের কথামত একশ' জন সৈন্য নিয়ে, পাহাড়ে-জঙ্গলে আমাদের খুঁজতে গিয়েছিলেন স্বয়ং I. G, S. P., এবং কর্নেল ডালাস স্মিথ্। আর ২২শে তারিখে ভোর রাত্রে নিশ্চিত যুদ্ধ জেনেও মাত্র পঞ্চাশ জন সৈন্য ও ভিকার্সগানের মাত্র একটি Section নিয়ে তাঁরা শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন —সুস্থ মস্তিষ্কে এটা ভাবা কঠিন। তা'ছাড়াও যুদ্ধের সাধারণ নীতি অনুযায়ী যুদ্ধ জয়ের জন্য কোন আক্রমণই প্ল্যান করা যায় না, যদি নাকি শত্রুর চাইতে পাঁচ গুণ, অন্তত তিনগুণও বেশি শক্তি নিয়ে যুদ্ধে নামা না যায়। এই কারণেই আমাদের সংগৃহীত তথ্য সন্দেহাতীত।

চৌধুরীহাটে আবার শত্রুসৈন্য তিন ভাগে বিভক্ত হ'ল। (ক) প্রথম ভাগে ভারতীয় Non Commissioned অফিসারদের নিয়ে ভারতীয় সৈন্যদলের ত্রিশ-জনের একটি প্লেটুন সামনা-সামনি যুদ্ধ করতে যাবে। তারা বিপ্লবীদের গুপ্তস্থান থেকে গুলী ছুঁড়তে বাধ্য করবে। (খ) সেই সময় সাঁড়াশির মত দুই পাশ থেকে দু'টি কম্পানি আক্রমণ চালাবে। উত্তর-পূর্ব দিক থেকে কর্নেল ডালাস্ স্মিথ ও দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে ডি, আই, জি, মিঃ ফারমার অন্য মিলিটারী অফিসারদের সঙ্গে এইরূপ একটি তীব্র আক্রমণ চালাবার পরিকল্পনা নিলেন। (গ) আক্রমণ চলাকালীন সামনের উঁচু পাহাড়ে তাদের ভিকার্স মেশিনগান বসানো থাকবে স্থির হ'ল।

ভোর হওয়ার একটু আগেই প্ল্যান অনুযায়ী, তিন দিক হ'তে তাঁরা বীরত্বের সঙ্গে

আসয়ে গেলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁদের—আমাদের প্রধান-বাহিনী শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে অনেক আগেই, ২১শে তারিখে সন্ধ্যে আটটা-ন'টার সময়, খিচুড়ি খেয়ে এই বাহুল্লা পাহাড় ত্যাগ করে চলে গেছে। পরিত্যক্ত এই পাহাড় যখন শত্রু-সৈন্যেরা বীরদর্পে দখল করে মনে মনে সান্ত্বনা পাচ্ছিল, আমাদের প্রধান বাহিনী তখন জালালাবাদে অপেক্ষা করছে—সন্ধ্যায় তারা নতুন প্ল্যান অনুযায়ী সর্বশক্তি নিয়ে শহর আক্রমণ করতে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বৃটিশ শক্তির এই অক্ষমতার গ্লানিকে চাপা দেওয়ার জন্য সরকার পক্ষ খুব চেষ্টা করেছেন। তাই ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট মিঃ জে, ইউনী জাজ্‌মেণ্টে লিখেছেন—

"They discovered however abundant traces of recent occupation by the raiders viz, five police musket-ball cartridges, one police revolver, blank cartridge, paper wrapping for police musket, etc., etc."—যাই হোক্ না কেন, বিদ্রোহীরা সেখানে কিছু আগেও যে ছিল, তার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়; যেমন—পাঁচটি পুলিস মাস্কেট-বল কার্তুজ, পুলিস রিভলভার, একটি খালি খোল ও পুলিস-মাস্কেট জড়ানো কাগজ সেখানে পাওয়া গেছে।

সত্যিই তো, যুদ্ধের জন্য তাঁদের এত তোড়জোড়, এত ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ, সাঁড়াশি আক্রমণের রণ-কৌশল—এসব তো একেবারে ব্যর্থ হয় নি! বিদ্রোহীদের সাক্ষাৎ নাইবা মিললো, সেখানে যে কিছুক্ষণ আগেও তারা ছিল, তার অসংখ্য প্রমাণ তো পাওয়া গেছে!—হ্যাঁ, এই প্রমাণ নিয়েই সেদিন তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল।

জালালাবাদ পাহাড়ে অপেক্ষাবত প্রধান-বাহিনী, তাদের পেছনে পর্দার অন্তরালে শত্রুপক্ষের এই যে বিরাট আক্রমণ প্রচেষ্টা—এর কোন খোঁজই পায় নি। আর শত্রুপক্ষও ধারণা করতে পারে নি, তাদের এত কাছে জালালাবাদ পাহাড়ে বিদ্রোহীরা শহর আক্রমণ করবার জন্য অপেক্ষা করছে। বাহুল্লা পাহাড়ে শত্রুপক্ষ বিদ্রোহীদের দেখা না পেয়ে ভেবেছিল, বিদ্রোহীরা স্বভাবতই শহর থেকে দূরে চলে যাবে—শহরের কাছাকাছি থাকবে না। তারা কি করে জানবে যে, বিপ্লবীরা সেই রাত্রেই শহর আক্রমণ করার প্ল্যান করেছে?

বাহুল্লা পাহাড়ে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এসে শত্রুপক্ষ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারে না। তারাও তাদের মত চেষ্টা করে যেতে লাগলো। কর্নেল ডালাস্ স্মিথ্ সৈন্যদের একটা বড় অংশ নিয়ে "ঝরঝরিয়া বটতলী" এলাকায় ক্যাম্প করলেন। ডি, আই, জি, ও এস, পি, অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে শহরে ফিরে এলেন। কর্নেল সাহেব হাটাজারি ও পাঁচালাইশ থানা অফিসারদের নির্দেশ দিলেন, চৌকিদার ও দফাদারদের যেন বিদ্রোহীদের খোঁজে পাঠানো হয়। এই দু'টি থানা থেকে দু'জন করে

চৌকিদার নিয়ে দশটি দল গঠন করা হ'ল। তারা সাদা পোশাকে সাধারণ গ্রাম্য চাষী সেজে বনে-জঙ্গলে ও পাহাড়ে "স্বদেশীদের" খোঁজে বেরিয়ে পড়লো। ওদিকে পুলিসসাহেব জনসন বিদ্রোহীদের সংবাদ সংগ্রহের জন্য হেম গুপ্ত, সিদ্দিক দেওয়ান প্রমুখ সাব-ইন্‌স্পেক্টারদের চার্জে বিভিন্ন স্কাউট পার্টি পাহাড় অঞ্চলে পাঠালেন।

বিদ্রোহীদের খোঁজ পাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ যতখানি ব্যস্ত ও মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, শহরের নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখবার জন্যও ঠিক সেই পরিমাণেই সজাগ ও তৎপর ছিলেন। শহরের প্রধান প্রধান ঘাঁটি—জেলখানা, ব্যাঙ্ক, সরকারী ট্রেজারী ও রেলের ট্রেজারী প্রভৃতি সুরক্ষিত রাখার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সৈন্য মোতায়েন হয়েছিল। তা'ছাড়াও শত্রুপক্ষ সব সময় আতঙ্কগ্রস্ত ছিল পাছে বিদ্রোহীদের দ্বারা অতর্কিতে শহর আক্রান্ত হয়। তারা জানতে পেরেছিলেন, আমাদের প্রধান-বাহিনী শহরের উত্তরে পাহাড় অঞ্চলে অবস্থান করছে। তাই উত্তর দিক দিয়ে শহরে প্রবেশের পথ দু'টি দুর্ভেদ্য করবার জন্য প্রচুর সৈন্য মোতায়েন করেছিলেন। ইউরোপীয়ান পল্টনের পথ ও প্যারেড গ্রাউণ্ডের রাস্তাটিও সৈন্যরা অবরোধ করেছিল—২২শে এপ্রিল শহরে আক্রমণ চালাবার জন্য আমাদে প্রধান-বাহিনীকে সেই সব অবরোধের সম্মুখীন হতে হ'ত। ২২শে তারিখে প্রধান-বাহিনী যে সহজে শহর আক্রমণের সুযোগ পাবে, সে আশা তাদের মোটেই ছিল না; তবু তারা ঠিক করেছিল, সুনিশ্চিত মৃত্যু জেনেও, সেই রাত্রেই তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ইংরেজ কর্তৃপক্ষ আজ তাদের এই সুযোগ দিতে যেন প্রস্তুত নয়! স্কাউটেরা খবরের পর খবর আনছে—কোনটা একেবারে বাজে খবর, কোনটা কিছু বা কাজের আবার কয়েকটা বেশ নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তখনও তারা একেবারে নির্ভুল সংবাদ পায় নি।

এখন প্রায় বেলা এগারোটা। এমন সময় আমাদের প্রধান-বাহিনী দেখতে পায় তাদের দিকে দু'জন কৃষক আসছে। আমাদের বিপ্লবী সৈন্যরা তাদের গোপন স্থানে থেকে এই দুই কৃষককে লক্ষ্য করছিল। কৃষকেরা কিন্তু বিপ্লবীদের অবস্থান আগে বুঝতে পারে নি। একেবারে কাছে এসে পঞ্চাশ-ষাটজন সশস্ত্র স্বদেশীকে দেখামাত্র ভয়ে তাদের মুখ সাদা হয়ে গেল। এখন পালাবার আর কোন উপায় নেই।

নির্মলদা কৃষকদের প্রশ্ন করলেন—"তোমরা কে? কোথায় যাচ্ছ? কি কাজে এসেছ?"

তাদের মধ্যে একজন কৃষক উত্তর দিল—"আমরা আমাদের গরু খুঁজতে এসেছি।" সত্যি কি তারা গরু খুঁজতে এসেছে—এ সন্দেহ বিপ্লবীদের মনেও এসেছে; কিন্তু তারা যে গরু খুঁজতে আসে নি, এ সম্বন্ধে বিদ্রোহীরা একেবারে নিশ্চিত নয়—এইটিই মানবতার দৃষ্টিভঙ্গী। শত্রুর সঙ্গে রণনীতি ও রণ-কৌশলের প্রয়োগে

মানবতা, মহানুভবতা এবং উদারতার স্থান কোথায়? মারি অরি পারি যে কৌশলে!—এখানে দয়া নেই, মায়া নেই; ছল-চাতুরী, মিথ্যা ভান, বিভ্রান্তি সৃষ্টি —প্রতি পদে শত্রুর বিরুদ্ধে এ সবই প্রযোজ্য! ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যারাই শত্রুর চালে ভুলেছে, শত্রুর প্রতি দুর্বলতা দেখিয়েছে, শত্রুর মিথ্যা সন্ধি প্রস্তাব সরল মনে অনুমোদন করেছে—তারাই শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছে। কাজেই যেখানে অসমান শক্তিব মধ্যে লড়াই, সেখানে তো সেইরূপ দুর্বলতা, মহানুভবতা ও মানবতার প্রশ্নই ওঠে না।

এই দু'জন কৃষককে সন্ধ্যে বা রাত পর্যন্ত বন্দী করে রাখা সাব্যস্ত হলে, এইজন্য তাদের কোন বেগ পেতে হ'ত না। কেবলমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা—বন্দী করে রাখবে কি রাখবে না। ২১শে তাবিখে বিকেলে ওয়েজুদ্দিকে বন্দী করে না রাখার যুক্তি ছিল। কারণ, বিকেল পাঁচটায় ওযেজুদ্দি গিয়ে শত্রুপক্ষকে যদি খববও দিত, তাহলেও বৃটিশ সৈন্যের পক্ষে দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে প্রধান-বাহিনীকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হওযা সম্ভব ছিল না। ঐ দু'তিন ঘণ্টাব মধ্যেই, প্রধান-বাহিনীর বাহুল্া পাহাড় ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু সকাল এগারোটায কৃষক দু'জনকে আটকে না রেখে ছেড়ে দিলে, তারা যদি বিশ্বাসঘাতকতা ববে তবে শত্রুপক্ষ যে সন্ধ্যের অনেক আগেই প্রধান-বাহিনীকে আক্রমণ করতে জালালাবাদ পাহাড়ে এসে পড়তে পারে, এ কথা তারা চিন্তাই করে নি। কিন্তু তাদের যখন সন্ধ্যে পযন্ত সেখানে থেকে সেই রাত্রেই শহর আক্রমণের কথা, তখন কর্তব্যের খাতিরে দ্বিধাহীনচিত্তে একটিমাত্র সিদ্ধান্তই নেওযা উচিত ছিল—কৃষক দু'জনের প্রতি অভদ্রতা হলেও বৈপ্লবিক কর্তব্যেই তাদের বন্দী করে রাখা। কিন্তু তাঁরা কৃষকদের সন্ধ্যে পর্যন্ত অতক্ষণ, অর্থাৎ তাদের মার্চ সুরু করা পযন্ত, সেই পাহাড়ে বন্দী করে রাখা নিষ্ঠুরতা হবে (কে জানে যদি তারা সরল ভালোমানুষ হয) ভেবে তাদের ছেড়ে দেওয়াই সাব্যস্ত করলেন।

কৃষকদের যখন ছেড়েই দেওয়া হবে, তখন তাদের মনে যদি বিশ্বাস জন্মান যায় যে, 'তারা স্বদেশী নয়—পুলিস, বিদ্রোহীদের বন্দী করতে এসেছে' তবে হয়ত মন্দের ভাল। এই ভেবে একটু জোরে জোরে কৃষকদের শুনিযে আমাদের সৈনিকেরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে লাগলো—

—"আচ্ছা, কোন্ দিক দিয়ে স্বদেশীরা গেছে বল তো? তারা এতদিন আছেও বা কোথায়?"

—"ঠিক আছে, আর কতদিন? বাছাধনেরা যাবে কোথায়? শীগ্গিরই ধরা পড়তে হবে—আজ না হলে বড় জোর কাল।"

—"আমাদের পার্টির বেড়াজাল ভেদ করে তারা যাবে কোথায়? উত্তর, পূব ও পশ্চিম—কোন দিকেই পালাবার পথ নেই।"

এইভাবে কৃষকদের শুনিয়ে শুনিয়ে কথাবার্তা বলে তাদের মনে বিশ্বাস জন্মাবার চেষ্টা হচ্ছিল যে, আমাদের প্রধান-বাহিনীটি পুলিসেরই একটা দল এবং আরো তিনটি অনুরূপ পুলিস-পার্টির সঙ্গে একত্র হয়ে স্বদেশীদের ধরবার জন্য জাল পেতেছে। একজন কৃষকদের বলল—

"দেখ বাবু, তোমরা যদি স্বদেশীদের কোন খবর বা খবরের সূত্রও পাও, তবে যত শীঘ্র পার আমাদের জানিও। খবরের সত্যতা প্রমাণিত হলে তোমাদের আমরা প্রচুর পুরস্কার দেব। আমাদের আরো তিনটি দল—পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্তে অপেক্ষা করছে। যাদেরই আগে পাবে তাদের কাছেই খবর দিলে হবে। নিশ্চয় দেবে তো?"

বলা বাহুল্য, তারা অবশ্যই খবর সরবরাহ করবে না বলে মূর্খতা প্রকাশ করে নি। কৃষক দু'জন অবলীলাক্রমে ভরসা দিল—খবর পাওয়া মাত্রই তারা তা' পৌঁছে দেবে। কেউ তাদের আর বাধা দিল না। তারা চলে গেল। ভাগ্যদেবী তাদের এই 'মানবতার উপাসনা' দেখে অলক্ষ্যে হাসলেন।

এই নিদারুণ অনিশ্চয়তা ও সঙ্কটময় অবস্থায় প্রধান-বাহিনীকে এখানে ছেড়ে যাচ্ছি আমাদের চারজনের পরবর্তী ঘটনা বলবার জন্য।

বিকেলে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বেলের কোয়ার্টার পরিত্যাগ করে রওনা হলাম। আনন্দ সাজলো ছাত্র, মাখন অফিস কর্মচারীর পোশাক নিল, গণেশ সামান্য একজন ব্যবসাদার আর আমি একজন মোটর গাড়ির ব্রোকার। প্রত্যেকেরই হাঁটবার ভঙ্গীও একটু পরিবর্তিত করা হ'ল। এতদিন পর্যন্ত যেভাবে চুলের সিঁথি করে এসেছি তা না করে অন্য ধরনের করে নিলাম। আনন্দ ও মাখনের গোঁফ ওঠার বয়স নয়, তবু তারা খুব দিয়ে দাড়ি গোঁফ কামাল। এতেও চেহারায় কিছুটা পরিবর্তন আনে। পরস্পরের সম্পর্ক ঠিক করে নিলাম—মামা, ভাগ্নে, কাকা, ভাইপো, ইত্যাদি। প্রত্যেকের নাম এবং সেই অনুসারে বাপের নামও স্থির করা হ'ল, পুলিসের জেরায় যেন ইতস্তত ভাব না আসে।

সামরিক শিক্ষা যেমন প্রয়োজন, তেমনি আবার ছল-চাতুরী প্রভৃতির জন্য ছদ্মবেশ, বিভিন্ন ভঙ্গীতে হাঁটা, মিথ্যা নাম-ধাম বলে পরিচয় দেওয়ার ট্রেনিংও বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষার একটি অঙ্গ—বিশেষ করে আমাদের ক্ষেত্রে এই সব শিক্ষা একেবারে অপরিহার্য ছিল।

এখন রণক্ষেত্রের রণ-কৌশল নয়—উপস্থিত প্রয়োজন—ট্রাঙ্ক-রোড দিয়ে যাবার

সময় মিলিটারী বা পুলিসের পেট্রলয় পার্টিকে বোকা বানিয়ে যে কোন উপায়ে সাত মাইল দূরে ভাটিয়ারী রেল-স্টেশনে পৌছনো।

চারজনের হাতেই পুরোনো চারটি ছাতা, একটি জীর্ণ সতরঞ্চি দিয়ে জড়ানো ছোট্ট একটি বিছানা, একজনের হাতে একটি ঘটি ও অপর একজন নিয়েছে একটি হারিকেন—অতি "নিরীহ সাধারণ যাত্রী", এতে কোন সন্দেহ নেই—কেবল জামায় ঢাকা চারজনের কোমরে বাঁধা গুলীভরা মাত্র আটটি পিস্তল! এই পিস্তলের সংবাদ কেউ জানে না—কাজেই "নিরীহ যাত্রীরা" যদি আগে থেকেই গুপ্তস্থানে সংরক্ষিত পিস্তলের বার্তা ঘোষণা না করে, তবে ভাবনা কি? কিন্তু কেবল কথার জবাব দিয়েই পুলিসকে সন্তুষ্ট করলে হবে না, চেহারা ও হাবভাব দেখেও তারা যাতে নিঃসন্দেহ হয় তার জন্য মুখের ভাবও সহজ সরল রাখা চাই। বেশভূষা কথাবার্তা কোন কাজেই আসবে না, যদি নাকি নিরীহ যাত্রীর অভিনয় ও সরলতার ভান নিখুঁতভাবে চোখ-মুখের অভিব্যক্তিতে ফুটে না ওঠে। পুলিস বা মিলিটারীকে বিভ্রান্ত করার ব্যাপারে সাফল্য লাভের জন্য আমরা কতটুকু প্রস্তুত ছিলাম তা পরীক্ষা সাপেক্ষ। তবে, Subjective চিন্তা করে সেইরূপ পরিস্থিতিতে পুলিসকে কি ভাবে ধোঁকা দেওয়া সম্ভব সেই সম্বন্ধে নিজেরই একটি বাস্তব ধারণা ছিল—এই যা। একবার যদি আমরা এই ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করি তাহলে এই বিষয়ে নিজেদের অনেকখানি শিক্ষিতও করে নিতে পারি। পুলিসের জেরায় পড়বার বাস্তব অবস্থার অনুভূতিই সেই সময় আমাদের এইভাবে প্রস্তুত হতে আরও বেশি সাহায্য করেছিল।

ভাটিয়ারা রেল-স্টেশনের উদ্দেশ্যে ট্রাঙ্ক-রোড দিয়ে চলেছি। প্রায় আট মাইল পথ হাঁটতে হবে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। এই ট্রাঙ্ক-রোডটি চাঁদপুর পর্যন্ত প্রায় ৯০ মাইল চলে গেছে। পথটির বেশির ভাগই কাঁচা, মাঝে মাঝে অনেকটা আবার বালির ওপর দিয়ে গেছে। যুব-বিদ্রোহের চারদিন পরে, ২২শে তারিখে, এই ট্রাঙ্ক-রোডটি যে মিলিটারী ও পুলিসের পেট্রলপার্টি পাহারা দিচ্ছে, তা সহজেই ধরে নেওয়া যায়। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই বুঝি পুলিসের পেট্রলপার্টির সম্মুখীন হব। একটু অন্ধকার হতে না হতেই হারিকেনটি জ্বালিয়ে নিলাম। আলো হাতে তো আর চোর ডাকাত পথ চলে না! তবু কি নির্ভয়ে চলতে পারছি? কোথা হতে অজানা বিপদ এসে জুটবে কে জানে? যাই হোক, অজানা বিপদ দেখা দিল না—জানা সঙ্কটই আত্মপ্রকাশ করলো। প্রায় দু'শ গজ দূরে একটি বাস দাঁড়ানো দেখা গেল। মনে হ'ল তাতে খাকী পোশাকে পুলিস বা মিলিটারী আছে। যদি নেহাতই সামনে পড়তে হয় তাহলে পুলিসের চাইতে মিলিটারীর উপস্থিতিই অধিক কাম্য। কারণ, পুলিস-পার্টি যদি হয় তবে তাদের মধ্যে কেউ হয়ত গণেশ

বা আমাকে চিনে ফেলতে পারে। মিলিটারীর কাছে অবশ্য সেই ভয় নেহ। যাহ হোক্, অত দূর থেকে অন্ধকারে পুলিস কি মিলিটারী কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। প্রতি পদক্ষেপেই তাদের দিকে এগিয়ে চলেছি—ব্যবধান ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরীক্ষা স্থরু হবে। এইরূপ অবস্থার কথা আগে থেকেই খুব ভাল করে জানা ছিল। তবু কি জানি কেন, আমাদের গতি মন্থর হয়ে গেল। পেছন ঘুরে পালানো বা হাঁটতে আরম্ভ করা যে মূর্খতা, তা বুঝেছিলাম—তাতে প্রহরারত সৈনিকেরা সন্দেহ কববেই। তাই গতি মন্থর হলেও সামনে চলা ছাড়া উপায় ছিল না। পথ ও সময যতই সংক্ষিপ্ত হতে লাগলো ততই ভেতরে ভেতরে একটা কম্পন অনুভূত হচ্ছিল। এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে আরও একটু নিরীহ সরল পথিকেব ভান করবাব চেষ্টা কবলাম। আনন্দকে বললাম জোরে জোরে গান ধরতে। চট্টগ্রামেব intonation-এ সে কীর্তন স্থরু করলো—"কৃষ্ণ কালো, তমাল কালো, তাইতো তমাল ভালবাসি· ····।"

ট্রাঙ্ক-রোড বলতে ধরে নেবেন না যে G. T. Road বা ব্যারাকপুব ট্রাঙ্ক-রোড —গাড়ি, লরি, বাস বা লোকজন সব সময় ছুটোছুটি করছে। চাঁদপুর পযন্ত ট্রাঙ্ক-রোডটি প্রায় নির্জন বললেই চলে। দিনের বেলাতেও এই রাস্তায় লোকজন, গাড়ি ইত্যাদি খুব কমই দেখা যায়। সন্ধ্যের পব থেকেই রাস্তাটি একেবারে নিস্তব্ধ ও নিজন। আনন্দের গান শোনবাব জন্য রাস্তায় লোক ছিল না। গান শুনছিলাম আমরা ও সেই পুলিস-পার্টি। আমরা ওদের খুব কাছাকাছি এসে পড়লাম। বাইরেব ভাবে মনে হচ্ছে, সেখানে যে পুলিস বা মিলিটারীর বাস দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে যেন আমাদের ভ্রূক্ষেপই নেই। আমবা যে অতি নিরীহ লোক—সাধারণ মানুষের পুলিস ও মিলিটারী সম্বন্ধে কৌতূহল বা আতঙ্ক থাকবে কেন? তাদের উপস্থিতিতে আমাদের কোন ভাবান্তর হতেই পারে না—আমরা আপন মনে বেশ সহজভাবে চলেছি। তাদের প্রায় বিপরীত দিকে একটু দাঁড়িযে, হারিকেনটি উঁচু করে গণেশের মুখের সামনে ধরলাম। সে হারিকেনের পলতেব আলোয় টুক্ করে একটা বিড়ি ধবিয়ে নিল। তারপর আমার বিড়িটা আমি গণেশের বিড়ির আগুনে জ্বালালাম। এই অভিনয়টুকু স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমরা করলাম, আগে থেকে কোন প্ল্যান ছিল না।

পোশাক ও ভাবভঙ্গী হয়ত খুব উপযোগী হয়েছিল বা ঘটি, ছাতা ও হারিকেন সাধারণ যাত্রীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল এবং আনন্দের গান অথবা বিড়িতে আগুন ধরানোও অতি নিখুঁতভাবে অভিনীত হয়েছিল; কারণ, এই সবকিছু মিলিয়েই "নিরীহ যাত্রী চারজন" অত্যন্ত কৃতকার্যতার সঙ্গে পুলিসের পেট্রলপার্টিকে ধোঁকা দিয়েছিল। পুলিস-পার্টি একটুও বিচলিত হ'ল না—তারা আমাদের দাঁড় করিয়ে

কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করাও প্রয়োজন মনে করলো না। আমরা পুলিসের পেট্রলপার্টির হাত হতে এইভাবে নিষ্কৃতি পেলাম—একটি ফাঁড়া কাটলো!

ভাটিয়ারী স্টেশনে রাত আটটার আগে পৌছনো দরকার। চট্টগ্রাম থেকে মেল ছাড়ে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময়। বাকি পথটায় পুলিস বা মিলিটারীর কাছে আর বাধা পাব কিনা জানি না, তবে প্রতিপদেই সে আশঙ্কা বোধ করেছি। ভেবে কিছু লাভ নেই, বাধা আসুক আর নাই আসুক, ভাটিয়ারী স্টেশনে সময় মত পৌছবার চেষ্টায় ত্রুটি থাকলে চলবে না। আমরা হাঁটতে সুরু করলাম। সৌভাগ্য আমাদের, পথে পুলিস-পার্টির সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয় নি। রাত আটটার কিছু আগেই ভাটিয়ারী স্টেশনে পৌছলাম।

মাখনকে টিকিট কাটতে পাঠিয়ে আমরা তিনজন প্ল্যাটফর্মে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালাম। টিকিট-কাউণ্টারে মাখন থার্ডক্লাশের চারখানা কুমিল্লার টিকিট চাইল। ভাটিয়ারী থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত টিকিট দেবার ব্যবস্থা নেই—লাক্‌সাম জংসন পর্যন্তই টিকিট পাওয়ার রীতি। কাজেই মাখন টাকা দিয়ে লাক্‌সামেরই চারটে টিকিট কিনলো। কিন্তু মনে হ'ল স্টেশন-মাস্টার সন্দেহ করেছে। যাই হোক্, সন্দেহ হয়ে থাকলেও সে আর কি করতে পারে? আমাদের যখন যেতেই হবে, তখন এই নিয়ে ভেবে কি লাভ? ট্রেন এলে আমরা একটি থার্ডক্লাশ কামরায় উঠে পড়লাম।

কম্পার্টমেন্টের ভেতর দিকে ট্রেন-কামরার দেওয়াল ঘেঁষে একেবারে শেষপ্রান্তে জায়গা করে নিলাম। ট্রেন প্রায় খালি ছিল বললেই চলে। দরজার কাছে বসা ঠিক নয় বলেই মনে হ'ল; কারণ, হঠাৎ আক্রান্ত হবার আগে টের পাওয়া যাবে না। দরজা থেকে দূরে থাকলে হঠাৎ পুলিসের আবির্ভাব হলেও কিছুটা আগে জানা যাবে এবং সেইমত প্রস্তুত হতে একটু সময় পাবো।

আমরা মোটামুটি সজাগ ছিলাম। তবে ভাবগতিক দেখে মনে হ'লনা তখনও পুলিস রেলপথে তাদের তৎপরতা সুরু করেছে। স্বভাবতই আমাদের মধ্যে একটু গাফিলতি ও উপেক্ষার ভাব এসেছিল। আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। অবশ্য ঘুম খুব গাঢ় হওয়া সম্ভব ছিল না। মাঝে মাঝে স্টেশনে ট্রেন থামার সময় ঘুম ভাঙছে—চা-বিড়ি-পান বিক্রির ডাক কানে আসছে। হঠাৎ মনে হ'ল গাড়ি একটা স্টেশনে থামলো। শুনলাম—"হেনী, হেনী" অর্থাৎ ফেণী স্টেশনে গাড়ি এসে পৌছেছে। ফেণী চট্টগ্রাম মেইন-স্টেশন থেকে প্রায় ষাট মাইল। এখন রাত প্রায় দুটো।

ট্রেন থামার মিনিটখানেকের মধ্যেই দেখি একদল পুলিস আমাদের কামরায় উঠছে। তাদের মধ্যে একজন সাব-ইন্‌স্পেক্টার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সব যাত্রীদের জিজ্ঞেস

করছে—“ভাটিয়ারী স্টেশন থেকে চারজন কারা লাক্‌সাম যাচ্ছেন ?” কোন কোন যাত্রীর টিকিট চেয়ে নিয়ে দেখছে এবং ক্রমাগতই ঐরূপ প্রশ্ন করে চলেছে। ভাটিয়ারী থেকে লাক্‌সামের চারজন যাত্রীকেই যে তাদের বিশেষ প্রয়োজন, তা বোঝা গেল। পুলিসের দলটিতে বারোজনের কম ছিল না, কিছু বেশিও হতে পারে। দু'জন অফিসারও ছিল এই দলে। পুলিস দেখে মুহূর্তে আমাদের ঘুম কোথায় চলে গেল ! ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম বটে, কিন্তু এক-আধটু নড়ে-চড়ে প্রত্যেকে নিজের রিভলভার দু'টি কোমরে ঠিক করে নিলাম, একটানে যেন বার করতে পারি। বুকের ভেতর তখন ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। ভাবতে লাগলাম, পুলিসকে কোন সুযোগ না দিয়ে আগে থেকেই গুলী চালাব নাকি ফাঁকি দিতে পারি কিনা দেখবো। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগেই পুলিস আমাদের একেবারে কাছে এসে উপস্থিত। তারা আমাদের ডাকতে লাগলো। সেই ডাকেই যেন সবেমাত্র ঘুম ভেঙেছে এমনভাবে গা-মোড়া দিয়ে, চোখ কচলে, হাই তুলে, ঘুমের ঘোরেই তাদের প্রশ্ন করলাম—“হ্যাঁ, কি চাই আপনাদের ?” তারাও পাল্টা প্রশ্ন করে জানতে চাইল—ভাটিয়ারী থেকেই আমরা আসছি কিনা—লাক্‌সাম যাচ্ছি কিনা—টিকিট চারটে কোথায়—ইত্যাদি। টিকিটগুলি তাদের দিলাম। প্রশ্নের উত্তরে জানালাম আমরা চারজনেই লাক্‌সাম যাত্রী এবং ভাটিয়ারী স্টেশন থেকেই আসছি।

প্রথম পর্বটি এইভাবে শেষ করে পুলিস-পার্টি কাজের দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু করলো। জেরা চলতে লাগলো—নাম-ধাম, কি করি, কোথায় যাচ্ছি ও কেন যাচ্ছি, আমাদের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক কি···ইত্যাদি, ইত্যাদি। আগে থেকেই আমাদের এই সব রিহার্সেল দেওয়া ছিল। কাজেই সব জেরারই যথাযত উত্তর দিলাম। তবু পুলিসের সন্দেহ যায় না—তারা ভাটিয়ারী স্টেশন-মাস্টারের টেলিগ্রাম পেয়েই এসেছে। তারা আমাদের গাড়ী থেকে নেমে তাদের সঙ্গে যেতে বললো। অবস্থা বড়ই বেগতিক! গণেশ খুব কাকুতি-মিনতি করে বলল—“দারোগাবাবু, আমরা পুলিসকে বড় ভয় করি। আমাদের দয়া করে ছেড়ে দিন। আপনাদের পায়ে পড়ি—ছেড়ে দিন।” গণেশ টুক্ করে প্রণাম করে দারোগাবাবুর মন ভোলাতে চেষ্টা করলো। কত বিনয়-নম্র ভাব, গদগদ কণ্ঠে কত মিনতি—“আমাদের ছেড়ে দিন !” ইন্‌স্পেক্টারবাবুকে দেখে মনে হচ্ছিল আমাদের প্রতি তিনি যেন কিছুটা দয়াপরবশ হয়েছেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে আমরা আরও অনুনয় করলাম—“স্যার, আপনি হুকুম দিলেই হয়। বিশ্বাস করুন স্যার, আমরা কোন কিছুতেই অপরাধী নই। নির্দোষীদের কেন স্যার অযথা হয়রানি করবেন ? আপনাদের পায়ে পড়ি—আমাদের যেতে দিন।”

ইন্‌স্পেক্টারবাবু সাব-ইন্‌স্পেক্টারের দিকে তাকালেন। এই অবস্থায় আমাদের

নিয়ে কি করবেন এটাই তাঁর প্রশ্ন। সাব-ইন্‌স্পেক্টার মহোদয় হাবিলদারের দিকে একবার তাকিয়েই আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। অবস্থাটা এমন দাঁড়ালো যে, কেউই দায়িত্ব নিতে চাইছেন না। বেড়ালের গলায় কে ঘণ্টা বাঁধবে? যিনি আমাদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য বলবেন এবং যে ইন্‌স্পেক্টার অনুরূপ আদেশ দেবেন, তাঁকেই ওপরওয়ালার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাঁরা সকলেই একমত হলে হয়ত বা আমরা নিষ্কৃতি পেতাম; কিন্তু সেইরূপ Democratic decision নেওয়ার উপায় ছিল না—তাঁরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

আমাদের কাকুতি-মিনতিতে কোন কাজ হ'ল না। ইন্‌স্পেক্টার মহাশয় বললেন —"দেখুন, আপনাদের ছেড়ে দিতে পারলে আমরা খুশিই হতাম। কিন্তু আমরা চাকরি করি, আমাদের অনেক সময় অপ্রিয় কর্তব্য করতেই হয়। আমরা টেলিগ্রামে ভাটিয়ারী স্টেশন থেকে আপনাদের সম্বন্ধে নির্দেশ পেয়েছি। আপনাদের কোন ভয় নেই—শুধুমাত্র জবানবন্দী নিয়েই আমরা আপনাদের ছেড়ে দেব।"

সত্যি, ভাটিয়ারী স্টেশন-মাস্টার অশ্বিনী ঘোষ রেল-কর্মচারী হয়েও পুলিসের কাজ করেছিল। আমাদের মামলার রায়ে অশ্বিনী ঘোষের কীর্তি লেখা আছে—

"At 8 p.m. Aswini Ghosh, Station Master, Bhatiari, found a person asking for four tickets for Comilla suspiciously. The station master took down the numbers of the tickets and at the time the train was leaving he showed them to the guard Ferrera and wired to Sitakundu, Feni, Comilla and Laksam."

—ভাটিয়ারী স্টেশন-মাস্টার অশ্বিনী ঘোষ, রাত আটটার সময় একজনকে দেখে সন্দেহ-জনকভাবে চারখানা কুমিল্লার টিকিট চাইছে! এতে তার সন্দেহ হওয়ায় সে টিকিটগুলির নম্বর টুকে রাখে। তারপর ট্রেন ছাড়বার সময় গার্ড ফেরেরাকে গোপনে ঐ চারজনকে দেখিয়ে দিল এবং সীতাকুণ্ড, ফেণী, কুমিল্লা ও লাকসামে টেলিগ্রামে খবর পাঠালো।

কতখানি লজ্জার কথা—আমরা এই একনিষ্ঠ বৃটিশভক্ত স্টেশন-মাস্টারের এতখানি বিচক্ষণতা ও কর্মতৎপরতার কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারি নি! অশ্বিনী ঘোষ আমাদের সন্দেহ করেছে, টিকিটের নম্বর টুকে রেখেছে, গার্ড ফেরেরাকে গোপনে আমাদের চারজনকে দেখিয়ে দিয়েছে, বিভিন্ন স্টেশনে আমাদের ধরবার জন্য টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে—কি করে সে আমাদের চোখের আড়ালে এতখানি ফাঁদ পাততে সফল হ'ল? এই স্টেশন-মাস্টার শেষপর্যন্ত রেলের চাকরিতেই বহাল ছিল নাকি বাংলার ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ সাদরে তাকে বরণ করে নিয়েছিল, তা আমার জানা নেই।

আজ যতই অশ্বিনী ঘোষের ইংরেজপ্রীতির প্রতি কটাক্ষ করি না কেন, তাতে আমাদের অক্ষমতা ঢাকা পড়বে না। যদি আমরা আরো সতর্ক হতাম, উদাসীন না থাকতাম, তবে কি এতখানি বিপদের সম্মুখীন হতাম? উদাসীনতা, গাফিলতি, অসতর্কতা ও অবহেলা বিপ্লবী ষড়যন্ত্রমূলক কাজের প্রধান শত্রু। ষড়যন্ত্রমূলক কাজের প্রতি পদক্ষেপে এই শত্রুকে যদি বিপ্লবীরা বিনাশ করতে না পারে তবে তাদের কাজ নিষ্ফলতার মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমাদেরও সেই দুর্দশায় পড়তে হ'ল। ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে—হিমাংশুকে ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে, জালালাবাদে চাষীদেব ছেড়ে দিয়ে যে ভুল হয়েছিল, জীবন দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে, গাফিলতি ও অবহেলার জন্য কঠোর সাজা চন্দননগরেও পেতে হয়েছে। আমাদের অসতর্কতা ও উদাসীনতার জন্য আমরাও নিষ্কৃতি পেলাম না। এ সব পরে জানাবো।

আমাদের ত্রুটি অস্বীকার করা যায় না – তবু অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে এটুকু বলতে পারি, এই ঘটনাটির আর একটি দিকের তাৎপর্য খুব সামান্য হলেও, একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। ভাটিয়ারী স্টেশন-মাস্টার, অশ্বিনী ঘোষ, আমাদের চারজনের গতি-বিধি যদিও সন্দেহের চোখে দেখেছিল, তবু একেবারে সাধারণ যাত্রীর বেশভূষায় পুরোপুরি বিপ্লবী বলে হয়ত আমাদের প্রতি তার সন্দেহের উদ্রেক হয় নি। আমরা বিপ্লবী বলেই যদি অশ্বিনী ঘোষের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হ'ত, তবে তার টেলিগ্রামের ভাষা ও মর্ম আরো সুস্পষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক ছিল এবং সেই সূত্রে পুলিস আমাদের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়তো—ফেণীতে আমাদের সঙ্গে কথা বলে অতক্ষণ সময় নষ্ট করতো না। এর একমাত্র কারণ, আমরা অসতর্ক থাকলেও আমাদের ছদ্মবেশ এবং অভিনয় প্রায় নিখুঁত হয়েছিল।

ভাবতে খুবই আশ্চয লাগে, ভাটিয়ারী স্টেশন থেকে যদি সচরাচর কুমিল্লার টিকিট বিক্রির পদ্ধতি না থাকে এবং তা সত্ত্বেও ভুলে যদি আমরা কুমিল্লার টিকিট চেয়েও থাকি, তবু তাতে স্টেশন-মাস্টারের ঐরূপ সন্দেহ হওয়ার বিশেষ কি কারণ থাকতে পারে? আমরা তখনও জানি না, জালালাবাদ পাহাড়ে বিকেল চারটা-পাঁচটা থেকে রাত আটটা-ন'টা পযন্ত বিপ্লবীদের সঙ্গে শত্রুবাহিনীর এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়ে গেছে।

ট্রাইব্যুনালের জজ আমাদের বিরুদ্ধে রায় দিতে গিয়ে লিখেছেন—

"On the night of the 22nd April the clash at Jalalabad was not the only incident but on the same night at the station of Feni there took place another dangerous event."

—২২শে এপ্রিল জালালাবাদের সংঘর্ষই একমাত্র ঘটনা নয়, সেই রাত্রেই ফেণী রেল-স্টেশনেও আবার একটি ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে।

জালালাবাদ যুদ্ধের সংবাদ সব স্টেশনে দেওয়া হয়েছিল এবং রেল-কর্মচারীদের প্রতিও সজাগ থাকবার নির্দেশ ছিল। তাই বৃটিশভক্ত অতিতৎপর অশ্বিনী ঘোষ, রেলের ডিউটি অপেক্ষা বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের স্বার্থে আত্মনিয়োগ করাই পরমার্থ লাভের একমাত্র উপায় বলেই মনে করেছিলেন। তাঁর টেলিগ্রামের ভাষা সুস্পষ্ট না হওয়ায় পুলিস মরিয়া হয়ে আমাদের আক্রমণ করে নি। পুলিস যখন এলো তখন আমাদের তিন বন্ধুর প্রত্যেকের কাছেই দুটো করে রিভলভার আর আমার সঙ্গে একটি অটোমেটিক্ পিস্তল ও একটি Webly Army Revolver ছিল। এই আটটি অস্ত্রের সঙ্গে আমাদের আরও দু'টী খুব শক্তিশালী অস্ত্র ছিল—একটী "ভীত-ত্রস্ত মুখের ভাব" ও দ্বিতীয়টী, "সরলতার ভান"। এই দু'টি অস্ত্র কিছুটা সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ হয়েছিল বলেই পুলিস আমাদের ওপব ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে আমরা একটু নিঃশ্বাস ফেলবার সময ও সুযোগ পেয়েছিলাম।

বেশভূষা চাল-চলন যতই সাবারণ নিরীহ যাত্রীর মত হোক্ না কেন, বাস্তব দুর্বলতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। যতই থার্ড ক্লাশেব যাত্রী সাজি না কেন, তার সঙ্গে আনন্দ ও মাখনের ফর্সা গায়ের রং, সুন্দর মুখশ্রী, অল্প বয়স—কোনটাই পুরোপুরি খাপ খাচ্ছিল না। আবার এই দু'টি অল্প বয়সের ছেলে কি ঐ সব "দুর্ধর্ষ বিপ্লবী" দলের লোক হতে পারে? কাজেই স্টেশন-মাস্টার ও পুলিস ঠিকমত হিসেব লাগাতে পারে নি—বিপ্লবীরা তো কথা বলার আগেই মানুষকে কাটে, খুন করে, গুলী করে; এত বিনয়ী, নম্র, ভদ্র ও ভীতু যারা, তারা কি বিপ্লবী হতে পারে?

তাদের মনের benefit of doubts - সংশয়ের সুযোগ আমরা পেলাম। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হ'ল না। পুলিস-হেপাজতে আমাদের যেতেই হবে। সেখানে আমাদের জবানবন্দী না নিয়ে ছাড়বে না। দারোগাবাবু বললেন—"চলুন, দেরি করবেন না। আমরা আপনাদের জবানবন্দী নিয়েই ছেড়ে দেব। আপনারা পরের ট্রেনেই চলে যেতে পারাবন—আসুন, আসুন।"

যদি সত্যি সত্যি আমাদের জবানবন্দী নিয়েই ছেড়ে দেয়, তবে কোন আপত্তিই নেই। কিন্তু পুলিস-custody-তে এক বার গেলে আমাদের শরীর তল্লাসী হবে-না—এ কথা ভাবতে পারছিলাম না। যা হোক্ সে তো পরের কথা, আপাততঃ তারা যখন বলছে, ট্রেন থেকে নামতেই হবে। আমরা পুলিসবেষ্টিত হয়ে ট্রেনের কামরা থেকে নামলাম। ট্রেনটি স্টেশন-বিল্ডিং ছাড়িয়ে প্ল্যাটফর্মের সামনের দিকে ছিল। সামনের দিকে পশ্চিমে রেল-লাইন। লাইনের বাঁ দিকে, অর্থাৎ দক্ষিণে ফেণী সাব-ডিভিশন শহর ও লোকালয়। লাইনের ডান দিকে মাঠ, ধানক্ষেত ও জংলা জায়গা এবং দূরে উত্তরে ফেণীর পাহাড় দেখতে পাওয়া যায়। যখন ট্রেন

থেকে নামছি তখন থেকেই মনের মধ্যে তুমুল আলোড়ন চলছিল— কিভাবে পালাব, কখন সেই সুযোগ নেব, custody-তে যাওয়ার আগে চেষ্টা করবো, নাকি শেষপর্যন্ত দেখবো—যদি জবানবন্দী নিয়েই ছেড়ে দেয়? অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব! পুলিস তল্লাসী না করে ছাড়বেনা জেনেও 'শেষপর্যন্ত দেখাব মনোভাব' আর কিছু নয়– যদি সহজে বাঁচা যায়!

ট্রেনের কামরা থেকে নেমে অবধি বুকের ভেতরটা ধড়াস্ ধড়াস্ করছিল। সুযোগ-সুবিধে খুঁজছিলাম কোন্ সময়ে আক্রমণ করবো? শেষ পর্যন্ত custody-তে যে যাবই, তেমন সিদ্ধান্ত তখনও নিই নি। স্থির করেছিলাম পুলিসবেষ্টনী ভেদ করতে প্রথম সুযোগেই আক্রমণ চালাবো, তবে মনের আড়ালে কি ছিলনা—'যদি statement নিয়েই ছেড়ে দেয়?' এত সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব কি তখনই বিচার করে দেখতে সময় পেয়েছি? তবে মনে আছে, ট্রেন হতে নামার পর থেকে প্রতি মুহূর্তেই আমার আশঙ্কা ছিল, যদি আমি পিস্তল ও রিভলভার বার করবার আগেই তারা আমাকে বন্দী করে! জামার নিচে খুব চেপে বেল্ট দিয়ে অস্ত্র দু'টি বাঁধা আছে, বাইরে থেকে যাতে ওদের অস্তিত্ব কোনমতেই বোঝা না যায়। পুলিসের এতগুলি তীক্ষ্ণ সন্ধানী চোখ আমাদের ওপর– তারা সব সময় চোখ বুলিয়ে দেখছিল জামার নিচে আমরা মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রেখেছি কিনা। আমাদের হাত যদি একবারও জামার নিচে যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটুকুও নড়ে ওঠে, তখনি তারা যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে সেই জন্য অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিল। তাদের এই সতর্ক দৃষ্টির অগোচরে কি করে তারা আক্রমণ করবার আগেই, আমার পিস্তল ও রিভলভারটি একটানে বার করে হাতে নেব, সে কথাই ভাবছিলাম। এক সেকেণ্ডের শত ভগ্নাংশের এক অংশেও অবস্থার অনুকূলে বা প্রতিকূলে পরিবর্তন ঘটতে পারে। তাই আমার ভাবনা, পুলিস বোঝবার আগেই আমি কি করে অস্ত্র হাতে নেব।

গাড়ি থেকে নেমেই আমি খুব দুর্বল ও অসুস্থতার ভান করতে লাগলাম। বুড়োদের মত একটুখানি ঝুঁকে পড়েছি, মাঝে মাঝে কাঁপছি, আমার দু'টি দুর্বল বাহু কাঁধ থেকে যেন একেবারে আলগাভাবে নিচে ঝুলে পড়েছে। এই অবস্থায় পুলিস-বেষ্টনীর মধ্যে ধীরে ধীরে এগোচ্ছি আর কেবল সুযোগ খুঁজছি কোমরে বাঁধা অস্ত্র দু'টিকে একটু আলগা করে রাখতে, টেনে বার করবার সময় যেন জামায় আটকে না যায়। কাশির সঙ্গে এক-আধটু অঙ্গভঙ্গী ও হাত দু'টি খুব সামান্য ব্যবহার করে পিস্তল ও রিভলভারটিকে একটু আলগা করে নিলাম। এত কিছু করেও পুলিসের আক্রমণের আগেই আমি যে অস্ত্রের সদ্ব্যবহার করতে পারবো, তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না।

আমরা পুলিশবেষ্টিত হয়ে ট্রেনটিকে বাঁদিকে রেখে স্টেশন-বিল্ডিং-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। লম্বা ট্রেনটি যেখানে শেষ হ'ল, তারও বিশ-পঁচিশ গজ পূবে গেলে স্টেশন-বিল্ডিং-এ পৌছনো যায়। মনে হ'ল স্টেশন-বিল্ডিং-এরই কোন ঘরে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। আমরা চট্টগ্রাম-কলকাতা মেলটির শেষপ্রান্ত অতিক্রম করলে দেখি, স্টেশনের ঠিক বিপরীত দিকে একটা মেইন-লাইন ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় লাইনের ওপর আর একটি ট্রেন দাঁড়ানো আছে—ইঞ্জিনের মুখ পূব দিকে—চট্টগ্রামের দিকে। এই ট্রেনটি গুর্খা সৈন্যে ভর্তি—একটি কম্পানি, অর্থাৎ সৈন্যসংখ্যা একশ' চল্লিশ বা দেড়শ' হবে। এতক্ষণ যাওবা কিছু আশা ছিল, তাও নির্মূল হতে চলেছে, এখন কি করি?

এই সৈন্যদল অবশ্য চট্টগ্রামে যাচ্ছিল না। আগরতলা মহারাজার সৈন্য—ইংরেজ সবকারের অনুরোধে বিলোনিয়াতে আমাদের প্রধান বাহিনীর বিরুদ্ধে অবরোধ ব্যূহ রচনার জন্যই যাচ্ছিল। এই তথ্য আমরা পরে সংগ্রহ করি। জাজ্‌মেণ্টে এইটুকুই মাত্র লেখা আছে—

"About 11-15 p.m. the Station Master's telegraphic message was received by S. I. Jatindra Mohan Roy officer-in-charge of Feni P. S. who had gone to the Feni Railway Station along with the Inspector Fazlul Baset, to receive the Tripura State Troops who were on their way from Agartala to Belonia."—ফেণী থানার ইন-চার্জ, সাব-ইন্‌স্পেক্টার যতীন্দ্রমোহন রায়, রাত ১১-১৫ মিনিটের সময় স্টেশন-মাস্টারের কাছ থেকে একটি টেলিগ্রাম পেয়ে ইন্‌স্পেক্টার ফজলুল বাসত্‌কে সঙ্গে নিয়ে আগরতলা থেকে বিলোনিয়া যাওয়ার পথে ত্রিপুরা রাজ্যের সৈন্যদের সাথে দেখা করতে যান।

এখানে স্টেশন-মাস্টারের যে টেলিগ্রামের কথা বলা হয়েছে, সেটি কিন্তু ভাটিয়ারী স্টেশন-মাস্টারের তারবার্তা নয়। সৈন্যদের শুভ সম্ভাষণ জানাতে এই টেলিগ্রাম পাঠান ফেণীর স্টেশন-মাস্টার। স্টেশনে এসে ইন্‌স্পেক্টার ও সাব-ইন্‌স্পেক্টার ভাটিয়ারীর খবর পান। এই সম্বন্ধে আর বেশি কিছু উদ্ধৃত করলাম না। গুর্খা সৈন্য কাদের, কি উদ্দেশ্যে বা কোথায় যাচ্ছে—তখন আমাদের এই সব সংবাদের প্রয়োজন ছিল না। আমরা গুর্খা সৈন্য ভর্তি এই ট্রেন দেখেই প্রমাদ গুণেছি। উত্তরে মাঠের মধ্যে দিয়ে পালাবার পথ অবরোধ করে এই ট্রেনটি দাঁড়িয়ে আছে। স্টেশন-বিল্ডিং ও কাঁটাতারের বেড়াতে দক্ষিণে শহরে যাবার পথও রুদ্ধ। দক্ষিণে শুধুমাত্র যাত্রীদের বেরোবার পথটিই খোলা ছিল। অবশ্য লাইন ধরে পূর্বদিকে পালাবার পথ খোলা, কিন্তু সেদিকে দৌড়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়তে না পারলে নির্দিষ্ট গতিপথ লক্ষ্য করে পেছন থেকে গুলী ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ করা শত্রুর পক্ষে সহজ।

Manoeuvre করার জন্য বাইরের অবস্থান খুব সংকীর্ণ। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থায় আসন্ন ভবিষ্যতের কথা ভাবা যাচ্ছিল না। তবু ক্ষীণ আশা—যদি জবানবন্দী নিয়েই ছেড়ে দেয়!

স্টেশনের একটি ঘরে আমাদের নিয়ে এলো। ঘরের পুলিসবেষ্টনীর বর্ণনা সরকারী তথ্য থেকেই দিচ্ছি—

"They were marched along the platform and taken inside the Asst. Station Master's room. The S. I. and the Inspector entered the room with them along with the Havildar, and several constables. In the room also were the Asst. Station Master, Pulin Behari Majumdar, a ticket collector, Prafulla Pathak, another ticket collector, Abdul Hakim and a signaller Lal Mia."—সহকারী স্টেশন-মাস্টারের ঘরে—প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে তাদের হাঁটিয়ে আনা হ'ল। এস, আই, ও ইন্‌স্পেক্টার এবং তাদের সঙ্গে হাবিলদার ও কয়েকজন কন্‌স্টেবলও ঘরে প্রবেশ করলো। সেখানে সহকারী স্টেশন-মাস্টার পুলিনবিহারী মজুমদার, একজন টিকিট কালেক্টর প্রফুল্ল পাঠক এবং আর একজন টিকেট কালেক্টর আবদুল হাকিম ও সিগ্‌নেলার লাল মিঞা উপস্থিত ছিল।

ঘরটিতে একটিমাত্র দরজা, কিন্তু খুব প্রশস্ত। একই দেওয়ালে, দরজার পাশে একটা খোলা জানালা। এই মস্ত জানালা জুড়ে ঘরের মধ্যে একটি খুব বড় টেবিল পাতা রয়েছে। টেবিলের চার-পাঁচ হাত দক্ষিণে বড় বড় দুটি আলমারী। আলমারী ও টেবিলের মাঝখানে দরজা পর্যন্ত যে স্থান, সেখানে আমরা চারজন সেপাইবেষ্টিত হয়ে দাঁড়িয়েছি। ইন্‌স্পেক্টার সাহেব একটি চেয়ারে বসেছেন। সাব-ইন্‌স্পেক্টার মহাশয় টেবিলের ওপর পা ঝুলিয়ে বসলেন।

আমরা পিঞ্জরাবদ্ধ—ছোট্ট ঘরে পুলিসবেষ্টিত হয়ে রয়েছি। সামনে ট্রেন বোঝাই গুর্খা সেপাই। কাঁটাতারে প্ল্যাটফর্মটি ঘেরা। আর বেশি সময় নেই—শেষ পর্ব এখনই সুরু হবে। চূড়ান্ত পরিস্থিতির জন্য আমরা প্রতীক্ষা করছি।

মুহূর্তগুলি যে কিভাবে কাটছিল—কতখানি অনিশ্চয়তা, ভয় ও আসন্ন সংঘর্ষের চিন্তা প্রতি মুহূর্তে আমাদের বিচলিত করছিল তা ভাষায় বা ভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব। এখন মরবার ভয়ের চাইতেও অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে বন্দী হওয়ার আশঙ্কা বহু গুণে বেশি। আমরা চারজন আটটি গুলীভরা রিভলভার সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও যদি বিনা সংঘর্ষে বন্দী হই, তবে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের এই কলঙ্ক স্বাধীনতা-ইতিহাসের পাতায় চিহ্নিত হয়ে থাকবে এবং ভারতের বিপ্লবীসমাজের কাছে আমাদের মুখ দেখাবার আর উপায় থাকবে না। এর চাইতে মৃত্যুও সহস্রগুণে শ্রেয়। কিন্তু এমনই

পারিস্থাত যে, মরার ইচ্ছায় ইচ্ছে থাকলেও মরতে হয়ত পারবো না—তার আগেই ধরা পড়ে যাবে। ছোট্ট একটি ঘরে প্রায় বারোজন কন্‌স্টেবল, ছোট ও বড় দারোগা, রেলের সহকারী স্টেশন-মাস্টার, দু'জন টিকিট কালেক্টার ও একজন সিগ্‌নেলার আমাদের ঘিরে রয়েছে। তারা আমাদের খুব কাছে, প্রায় গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়িয়েছিল। সামনে গুর্খা সৈন্য ভর্তি ট্রেন। ঘরেব মধ্যে manoevre করবার একটুও জায়গা নেই। প্রত্যেকটি সেপাইয়ের হাতে বেটন ও কোমরে বেয়নেট। একটু সন্দেহ হলেই হয়ত বেটনের বাড়ি দেবে না হয় জাপ্‌টে ধরবে। এই অবস্থায় কি করে পিস্তল বার করে গুলী করবো? অত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে যদি দু'একটি ফায়ার করি, তবে বেটনের আঘাতে যে অজ্ঞান হয়ে পড়বো না বা বন্দী হবো না, তার নিশ্চয়তা কোথায়?

আব সময় নেই। দারোগাবাবু গণেশকে বিছানাটা খুলে দেখাতে বললেন। বিছানা খোলা হ'ল। গরীবের সাধাবণ বিছানায় সন্দেহজনক জিনিস কি আর থাকতে পারে! কোন আপত্তিকর জিনিস পাওয়া গেল না। গণেশ দারোগাবাবুকে অনুবোধ জানালো যে, শাবীরিক প্রয়োজনে সে একটু বাইবে যেতে চায়। সহৃদয় দারোগা হাবিলদারকে নির্দেশ দিলেন গণেশকে বাইরে নিয়ে যেতে। হাবিলদার ও দু'জন সেপাই সঙ্গে করে গণেশ বাইবে গেল। এখন ঘরের ভেতর তাদের সামনে আমরা তিনজন। কই বাবা, জবানবন্দী নিচ্ছে না কেন? এতক্ষণ এসেছি Statement নেবার নাম গন্ধও নেই। বিছানা সার্চ কবা হয়েছে, এখন Statement নিলেই তো বেঁচে যাই! কিন্তু Man proposes, God disposes—আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল না।

খোলাখুলিভাবে সার্চ করবাব প্রস্তাবটি করতে দারোগাবাবুর যেন একটু ইতস্তত ভাব—একটু সঙ্কোচ ও ভদ্রতা তাঁকে যেন বাধা দিচ্ছিল। কিন্তু ডিউটি যতই কঠিন বা অপ্রিয় হোক্ না কেন, তা পালন করতেই হবে, সুতরাং শেষপর্যন্ত দারোগাবাবু চক্ষুলজ্জা ছেড়ে বললেন—"দেখুন, তল্লাসী করা আমাদের নিয়ম। শিষ্টতা বিরুদ্ধ হলেও কর্তব্য আমাদের করতেই হবে। ক্ষমা করবেন—আপনাবা এক-একজন আসুন, আমরা তল্লাসী করবো।" প্রথমে মাখনকে ডাকা হ'ল। মাখন কি করবে বুঝতে পারছে না। সে ছিল দরজার পাশে, তারপর আনন্দ এবং সর্বশেষে ঘরের ভেতরে প্রায় আলমারী ঘেঁষে ছিলাম আমি। আমার সামনে ও পেছনে দু'জন কনস্টেবল। মাখন একটু এগিয়ে টেবিলের কাছে দাঁড়ালো। একজন সেপাই ডিউটি করতে এলো, অর্থাৎ শরীর সার্চ করবে। মাখনের গায়ে হাত দিতে যাবে, এই সময় উপস্থিত পুলিসদের মনে হ'ল হয়ত বা কোন লুকোনো অস্ত্র আবিষ্কৃত হবে—সবার চোখ সেই মুহূর্তে মাখনের জামার নিচে কি আছে দেখতে উৎসুক! ম্যাজিসিয়ানরা

ঠিক এইরূপ সাইকোলজিক্যাল মুহূর্ত বেছে দর্শকবৃন্দকে বোকা বানায়। অনেক আগেই আমার ম্যাজিক দেখাবার কথা লিখেছি—চট্টগ্রামের প্রধান Public Stage-এও আমি ম্যাজিক দেখিয়েছি এবং দর্শকবৃন্দের অন্যমনস্কতার সাইকোলজিক্যাল মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে তাঁদের হতবুদ্ধিও করেছি। বিপ্লবী ম্যাজিসিয়ান যে সুযোগ এতক্ষণ ধরে খুঁজছিল, তা পেয়ে গেল—সব পুলিসেরই চোখ মাখনের দিকে, জামার নিচ থেকে যদি রিভলভার বার হয়!

আর হয়ত এই সুযোগ পাবোনা। নিমেষে আমার কোমর থেকে ঝট্‌কা টানে দু' হাতে পিস্তল ও রিভলভার বার করলাম। কারও কিছু বোঝবার আগেই প্রাথমিক প্রস্তুতির কাজ সেরে নিলাম—আমার দুই মুঠিতে দু'টি আগ্নেয়াস্ত্র অগ্নিবর্ষণ করতে তৈরি। পিস্তল বার করবার সঙ্গে সঙ্গেই পেছনে দাঁড়ানো সেপাইয়ের জঙ্ঘা লক্ষ্য করে গুলী করলাম, সে পড়ে গেল। আমি এক লাফে বড় টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়ালাম। বিদ্যুৎগতিতে লাফিয়ে ওঠবার সময় আর একজন সেপাইয়ের পা লক্ষ্য করে গুলী করলাম। টেবিলের ওপর থেকে গর্জন করে বললাম—"ভাগো, জান বাঁচাও!" অবশ্য আমার হুকুমের পূর্বেই "জান বাঁচাবার" জন্য যে যেখানে পারলো পালালো। এত দ্রুত ও চকিতে সমস্ত ঘটনা ঘটে গেল যে, পুলিস বা মিলিটারী কিছু বুঝতেই পারলো না। কাশিতে প্রায় বক্রাকার দেহ, শিথিল মাংসপেশী, বাঁধনহীন হাত-পা যেন চলতে পারে না—এমন একজন নিরীহ যাত্রী হঠাৎ রিভলভার বার করে অতজন পুলিসকে আক্রমণ করবে, স্প্রীং-এর মত লাফিয়ে টেবিলে উঠে গুলী চালাবে, তা বেচারা পুলিসেরা ভাববে কি করে?

এক বা দেড় সেকেণ্ডে ঘর একেবারে খালি হয়ে গেল। সবার আগে ছিল মাখন তার পেছনে আনন্দ। আমি টেবিলের ওপর থেকে দেখলাম আনন্দ দরজা দিয়ে দৌড়ে বেরোচ্ছে। আমি তাকে অনুসরণ করলাম। আমার গতি যতই দ্রুত হোক্ না কেন, সংঘর্ষের সময় আমার মাথা স্থির ছিল। তাই ঘরের দরজা অতিক্রম করবার সময় না হেঁটে এক লাফেই বাইরে এলাম। কারণ, দরজার পাশে বেটন নিয়ে যদি পুলিস থাকে তাহলে সে যেন আমাকে আঘাত করতে না পারে। বাইরে এসে আমরা বাঁ দিকে প্ল্যাটফর্মের ওপর পাঁচ-ছয় হাত দূরে দারোগাবাবুকে দেখতে পেলাম। তাঁর হাতে পিস্তল আছে কিনা বা তিনি প্রতি-আক্রমণের কোন আয়োজন করছেন কিনা, দেখবার সময় আমার ছিল না। কাল-বিলম্ব না করে, তাঁকে কোন initiative নেওয়ার সুযোগ না দিয়েই, পিস্তল ঘুরিয়ে তাঁর জঙ্ঘা লক্ষ্য করে গুলী করলাম। তিনি লুটিয়ে পড়লেন।

আমরা চারজন পরে যখন কলকাতায় একত্র হই, তখন কে কয় রাউণ্ড ফায়ার

[illegible] তার হিসেব নেওয়া হয়েছিল। আনন্দ বলেছিল সে ঘরের বাইরে এসে ওপরের দিকে একটিমাত্র ফাঁকা আওয়াজ করে। মাখন জানিয়েছিল পুলিসকে ভয় দেখাবার জন্য আলমারীর পাশে রিভলভারের মুখ মেঝের দিকে রেখে সে একটি ফায়ার করেছিল। আমার হাতে পিস্তল ও একটি রিভলভার ছিল। পিস্তলের গুলী দারোগাবাবুর পেটে লাগে। আমার প্রথম গুলী পেছনের সেপাই ও দ্বিতীয় গুলী সামনের প্রহরীকে আহত করে।

মামলার জাজ্‌মেণ্ট থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি—

"The Inspector Fazlul Baet says that after the four suspects had been taken inside the room, he sat down on a chair by the doorway and told the S. I. to search their persons. Immediately before that the eldest looking of the four said he wanted to go out to make water, so before searching him he was sent outside escorted by the Havilder and two Constables. Then the S. I. began to search the other three. He was about to go over the person of one of them when one of the other two pulled out a revolver from under his shirt and fired in the direction of the Inspector. This was followed immediately by a second shot and he jumped through the doorway and ran and hide in the first class waiting-room. When he returned after an interval, according to him, of two or three minutes—he found the sub-inspector, and the two constables Manindra Pal and Yakub Ali had been shot······The S. I. goes on to say that at the same time one of the three suspects started to rush out of the room and as he ran past him, he (the S.I.) jumped upon him whereupon the fugitive shot him in the side and he fell down on the floor unconscious and did not see what happened after that···" (Judgment of Chittagong Armoury Raid Case No. 1. Page—77).

—ইন্‌স্পেক্টার ফজলুল বাসেত্‌ তাঁর জবানবন্দীতে বলেছেন, চারজন সন্দেহজনক ব্যক্তিকে কক্ষের ভেতরে আনবার পর তিনি দরজা সংলগ্ন একটি চেয়ারে বসলেন এবং তাদের শরীর তল্লাসী করবার আদেশ দিলেন। তল্লাসী স্বরু করবার ঠিক আগের মুহূর্তে ঐ চারজনের মধ্যে যাকে সব চাইতে বয়স্ক বলে মনে হচ্ছিল, সে শারীরিক প্রয়োজনে বাইরে যেতে চাইল। সার্চ করবার আগেই তাকে হাবিলদার ও দু'জন সেপাই বাইরে নিয়ে গেল। তারপর S. I. তিনজনকে সার্চ করতে গেল।

S. I. তাদের মধ্যে একজনের গায়ে সার্চ করবার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াতে যাচ্ছে, [illegible] বাকি দু'জনের একজন, সার্টের নিচ থেকে রিভলভার বার করে প্রথমে ইন্‌স্পেক্টারকে লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি ফায়ার হয় এবং সে লাফিয়ে দরজা পেরিয়ে দৌড়ে প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামকক্ষে লুকিয়ে থাকে। (জজ সাহেব সন্দেহ প্রকাশ করে লিখেছেন) অবশ্য ইন্‌স্পেক্টারের কথা অনুযায়ী, সে নাকি দু'তিন মিনিট পরে এসে দেখে যে, S. I. এবং দু'জন কনস্টেবল—মণীন্দ্র পাল ও ইয়াকুব আলি, গুলীবিদ্ধ হয়েছে। · ·· (সাব-ইন্‌স্পেক্টারের উক্তি থেকে জজ লিখেছেন) S. I. বলে গেল তিনজনের মধ্যে যখন একজন তার পাশ দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল, তখন সে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সেই সময় আততায়ী তাকে পাশে গুলী করে। এই গুলীতে সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে—তারপর আর কি ঘটেছে সে বলতে পারে না ···।

ফেণীতে অত পুলিস, মিলিটারী ও রেলকর্মচারীদের ছত্রভঙ্গ করে তাদের বেড়া-জাল থেকে আমাদের উধাও হওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে ইন্‌স্পেক্টার ও ছোট দারোগাবাবুর খুব অখ্যাতি ও দুর্নাম হয়। তাই ইন্‌স্পেক্টার, তার পালাবার কারণটি যে যুক্তিসঙ্গত, তা' বোঝাবার জন্যই জবানবন্দীতে বলে—তাকে লক্ষ্য করেই প্রথম গুলী ছোড়া হয় এবং পরমুহূর্তেই আবার টোটা ফাটে। ছোট দারোগাবাবুও অক্ষমতা ঢাকবার জন্য সাফাই দিতে গিয়ে নিজের বীরত্বের কথা বলে—একবার একজনের ওপর লাফিয়ে পড়েছিল কিন্তু গুলীবিদ্ধ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পরবার পর আর কিছু বলতে পারে না।

এখন একটি রহস্য উদ্‌ঘাটন করি। ইন্‌স্পেক্টার ফজলুল বাসেত্, এস, আই, যতীন্দ্রমোহন রায়, মণীন্দ্র পাল ও ইয়াকুব—এরা আমাকে কেউ সনাক্ত করে নি। খাকী পোশাকধারী বৃটিশ সরকারের সেপাই আমাদের শত্রু—তারা কোন্ জাতের তা' আমাদের বিচার্য ছিল না। ইন্‌স্পেক্টার ও অন্য সেপাইরা বিশ্বাস করেছিল, আমরা তাদের কাউকে মেরে ফেলবার জন্য গুলী করি নি—বাধ্য হয়ে আহত করেছি মাত্র এবং সেখানে আমরা হিন্দু-মুসলমানে কোন পার্থক্য রাখি নি। সবচেয়ে বড় রহস্য হ'ল যতীন্দ্রমোহন রায় আমাদের সাথী হারানের (সৌরীন্দ্রমোহন দত্তচৌধুরী) মামা। হারান রেল-লাইন ধ্বংসকার্যে লিপ্ত ছিল। মামলার সময় সে যখন আমাদের সঙ্গে একই কাঠগড়ায়, তখন তার মামাও সাক্ষীর বাক্সে দাঁড়িয়ে জবানবন্দী দিচ্ছিলেন।

মণীন্দ্র ও ইয়াকুবকে আহত করে আমি আনন্দকে অনুসরণ করি। কিন্তু বাইরে প্ল্যাটফর্মের ওপর বাঁ দিকে ঘুরে দারোগাবাবুকে দেখে গুলী ছুঁড়তে এই যে একটু অন্যদিকে লক্ষ্য দিতে হয়েছে, এরই মধ্যে অন্ধকারে আমি আনন্দকে

হারিয়ে ফেলি। দারোগাবাবুকে গুলী করেই আমি ফিরে আনন্দ ভেবে একজনের পেছনে ছুটে গিয়েছিলাম কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল সে আনন্দ নয়।

আনন্দ ও মাখনকে হারিয়ে ফেললাম। পরে কলকাতায় যখন তাদের সঙ্গে আমি একত্র হয়েছি, তখন মাখনের কথা শুনে আমি তো বোকা হয়ে গেলাম। আমি যখন প্রথম ফায়ার করি তখন সে ছিল বড় খোলা দরজার কাছে, টেবিলের গা ঘেষে। মাখন ও আমার মধ্যে ছিল আনন্দ। তবু খুবই আশ্চর্য ব্যাপার, আমার গুলীর শব্দ শুনে মাখন তৎক্ষণাৎ বাইরে চলে না গিয়ে ঘরের ভেতর চলে এলো এবং আলমারীর আড়ালে দাঁড়ালো। আমার পেছনে যে সেপাই ছিল, তাকেই প্রথমে গুলী করতে হয়েছে। গুলী ছুঁড়তে যেটুকু সময় আমার দৃষ্টি পেছনের দিকে গেছে, তারই মধ্যে তড়িৎগতিতে মাখন একেবারে আলমারীর পেছনে চলে গেছে। টেবিল থেকে লাফিয়ে পড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সময় ঘর একেবারে শূন্য মনে হয়েছিল আমার; কেবল ইয়াকুব ও মণীন্দ্র মেঝের ওপর পড়েছিল। আমার ঠিক আগে আনন্দ বাব হ'ল—ঘরে আর কেউ ছিল বলে ভাবতেই পারি নি!

ঘরের বাইরে না পালিয়ে পুলিস বেষ্টনীতে পড়বার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও মাখন কেন ঘরের ভেতর ঢুকলো জিজ্ঞেস করাতে সে বলল—"পেছন থেকে আপনার গুলীর আওয়াজ শুনে আমার মনে হয়েছে হয়ত আমরা cross fire করে নিজেদের মধ্যে কেউ গুলীবিদ্ধ হতে পারি। সেই জন্য আপনার পেছনে পজিশন্ নিতে বিদ্যুদ্বেগে ভেতরের দিকে ছুটে যাই।" মাখন এটা মারাত্মক ভুল করেছিল। এই ভুলের সুযোগে একজন সেপাই তাকে আক্রমণ করে; এই সেপাইটিও আলমারীর আড়ালে ছিল। মাথায় বেটনের প্রচণ্ড দুই আঘাত মাখনকে অত্যন্ত দুর্বল করে দেয় এবং তার হাত হতে একটি রিভলভার পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনা আমরা কেউ তখন জানতে পারি নি। খুবই আশ্চর্য মনে হয় যে, সেপাইটি মাখনের রিভলভার কুড়িয়ে পেয়েও তার দিকে গুলী ছুঁড়লো না কেন? আবার এটাও ভাবতে শরীর শিউরে ওঠে, মাখন ঐ প্রচণ্ড আঘাতেও কি করে স্থির ছিল—কি করে পালাতে সমর্থ হ'ল! খুব সৌভাগ্য বলতে হবে যে, সেই রাতের অন্ধকারেও মাখন প্ল্যাটফর্মের ওপর আনন্দকে খুঁজে পেয়েছিল।

এতক্ষণ আমাদের তিনজনের কথা বললাম। গণেশের কি হ'ল? তল্লাসী সুরু করবার আগে একজন হাবিলদার ও দু'জন কনস্টেবল পাহারা দিয়ে গণেশকে প্ল্যাট-ফর্মের কম্পাউণ্ডে নিয়ে গেল। ইতিমধ্যে আমাদের সার্চ আরম্ভ হয় এবং গুলী চলে। স্বভাবতই গুলীর শব্দ গণেশ ও পুলিসেরা শুনতে পায়। খোলা মাঠে গণেশের দু'টি রিভলভারের সামনে বেচারা হাবিলদার ও সেপাই দু'জন নিজেদের

অত্যন্ত নিঃসহায় মনে করে। গুলীর আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই গণেশ দু'হাতে দু'টি রিভলভার তুলে ধরে দৃঢ়কণ্ঠে তাদের আদেশ দেয়—"হাত উঠাও! About turn! ভাগো!" তারাও আদেশ অমান্য করলো না—মুহূর্তে পালানোই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পুলিসের মুখের বিবরণ জাজ্‌মেণ্টের পাতা থেকে উদ্ধৃত করছি—

"Constable Jogendra Roy says that the eldest looking of the four suspects asked to be allowed to go out to make water and was taken out by the Havilder Heman Singh, constable Torab Ali and himself. They took him to the Railway track east of the station building and refusing his request to take him outside the station compound told him to micturate there. As he sat down, there was a report from the direction of the Asst. Station Master's room followed by another report and he got up and made off towards the nórth. The Havilder and constables pursued him and he turned and fired at them and then ran on. Jogendra Roy got up and ran after him again and the fugitive halted near the goods godown and fired at him again. Jogendra then looked round to see if the Havilder and Torab Ali were following him, but finding that they had given up the pursuit, he retreated in fear to the station building. There he found the Sub-Inspector and one cónstable Manindra Pal and Yakub Ali lying wounded. Monindra had a revolver in his hand which he said he had wrested from one of the suspects".

—কনস্টেবল যোগেন্দ্র রায় বলেছে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠজন শারীরিক প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার অনুমতি চাইলে কনস্টেবল তোরাব আলি, হাবিলদার ও সে, তাকে বাইরে নিয়ে যায়। স্টেশনের পূর্ব দিকে রেল লাইনের ওপর তাকে নেওয়া হয়। সে প্ল্যাটফর্ম কম্পাউণ্ডের বাইরে যাবার অনুরোধ করলে প্রহরীরা তা' অস্বীকার করে। যেমনি সে বসেছে, তখনই তারা সহকারী স্টেশন-মাস্টারের কক্ষ থেকে একটি গুলীর আওয়াজ শুনতে পায় এবং পরমুহূর্তেই আরো একটি গুলীর শব্দ কানে আসে। সেই সুযোগে সে উঠেই উত্তর দিকে ছুট দেয়। হাবিলদার ও কনস্টেবলরা তার পেছু নিলে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়ে আবার দৌড়তে থাকে। যোগেন্দ্র (বোধ হয় গুলী থেকে বাঁচতে শুয়ে পড়েছিল) আবার উঠে দাঁড়ায় এবং তাকে অনুসরণ করে। পলাতক মাল-গুদামের

কাছে দাঁড়িয়ে আবার যোগেন্দ্রকে লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়ে। এই সময় যোগেন্দ্র চারিদিক তাকিয়ে দেখে যে, তোরাব আলি বা হাবিলদার কেউই আর পলাতককে অনুসরণ করছে না। ভয় পেয়ে সেও তখন স্টেশনে ফিরে এলো। সেখানে সে দারোগাবাবু, ইয়াকুব ও মণীন্দ্রকে আহত অবস্থায় শায়িত দেখে। মণীন্দ্রের হাতে একটি রিভলভার দেখতে পায়—মণীন্দ্র তাকে বলেছে, রিভলভারটি সে আততায়ীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই কিভাবে তারা সবাই, অর্থাৎ পুলিস-কর্মচারীরা, হতভম্ব হয়ে যে যেখানে পেরেছে ছত্রভঙ্গ হয়ে ভয়ে পালিয়েছে, তা' তাদের নিজ মুখেই বলেছে। সহকারী স্টেশন-মাস্টারের কক্ষে যারা ছিল তাদের দুরবস্থার কথা ইন্স্পেক্টারের উক্তি থেকেই জানা যাচ্ছে। আর যে তিনজন গণেশকে পাহারা দিয়ে বাইরে এনেছিল, তাদের শোচনীয় অবস্থার কথাও যোগেন্দ্র রায়ের বর্ণনায় পেয়েছি। মোট কথা বোঝা গেল, ভয়ে তারা চারিদিকে ছুটে পালিয়েছে এবং কর্তৃপক্ষকে তাদের কর্তব্যপরায়ণতা বোঝাবার জন্য ইন্স্পেক্টার বলেছে, 'আমাকেই প্রথম গুলী করে, তাই পালাতে হয়', পুলিসের ছোটবাবু বলতে চাইলো—সে আমার ভয়ে কক্ষ ছেড়ে পালিয়ে আসে নি, আততায়ীদের পালাবার সময় প্ল্যাটফর্মের ওপর একজনকে জাপটে ধরে এবং তারই গুলীতে ধরাশায়ী হয়েছে; যোগেন্দ্র রায়ও কর্তব্যে অটল ছিল—সেও হাবিলদার এবং তোরাব আলির সঙ্গে পলাতককে ধরবার জন্য রিভলভারের গুলী উপেক্ষা করে পেছনে ছুটে যায়। সহকারী স্টেশন-মাস্টারের ঘরের দরজা বাইরে থেকে অবরোধ করে যে সেপাইটি পাহারা দিচ্ছিল, তার কথা এতক্ষণ বলা হয় নি। তার নাকের ডগা দিয়ে তিনজন পালিয়ে গেল আর সে নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল—কর্তব্য পালনে অক্ষম হ'ল, তা' কি করে হতে পারে? সেও যে সাধ্যমত কর্তব্য করেছে, সাক্ষী দেবার সময় তারই বর্ণনা দেয় কনস্টেবল সীতারাম তেওয়ারী। জজসাহেব তার উক্তি থেকে লিখছেন—

"Constable Sitaram Tewari says that he and constable Jogendra Roy remained on the verandah while the four suspects were taken inside the room. Presently one of them was taken away to micturate by the havilder and constable Torab Ali and Jogendra Roy and the firing started. The three suspects rushed out of the room and made off towards the south. He ran after them for some distance but tripped over a signal wire and fell. The fugitives fired two shots at him so he lay there for sometime not daring to get up. Then he crawled back to the station where he found that the

Sub- Asst. Surgeon and some other police officers and constables had arrived..." (Judgement Chittagong Armoury Raid Case No. 1).

কনস্টেবল সীতারাম তেওয়াবী তার বয়ানে বলেছে, চারজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে যখন কক্ষের ভেতর নিয়ে গেল, তখন সে ও যোগেন্দ্র রায় (দরজার বাইরে) বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। সেই চারজনের মধ্যে একজনকে হাবিলদার, যোগেন্দ্র ও তোবাব আলি বাইরে নিয়ে যায়। সেই সময় গুলী চালান সুরু হয়। অন্য তিনজন আততায়ী ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে যায়। কিছুদূর পর্যন্ত সে তাদের পেছন পেছন ধাওয়া করে, কিন্তু শেষে সিগন্যালের তারে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। পলাতকেরা তার দিকে দু'বার গুলী ছোঁড়ে, তা'তে সে ভয়ে কিছু সময়ের জন্য সেখানেই শুয়ে রইল। তারপর যখন সে বুকে গড়িয়ে গড়িয়ে স্টেশনে আসে, তখন দেখতে পায় ডাক্তার, অন্যান্য পুলিস অফিসার ও অনেক কনস্টেবল সেখানে এসে পৌছেছে।

রাতের অন্ধকারে গুলীর আওয়াজ, চেঁচামেচি, চারিদিকে ছুটোছুটি - পুলিসদের প্রাণ নিয়ে পালাবার চেষ্টা, রেল-কর্মচারীদের মৃত্যুভয়ে হরিনাম জপ, প্রভৃতি সবকিছু মিলে দু'তিন সেকেণ্ডেই একটা যেন দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেল। গুর্খা সৈন্যরা কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে রইল, তারা কিছু অনুমান করবার আগেই ড্রামা শেষ। তিনজন পুলিসকে গুলীবিদ্ধ অবস্থায় ধরাশায়ী দেখে গুর্খা সৈন্যের' হয়ত ভেবেছিল তাদের প্রতি মায়ের অশেষ কৃপা যে, তাদের অংশ গ্রহণের পূর্বেই নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। পুলিসেরা যেমন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল তেমনি গোলমালের মধ্যে আমাদেরও ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। গণেশ একদিকে গেল একেবারে একা। আমিও দলছাড়া হয়ে পড়লাম। মাখন ও আনন্দ কোথায় গেল, গণেশও বা কোথায়—তখন কিছুই জানবার উপায় ছিল না। তবে আমি সুনিশ্চিত ছিলাম যে, গণেশকে তারা কোনমতেই বন্দী করতে পারবে না। আমরাও কেউ এই যাত্রায় ধরা পড়লাম না।

আনন্দ প্রথমে একা প্ল্যাটফর্মের পূর্বদিকে ছুটে যায়। কিছুক্ষণ বাদেই সে বুঝতে পারে তার পেছনে আমি আর নেই। মাখন তো তার আগে দরজার মুখেই ছিল, তবে সে গেল কোথায়? অনন্তদাও তো তার পেছনেই ছিল, তাকেই অনুসরণ করে আসছিল, তবে সেইবা কোথায় হারিয়ে গেল? কি করবে সে ঠিক করতে পারছিল না—কোথায় যাবে, কোনদিকে গেলে ভাল হবে, কারো দেখা কি পাওয়া যাবে না? এমন সময়, আশা-নিরাশার সন্ধিক্ষণে, আনন্দ দেখতে পেল মাখন ছুটে তার দিকেই আসছে। মাখন এতক্ষণ ছিল কোথায়? এতক্ষণ আনন্দ ভেবেছে যে, সেই সবার আগে বেরিয়ে উধাও হয়েছে। মাখনকে পেছন থেকে আসতে দেখে সে একটু আশ্চর্য হ'ল। কাছে এলে আনন্দ তাকে দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে

পড়লো। মাখনের সমস্ত জামা-কাপড় রক্তে লাল হয়ে গেছে। আনন্দ জিজ্ঞেস করলো—"এ কি? কি করে হ'ল? কে আঘাত করেছে? মাথা ফেটে গেছে? আর কোথায় লেগেছে?" মাখন শুধু বলল—"মাথায়।" তার যেন আর কিছু বলবার মত শক্তি ছিল না—অবসন্ন দেহ যেন তখনই মাটিতে লুটিয়ে পড়বে! সেই অবস্থায় এতক্ষণ এত দূর কি করে ছুটে এসেছে তা' সে নিজেও জানে না। আনন্দ তাকে সর্বশক্তি দিয়ে ধরে ফেলে মাটিতে পড়তে দিল না। সামান্য আঘাতে যদি মাথার চামড়াও কেটে যায়, তাতেও ভয়ানক রক্তক্ষরণ হয়। এই সাধারণ অভিজ্ঞতা ফুটবল খেলার মাঠে হয়ত অনেকেরই আছে। মাখনের যদিও মাথার খুলি ফাটে নি, তবু বেটনের দু'টি আঘাতই যে সাংঘাতিক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ক্ষতস্থান শুকিয়ে যাওয়ার পরও মাখন বহু মাস পর্যন্ত মাথায় তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করতো।

মাখন তার শ্রান্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহ নিয়ে যেন আর চলতে পারছিল না। স্টেশনের পূব দিকে প্ল্যাটফর্মের দূরত্ব প্রায় দু'শ' গজ। তখনও তারা দু'জন অন্ধকারে প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে। বেশিক্ষণ সেভাবে সেখানে থাকা চলে না—উচিতও হবে না। আনন্দ মাখনকে সাহস দিতে বলে—তাকে আরও শক্তি সঞ্চয় করতে হবে—আরও পথ চলতে হবে, কোনপ্রকারে গণেশ ও আমার সঙ্গে যোগাযোগ হয় কিনা তার চেষ্টা করতে হবে। শত কষ্ট সত্ত্বেও মাখন তার শরীর টেনে টেনে চলেছিল—আমাদের দেখা তাদের পেতেই হবে।

প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে দক্ষিণদিকে কিছুক্ষণ হাঁটতেই তারা ফেণী ট্রাঙ্ক-রোডে এসে পড়ে এবং ট্রাঙ্ক-রোড ধরেই কুমিল্লা অভিমুখে হাঁটতে সুরু করলো। তখন রাত প্রায় তিনটা। নির্জন রাস্তা, তবু অনভিজ্ঞতার জন্য পথ চলার সময় কোন কিছুর ছায়া দেখে মনে হয়েছে মানুষ, দূরের কোন আওয়াজে মনে হয়েছে বন্দুকের শব্দ, নিজেদের পায়ের শব্দে মনে হয়েছে—ওই বুঝি পেছনে কেউ আসছে। তারা নিজেরাই আমাকে এইরূপ বর্ণনা দিয়েছে। তা ছাড়া আমারও ঠিক এইরূপ বিকারগ্রস্ত মনের অতীত অভীজ্ঞতা ছিল। ১৯২৩ সালে "নাগারখানা পাহাড়ে" যুদ্ধের পর পুলিস বেষ্টনী ভেদ করে আমরা তিনজন—অবনী ভট্টাচার্য, দেবেন ও আমি যখন পাহাড়ের রাস্তা, রেল-লাইন বা ট্রাঙ্ক-রোড দিয়ে গভীর রাত্রে ভাটিয়ারী সমুদ্র-তীরের দিকে যাচ্ছিলাম, তখন আমাদেরও নানারকম অদ্ভুত সব চিন্তা মনে এসেছে—ওই বুঝি গুলীর শব্দ হ'ল, ওই বুঝি আমাদের কেউ অনুসরণ করছে, ইত্যাদি। অত রাত্রে পাহাড়ে-জঙ্গলে, রেল-লাইনে ও ট্রাঙ্ক-রোডের ওপরে কে আমাদের পেছু ধাওয়া করবে? "নাগারখানা" যুদ্ধ শেষ হয়েছিল বিকেল চারটে-পাঁচটায় সময়। রাত দুটো-তিনটের সময় আন্দাজে কে আমাদের অনুসরণ করবে? বিকারগ্রস্ত মনে

যুক্তি দিয়ে কিছু ভাবা যায় না। ঠিক অনুরূপভাবেই ১৮ই এপ্রিল, যুব-বিদ্রোহের পর, প্রধান-বাহিনী যখন পাহাড়ের দিকে যাচ্ছিল, তখন বাজিদ্‌বেস্তানের নির্জন রাস্তার ওপর একটিমাত্র মোটরের লাইট দেখে শত্রুর মোটর মনে করে সকলে রাস্তার ধারে শুয়ে পড়লো—আমরা ছাড়া শহর থেকে অতদূরে, সেই নির্জন রাস্তায় বিধ্বস্ত ও বিক্ষিপ্ত ইংরেজরা যে কোনমতেই যেতে পারে না, তা' তারা ভাবতেই পারে নি। এইরূপ শোচনীয় অভিজ্ঞতার কথা শান্ত পরিবেশে কখনই ভাবা যায় না। কিন্তু এইটি রূঢ় বাস্তব সত্য যে, "যুদ্ধের" পর সাহসী যোদ্ধাদেরও এইরূপ মনের বিকার দেখা গেছে।

মাখন ও আনন্দ ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে ও সতর্কতার সঙ্গে চারিদিকে দৃষ্টি রেখে পথ চলেছে, যাতে শত্রুপক্ষ তাদের অস্তিত্ব টের না পায়। আমার ও গণেশের সন্ধান পাওয়া যে তাদের একান্ত প্রয়োজন! পরে দেখা হলে তারা বলেছে, তাদের ধারণা হয়েছিল—পাকে-চক্রে তারা দু'জনে যেমন একত্র হয়েছে, তেমনি আমি ও গণেশও এক সঙ্গেই আছি। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা চারিদিকে লক্ষ্য রেখেছে কোথাও আমাদের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। তাদের খুব আশা ছিল আমাদের দেখা পাবেই।

সময় চলে যেতে লাগলো। সজাগ দৃষ্টি রেখে প্রায় তিন ঘণ্টা হাঁটবার পরেও আমাদের দেখা না পেয়ে তারা একেবারে নিরাশ হয়ে পড়লো। এখন নিজ বুদ্ধিতেই তাদের চলতে হবে। বসে বসে কোন প্ল্যান করবার অবকাশ ছিল না। তবে তারা এইটুকু বুঝেছিল যে, ধরা পড়লে চলবে না। নিজেদের বাঁচিয়ে ভোর হবার আগেই লোকালয় ছেড়ে কোন পাহাড়ে-জঙ্গলে অথবা নির্জন স্থানে আশ্রয় নিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে শ্রান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহ কোনমতে খাড়া রেখে তারা এগিয়ে চলেছিল।

এমন সময় দেখা গেল প্রায় দেড়শ' দু'শ' গজ দূরে একজন লোক আগে আগে যাচ্ছে। এই সময়ে এমন নির্জন রাস্তা দিয়ে একা একজন লোক কোথায় বা কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছে? তারা পেছনে খুব ভাল করে তাকিয়ে দেখলো কেউ আসছে কিনা। পুলিস পেছু নিলে প্রায় সময়েই সামনে একজন ও পেছনে একজন থেকে নিজেদের মধ্যে সংযোগ রেখে অনুসরণ করে। তাদের মনে হচ্ছিল পেছনের লোকটিকে হয়ত এখনও দেখা যাচ্ছে না; কিন্তু সামনের লোকটিও বা অত ধীরে ধীরে হাঁটছে কেন? সামনের এই লোকটি যেন পথের পাশে একটুক্ষণ বসলো। তারা তাদের গতিও সেই অনুযায়ী কিছুটা মন্থর করলো। ঐ লোকটি যেমন তাদের আগে আগে হাঁটছে তেমনি তার গতি ও দূরত্ব অব্যাহত রেখে সে নিজ গন্তব্যস্থানে চলে যাক্—এটাই তারা চেয়েছিল। যদি পুলিসের গুপ্তচর না হয় তবে তার গতির পরিবর্তন

কমিয়ে নিতে চাইল। মাখন ও আনন্দ আরো একটু আস্তে হাঁটতে লাগলো। সেই ব্যক্তিও যেন তার গতি আরো একটু মন্থর করলো। না, সে পুলিসের লোক না হয়েই যায় না। অবশেষে তারা সেই লোকটিকে পথের ধারে একটি বড় গাছের তলায় বসে পড়তে দেখে একেবারে নিঃসন্দেহ হ'ল যে, নিশ্চয়ই সে পুলিসের চর। তারা দু'জন গাছটি অতিক্রম করে যাওয়ার পরেই তাদের পেছু নেবার মতলবই যে তার সেখানে বসার একমাত্র কারণ, এটা যে, কেউ বুঝতে পারবে। আরো খানিকটা এগোবার পর দেখা গেল লোকটি সযত্নে তাদের কাছ থেকে মুখ ঢেকে রাখতে চাইছে এবং মাথার ওপর দিয়ে চাদরে সমস্ত শরীর সে ঢেকে দিল। এতে মাখন ও আনন্দের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হ'ল—এ সবের কি অর্থ? দু'জনেই তাবা নিজ নিজ রিভলভার হাতের মুঠোয় নিল। এক নিমেষে চোখের ইঙ্গিতে ও ফিস্ ফিস্ করে পরস্পরেব মধ্যে স্থির করলো, লোকটিকে তারা চ্যালেঞ্জ করবে।

গাছটিব ঠিক বিপরীত দিকে ট্রাঙ্ক-বোডেব ওপর এসে পৌছেই বিদ্যুদ্বেগে তারা ট্রাঙ্ক-.বাড ছেড়ে বাঁ দিকে নেমে পড়ে গাছতলায় বসা লোকটির বুক লক্ষ্য করে বিভলভাব বাগিয়ে ধরলো। রিভলভারের ট্রিগারে তাদের আঙুল; দৃঢ় কণ্ঠে দু'জনেই একসঙ্গে আদেশ দিল—"হাত তোল।" লোকটি আদেশ পাওয়া মাত্রই কোন দ্বিরুক্তি না কবে হাত তুললো। তারপর দু'টি "বালক" প্রশ্ন করলো—"কোথায় যাচ্ছ? কি উদ্দেশ্য তোমার? কে তুমি? কেন পেছু নিয়েছ?"

জবাব এলো—"আমি গণেশদা!" গণেশদা! এও কি সম্ভব? স্বপ্ন না মতিভ্রম? উপন্যাস নয়, সিনেমা নয়—বাস্তব সত্য। সত্যিই গণেশদা—এতে কোন ভুল নেই। দু'টি "বালক" গণেশদা বলে একেবাবে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এত বিপদ এবং দুঃখেব মধ্যেও এই আশ্চর্য মিলন রূপকথার মতই বিপ্লবী ইতিহাসে লেখা থাকবে।

আনন্দ, মাখন ও গণেশের এখন চিন্তা—আমার কি হ'ল? আমি কোথায়? তাদের অপ্রত্যাশিত মিলনের পবে মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে—তবে কি আকস্মিকভাবে আমার সঙ্গেও তাদের ট্রাঙ্ক-রোডেই দেখা হবে? কিন্তু আমার সঙ্গে আকস্মিক মিলনের কোন সম্ভাবনা ছিল না। আমি স্টেশন-মাস্টারের কামরা থেকে বেরিয়ে যতীনবাবুকে গুলী করে আনন্দের পেছন পেছন পুব দিকে প্ল্যাটফর্মের ওপর ছুটে গেছি। কিছুদূর গিয়েই বুঝতে পারলাম আমার সামনে যাকে দেখছি সে আনন্দ বা মাখন দু'জনের কেউই নয়। আমি বুঝলাম আমার সামনে হয়ত কোন রেল-কর্মচারী বা পুলিস ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে। আরও মনে হ'ল, পেছনেও কয়েকজন ছুটে আসছে। সামনে ও পেছনে অপরিচিত লোক, মাঝে আমি। লোকগুলি যে

কা'ন্না তাও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আমি সেই অবস্থায় আমার আশে-পাশের অচেনা লোকদের এড়ানোর জন্য ডান দিকে, অর্থাৎ, প্ল্যাটফর্মের দক্ষিণে মোড় নিয়ে একটু যেতে না যেতেই কাঁটাতারের বেড়ার ওপর গিয়ে পড়লাম। প্রথমটা কাঁটাতারের বেড়া আমি বুঝতে পারি নি। কিন্তু একটু পরেই আমার শোচনীয় অবস্থা উপলব্ধি করে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করলাম। আমার দুই হাতের মুঠোতে পিস্তল ও রিভলভার ধরা আছে, কাজেই হাত দু'টি আটকা! এই অবস্থায় কাঁটাতারের বেড়ায় আমার জামা কাপড় জড়িয়ে গেছে, হাত পা মাথা—শরীরের নানা স্থান আঁচড়ে গেছে। এর মধ্যে দু'একটি ক্ষত কিছু গভীর বলেই মনে হ'ল। মাত্র কয়েক মিনিট আগে গুলী চালিয়ে এসেছি, তখনও লোকজন ছুটোছুটি করছে —বিপদের মুখ থেকে নিরাপদ স্থানে যেতে পারি নি; কাজেই এক মুহূর্তের জন্যও পিস্তল ও রিভলভার হাতছাড়া করতে পারছি না। কাঁটাতারের বেড়ার ওপর এইরূপ অসহায় অবস্থায় বেশিক্ষণ পড়ে থাকার অর্থই হ'ল আবার নিশ্চিত বিপদের মুখে পড়া। তাই অবিলম্বে কোনকিছু ভ্রূক্ষেপ না করে, গায়ের সমস্ত জোরে এক হ্যাঁচকা টানে নিজেকে কাঁটাতারের বেড়া থেকে মুক্ত করে নিতে চাইলাম। টানের চোটে জামা কাপড় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মাথা ও পায়ের দু' জায়গায় গভীর ক্ষত হ'ল। অন্ধকারে দেখতে পাই নি, কিন্তু বেশ বুঝতে পারলাম মাথা ও ডান পা থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। তবু মনে আনন্দ—কাঁটাতারের বেড়া থেকে তো মুক্তি পেলাম! কিন্তু হায়! কে জানতো যে উত্তপ্ত কড়াই থেকে আমি একেবারে জ্বলন্ত উনোনে পড়বো?

স্টেশনের পূর্ব দিকের দেওয়াল পর্যন্ত কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা। স্টেশনের দেওয়াল ও কাঁটাতারের বেড়া যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে তার মাঝখানে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের গমনাগমনের একটি ছোট্ট গেট ছিল। এই গেটটি আমি দেখতে পাই নি। আমি এই গেটেরই সামান্য কয়েক হাত দূরে কাঁটাতারের ওপর গিয়ে পড়ি। গেটটির বাইরে সোজা দক্ষিণে, যাত্রীদের লোকালয়ে যাবার পথ। আর এই পথেরই বাঁ দিকে একটি কাদা জমানো ছোট্ট পুকুর। কাছেই একটি মাটির দেওয়ালের বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। এই বাড়িটি তৈরি করবার জন্যই পুকুরে কাদা জমানো হয়েছে। বেড়া থেকে মুক্ত হয়ে আমি কোনমতে Balance রাখতে পারলাম না। আমার দু'হাত বন্ধ, এই পাঁক-পুকুরের সরু পাড়ের ওপর থেকে পিছলে আমি একেবারে কাদার মধ্যে পড়ে গেলাম।

কাঁটাতারে আটকে যাওয়া, হ্যাঁচকা টানে নিজেকে মুক্ত করা ও আবার কাদার মধ্যে পড়া—এই সব ঘটনাই হয়ত দু'এক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটেছে। কাঁটাতারে জড়িয়ে পড়ে আমি খুব অসহায় বোধ করেছি সন্দেহ নেই, কিন্তু কাদার মধ্যে পড়ে

পারবো না। মানসচক্ষে অনুধাবন করুন—আমি কাদাভর্তি পুকুরে পড়েছি—গলা পর্যন্ত কাদা, দু'হাত উঁচু করে রেখেছি—একহাতে পিস্তল ও অন্য হাতে রিভলভার। হাত দু'টি বদ্ধ কেবল পায়ের জোরে এই পাঁকের গর্ত থেকে আমি উঠতে চাইছিলাম; যতবার কাদায় পা বাড়িয়ে উঠবার চেষ্টা করছিলাম ততবারই পা পিছলে গেছে—আমি আরো কাদার তলায় ডুবে গেছি। ভীষণ ছটফট্ করতে করতে পিস্তলধরা দু'টি হাত বার বার সামনের দিকে ছুঁড়েছি—আমি যেন বাতাসে সাঁতার কাটছিলাম। সমস্ত শরীরের ঝাঁকুনি, কাদা-পুকুরের পিছল তলায় পায়ের দ্রুত ক্রিয়া এবং শূন্যে হস্ত ও বাহুর সঞ্চালন আমাকে কিভাবে শেষপর্যন্ত মুক্ত হতে সাহায্য করেছিল, তা এখন আর লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। যা হোক্, আমি কাদা-পুকুর থেকে কোন মতে উঠে এলাম। এই সময় অন্য কোন লোক আমার চোখে পড়ে নি। সারা গায়ে কাদা মাখা অবস্থায় আমাকে যদি কেউ দেখতে পেত, তাহলে তার পক্ষে আমাকে ভূত বলে ধরে নেওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক হ'ত না।

আমি যে কাঁটাতারের বেড়ার ওপর পড়েছিলাম তা' কেউ দেখে নি। সেই জন্যই ভেবেছিলাম, পুলিস হয়ত এ ব্যাপার জানবে না। কিন্তু দেখা গেল, আমাদের মধ্যে কেউ না কেউ কাঁটাতারে আটকে যে যথেষ্ট আক্কেল সেলামী দিয়েছে, পুলিস শেষপর্যন্ত সেটা আবিষ্কার করেছে। ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেণ্ট মিঃ জে, ইউনী তাঁর জাজ্‌মেণ্টে লিপিবদ্ধ করতে ভোলেন নি—

"At 5-30 a.m. the A. S. I. Serajul Haq was sent by the Inspector to look for the fugitives......From 3-30 a.m. another A. S. I. (P. W. 64) searched for them along the road from Birinchi, a village on the west side of the railway line up to Ranirhat but was similarly unsuccessful. He returned to the Railway Station at about 6 a.m. and at the south-east corner of the railway fence which seperates the station and the college compound, he found sticking to the barbed wire at one place a small torn piece of cloth [Ex. ccxcll (1)] and a chadar and at another place near by another small torn fragment of cloth [Ex. ccx II (2)]" (Judgment Chittagong Armoury Raid Case No. 1 Page —79).

—ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় ইন্‌স্পেক্টার সাহেব, এ, এস, আই, সিরাজুল হককে পলাতকদের অনুসন্ধানে পাঠান।...৬৪ নং সরকারী সাক্ষী, অপর একজন এ, এস, আই, ভোর সাড়ে তিনটা থেকে রেল-লাইনের পশ্চিমে বিরিঞ্চি গ্রাম হতে রাণীরহাট

সময় সেই এ, এস, আই, রেল-স্টেশনে ফিরে আসেন এবং রেল-কম্পাউণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, যেখানে কলেজ কম্পাউণ্ড বিভক্ত হয়েছে, সেখানে কাঁটাতারের কোন এক স্থানে ছোট একটুক্রো কাপড় ও একটা চাদব ঝুলতে দেখেন। কাছেই অপর একটি স্থানে আরো এক টুক্রো ছিন্ন বস্ত্র দেখতে পান। এই সব কিছুই ওপরে চিহ্ন দিয়ে কোর্টে উপস্থিত করা হয়েছে।

এই সব ছেঁড়া টুক্বো কাপড় যে আমাদেরই কারো ব্যবহৃত, তার কি প্রমাণ আছে? এই ধরনেব ছেঁড়া টুক্রো কাপড় খুঁজলে বেড়ার গায়ে হয়ত আরও পাওয়া যেত, কিন্তু তাই বলে সেগুলি যে আমাদের কারও হবে, এটা প্রমাণ সাপেক্ষ। পুলিস প্রমাণ করলো Dying Company র নম্বর দিয়ে। এপ্রিল মাসের ১১ই তারিখে এই নম্বরেব একটি ধুতি আমাদের সাথী রজত সেন ধোয়াব জন্য দেয়। কাজেই রজত সেনেব কাপড আমাদের কেউ ব্যবহার করেছে এবং আমরা সবাই যে একই ষড়যন্ত্রেব অন্তর্ভুক্ত, পুলিস তা' প্রমাণ করতে চেষ্টা কবেছে। Judgement-এ লেখা আছে—

"On this piece the number 15427 was marked in marking ink. And on 11-4-30 a Kaddar Dhoti was received for cleaning by P. W. 166 from Rajat Sen and was marked with the number 15427 is Ex. 159 (4)".

বাঃ, কি চমৎকার! পুলিসেব কি বিচক্ষণতা! পাঁচকড়িবাবুর ডিটেক্টিভ নায়ক অরিন্দমকেও হাব মানায়। কিন্তু চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের ইতিহাসই পুলিসের এইরূপ বিশ্লেষণ শক্তি ও বিচক্ষনতাকে ম্লান কবে দিয়েছে; কারণ, সেই সব বিপ্লবী যুবকেরা তাদের নিজেদেব বাড়ির বন্দুক ও মোটর গাড়িইতো আক্রমণের সময় ব্যবহার করেছে, ষড়যন্ত্র এবং যোগাযোগ প্রমাণের জন্য অত কষ্ট করে ছেঁড়া কাপড় খুঁজে বেড়াবার দরকাব কি ছিল!

আমি ফেণীতে আগেও কয়েকবার এসেছি—তাই সহজেই চিনতে পারলাম এখান থেকে প্রায় কোয়ার্টার মাইল দূরে ফেণী অভয়-আশ্রম। শ্রীনির্মলচন্দ্র সিংহরায় বোধহয় তখন অভয়-আশ্রমের সেক্রেটারী। শারীরিক ক্রিয়াকৌশল প্রদর্শনীর জন্য এখানে আমি আগে একবার আসি, তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। ভাবলাম তাঁর কাছে গিয়ে সাহায্য চাইলে হয়ত বিমুখ করবেন না। বড় রাস্তা ধরে আশ্রমে না এসে মাঠের ওপর দিয়ে পথ করে নিলাম। দু'তিনটি উঁচু বেড়া হাতের ভার দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত আমি আশ্রমের কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়লাম। আমার ভাগ্য ভালো যে, অত রাত্রে কেউ জেগে ছিল না এবং

রাস্তার উপর থেকে কেউ আমাকে আশ্রমে ঢুকতে দেখে নি। আশ্রমের যে ঘরে নির্মলবাবু থাকতেন সেটি আমার জানা ছিল। আমি সেই বাঁশের বেড়ার ঘরের দরজায় করাঘাত করে ডাকলাম—"নির্মলবাবু, নিমলবাবু!" কোন উত্তর পেলাম না। তারপর গলা আরো চড়িয়ে চেঁচালাম—"নির্মলবাবু!" ঘরের ভেতরে কার যেন ঘুম ভাঙলো—নিদ্রাভঙ্গে গা-মোড়ামুড়ির শব্দ কানে এলো এবং তার পরেই ঘুমের আমেজ জড়ানো মোটা গলার প্রশ্ন হ'ল—"কে?" গলার আওয়াজ কিন্তু ঠিক নির্মলবাবুর বলে মনে হ'লনা। আমি জবাব দিলাম—"নির্মলবাবুকে চাইছিলাম। তাঁকে একটু ডেকে দিন।" উত্তর এল—"নির্মলবাবু নেই। হাটে গেছেন খদ্দরের কাপড় কিনতে। সকালে ন'টা দশটায় ফিরবেন।" নির্মলবাবু তো নেই, এখন কি করা যায়? তাঁকেই মিনতি করলাম—"দেখুন, নির্মলবাবু আসা পযন্ত আমি এখানে অপেক্ষা কবতে চাই।" তিনি আমায় কথা শেষ করতেই দিলেন না, সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন--"না, না, তা হবে না। আপনি এখন যান—সকাল দশটায় আসবেন।" ভাবলাম, আশ্রমে অসময়ে অনেকে আশ্রয় নিতে উপস্থিত হন এবং তাতে তাঁরা যথেষ্ট বিব্রত বোধ করেন; সেই কারণে হয়ত কোন তিক্ত অভিজ্ঞতাবশতই তাঁরা স্থির করেছেন কাউকে আশ্রমে স্থান দেবেন না। কাজেই মনে হ'ল আমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হবার কোন সম্ভাবনা নেই। অগত্যা ভদ্রলোককে আর বিরক্ত না করে সেই স্থান পরিত্যাগ করলাম। বোধ হয় ভালই হ'ল—একেবারে নির্ভেজাল খদ্দর, কে জানে আমার কাদা ও রক্তমাখা দেহ এবং দু'হাতে পিস্তল দেখে তাঁর কি অবস্থা হ'ত?

আমি মাঠ দিয়ে ঘুরে আবার রেল-লাইনে এলাম। স্টেশন থেকে প্রায় তিনশ' গজ পূর্বে দাড়িয়ে আশেপাশের অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করছিলাম। খুব একটা হৈ-চৈ অথবা পুলিস ও মিলিটারীর ব্যস্ততা দেখা গেল না। কেউ ধরা পড়েছে কিনা বুঝতে চেষ্টা করলাম। আবছা অন্ধকারে দূর থেকে দেখে মনে হলনা আমাদের কেউ ধরা পড়েছে।

রেল-লাইন পেরিয়ে আমি উত্তর দিকে মাঠের ভেতর দিয়ে এগোতে লাগলাম। বাকি রাতটুকু হাঁটতে হাঁটতেই কেটে গেল। কাদা, জল, নর্দমা, খাল, ডোবা, প্রভৃতি অতিক্রম করে চলেছি। ফেণী ষ্টেশনের উত্তরে—বহুদূরে, পর্বতশ্রেণী লক্ষ্য করে চলতে লাগলাম। সূর্যোদয়ের পূর্বে বিস্তীর্ণ পাহাড়ের কোলে গাছপালা, জঙ্গল প্রভৃতির আড়ালে আশ্রয় খুঁজে পাওয়ার আশায় অধীর পদযুগল দ্রুত পথ অতিক্রম করে চললো।

পুরু কাদামাটিতে তখনও আমার গা ভর্তি। পিস্তল ও রিভলভার—দু'টিই কাদা-মাখা। সামনে একটা ছোট্ট ডোবা দেখতে পেয়ে তার জলে আমার গায়ের

কাদামাটি কিছুটা পরিষ্কার করে নিলাম। মাথা ও পায়ের ক্ষতস্থানও ডোবার সেই ঘোলা জলেই পরিষ্কার করা হ'ল। ক্ষত থেকে তখনও একটু একটু রক্ত ঝরছিল। শরীর পরিষ্কার করা বা ক্ষতস্থান ধোয়া আমার যত না প্রয়োজন, তার চেয়ে পিস্তল ও রিভলভার দু'টি পরিষ্কার করবার তাগিদ সহস্রগুণ বেশি।

পিস্তলটিতে একসঙ্গে নয়টি কার্তুজ ব্যবহার করা যেত। আমি পিস্তল দিয়ে মাত্র একটি ফায়ার করেছি এবং পিস্তলের গুলীতে আহত হয়েছেন দারোগা যতীনবাবু। পিস্তলের ম্যাগাজিনে বাকি আটটি কার্তুজ ভর্তি আছে। তা'ছাড়া আমার সঙ্গে একটি থলেতে আরো প্রায় একশ' টোটা মজুত। কিন্তু রিভলভারের '৪৫০ ব্যাসের কোন অতিরিক্ত কার্তুজ আমার সঙ্গে ছিল না; ছয়টি কার্তুজই রিভলভারে ভর্তি ছিল। তরুণ সাথীরা আমার অভিমত জানতো—রিভলভারের ছ'টি ও পিস্তলের ন'টি গুলী ব্যবহারের আগেই প্রথম decision হয়ে যাবে। তাই রিভলভারের বড় বড় কার্তুজ আমি মাখন ও আনন্দের কাছে ভাগাভাগি করে রাখতে বলেছিলাম। পিস্তলের প্রায় একশ'র বেশি অতিরিক্ত কার্তুজ আমার কাছেই ছিল। কারণ, সবে ধন নীলমণি মাত্র একটিই পিস্তল ছিল আমাদের। আমি রিভলভার দিয়ে পাঁচটি ফায়ার করেছি, কাজেই রিভলভারের তাজা কার্তুজ ছিল মাত্র একটি—পাঁচটি ফায়ার করা হয়ে গেছে। যতদূর সম্ভব আগ্নেয়াস্ত্র দু'টি খুব ভালো করে পরিষ্কার করলাম। পরিষ্কার করবার পর যা দেখলাম তাতে তো তোমার হাত-পা ঠাণ্ডা! রিভলভারে আছে মাত্র একটি কার্তুজ, আর পিস্তলের ইজেকটারের স্প্রীং (কার্তুজ টেনে বার করবার স্প্রীং) ভেঙে গেছে। কি সর্বনাশ! পিস্তলটি তো একেবারেই অকেজো হয়ে পড়েছে! কেবলমাত্র একটি তাজা কার্তুজের ওপর নির্ভর করে রিভলভার সঙ্গে রাখতে হবে। এ এক মহা সমস্যা! হাতে পিস্তল ও রিভলভার সমেত ধরা পড়বার চাইতে যে মরাও ভাল! ভারাক্রান্ত মনে পাহাড়ের দিকে ছুটে চললাম।

তখনও ভোর হতে কিছু বাকি। পাহাড়ে উঠে ঝোপঝাড় ও গাছপালায় ঘেরা একটি নির্জন স্থান বেছে নিয়ে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লাম। অবসন্ন ক্লান্ত শরীর—গায়ের জামা-কাপড় ছিন্ন-ভিন্ন; রিভলভারে কার্তুজ নেই, পিস্তলের ইজেক্টার ভাঙ্গা, পায়ের পাতা ক্ষত-বিক্ষত—পেটে কিছুই নেই—তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে—অপরিসীম ক্লান্তিতে শরীর মন আচ্ছন্ন—এতটুকু নড়বারও আর ইচ্ছে নেই। ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালায় স্বভাবতই ঘুম আসা সম্ভব নয়, তবু জানিনা অবশ-দেহ কখন ঘুমে লুটিয়ে পড়েছে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম ঠিক বলতে পারি না, ঘুম ভেঙেই দেখি সূর্য বেশ কিছুটা উঠেছে। মনে হ'ল সকাল প্রায় আটটা হবে।

বন্ধুদের কি হ'ল ভেবে মনটা খুবই খারাপ। পিস্তল ও রিভলভার দু'টিই

অকেজো, কাজেই অস্ত্র থাকতেও আমি নিরস্ত্র। যদি এভাবে আমাকে গ্রেফতার করে, তবে প্রচার হবে—অস্ত্র সহ অনন্ত সিংহ বন্দী হয়েছে। এটা আমার পক্ষে ভাবাও অসহ্য। তাই পিস্তল ও রিভলভার দু'টিকেই আমি চিরতরে বিদায় দিলাম—মাটির নিচে পুঁতে ফেললাম। আমার পরনে কাদামাখা ছেঁড়া ধুতি সার্ট, তাতে আবার স্থানে স্থানে রক্তের দাগ। এ অবস্থায় কারো নজরে পড়লেই সন্দেহের উদ্রেক হবে। কিন্তু পাহাড়ের টিলার ওপর জঙ্গলে বসে দিন কাটালে তো আর সমস্যার সমাধান হবে না! লোকালয়ে আসতে হবে—পথ খুঁজে নিতে হবে—কলকাতা ও চট্টগ্রামের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে।

ধীরে ধীরে পাহাড় থেকে নেমে এলাম। গায়ে কাদা ও রক্তমাখা শতচ্ছিন্ন পরিধেয় আর নেই—বেশ বদল করেছি। প্রায় উলঙ্গ অবস্থা—মাত্র ছয় ইঞ্চি মত চওড়া কাপড়ের কৌপীন পরনে। মনে মনে স্থির করেছি—কালা, বোবা, ও অর্ধ পাগলের ভূমিকা অভিনয় করবো। বিবস্ত্র অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য পাগল-ভাব এবং প্রয়োজনের খাতিরে কালা ও বোবা সাজাই বেশি মানাবে বলে মনে হ'ল। গায়ে কাদামাটি মেখে চুল এলোমেলো করে ছড়িয়ে দিলাম।

বিস্তীর্ণ পাহাড় ও মাঠ অতিক্রম করে চলেছি। মাথার ওপর প্রখর রৌদ্র। জলের অভাবে জিহ্বা, গলা ও মুখ শুকিয়ে গেছে। আশেপাশে কোথাও জলের কোন চিহ্নও নেই। মনে মনে ভাবছিলাম কাউকে যদি একা দেখি তবে তার কাছে বোবা সেজে আকারে-ইঙ্গিতে জল এবং খাবার চাইব। দুপুর প্রায় বারোটার সময় একজন চাষীকে একেবার একা এবং তারপরে আরও দু'জনকে নির্জনে পেলাম বটে, তবে তাদের কাছে গিয়েও শেষপর্যন্ত আমার আর কিছু বলা হ'ল না কোন না কোন বাধা এসে পড়লো। এমনি করে প্রায় একটা বেজে গেল। ফেণী-বিলোনিয়া নতুন রেল-লাইন ও তার পাশের নতুন রাস্তা পার হয়ে আবার মাঠ-ঘাট অতিক্রম করে চলেছি। কাছেই লোকালয় দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎ কোন বিপদের আশঙ্কায় ট্রাঙ্ক-রোড এবং লোকালয় এড়িয়ে চলছিলাম।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিপদ এড়ানো গেল না। কোথা থেকে ছোট ছোট কতকগুলি ছেলে জুটে গেল। অর্ধ-উলঙ্গ বেশে 'পাগলটিকে' দেখতে পেয়ে তাদের কৌতূহলের সীমা রইল না। ছেলেদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিল। তারা আমাকে নানা টিট্‌কারী দিতে লাগলো—চারিদিক থেকে ছোট ছোট ঢিল ছুঁড়তে আরম্ভ করলো—অবশ্য তেমন জোরে নয়, আর সবগুলি গায়েও লাগছিল না। তবে খুব আশঙ্কাজনক ও বিরক্তিকর পরিস্থিতি। বড়রা এসে জুটবে কিনা বা দফাদার চৌকিদারের আকস্মিক আবির্ভাব যদি হয়—ইত্যাদি ভেবে নিতান্ত অনিশ্চয়তা বোধ করছিলাম।

এইসব দুরন্ত বালকের দল আমাকে প্রায় আধ মাইলেরও বেশি তাড়িয়ে নিয়ে চললো। তাদের না পারি কিছু বলতে, না পারি ভয় দেখাতে। নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন-ভাব দেখানই শ্রেয় মনে হ'ল। আত্মরক্ষার অন্য কোন পন্থাই কাজে লাগলো না। রাগ, দুঃখ বা অভিযোগ জানাব তেমন কেউই তো সেখানে ছিল না - সবক'টি যে বাচ্চা! নিজেকে এত অসহায় মনে হচ্ছিল যে, মাঝে মাঝে রাগে দুঃখে চোখে জল এসে যাচ্ছিল। আশ্চর্য! এতগুলি বালকের মধ্যে একজনও কি ঐরূপ অশোভন ও নিষ্করুণ আচরণের প্রতিবাদ করবে না?

বালকেরা দেখলো তাদের এত গালমন্দ ও টিট্‌কারী আমাকে মোটেই বিচলিত করছে না, তাদের অবিশ্রান্ত ঢিল ছোঁড়ার দিকেও আমার ভ্রূক্ষেপ নেই, স্বভাবতই তাদের উৎসাহ কমে গেল। শেষ পর্যন্ত, প্রায় আধ ঘণ্টা পরে, শ্রান্ত ক্লান্ত ও নিরুৎসাহ হয়ে অশান্ত বালকের দল রণে ভঙ্গ দিল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

এতক্ষণ বালকদের উৎপীড়নে খাওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিলাম—এমন কি নিদারুণ জল-পিপাসার কথাও মনে ছিল না। এখন ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা আমাকে অস্থির করে তুললো। ক্ষুধার জ্বালা তবু খানিকটা সহ্য করা যায়, কিন্তু তৃষ্ণায় আমার বুক যেন ফেটে যাচ্ছিল। চলার পথে যখনই কোথাও ঘোলা জল বা পচা লতাপাতার নিচে সামান্যতম জলও দেখতে পেয়েছি, তখনই তা দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা করেছি। অনেকের হয়ত মনে হবে—এসব লেখার জন্যই লেখা—কল্পনা-বিলাস মাত্র। কিন্তু এগুলি এত বাস্তব, এত সত্য যে, উপন্যাসের রঙীন চিত্রকেও ম্লান করে দেয়।

প্রায় আট বছর পূর্বে একবার আমি আমার মামাদের সঙ্গে আগরতলার পাহাড়ে শিকারে যাই। প্রখর রৌদ্রে পাহাড়ের দুর্গম পথ হাঁটা যে কি কষ্টসাধ্য, তা' যার অভিজ্ঞতা আছে সে ছাড়া অন্য কেউই বুঝবে না। সেদিনও আমরা জলের অভাবে এইরকম ছট্‌ফট্‌ করেছি। সঙ্গে water carrier (বহন করার উপযোগী জলপাত্র) নিয়েছিলাম বটে কিন্তু একটি মাত্র water carrier সকলের তৃষ্ণা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। দুর্গম পাহাড়ের কোন্ এলাকায় কুকীদের বাস, মামারা তা জানতেন। অনেক কুকী পরিবারের সঙ্গে মামাদের পরিচয়ও ছিল। কুকী সম্প্রদায়ের লোকেদের বাড়িতে দেখেছি জল ঠাণ্ডা রাখার জন্য তারা বড় বড় জলভর্তি জালা মাটির নিচে পুঁতে রাখে। তাদের বাড়িতে জল খেয়েছি ও আমাদের সঙ্গের শূন্য জলপাত্রটিও পূর্ণ করে নিয়েছি। কিন্তু এইরূপ একটি বাড়ি থেকে অন্য একটি কুকী পরিবারের বাড়ি পৌছবার মাঝের পথটুকু হাঁটাও প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। আজও আমার মনে আছে সেই সময় মামা আমাকে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়ে দেশের ভাষায় বলেছিলেন—"হেরে, তুই হেতেই জম্যা গেছছ্? হে আর তুই

দেখছচ্ কি? জলের লাগ্যা হেমন হেমন সময় গেছে যহন্ বুকের ছাতি ফাট্যা গেছে। এক ফোঁটা জলের লাগ্যা হাতীর লাদ্দা চিপ্যা জল কর্যা খাইছি।"—(মামা বললেন, এমনও মাঝে মাঝে হয়েছে যে হাতীর বিষ্ঠা নিংড়ে নিয়ে খেয়ে ওঁরা পিপাসা নিবারণ করেছেন)। তখন কথাটা শুনে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩০ সালের ২৬শে এপ্রিল, বিলোনিয়ার পথে আমার যা অবস্থা হ'ল, তাতে মামার সেদিনকার কথা অতি সত্যি বলেই মনে হচ্ছিল।

সেদিন এক ফোঁটা জলের জন্য আমি অনায়াসে সে রকম সব কিছুই করতে পারতাম। চোখের সামনে জল বা খাদ্যের ব্যবস্থার কোন উপায় আছে বলে মনে হচ্ছিল না। এমন সময় প্রায় ছ'সাতশ' গজ দূরে একটি বড় পাকাবাড়ি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। বাড়িটির মস্ত কম্পাউণ্ড পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাড়ির গেট দিয়ে রাস্তাটা সোজা বেরিয়ে ফেণী-বিলোনিয়ার বড় রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। বেরোবার মুখে বাড়ির এই রাস্তার ডান পাশে একটা বড় দীঘি, তাতে বাঁধানো পাকা ঘাট। কম্পাউণ্ডের মধ্যে সাজানো-গোছানো সুন্দর একটি মন্দির। মন্দিরটি খুব বড় না হলেও চোখে পড়বার মত মাঝারি ধরনের তো বটেই। এখন মনে পড়ছে বোধ-হয় পাশাপাশি দু'টি মন্দির ছিল। মন্দিরের অস্তিত্ব, বাড়ির কর্তা ও তাঁর প্রভাবে অন্যান্যদের মানসিক গঠন ও চরিত্র কিরূপ হতে পারে, সেইরূপ প্রাথমিক গবেষণায় সাহায্য করেছিল।

ঐ বাড়ি এবং একটি বা দু'টি মন্দিরের অবস্থান সম্বন্ধে আজ বিশেষ করে উল্লেখের মধ্যে আমার অন্য একটি উদ্দেশ্য আছে। এই লেখাটি যদি বাড়ির সেই দিনের সেই দয়াময়ী বালিকাটি কোনদিন পড়েন, তবে তাঁর যেন বুঝতে ভুল না হয় যে, ক্ষণিকের 'তুচ্ছ' সেই ঘটনার নায়ক ছিলাম আমি। তাঁর অবশ্য সেই সামান্য ঘটনাটি মনে না থাকাই স্বাভাবিক—এইরূপ তুচ্ছ ঘটনা তাঁর জীবনে হয়ত বহু ঘটেছে। কিন্তু এই বাড়ির পটভূমিতে ক্ষণিকের সেই স্মৃতি আমার মন থেকে আজও মুছে যায় নি। আজ ছত্রিশ বছর পরেও লিখতে বসে সেই স্মৃতি আমার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

আমি যদি সেদিন সেই সময়ে একটি নিদারুণ অসহায় অবস্থার মধ্যে না থাকতাম, তবে হয়ত সেই সামান্য ঘটনা আমারও সামান্য বলেই মনে হ'ত। প্রায় বারো ঘণ্টা আগে ফেণীতে পুলিস বেষ্টনী ভেদ করে এসেছি। নিজেদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, বন্ধুদেরও কোন খবর নেই—মন খুবই খারাপ। আবার নিজের নিরাপত্তার জন্য প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় পাগলের অভিনয় করে চলেছি, অশান্ত, অসংযত বালকদের কৌতুকের সামগ্রী হয়েছি, তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে চাতকের মত ব্যাকুল দৃষ্টিতে খুঁজে বেড়াচ্ছি যদি কোথাও একবিন্দু জলের সন্ধান পাই। এমন একটি শোচনীয়

অবস্থায়, -জীবনের এইরূপ সন্ধিক্ষণে—ওই বাড়ি, ওই জলাশয় আমাকে আকর্ষণ করলো।

দীঘিতে নেমে প্রচুর জল খেলাম। তারপর খুব সন্তর্পণে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। দুপুর প্রায় দুটো হবে। এত বড় বাড়ি হলে কি হবে লোকজন কাউকে দেখতে পেলাম না। আমার একা একজন লোকেব সঙ্গে দেখা হওয়া প্রয়োজন, যার সঙ্গে কথা বলতে পারি। তারপর তার কাছে সাহায্যেব জন্য আবেদন জানাব, এই ছিল ইচ্ছে। কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়লাম। তখনও কাউকে দেখতে পেলাম না। একটু দূবে দু'একজন বালক আমাব দৃষ্টি আকর্ষণ কবলো। তারা কম্পাউণ্ডের মধ্যেই খেলা করছিল। আমাকে দেখে তাবা বেশ উৎসুক হয়ে উঠলো। আমার উদ্‌ভ্রান্ত অর্ধ উলঙ্গ বেশ কার না কৌতুহল জাগাবে? ছেলেরা আমাকে দেখেই তাদেব সমবয়সীদের ডেকে কি যেন বললো। দেখতে দেখতে কোথা থেকে প্রায় পনেরো-ষোলজন বালক ছুটে এলো। আমার তো তাদের দেখেই আত্মারাম খাঁচা ছাড়া! আবাব সেই বালকের দল! ছুটে পালাবার উপায় নেই। পনেরো-বিশ হাত ব্যবধানে আমাব সামনে তাবা ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। দলে তারা ক্রমশই বাড়ছে। তাদের মধ্যে আমাকে নিয়েই হাসি ঠাট্টা হচ্ছিল। কেউ কেউ ভয় দেখাচ্ছিল এবং চোখমুখ রাঙিয়ে আমাকে বেড়িয়ে যেতেও বলছিল। তবু বলতে হবে এরা অনেক শান্ত, অনেক ভদ্র—তখনও ঢিল ছুঁড়তে সুরু কবে নি।

তাদেব সহানুভূতি লাভেব আশায় আমি হাত ও মুখেব ভঙ্গিতে ইশারায় পেটের অবস্থা জানিয়ে আমাকে কিছু খেতে দেবাব জন্য নির্বাক আবেদন জানালাম। তখনও আমি কালা ও বোবা—মুখে কিছু বলতে পারছি না, কানেও কিছু শুনছি না; ইসারা ও ইঙ্গিতেই কথা বলি এবং বুঝি।

ব্যথাতুর দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল কবে তাকিয়ে রইলাম। দাঁড়াতে পারছি না—এই রকম ভান করে আগেই বসে পড়েছিলাম, এখন যেন আর বসারও ক্ষমতা নেই। আধ-শোয়া অবস্থায় শরীরটা উঠোনের ওপর এলিয়ে দিলাম। আশ্চর্য! আমার কোন অভিনয়ই তাদের মন স্পর্শ কবলো না। বালকের দল ক্রমেই অধীর হয়ে উঠছে—আমার সব কিছুই তারা বাড়াবাড়ি বলে মনে করছে এবং বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করাটা আমার অনধিকারচর্চা বলেই ভাবছে। তারপর আমার বসে পড়া এবং আস্তে আস্তে সেখানেই শোয়া, ছেলেরা একেবারেই পছন্দ করলো না। সকলেই উত্তেজিত—তাদের অতগুলি ছোট ছোট হাত এক সঙ্গে কিল, ঘুষি বাগিয়ে উঠলো—যদি বেরিয়ে না যাই আমাকে যেন মেরেই খুন করবে। অবশ্য গায়ের কাছে আসতে কেউই সাহস করছিলনা—যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে বা এক পা দু'পা এগিয়ে

বলতে হবে যে, তখনও পর্য্যন্ত কোন বয়স্ক লোকের দেখা পাইনি। যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে—এই বালকদের ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ বয়স্ক কেউ এসে পড়লেও আমার মুখ ফুটে কিছু বলা সম্ভব হ'ত না—আমাকে বোবা সেজেই থাকতে হ'ত! আর কোন উপায় নেই দেখে সেই স্থান পরিত্যাগের জন্য প্রস্তুত হলাম। যেই উঠতে যাচ্ছি, কানে এলো—"কেন ওকে বিরক্ত করছিস্? তোদের কি একটুও দয়া মায়া নেই?"—একটি বালিকার কণ্ঠে ধমকের স্বর! মেয়েটি বোধহয় ভিড়ের মধ্যে পেছনের দিকে ছিল, তাই তাকে এতক্ষণ দেখতে পাই নি। নানারূপ ভান ও অভিনয় করার দরুণ আমার দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত ও অর্থহীন করে রাখতে হয়েছিল—যেন কিছুই দেখছি না বা বুঝতে পারছি না। এই জন্যই ওই বালকদের দলে কোন বালিকার অস্তিত্ব এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি।

ছোট্ট মেয়ের কচিকণ্ঠে যখন অকস্মাৎ ধ্বনিত হ'ল, 'কেন ওকে বিরক্ত করছিস্—তোদের একটুও দয়া মায়া নেই'—আমি ক্ষণিকের জন্য অভিভূত হলাম। কে এই বালিকা? এইটুকু দয়া, এই সামান্য সহানুভূতিটুকুর জন্যই প্রায় বারো ঘণ্টা ধরে, সহস্র দুর্বিপাকের মধ্যেও, আকুল প্রতীক্ষায় ছিলাম। কোথাও কোন ভরসা পাই নি, কারো কাছে কোন সাহায্যের আশাও ছিল না, লোক দেখলেই আগে-ভাগে সরে গেছি, কারো কাছে বলতে গিয়েও বলা হয় নি—অনেকে সন্দেহ করেছে, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, বালকদের কাছেও তাড়া খেয়েছি—ওরা মনের সাধে কটুকথা বলেছে, ঢিল ছুঁড়েছে। তারপর বড় বাড়ি ও মন্দির দেখে খুব আশা নিয়ে এগিয়েছি যদি একটু আশ্রয় পাওয়া যায়! কিন্তু মারমুখো ছেলেদের উত্তেজনা ও তাদের কিল ঘুষির মহড়া দেখে যখন এইসব অর্বাচীনদের প্রতি শত অভিযোগ নিয়ে অভিমানভরে চলে যাচ্ছি, তখন সেই করুণামাখা কণ্ঠস্বর আমাকে চমকিত—বিচলিত করলো! কে এই সহানুভূতিশীলা বালিকা? কে এই বালিকা, যার হৃদয় আমার দুঃস্থ অসহায় অবস্থা দেখে বিচলিত হয়েছে? আমার চোখ দু'টি চঞ্চল হয়ে উঠলো—সেই বালকদের ভিড়ের মধ্যে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম কোথায় সেই বালিকা?

একটু মুখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেলাম—একটি ছোট্ট মেয়ে, বয়স নয়-দশ বছর হবে—ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। সে দু'হাত তুলে খুব সহানুভূতির সঙ্গে ইঙ্গিতে আমাকে বসতে বললো। তারপর বালক-সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে আদেশের সুরে বলে উঠলো—"তোরা ওকে বিরক্ত করবি না, ওর ক্ষিদে পেয়েছে, আমি ওর জন্য ভাত নিয়ে আসি।" এই বলে মেয়েটি দ্রুতগতিতে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

করুণাময়ী মূর্তি! উজ্জ্বল গৌরবর্ণা, মুখ চোখ যেন তুলিতে আঁকা। অতি সাধারণ একটা শাড়ি পরা—কোথাও কোন বাহুল্য নেই। করুণাঘন দৃষ্টি—বেদনা, দয়া ও সহানুভূতির সে যেন এক জীবন্ত প্রতিমা!

কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটি ফিরে এলো। কলাপাতায় সাজানো ভাত দু'হাতে ধরে নিয়ে এসেছে। অতিথি সেবার উপচার ছোট ছোট কচি দু'টি হাতের অপূর্ব শোভাবর্ধন করেছে। মেয়েটির গতি ক্রমেই মন্থর হ'ল। সে ইতস্তত করছিল—মনে হ'ল কাছে আসতে ভয় পাচ্ছে। প্রায় হাত পনেরো দূরে কলাপাতায় সাজানো ভাত মাটিতে রেখে দিল। তারপর ইশারায় আমাকে সেই ভাত তুলে নিয়ে দীঘির পাড়ে বসে খেতে বললো। নানা ইঙ্গিতে বারে বারে সে বোঝাতে চাইল আমি যেন ভাতগুলি নিয়ে কম্পাউণ্ডের বাইরে দীঘির পাড়ে যাই। অন্যান্য বালকেরাও একইভাবে ভাত নিয়ে বাইরে খাওয়ার কথা আমাকে বোঝাতে চাইল। মেয়েটির ধমক খাওয়ার পর থেকেই ছেলের দল বেশ সংযত হয়ে গিয়েছিল।

যে মেয়েব এতখানি দরদ, এত সহানুভূতি—যে মুহূর্তে আমার জন্য ভাত, ডাল, তরকারী সাজিয়ে নিয়ে এলো, সে নিশ্চয়ই এই বড় বাড়িরই কেউ হবে। হয়ত সে কোন সম্পদশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা, তবু তার বেশ-ভূষায় ও শান্ত-সংযত চলা-ফেরায় সম্পদ বা আভিজাত্য দম্ভের লেশমাত্র স্পর্শ নেই। তাই সে আরও সুন্দর—বাইরের চাকচিক্য বা বেশ-ভূষায় নয়, অন্তরের সম্পদে ঐশ্বযময়ী ভারতমাতার এক অসামান্যা কন্যা সে!

কিন্তু এত দরদ যে মেয়ের, সেই আমাকে নির্দেশ দিচ্ছে বাইরে বসে খেতে? তার এই আদেশে কঠোরতা ছিল না, ছিল অনুনয়! এই বালিকা আমার অন্তরের শ্রদ্ধা আকযণ করেছে। আমি তার কথামতই ভাত-তরকারী নিয়ে কম্পাউণ্ডের বাইরে দীঘির পাড়ে গিয়ে বসলাম। ভাত নিয়ে দীঘির পাড়ে আসা অবধি অর্ধ-পাগলের যা যা করা উচিত, সেইমত অভিনয় করে চলেছি। বালকের দল এই 'পাগলটিকে' নিয়ে খুব কৌতুক উপভোগ করছিল। তারা সবাই আমার পেছন পেছন দীঘির পাড় অবধি এলো। আমাকে নিয়ে আমোদ উপভোগের পালা এখনও শেষ হয় নি—আমার খাওয়াও তাদের দেখতে হবে।

আহার্য হাতে তুলে নেওয়ার পর আমার আর তর সইছিল না। অনাহারক্লিষ্ট পাকস্থলীর সমস্ত মাংসপেশী এক সঙ্গে যেন বিদ্রোহ করে উঠলো। তাদের এক্ষুণি শান্ত করতে হবে। ভাত, ডাল, তরকারী আর মাঝারি আকারের চিংড়ি মাছ ছিল একটি। পোলাও-মাংস জীবনে অনেক খেয়েছি, কিন্তু সেদিনের এই খাবার

অসুমের।

খাওয়ার ভঙ্গিটা ইচ্ছে করেই পাগলের মত করছিলাম—কখনো দু'হাতে খাচ্ছি, আবার কখনও কোন্‌টা খাবো যেন বুঝতে পারছিনা মত ভান করে চলেছি। সবটাই বালকদের কাছে আমোদের বিষয়—হাসি আর হাসি; হাসতে হাসতে তারা একেবারে লুটোপুটি!

এই আনন্দমুখর বালকদের দলে আগাগোড়াই সেই লক্ষ্মীপ্রতিমা বালিকাটি উপস্থিত ছিল। বালকদের এই কৌতুক উৎসবে মেয়েটির শান্তভাবের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম চোখে পড়ে নি। কিইবা তার বয়স—তবু ও যে একটি মেয়ে—মায়ের জাত! এই বয়সেই দরদ দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে, পরের দুঃখ ব্যথা উপলব্ধি করার শক্তি তার হয়েছে। আমি যতক্ষণ পাগলামীর ভান করে সেখানে খাচ্ছিলাম, ততক্ষণ আমার দৃষ্টি অন্যের অগোচরে মেয়েটির প্রতি নিবদ্ধ ছিল। আমি তার প্রতিটি আচরণ নিরীক্ষণ করছিলাম। সুলক্ষণা, অসামান্যা এই মেয়েটিকে ঋষি বঙ্কিমের কল্পনাসৃষ্ট ভবানী পাঠক যদি একবার দেখতে পেতেন, তবে কি তিনি এই বালিকাটিকেও দেবী চৌধুরাণীর আসনে বসবার উপযোগী করে তুলবার শিক্ষা দিতেন না?

আমার খাওয়া শেষ হ'ল। নাটকের এই অঙ্কে শেষ যবনিকা টেনে আমায় উঠতে হ'ল। ক্ষণিকের অতিথি আমি, উদ্দেশ্য আমার সামান্যই—ক্ষুধার জ্বালা মেটাবার জন্য চেয়েছিলাম আহার। আহার্য পেয়েছি—পেট ভরে খেয়েছি, তবু যাবার সময় মনের ওপর এই প্রতিক্রিয়া কেন? বালিকাটির প্রতি আমার যেন কেমন মায়া জন্মেছে।

আনন্দমঠে ভবানন্দ মহেন্দ্রকে বলছেন—"আমাদের মা নেই, বাপ নেই, ঘর নেই, বাড়ি নেই, আমরা জানি জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। মহেন্দ্র অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো—'তোমাদের মায়া নেই?' তখন ভবানন্দ বলিলেন—'যে বলে মায়া নেই সে হয় মিথ্যা ভান করে নয়তো কোনদিনই তার মায়া ছিল না। আমাদের মায়া আছে তবে আমরা মায়া কাটাই'।" আমাকেও মায়া কাটাতে হবে। মায়ার বন্ধন আমাদের বেঁধে রাখতে পারে না। বালিকাটির মধুর ব্যবহার ও সহানুভূতি আমাকে আকর্ষণ করেছে। জীবনে এর পুর্বে আর কখনও কোন ছোট ছেলে বা মেয়ে আমার হৃদয় এতখানি কি জয় করতে পেরেছিল? সেই অসহায় অবস্থায়, যখন একটু করুণা, একটুখানি দয়া ও সামান্য সহানুভূতির জন্য আমার প্রাণ উন্মুখ, তখন এই বালিকার হৃদয়ের প্রসারতা, মানুষের প্রতি দয়া, আমাকে অভিভূত করেছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই অনামী অখ্যাত সামান্য ছোট্ট মেয়েটির কি স্থান থাকবে না?

এখন আমায় যেতে হবে। যাওয়ার আগে সেই মেয়েটির কাছে বিদায় নেবার ইচ্ছে ছিল। এমন কি সম্ভব হলে, আমার পরিচয়টুকু দিতে পারলেও ভাল লাগতো। কিন্তু কিছুই না বলে চলে আসতে হ'ল। না বলে চলে আসার বেদনা অনুভব করছিলাম। বালকের দল দীঘির পাড় ধরে কিছুটা পথ আমাকে অনুসরণ করে এলো। আমি শেষবারের মত ফিরে তাকালাম। মেয়েটি তখনও বালকদের সঙ্গে ছিল। আমি মেয়েটির ক্ষণিক আতিথ্যের এই স্মৃতিটুকু নিয়েই বিদায় নিলাম।

সামান্য ঘটনার এই ক্ষুদ্র স্মৃতিটুকু আজও বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায় নি। অন্যের কাছে এই ক্ষণিকের ক্ষুদ্র ঘটনা যতই নগণ্য হোক্ না কেন, আমার কাছে এই ছোট্ট মেয়েটির ছোট্ট করুণার স্পর্শ অতীত স্মৃতির অনেকখানি জুড়ে আছে। পাঁচ বছর পূর্বে যখন 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' ইংরেজী দৈনিকে প্রতি সপ্তাহে লিখছিলাম তখনও এই ঘটনার উল্লেখ করেছি। তখনও আমার ইচ্ছে ছিল অপ্রত্যাশিতভাবে কোন সময়ে সেই বালিকাটি (আজ যার বয়স পঁয়তাল্লিশ বা ছেচল্লিশের বেশি হবে না) যদি একবার এই লেখাটি পড়েন তবে আমার খুব ভাল লাগবে। আরও ভাল লাগবে যদি আজকের এই বাংলা লেখাটি কোন সময়ে কোন কারণে একবার পড়ে তিনি ছত্রিশ বছর আগেকার সেই দিনের সেই সামান্য ঘটনাটি মনে করতে পারেন।

জানি না আজ তিনি কোথায়। ফেণী-বিলোনিয়ার বড় রাস্তার কোন এক জায়গায় তাঁদের বাড়ি। বাড়িতে মন্দির আছে। কম্পাউণ্ড পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাড়ির সামনে ডান পাশে বড় পুকুর বা দীঘি—দীঘিতে পাকা ঘাট। একদিন দুপুর বেলায় একজন অর্ধ-পাগল প্রায় নগ্ন অবস্থায় ক্ষুধার তাড়নায়, আহারের আশায় এই বাড়িতে গিয়েছিল। একটি নয়-দশ বছরের বালিকা অশান্ত ছেলেদের উৎপীড়নের হাত থেকে 'পাগলটিকে' বাঁচিয়ে সযত্নে খাবার এনে তাকে খাওয়ায়। ভারতের স্নেহময়ী নারীর প্রতিমূর্তি সেই শ্রদ্ধেয়া বালিকাটির প্রতি আজ আমার আবেদন, যদি কোনদিন আমার এই লেখাটি পড়ে এই সামান্য ঘটনার স্মৃতি তাঁর মনে জাগে তবে কোন আপত্তি না থাকলে একটি চিঠি লিখলে খুশি হবো। ঠিকানা এই বইয়ের প্রেসেই পাওয়া যাবে। সকলকে জানাবার অভিপ্রায়েই যদিও আমার এই ঘটনাটি লেখা, তবু বিশেষ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়েছি লেখবার জন্য—যদি লেখাটি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে! তাঁর পাকিস্তানে থাকার সম্ভাবনাই বেশি; কারণ, তাঁদের বাড়িটি পূর্ব-পাকিস্তান এলাকায় পড়েছে। কাজেই আমার এই লেখাটি তাঁর হাতে কোনদিন গিয়ে পৌছবার আশা খুবই কম।

আজ আমার বয়স চৌষট্টি। আমার অবর্তমানে পুরনো কাগজের গাদা থেকে উদ্ধার পেয়েও এই লেখাটি কোন একদিন যদি তাঁর হাতে গিয়ে পড়ে,

সেদিন তিনি বুঝবেন বাংলার অগ্নিযুগের সৈনিকেরা কেবল ইংরেজের বিরুদ্ধেই রক্তাক্ত সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, তাদের দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা, প্রভৃতি কিছুই ছিল না—তা' নয়। তাদের অন্তরেও স্নেহ-মমতা, আবেগ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অনুভূতি কারো চেয়ে কম ছিল না।

এই মধুর স্মৃতি আমাব জীবনেব একটি অপূর্ব সঞ্চয়! এই স্মৃতি ভোলা যায় না, আমি ভুলতে পারি নি। সেদিনের হে অনামী, অখ্যাত, সামান্য বালিকা! তোমার মমতাপূর্ণ দরদী হৃদয়ের প্রতি সেইদিনই আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছি। আজ দীর্ঘ ছত্রিশ বছর পরেও আমার সেই শ্রদ্ধা অটুট আছে। যদি কোনদিন এই সামান্য ঘটনা তোমার মনে পড়ে তবে জানবে, উন্মাদ বেশে যে ক্ষণিকেব অতিথি তোমাদের বাড়ি গিয়েছিল সে আ কেউ নয়—ভারতের মুক্তি-যুদ্ধেব একজন সৈনিক—অনন্ত সিংহ।

ফেণী-সংঘর্ষের বিবরণ দিতে দীর্ঘ সময় লেগে গেল। আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে এক প্রচণ্ড আসন্ন যুদ্ধের সম্মুখে প্রধান-বাহিনীকে আমরা ছেড়ে এসেছি। জালালাবাদেব তু'মাইলের মধ্যে চৌধুরীহাট। কর্নেল ডালাস্ স্মিথ এখানে সৈন্যশিবির স্থাপন করে বিপ্লবীদেব আক্রমণ করবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বিপ্লবীদের খোঁজে চারিদিকে চর পাঠানো হয়েছে। তু'জন "চাষী" পাহাড়ের ওপর বিপ্লবী-বাহিনীর অবস্থান দেখবার স্থযোগ পেয়েছিল। এই তু'জনকেই সকাল এগারোটা থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বন্দী করে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের বিপ্লবী নায়কেরা ভুল করেছিলেন —তু'জনকেই স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। শত্রুপক্ষ এই ভুলের পূর্ণ স্থযোগ নিল—

"That same afternoon S. I. Moidhar Ali brought information about the where abouts of the raiders to the Superintendent of Police who sent him and Hem Cupta to verify it. They went out by taxi to Jharjaria Battali about six miles from Chittagong picking up on route S. I. Fazlur Rahaman of Panchalais P. S., who was on his way to the S. P. with similar news. At Jharjaria Battali they made further inquiries and brought back with them to the Superintendent of Police a man who had given them the detailed and reliable information which they were seeking. At the time S. I. Abdur Rahim had also been sent to Jharjaria Battali to make inquiries. If he found the information to be correct he was to go on to Chowdhury-hat and inform Col. Dallas Smith and his party. This he did.

"About 3-30 p.m. Hem Gupta and Moidhar Ali returned to

Chittagong and reported to the Superintendent of Police what they learned......" (Judgement Chittagong Armoury Raid Case No. 1).

—দারোগা হেম গুপ্ত ও মইধর আলীকে প্রধান পুলিস সাহেব বিদ্রোহীদের আস্তানার সংবাদ সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছিলেন এবং মইধর আলী বিপ্লবীদের অবস্থানের সংবাদ নিয়ে পুলিস সাহেবের কাছে ফিরে এলেন। তাঁরা দু'জন ট্যাক্সিতে শহর থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে, ঝরঝরিয়া বটতলীতে যান এবং পাঁচালাইশ থানার দারোগা ফজলুর রহমানকে গাড়িতে তুলে নেন। তিনিও অনুরূপ সংবাদ নিয়ে পুলিস সাহেবের কাছে যাচ্ছিলেন। তাঁরা ঝরঝরিয়া বটতলীতে আরও খবরাখবর সংগ্রহ করে তাঁদের সঙ্গে এমন একজন লোককে পুলিস সাহেবের কাছে হাজির করেন, যার কাছে তাঁদের বহু আকাঙ্ক্ষিত নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায়। এই সময় দারোগা আব্দুর রহমানকে আরও বিস্তারিত খবরের জন্য ঝরঝরিয়া বটতলীতে পাঠানো হয়। তিনি ঐ লোকের সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলে তাঁর প্রতি নির্দেশ ছিল, চৌধুরীহাটে গিয়ে কর্নেল ডালাস্ স্মিথ্ ও তাঁর পার্টিকে সব জানাতে। আব্দুর রহমান তাই করেছিলেন।

সাড়ে তিনটের সময় হেম গুপ্ত ও মইধর আলী শহরে ফিরে এসে পুলিস সাহেবকে আরও বিশদ খবর জানান।

শত্রুপক্ষের এই তৎপরতার কথা পাহাড়ের ওপর বিপ্লবীদের জানবার কথা নয়—জানা সম্ভবও ছিল না। তবে সেদিন সকাল থেকেই একটার পর একটা অমঙ্গলের সূচনা হয়েছে। আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধোপযোগী পাহাড়ে আশ্রয় নিতে না পেরে বাধ্য হয়ে অপেক্ষাকৃত নিচু টিলায় শিবির স্থাপন করা, ভোর হবার আগে টিলার ওপর উঠতে না পারায় তাদের প্রতি কয়েকজন চাষীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া, সকাল এগারোটায় বিনা প্রয়োজনে দু'জন চাষীর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব এবং তাদের বন্দী না করে ছেড়ে দেওয়া—এই সব কিছুর অমার্জনীয় ত্রুটি আজ যেন তাদের ক্ষমা করবে না। বিপ্লবীরা বুঝেছিল এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনাও করেছিল যে, শহর আক্রমণের সুযোগ তারা বোধহয় আর পাবে না। সত্যিই, ভোরের অমঙ্গল ইঙ্গিত সারাদিনের দুর্যোগের বার্তাই ঘোষণা করে গেল। কিন্তু কে জানতো আজই শহীদ-রক্তে ভারতে একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচিত হবে!

বেলা প্রায় দুটোর সময় বিপ্লবী শিবিরে পাহারারত সুবোধ রায় চকিত বিস্ময়ে দেখলো অদূরে আর একটি টিলার ওপর থেকে একজন "চাষী" রুমাল, গামছা অথবা তার গায়ের জামা নেড়ে কাউকে যেন ইশারায় কিছু জানাচ্ছে। সুবোধ সহজেই অনুমান করে, শত্রুপক্ষকে তাদের অবস্থান জানাবার উদ্দেশ্যেই এই সঙ্কেত। সুবোধ রায় তার সাথী মনোরঞ্জন সেনের দৃষ্টি এই "চাষীর" প্রতি আকৃষ্ট করে।

এই সঙ্কেতের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তারা দু'জনেই একমত। সঙ্গে সঙ্গে নেতাদেরও তারা এই সংবাদ জানায়। মুখে মুখে সবার কাছেই খবর পৌছলো। সকলেই নিজ নিজ বন্দুক ও রিভলভার পরীক্ষা করে নিল—ট্রিগার, স্ট্রাইকিং পিন্ ও চেম্বারে টোটা ভর্তি আছে কিনা।

যুদ্ধ আসন্ন, মৃত্যু শিয়রে দাঁড়িয়ে—সকলেই বুঝেছিল আর দেরি নেই আজই পরীক্ষার চরম মুহূর্ত আগত! তবু নিজেদের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা গল্প-গুজব সমানে চলেছে। নির্মলদা বললেন—"অম্বিকাদা, আজ হয়ত মরতেই হবে। তবে মরবার আগে চপ কাট্‌লেট্ খেতে ইচ্ছে করছে।" অম্বিকাদা হেসে উত্তর দিলেন—"যুবক সাথীরা যুদ্ধের অভিলাষে সময় গুণছে। সশস্ত্র সংগ্রামের তীব্র ক্ষুধা যাদের, তাদের কি এখন চপ কাট্‌লেট্ খেতে ইচ্ছে করবে?" অম্বিকাদার কথা শেষ হবার আগেই স্বর্ণপদকধারী কৃতী যুবক ডাক্তার, বৈপ্লবিক চরিত্রের মাধুর্যের মধ্যেও হাস্যরসে রসিক —বিধু ভট্টাচার্য, হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে বলে উঠলো—"এ কি বলছেন অম্বিকাদা? আপনি তো কেবল রথ দেখার কথাই ভাবছেন, আমরা যে রথও দেখবো, কলাও বেচবো—যুদ্ধও করবো, আবার চপ কাটলেট্‌ও খাব।" আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় কে এরা মরণ-বিজয়ী বীর?

বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে বিপ্লবীরা পাহাড়ের ওপরে ছড়িয়ে বসেছে। এক কোণে বসেছে সুরেশ দেব, শম্ভু দস্তিদার, শান্তি নাগ, জিতেন্দ্র দাশগুপ্ত আর বিনোদ চৌধুরী। প্রত্যেকেরই মুখ দৃপ্ত, উদ্ভাসিত—প্রত্যেকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—প্রাণ দেবে, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের মেরে তবেই মরবে।

আর একটু দূরে একসঙ্গে চক্রাকারে বসেছে ক্ষীরোদ ব্যানার্জী, কালী চক্রবর্তী, হেমেন্দু দস্তিদার, অর্ধেন্দু দস্তিদার এবং রণধীর দাশগুপ্ত। তারা আজকের যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করে মৃত্যুসঙ্কল্প ঘোষণা করেছে। তখনও কেউ ভাবতে পারেনি তাদের মধ্যে অর্ধেন্দু দস্তিদার আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই তার বুকের রক্তে জালালাবাদের পাহাড়টিকে রাঙিয়ে দেবে—ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধের অমর শহীদ হবে।

তাদের পাশে একটি গাছের ছায়ায় একসঙ্গে বসেছে—মধুসূদন দত্ত, কৃষ্ণ চৌধুরী, বিনোদ দত্ত, ননী দেব, কালী দে ও মলিন ঘোষ। মধুসূদনই এদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। মধুসূদনের বড় ভাইটি আমারই সমবয়সী। তারা দুই ভাই দেখতে প্রায় একই রকম। একেবারে প্রথম থেকেই মধুসূদন আমাদের সঙ্গে বিপ্লবী দলে ছিল। আমি তাদের দু'জনকে প্রায়ই ভুল করতাম। মধু ধনী জমিদার বাড়ির ছেলে, যুব-বিদ্রোহে যোগ দিতে নিজ বাড়ির বন্দুকটিও সঙ্গে নিয়ে চলে এসেছিল। মধুর প্রতি সবারই খুব শ্রদ্ধা। ধীর শান্ত অথচ দৃঢ়চিত্ত মধু সকলকেই মুগ্ধ করেছিল।

অনেকেরই মনে হয়েছিল—চারদিন ধরে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে পঞ্চম দিন প্রত্যূষে শহর আক্রমণ সফল হবে না, হতে পারে না। কারণ শত্রুপক্ষ এতদিনের মধ্যে তাদের অপর্যাপ্ত শক্তি নিয়ে শহরে নিশ্চয়ই ব্যূহ রচনা করেছে—কাজেই বীরের মত মরা ছাড়া অন্য কোন প্রোগ্রামের সফলতার কথা ভাবা তাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবেনা। মধুসূদন তাদের মধ্যে এইরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে সেই গ্রুপকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল—

"দেখ ভাই সব, বিপ্লবীরা পেছন দিকে তাকিয়ে মাঝপথে থমকে দাঁড়াতে পারে না। চলার পথে ভুল-ত্রুটি আছে—থাকবেও। সেই জন্য অবসাদক্লিষ্ট হওয়া আমাদের শোভা পায় না। আমরা কি আমাদের ভুলের সমাধির ওপর বীরত্বের বিজয় পতাকা উড়িয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধকে শক্তিশালী করে তুলতে পারি না?" সবার মুখে দৃঢ়তা ফুটে উঠে। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ তরঙ্গের বেগ হঠাৎ যেন বিপ্লবী তরুণদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তরুণ সাথীদের বীরত্বপুর্ণ লড়াই দেখতে মধুসূদন আর বেঁচে রইল না—সে আর পেছন ফিরে তাকাল না। বিপ্লবের সম্মুখগতি অব্যাহত রাখতে সে প্রাণ দিল—'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি তাড়াতাড়ি!'

সহায়রাম দাস ও মতি কানুনগো, দুই বন্ধু একসঙ্গে গভর্ণমেণ্ট কলেজিয়েট স্কুলে পড়তো। দু'জনেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। মতি আমাদের যুব-সাথী মিহির বোসের বাবার বন্দুক নিয়ে এসেছে। ভাল ছেলে মিহির বাবার বন্দুকটি মতির হাতে তুলে দিয়ে দিব্যি ভেজা বেড়ালটির মত বাড়িতে বসে রইল—২৩শে তারিখ সকালে ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখায় মিহির যোগ দেবে। কিন্তু জালালাবাদ পাহাড়ে ২২শে তারিখে বিকেলে সহায়রাম ও মতি ভাবছে মিহিরের কি হ'ল—তার বাবারও বা কি হতে পারে? বাড়ি থেকে বন্দুক যারা এনেছে, কর্তৃপক্ষ তাদের বাড়ির ওপর কতখানি জুলুম করছে তাই নিয়ে তারা দু'জনে আলাপ করছিল। তাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিয়েছে সুবোধ রায়। সেও বাড়ির বন্দুক অপহরণ করেছে। সুবোধ বলল—"এই নিয়ে মিথ্যা গবেষণা। যা হবার তা হবেই। খুব জোর বাড়ির কর্তার ওপর জুলুম করবে। কতখানি জুলুম করবে তা' কে বলবে? আমাদের সব অবস্থার জন্যই প্রস্তুত থাকতে হবে।" এই গ্রুপের সঙ্গে বিধু সেন, নারায়ণ সেন (অনাথ রায়) ও পুলিনবিকাশ ঘোষও আছে। সকলেই মরবার জন্য প্রস্তুত। তাদের মধ্যে শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে মতি ও পুলিনের।

অপর একটি ছোট দলে বসে আছে ছ'জন—মহেন্দ্র চৌধুরী, নির্মল লালা, বীরেন্দ্রকিশোর দে, নিতাইপদ ঘোষ ও বিজয় সেন। নির্মল লালা চোদ্দ-পনেরো বছরের বালক, টেগ্‌রা বলেরই সাথী এবং সমবয়সী। অপূর্ব তার মনোবল।

সবাইকে উৎসাহ দিয়ে প্রাণবন্ত করে রেখেছিল সে। সেই দলে সে যেন একটি জীবন্ত অগ্নিগোলক। এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে নির্মলও ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সুদৃঢ় সোপান রচনা করে গেল।

এই গ্রুপে নিতাইপদ ঘোষের বলিষ্ঠ দেহসৌষ্ঠব সবাইকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেছিল। শান্ত ধীর ও গম্ভীর নিতাই অত্যন্ত স্বল্পভাষী—তার মুখে কথা কম, কিন্তু অন্তরে দুর্জয় সাহস ও স্বার্থত্যাগের স্পৃহা সংগঠনের সবার কাছেই তাকে প্রিয় করে তুলেছিল। যুব-বিদ্রোহের দিন দুই আগে নিতাই বাড়ি থেকে প্রায় দু'হাজার টাকা নিয়ে আসে। নিতাই সুবোধ চৌধুরীর বিশেষ বন্ধু। সেও সুবোধ চৌধুরীর কোয়ার্টারের কাছেই রেলের ক্লাস-কোয়ার্টারে থাকতো। নেতৃস্থানীয় অনেকে যদিও নিতাইকে জানতো, তবু গুপ্ত সংগঠনের রীতি অনুযায়ী তার পরিচয় সকলের জানবার সুযোগ হয় নি। তাই স্বীকারোক্তিতে তার নাম-ধাম ও পরিচয় পুলিস পায় নি। নিতাইকেও আসামীর কাঠগড়ায় আমাদের সঙ্গে মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত দু'টি বৎসর অপেক্ষা করতে হয়েছে। কিন্তু শেষে প্রমাণ অভাবে তাকে মুক্তি দিতে শত্রুপক্ষ বাধ্য হয়েছে।

নির্মল লালার গুলীবিদ্ধ মৃতদেহও কেউ সনাক্ত করতে পারে নি এবং তারও নাম পুলিস জানতে পারে নি। নির্মল লালার মৃতদেহকে পুলিস সুধাংশু বোস বলে সনাক্ত করেছিল। পুলিসের অত সাক্ষী এবং বিশ্বাসঘাতকদের স্বীকারোক্তিও শত্রুপক্ষকে নির্মল লালার পরিচয় জানতে সাহায্য করে নি।

হাতে পুলিস মাস্কেট্রি, কোমরে রিভলভার—বনবিহারী দত্ত, অশ্বিনী চৌধুরী, শম্ভু দস্তিদার, প্রভাস বল, শশাঙ্ক দত্ত এবং সুবোধ বল আসন্ন যুদ্ধের জন্য দৃঢ়সংকল্প। তারা ভাবছে সেই 'চাষী' কাকে সংকেত পাঠালো—অতর্কিত আক্রমণ কখন ও কোন্ দিক দিয়ে আসতে পারে? সজাগ দৃষ্টি, সদা ক্ষিপ্রগতি ও দুর্জয় সাহস হ'ল বর্ত্তমানে তাদের একমাত্র রণনীতি। শত্রু আক্রমণ করবে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে— অসমান সামরিক শক্তির মধ্যে লড়াই হবে। পাঁচগুণ বেশি সংখ্যক সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে—কারণ, সাধারণ সামরিক নীতি অনুসারে পাঁচ গুণ বা তিন গুণ বেশি শক্তি নিয়ে জয়ের আশায় আক্রমণ করতে হয়। চতুর্থ দিনে কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রামে বহু সৈন্য আমদানী করেছে, তাই বিপ্লবীদের অবস্থান সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে যখন তারা আক্রমণ করবে, তখন বিদ্রোহীদের পরাজিত ও বন্দী করাই যে তাদের একমাত্র লক্ষ্য তাতে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। তাই অসমান শক্তির লড়াইয়ে বিপ্লবীদের সামরিক শক্তির স্বল্পতা সম্বন্ধে আমাদের প্রধান-বাহিনী খুব সচেতন। তবু এই যুদ্ধে আজ বিপ্লবীদের প্রমাণ করতেই হবে বিপ্লবী শক্তি অনমনীয় এবং অপরাজেয়! শশাঙ্ক দত্ত ও প্রভাস বল ভাবাবেগে বলে উঠলো—"আজ আমরা

ইতিহাসের পাতায় দ্বিতীয় 'হলদিঘাট' রচনা করবো।" এই মনোবল নিয়েই মেশিনগানের বিরুদ্ধে তারা বিরামহীন মাস্কেট্রি চালিয়েছে—পরাজয় মেনে নেয় নি —মৃত্যু বরণ করেছে!

ভয়-ভাবনা ও শঙ্কাহীন ছ'জন মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণ বিপ্লবী, পাহাড়ের একটি কোণে পজিশান্ নিয়ে বসেছে। সুবোধ চৌধুরী, ফণীন্দ্র নন্দী, ভবতোষ ভট্টাচার্য, হরিপদ মহাজন, সুধাংশু বোস এবং সরোজ গুহ—এরা সকলেই জানে আত্মরক্ষার জন্য কোন আড়ালের সুবিধে তারা পাবে না। তাই এমন একটি স্থান তারা বেছে নিয়েছে, যেন নিজেদেব অস্তিত্ব গোপন রেখে বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টিনিক্ষেপ করা সম্ভব হয়। শত্রুপক্ষ সংকেত পেয়েছে—যুদ্ধ আসন্ন। অন্তিম যুদ্ধের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তরুণ বিপ্লবীরা প্রস্তুত। "জীবন কি এতই মধুব—শান্তি কি এতই প্রিয়? হে ভগবান! কাব কি মনোবাঞ্ছা জানি না—আমাব একমাত্র কামনা: স্বাধীনতা না হয মৃত্যু!" —হেন্‌রী প্যাট্রিকের এই মহান বাণী বিপ্লবীদের অন্তরে ধ্বনিত হতে লাগলো। শত্রু যখন পাঁয়তারা কষছে, সৈন্য সমাবেশ করছে, বিপ্লবীরা তখন সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য নিজ শক্তি সঞ্চয় করছে। যুদ্ধ হবে সাম্রাজ্যবাদী সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে দুর্জয় বিপ্লবী শক্তির।

ব্রীগেডিয়ার ত্রিপুবা সেনের সঙ্গে মনোরঞ্জন সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, স্বদেশ বায এবং টেগ্‌রা (হরিগোপাল বল)—কি অপূর্ব যোগাযোগ! গোপনে বসে তারা কি পবামর্শ করছে? তারা মৃত্যুব সঙ্গেই এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। টেগ্‌রা সবাইকে বলে শপথ নিতে—"আমবা এখন আর ভাববো না। আমাব মনে হয়, আক্রমণ করবাব আগেই আমবা আক্রান্ত হব। এই সঙ্কট মুহূর্তে আমাদেব একমাত্র কাজ দ্বিধাহীন চিত্তে, সংঘবদ্ধভাবে, মনে কোন ক্ষোভ না বেখে অসম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করা। আমাদের সাহস ও বিক্রম দেখে শত্রুপক্ষ স্তম্ভিত হোক্। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে মরণপণ যুদ্ধে শত্রু-নিধন যজ্ঞ চালিয়ে যাবো! শপথ নিচ্ছি—মৃত্যু।" টেগরা মাটিতে লিখলো—DEATH!

মাস্টারদা, অম্বিকাদা, নির্মলদা, লোকনাথ, নরেশ ও বিধু একত্রে আলোচনা ও পবামর্শ করছিলেন—যদি সুযোগ পান তবে কিভাবে শহর আক্রমণে সৈন্য পবিচালনা করবেন। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারছিলেন যে, শত্রু সেই সুযোগ তাঁদের দেবে না। তাঁদের চিন্তাধারার মধ্যে অনেকখানি জুড়ে ছিলাম আমরা চারজন। আমাদের সঙ্গে সংযোগস্থাপন করতে যে চারজনকে পাঠিয়েছিলেন, তাদের সম্বন্ধে এবং রেল-লাইন ধ্বংস করতে যারা গিয়েছিল তারা সকলে, নির্দেশ অনুযায়ী শহরে ফিবে এসেছে কিনা তা' নিয়েও মাস্টারদারা গবেষণা করেছেন। তাঁরা জানতেন ফেণীতে দুই দলে আটজনকে পাঠানো হয়। এক দলে ছিল—লালমোহন সেন, সুকুমার

ভৌমিক, হারান দত্ত চৌধুরী ও সুবোধ মিত্র এবং অপর গ্রুপটিতে ছিল—উপেন্দ্র ভট্টাচার্য, শঙ্কর, সুশীল দে ও বিজয় আইচ। কাজেই মাস্টারদারা ভাবছিলেন, আমরা সবাই যদি শহরে উপস্থিত থাকি, যার নাকি সম্ভাবনাও ছিল, তবে আমাদের ষোলজনের একটি শক্তিশালী দলের সঙ্গে প্রধান-বাহিনীর সংযোগ হবে এবং আমাদের মিলিত শক্তি শত্রুপক্ষকে স্থানে স্থানে অতর্কিত আক্রমণের সুযোগও পাবে। আশা-নিরাশা ও শঙ্কার মধ্যে যখন তাদের চিন্তা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন

সবক।ব পক্ষেব তোলা ১৯২৪ সালের নাগারখান যুদ্ধের নক্সা। নাগাবখানা পাহাড়ের সঙ্গে লাগানো জালালাবাদ পাহাড়েব ভৌগলিক অবস্থান।

কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে একটার পর একটা সংবাদ পাচ্ছে এবং সংবাদগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখছে। আমাদের শক্তি ও অবস্থান সম্বন্ধে পুলিস সাহেব পর পর খুব তাড়াতাড়ি অনেক সংবাদ সংগ্রহ করলেন। সংবাদ নিয়ে প্রথম এলেন দারোগা ফজলুর রহমান, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আরো তথ্য নিয়ে এলেন দারোগা আব্দুর রহিম এবং সর্বশেষে হেম গুপ্ত ও মইধর আলী অনেক বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরশীল তথ্য এবং একজন informer-কে সঙ্গে নিয়ে এলেন। সাহেব informer-কে

দেখে খুব খুশি—আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। এস, পি, informer-কে প্রশ্নবাণ বর্ষণ করতে লাগলেন—

সাহেব—"দেখো, হাম্ বহুত্ খুস্ হুয়া তুমহারা উপর। আগর তুমহারা পাতা সাচ হুয়া তো তুম্‌কো সরকার বহুত ইনাম্ দেগা। লেও আভি দশ রূপেয়া।"

এই কথা বলেই জন্‌সন্ সাহেব তাঁর হিপ্ পকেট থেকে দশ টাকার একটি নোট বার করে informer-এর হাতে গুঁজে দিলেন। সংবাদদাতা সাহেবের কাছে দাঁত বার করে মনের আনন্দ প্রকাশ করলো এবং এক মস্ত সেলাম ঠুকে "জো হুকুম" ভাব নিয়ে দাঁড়ালো।

এস, পি,—"তুম্ যো দেখা, সব সাচ্ সাচ্ বাতাও। ঝুটা মৎ বোল আউর জ্যাদাভি মৎ বোল। আভি বাতাও ক্যা ক্যা দেখা।"

সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে ইন্‌ফরমার তার চট্টগ্রাম ভাষা মিশ্রিত হিন্দীতে উত্তর দিল—

"আঁই আর হামারা বন্ধু মিলি আভি দেখা হায় হিতারা পাহাড়মে বইঠ্‌কে হায়।"—(আমি ও আমার বন্ধু একই সঙ্গে দেখেছি তারা পাহাড়ে বসে আছে)।

এস, পি,—"কেতনা আদমী হ্যায়?"

ইন্‌ফরমার—"পঁচাশ-ষাট মানুষ হোগা সাব।"

এস, পি,—"সবকা পাশ বন্দুক হায়?"

ইন্‌ফরমার—"হাতমে আছে, আউর এক এক জাগামে টাল করি রাইখ্যে।"—(হাতেও আছে আবার জায়গায় জায়গায় একসঙ্গে স্তূপীকৃত করেও রেখেছে)।

এস, পি—"তুমহারা পুরা পাতা হায় যো, অউর কই আদমী দুস্‌রা জাগামে ছিপ্পা নহি হ্যায়?"

ইন্‌ফরমার—"ইন্দি উন্দি দেখা, মগর চোখে নাহি পড়া।"—(এদিক ওদিক দেখেছি, কিন্তু চোখে পড়ে নি)।

এস, পি,—"ঠিক হায়, তুম সাথ যাও। ঘাবড়াও মৎ। ঠিক জাগা সাহাব লোগকে বাতা দেনা।"

পুলিসসাহেব নানারকম প্রশ্ন করে আরও অনেক খবর জানলেন এবং ইন্‌ফরমারের কথা শুনে একটা নক্সা এঁকে নিলেন।

জনসন সাহেব এই ইন্‌ফরমার ও দু'জন সাব-ইন্‌স্পেক্টারকে চৌধুরীহাটের মিলিটারী ছাউনীতে ডি, আই, জি, মি ফারমার ও কর্নেল ডালাস্ স্মিথের কাছে পাঠালেন। তিনি স্বয়ং শহরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ক্যাপ্টেন টেট্, ক্যাপ্টেন রবিন্‌সন ও মেজর বেকারের সঙ্গে এক কন্‌ফারেন্সে মিলিত হলেন। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের একটা ম্যাপ নিয়ে তাঁরা বিদ্রোহীবাহিনীর অবস্থান ও সেখানে যাওয়ার পথ ম্যাপে চিহ্নিত

করলেন। তারপর ক্যাপ্‌টেন টেটের অধীনে একদল সৈন্য কর্নেল ডালাস্ স্মিথের বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিতে তৎক্ষণাৎ যাত্রা করলো। তারা ট্যাক্সি, ট্রাক ও প্রাইভেট মোটর সংগ্রহ করেছিল। প্রায় বিকেল চারটের সময় ক্যাপ্‌টেন টেট্ হেম গুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন।

ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্-এর একটি প্লেটুন ও সুরমা ভ্যালি লাইট হর্সের অপর একটি প্লেটুন, দ্রুত জালালাবাদে পৌঁছবার জন্য দশটি ট্যাক্সি ও তিনটি ট্রাকে অস্ত্রশস্ত্র সমেত চাপলো। ক্যাপ্‌টেন টেটকে শুভকামনা জানিয়ে জেলা-শাসক বললেন—"বিদ্রোহীদের ঘেরাও করতেই হবে। তাদের যে কোন উপায়ে বন্দী করা চাই। যতদিন তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লুকিয়ে থাকবে, ততদিন শান্তি বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাবে। তাদের পালাবার পথ রাখলে চলবে না—যে কোন উপায়ে বন্দী করা চাই।"

গর্বিত, উদ্ধত, অমার্জিত, অসংযত ও সাম্রাজ্যবাদী আভিজাত্যের অহঙ্কারে চিরমত্ত ক্যাপ্‌টেন টেট্ উত্তর দিলেন—"বাঙালী কুত্তাদের আমি চিনি। তাদের বিষদাঁত আজ ভাঙবো।" এই টেট্ সাহেবই ১৮ই এপ্রিল লোকনাথের চ্যালেঞ্জ—"Halt! Ready for charge!"—এর উত্তরে বিদ্রুপোক্তি করেছিলেন—"হল্ট? বাঙালী কুত্তা, চার্জ?"

পুলিস সাহেব জনসন খুশি হয়ে ক্যাপ্‌টেন টেটের করমর্দন করে বললেন—"You must have to complete by round them up. They must have to be arrested dead or alive! This chance we must not miss"—পালাবার পথ না রেখে আজ তাদের ঘিরে ফেলতে হবে। তাদের জীবিত বা মৃত বন্দী করা চাই। এই সুযোগ আমরা কোনমতেই হারাব না।

মোটরগাড়িগুলি স্টার্ট দেওয়া হ'ল। এক সঙ্গে সব গাড়িগুলি গুঞ্জন তুলে রাজপথ কাঁপিয়ে ধুলো উড়িয়ে বিপ্লবীদের ঘেরাও করতে–জীবিত বা মৃত বন্দী করতে, ছুটে চললো। এই সঙ্গে আরও একটি পুরো কম্পানি সৈন্য ট্রেনযোগে রওনা হ'ল। আজ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী "সপ্তরথী" বিপ্লবী "অভিমন্যু" বধ করবে।

আমি দলিল স্বরূপ সরকারী পক্ষের একটি ম্যাপ (ম্যাপটি ২৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) তুলে দিলাম। এই মূল নক্সাটি দেওয়ালে ঝোলান ম্যাপের মত ৬×৫ সাইজের হবে। ১৯২৪ সালে নাগারখানা যুদ্ধে মাস্টারদা ও অম্বিকাদা গুলীবিদ্ধ হয়ে বন্দী হন। তারপর সেসন কোর্টে একই সঙ্গে অম্বিকাদা, মাস্টারদা, ও আমার বিচার হয়। সেই সময় এই নক্সাটি সরকারপক্ষ মামলায় উপস্থিত করে। এই ঘটনার প্রায় সাত বছর পরে, ১৯৩০ সালে, আমাদের বিচারের সময় এই নক্সাটি আবার সরকারী পক্ষ থেকে মামলায় দাখিল করা হয়। ১৯৩০ সালে সেই মূল নক্সাতে সরকার "জালালাবাদ" ও "নাগারখানা" দু'টি পাহাড়েরই অবস্থান দেখিয়েছে। এই ম্যাপে

১৯২৪ সালের ঘটনা ও আমাদের গতিপথ বুঝতে এই নক্সা সাহায্য করবে। পাঠকবর্গ ১৯২৪ সালের বিষয়বস্তুকে ১৯৩০ সালের বিবরণ থেকে পৃথক করে দেখার কথা মনে রাখবেন, নইলে এই নক্সা বুঝতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। পাঁচালাইশ থানা ও বাজিদ্‌বস্তানের রাস্তাটিও এই ম্যাপে লক্ষ্য করবেন। এই পথ দিয়ে ক্যাপ্‌টেন টেটের "মোটর-বাহিনী" অগ্রসর হয়। টেটের বাহিনী যোগ দেবে কর্নেল ডালাস্‌ স্মিথ ও D. I. G. মিঃ ফারমারের সৈন্যদের সঙ্গে এবং ট্রেনযোগে এক কম্পানি সৈন্য সেখানে পৌছলেই তারা সর্বশক্তি নিয়ে চারিদিক থেকে জালালাবাদ পাহাড়ে "বিদ্রোহীদের" আক্রমণ করবে—জীবিত বা মৃত তাদের যে বন্দী করতেই হবে!

বিকেল প্রায় সাড়ে চারটা; স্পেশাল ট্রেন স্টেশনে দাঁড়িয়ে—এক কম্পানি সৈন্য ট্রেনে উঠলে ট্রেনটি চৌধুরীহাটের দিকে রওনা হ'ল। বিশ-পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই পাঁচালাইশ ও চৌধুরীহাট স্টেশনের মাঝে সিগ্‌ন্যাল দেখে ট্রেনটি থেমে গেল। আগে থেকে ডি, আই, জি, মিঃ ফারমার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর নির্দেশেই ট্রেন ঐ জায়গায় থামান হ'ল। আমাদের বিপ্লবী বন্ধুরা জালালাবাদ পাহাড়ের ওপর থেকেই দেখতে পেল, ট্রেনটি যেখানে থামলো সেখানে কোন স্টেশন নেই এবং ইতিপূর্বে কয়েকটি লোকাল ট্রেন যাওয়ার সময় এই স্থানে কখনও থামে নি। সকলের মনেই একসঙ্গে প্রশ্ন জাগলো—অসময়ে এবং অস্থানে ট্রেনটি থামলো কেন? কোন সন্দেহ নেই—সৈন্য বোঝাই ট্রেন এসেছে। তারা খুব লক্ষ্য করতে চেষ্টা করলো কিন্তু ঝোপ-ঝাড় ও জঙ্গলের আড়ালে ট্রেনের অবস্থিতি ছাড়া আর কিছুই বোঝা গেল না। আমাদের বিপ্লবী সাথীদের তখন আর কিছু করবার ছিল না। শেষ মুহূর্তে এই পাহাড় ছেড়ে আরো উঁচু কোন পাহাড়ে যাওয়ার চেষ্টা করার অর্থই হচ্ছে তাদের অবস্থান ও গতিবিধি শত্রুকে জানিয়ে দেওয়া। দিনের আলোয় তখন সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। যদি সন্ধ্যে হ'ত, একটু আঁধার নেমে আসত, তবে অন্ধকারের সুযোগে শত্রুর দৃষ্টির অগোচরে 'ট্যাকৃটিক্যাল পজিশন' পরিবর্তনের চেষ্টা হয়ত বা সম্ভব হ'ত। কিন্তু দিনের আলোতে সেই সম্ভাবনা নেই। তাই চতুর্দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা ব্যতীত তাদের আর কিছু করার ছিল না।

এদিকে বিভিন্ন দলে শত্রু-সৈন্য এসে জড়ো হয়েছে। রিজার্ভ-বাহিনী ট্রেনযোগে এসে পৌছবার আগেই ক্যাপ্‌টেন টেটের "মোটর-বাহিনী" ডি, আই, জি, মিঃ ফারমারের সৈন্যদলের সঙ্গে যোগ দিল। ক্যাপ্‌টেন টেটের রণকৌশলের প্ল্যানটি ছিল এইরূপ—একটি কম্পানি নিয়ে টেট্‌ 'বিদ্রোহীদের' অতর্কিতে ঘিরে ফেলবেন এবং উদ্যত সঙ্গীন হাতে তাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করবেন। এই অভিপ্রায়ে দু'টি প্লেটুন পঞ্চাশ গজ ব্যবধানে Single file-এ অর্থাৎ, একজনের পেছনে

একেবারে কাছে এগিয়ে যাবে। তারপর গোপনে জালালাবাদের পাদদেশে পৌঁছনার পর, দ্রুত ছুটে গিয়ে একজনের পাশে একজন সারিবদ্ধ হয়ে লুকিয়ে পজিশন্ নেবে। সঠিক পজিশন্ নেবার পর তারা সঙ্কেতে পরবর্তী পদক্ষেপের নির্দেশ পাবে। সঙ্কেত পেয়ে সৈন্যেরা সারিবদ্ধভাবে, বিপ্লবীদের দৃষ্টির অগোচরে, বুকে হেঁটে বা গুঁড়ি মেরে পাহাড়ে উঠবে এবং অতর্কিতে সঙ্গীনের বিভীষিকা দেখিয়ে তাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করবে।

এই রণকৌশল কার্যে পরিণত করবার জন্য যখন ঐ দু'টি প্লেটুন নির্দেশ মত এগোবো, তখন জালালাবাদ পাহাড়ের পাদদেশে একটি গভীর ও বেশ চওড়া শুকনো নর্দমার আড়ালে আর একটি প্লেটুনের সঙ্গে ক্যাপ্‌টেন স্বয়ং উপস্থিত থাকবেন।

এই Assault Party-র দায়িত্ব ক্যাপ্‌টেন টেটের উপর ন্যস্ত হয় এবং এই সৈন্যদল নিযুক্ত হয় ব্যাপক আক্রমণের কেন্দ্রস্থলে।

হাতে আঁকা জালালাবাদেব একটি নক্সা এখানে দেওয়া হ'ল। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার সৌজন্যে এই নক্সাটি আমি এখানে পরিবেশন করলাম। নক্সায় দেখা যাবে, রেল-লাইন ও তার পাশে রাস্তা। ক্যাপ্‌টেন টেটের সৈন্যদল তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছে এবং তাদের মাঝে ও পেছনে টেটের হেডকোয়ার্টার। এই সৈন্যদলেব আরো দক্ষিণ-পশ্চিমে ডি, আই, জি, মিঃ ফারমারের সৈন্যদলের অবস্থান দেখা যাচ্ছে। দুই প্লেটুন-সৈন্য নিয়ে পাহাড়েব আড়ালে নিজেদের গতিপথ বিপ্লবীদের দৃষ্টির সম্পূর্ণ বাইরে রেখে ডি, আই, জি, স্বয়ং টেটের বাহিনীর পশ্চিমে এমন ভাবে পজিশন্ নিলেন যাতে "বিদ্রোহীরা" কোনমতেই পালাতে না পারে। এই নক্সায় আরও দেখা যাবে, কর্নেল ডালাস্ স্মিথ আবো দুই প্লেটুন সৈন্য ক্যাপ্‌টেন টেটের সৈন্যদলের উত্তর-পূর্বে পাঠিয়েছেন। তারাও পাহাড়ের আড়ালে বহুদূর ঘোরা পথে এই বিশেষ স্থানে পজিশন্ নেয়। কারণ, ক্যাপ্‌টেন টেটের আক্রমণে বিপ্লবীরা আত্মসমর্পণ না করে যদি উত্তর-পূর্ব দিকে পালাবার প্রয়াস পায়, তবে কর্নেল সাহেবের দুর্ভেদ্য ব্যূহের মধ্যে তাদের পড়তেই হবে এবং মৃত্যু বা আত্মসমর্পণ ছাড়া বিপ্লবীদের তখন আর কোন উপায় থাকবে না।

জালালাবাদ পাহাড় এইভাবে ঘিরেই তারা যে আক্রমণের ব্যাপক সামরিক পরিকল্পনা করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের মামলায় প্রায় এক হাজার সরকারী পক্ষের সাক্ষী জবানবন্দী দিয়েছে। সাক্ষীদের মধ্যে অনেক পুলিস ও সরকারী কর্মচারী জেরায় অনেক কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। তা'ছাড়া অনেক উচ্চ ও নিম্নপদস্থ কর্মচারীরাও গোপনে আমাদের অনেক তথ্য সরবরাহ করেছে। সেই সব তথ্য ও জেরার জবাবে সাক্ষীদের উক্তি জজসাহেব যা লিপিবদ্ধ

করেছেন, তার সব নকল আমাদের কাছে আছে। সেই সব যদি লেখা হয় তবে তাতেই হাজার পৃষ্ঠার এক গ্রন্থ হতে পারে। আমার এই লেখার সীমিত গণ্ডিতে তা সম্ভব নয়। তবে এখানে আমাদের Judgment থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করছি। তাতে দেখতে পাবো সরকারী ভাষ্যেও ওপরে বর্ণিত আমার সব কথার স্বীকৃতি আছে। কেবল ব্যতিক্রম দেখা যাবে সৈন্যসংখ্যার বর্ণনাব মধ্যে। সরকার পক্ষ ও আমাদের বর্ণনার মধ্যে কেন এই পার্থক্য তার অন্তর্নিহিত কারণও জাজ্‌মেণ্টের উদ্ধৃতিব মধ্যেই পাওযা যাবে—পরাজয়ের কলঙ্ক

জা~লালাবাদ পাহাড়ে যুদ্ধের পূর্বাহ্নে উভযপক্ষেব সামবিক সমাবেশ।
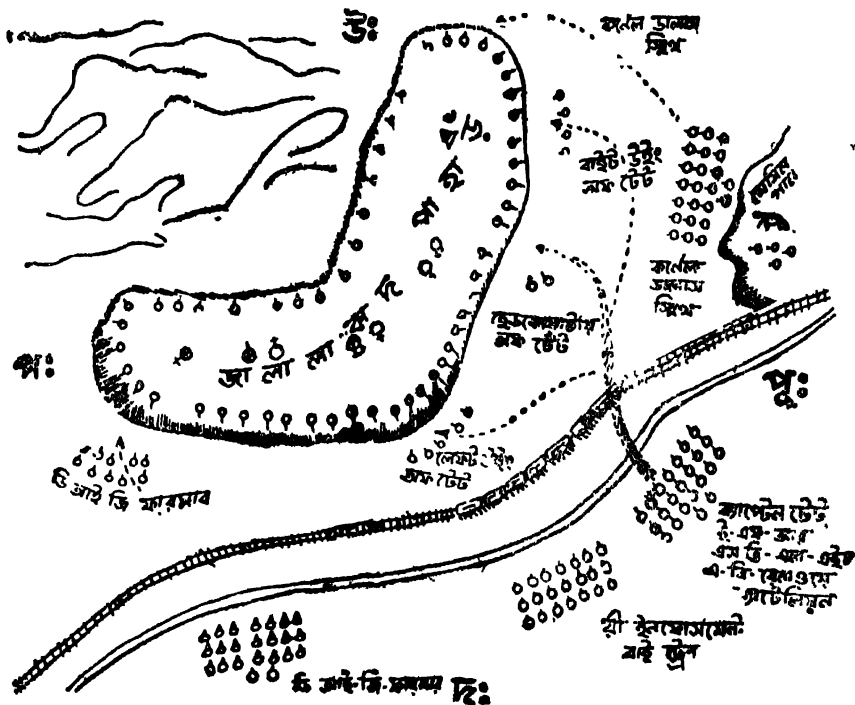
ঢাকবার জন্যই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের প্রতিনিধিদের মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে। তাদের অক্ষমতার সমর্থনেই প্রচার করতে হয়েছে যে, সামান্য সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করতে গিয়েছিল বলেই সেই রাত্রে তাদের শহরে ফিরে আসতে হয়েছে। জাজ্‌মেণ্টে এইভাবে লেখা আছে—

"About 3-30 P. M. Hem Gupta and Maidhar Ali returned to Chittagong and reported to the Superintendent of Police what they had learned. After a consultation at which the District Magistrate, the Superintendant of Police, Major Baker and Capt. Taitt of the

A. B. Railway Battalion, A. F. I. and Capt. Robinson, the Officer-In-Charge of the Surma Valley Light Horse detachment, were present, it was decided to sent out a party in taxis and attempt to round-up the raiders. So about 4-10 P. M. a force consisting of some 23 men of the Eastern Forntier Rifles and 23 troopers of the Surma Valley Light Horse in charge of Capt. Taitt and accompained by S. I. Hem Cupta proceeded by car to Jarjaria Battali. There they met the D. I. G. (Mr. Farmer) who on receiving Abdul Rahim's report, had arrived with a small party consisting of one Lewis Gun section of the A. B. Railway Battalion and six or eight men of the Eastern Frontier Rifles.

—বিকেল তিনটে তিবিশ মিনিটের সময় সাব-ইন্‌স্পেক্টার হেম গুপ্ত ও মইধর আলি যা জানতে পেরেছে, তা সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের কাছে রিপোর্ট করলো। তারপর জেলা-শাসকেব উপস্থিতিতে পুলিসসাহেব, ক্যাপ্‌টেনটেট্, মেজর বেকার, ক্যাপ্‌টেন রবিন্‌সন, প্রমুখ অধিনায়কেরা পরস্পর আলোচনার পর বিদ্রোহীদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলবার উদ্দেশ্যে ট্যাক্সির সাহায্যে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। অতএব ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্-এর তেইশ জন ও সুরমা ভ্যালি লাইট হর্স রেজিমেণ্টের তেইশজন সৈন্য ক্যাপ্‌টেন টেটের অধীনে মোটর-যোগে ঝরঝরিয়া বটতলী অভিমুখে এগোল। সাব-ইন্‌স্পেক্টার হেম গুপ্তও তাঁদের সঙ্গে গেলেন। আব্দুল রহিমের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে একটিমাত্র লুইস্ গান সেক্সান এবং ছয় বা আটজন ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের সৈন্য নিয়ে ডি, আই, জি, (মিঃ ফারমার) আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ক্যাপ্‌টেন টেট্ ও তাঁর পার্টি মিঃ ফারমারের পার্টির সঙ্গে মিলিত হ'ল।

এখানে বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, অতজন জেলা ও সামরিক অধিনায়ক পরামর্শ করে প্রায় ষাটজন সশস্ত্র বিপ্লবীকে বন্দী করবার জন্য মাত্র ২৩+২৩+১০ —মোট ৫৬ জন সৈন্য নিয়ে রওনা হলেন। কেন এই অবিশ্বাস্য বিবরণ? একজন বিপ্লবীকে বন্দী করতে যাওয়ার সময়েও আমরা দেখেছি পঞ্চাশ-ষাটজন সেপাই নিযুক্ত করা হয়েছে। আই, জি, মিঃ লোম্যান যে বিশে তারিখে এক কম্পানি (প্রায় ১৬০ জন) সৈন্য নিয়ে পাহাড়ে বিপ্লবীদের অনুসন্ধানে গিয়েছিলেন, সেই সরকারী ভাষ্য আমি আগেই উদ্ধৃত করেছি। কিন্তু ২২শে তারিখে, যুব-বিদ্রোহের চারদিন পরে, যখন চট্টগ্রাম শহর মিলিটারীতে ছেয়ে গেছে, তখন সৈন্যসংখ্যা সম্বন্ধে এত অবিশ্বাস্য বিবরণ সরকারপক্ষ থেকে কেন সরবরাহ করা হচ্ছে? জালালাবাদে সশস্ত্র

বিপ্লবীদের বন্দী করতে মাত্র ছাপ্পান্নজন সৈন্য পাঠানো হয়েছে বলে মিথ্যা কুয়াশা সৃষ্টির এত চেষ্টা কেন? পরে জানতে পারবো সযত্নে সত্য গোপনের গূঢ় রহস্যটি কি।

জাজ্‌মেণ্টে তারপরে মুদ্রিত আছে—

"The informer who had accompanied the party from Chittagong described the place where the raiders were and it was decided that the force should advance in that direction in two parties. Capt. Taitt's party went along a nalla running into the hills to the west of Jarjaria Battali mosque, while Mr. Farmer's party made a detour across the hills. At the end of the defile Capt. Taitt's party emerged into open paddyfields across which the informer pointed out a steep jungle covered hill locally known as Jalalabad hill on which he said the raiders were."

চট্টগ্রাম থেকে সেই সংবাদদাতা তাদের সঙ্গে যায় এবং সে বিদ্রোহীদের কোথায় দেখেছে তার বর্ণনা দেয়। সেই দিকে দুই দল সৈন্য পাঠানো স্থির হ'ল। ক্যাপ্‌টেন টেটের পার্টি ঝরঝরিয়া বটতলী মসজিদের পশ্চিমপ্রান্তে পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত একটি নালা অনুসরণ করে চলে। সেই সময় ফারমার সাহেবের পার্টিও পাহাড়ের ওপরে চক্কর দিয়ে এগোতে লাগলো। ইতিমধ্যে ক্যাপ্‌টেন টেটের বাহিনী নালাটির শেষ সীমায় এসে উপস্থিত হয়। তার পরেই উন্মুক্ত ধানক্ষেত পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। জঙ্গলে ঢাকা খাড়া এই পাহাড়টি দেখিয়ে সংবাদদাতা জানাল সেখানে সে "আক্রমণকারীদের" দেখেছে। সেই অঞ্চলে এই পাহাড়টি জালালাবাদ পাহাড় নামে পরিচিত।

বিপ্লবীদের দৃষ্টির অগোচরে নালার মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে সিগ্‌ন্যালের জন্য সৈন্যরা চুপি চুপি অপেক্ষা করছে। কিন্তু সামনের খোলা ধানক্ষেতটুকু অতিক্রম করতে না পারলে খাড়া পাহাড়ের নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত বিস্তৃত জঙ্গলের সুযোগ পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বন-জঙ্গলের সুযোগ পেলে তবেই গুড়ি মেরে ওপরে উঠে অতর্কিতে বিপ্লবীদের আক্রমণ করা যাবে। বিপ্লবীদের সম্মুখের এই সামান্য খোলা ধানক্ষেতটুকুর tactical importance (রণকৌশলের দিক থেকে গুরুত্ব) ছিল প্রচুর। শত্রুপক্ষকে যে কোন উপায়েই খোলা ধানক্ষেতটি অতিক্রম করতে হবে। এইরূপ ক্ষেত্রে রণকৌশল অনুসারে double-up করে, অর্থাৎ, দৌড়ে গিয়ে extended line-এ (বর্ধিত বা বিস্তারিত সারিতে) ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে পজিশন্ নেওয়া প্রয়োজন।

ক্যাপ্‌টেন টেট্‌ যদি একবারও বুঝতেন যে, পঞ্চাশ-ষাটজোড়া চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি

এড়ানো তাঁর সৈন্যদের পক্ষে সম্ভব নয় তবে হয়ত রাত্রির অন্ধকারের অপেক্ষায় থাকাই শ্রেয় মনে করবেন। তা'ছাড়া জানিনা, অন্ধকারে আচম্‌কা আক্রমণের মুখে পড়ার ভয় ক্যাপ্‌টেনকে দিনের আলোতে খোলা ধানক্ষেত অতিক্রম করবার সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচিত করেছিল কি না।

ট্রেনটি এসে থামার পর থেকে আমাদের ইণ্ডিয়ান রিপাব্‌লিকান আর্মির যুবক সৈন্যদল সহস্রগুণ বেশি সজাগ হয়ে উঠেছে। তারা হঠাৎ দেখতে পেলো সৈন্যেরা নালা ও ঝোপের আড়াল থেকে বেড়িয়ে দৌড়ে ধানক্ষেত অতিক্রম করছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—"অনেক সৈন্য!" ছুটে আসছে!" "এ যে সব গুর্খা সিপাই!" "আমরা যে তাদেব দেখতে পেযেছি তা' বোধ হয় তারা বুঝতে পারে নি!" "পাহাড়ের নিচে জঙ্গলে গা ঢাকা দিচ্ছে!" "বুকে হেঁটে চুপি চুপি পাহাড়ে উঠছে!"—ইত্যাদি।

শত্রুসৈন্য আসতে দেখে ও তাদের আগমনবার্তা মুখে মুখে প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিম দিকের এক স্থান থেকে দশ-বারোজন যুবকসাথী সেই পাহাড় ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার উপক্রম করছে, এমন সময়, সৌভাগ্যক্রমে মাস্টারদা সেখানে উপস্থিত হন। তিনি বজ্রকণ্ঠে আদেশ দিলেন—"খবরদার, এই পাহাড়-ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার চেষ্টা করবে না। এখন এইরূপ চেষ্টার অর্থই হচ্ছে মেশিনগানের মুখে উড়ে যাওয়া। শত্রুসৈন্য আমাদের অবস্থান যত কম জানতে পারে তার চেষ্টা করতে হবে। লোকনাথ, ফিল্ড কম্যাণ্ড তোমার ওপর ন্যস্ত আছে, তুমি আমাদের পরিচালনা কর। ভয় নেই—সাহস আন, শত্রুকে নিপাত কর! বন্দেমাতরম্‌!"

জালালাবাদ যুদ্ধের সেনাপতি, জেনারেল বল (লোকনাথ বল) নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। সে মাস্টারদাকে উত্তর দিল—"আমাদের সাময়িক গণতন্ত্রী বিপ্লবী সরকার ও আপনার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা নিয়ে আমি আমার বৈপ্লবিক কর্তব্য পালন করতে একটুও পশ্চাদপদ নই!"

তারপর জেনারেল বল সবাইকে উদ্দেশ করে ইংরেজীতে আদেশ দিল—"নিজ নিজ সেক্সনে গিয়ে পজিশন্‌ নাও!" দ্রুত ছুটে গিয়ে নিজ নিজ গ্রুপে বিপ্লবী সৈন্যেরা পজিশন্‌ নিল। তারপর দ্বিতীয় আদেশ হ'ল—"Extended line-এ শোয়া পজিশন্‌ নাও! মাস্কেট্রি লোড করে সবাই প্রস্তুত থাক। হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত কেউ ফায়ার করবে না।" আসন্ন যুদ্ধে মানসিক বল ও সমরশক্তি বাড়িয়ে তোলা এবং সকলকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য লোকনাথ বলল—"ভাইসব! আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই যুদ্ধ সুরু হবে। এই সময় চল আমরা একবার স্মরণ করি রবার্ট ক্লাইভের বিশ্বাসঘাতকতার কথা, জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃসংশতার কাহিনী, বৃটিশ দস্যুর

দু'শ 'বছরের অমানুষিক অত্যাচারের ইতিহাস। দয়া নেই, মায়া নেই, ক্ষমা নেই—চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, রক্তের বদলে রক্ত চাই। আমরা বিক্রম ও চরম সাহসের সঙ্গে লড়াই কবে, বীরের মত মৃত্যুবরণ করবো, অবিচলিত চিত্তে দৃঢ় হস্তে শত্রুকে কঠিন আঘাত হানবো, তাহলেই শত্রুর মনোবল ভেঙে পড়বে—তাদের পরাজয় সুনিশ্চিত হবে। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক!"

লোকনাথের কথা সবার অন্তরে গর্জন করে প্রতিধ্বনি তুললো—"জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন!"

লোকনাথ ও অম্বিকাদা জালালাবাদ পাহাড়ের ওপরে কেন্দ্রস্থলে পজিশন্ নিল। মাস্টারদা সামান্য দূরে তাদের পেছনে ছিলেন আব নির্মলদা কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় বিশ গজ দূরে পজিশন্ নিলেন। মোট কথা এই চারজন নেতা এমনভাবে পজিশন্ নিলেন যেন যুদ্ধ চলাকালে পরস্পর পরামর্শ করতে পারেন এবং অন্যান্যদের সঙ্গেও যোগাযোগ অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়।

শত্রুসৈন্য বা আমাদের পক্ষ, কেউই ফায়ার করছে না—কেউই নিজেদের অস্তিত্ব অপর পক্ষকে বুঝতে দিতে চাইছে না। শত্রুসৈন্য অতি সন্তর্পণে আত্মগোপন করে ধীরে ধীরে পাহাড় বেয়ে উঠতে চেষ্টা করছে।

পাহাড়ের ওপর থেকে শোনা গেল—ট্রিং-ক্রিং শব্দ। সৈন্যেবা নিজ নিজ বন্দুকে বেয়নেট ফিট্ করছে। জঙ্গলের আড়াল থেকে বেরিয়ে সৈন্যদল ধাপে ধাপে নিঃশব্দে পাহাড়ে উঠতে লাগলো। মাঝে মাঝে ঝোপের ফাঁকে সূর্য-রশ্মিতে বেয়নেটগুলি চমকাচ্ছে। নৃশংস বৃটিশ সৈন্য বেয়নেট চার্জ করার জন্য এগিয়ে আসছে। তারা কি সেই সুযোগ পাবে? আমাদের সবার দৃঢ়মুষ্টিতে মাস্কেট্ ধরা আছে—ট্রিগারে আঙুল নিবদ্ধ। চরম মুহূর্তের জন্য সকলেই প্রস্তুত। সবার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। আতঙ্ক নয়, ভয় নয়—মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত থেকেও যুদ্ধের আসন্ন মুহূর্তে মানসিক ও শারীরিক প্রতিক্রিয়া হবেই। প্রত্যেকে অন্তরে উত্তাপ অনুভব করছে।

বৃটিশ সৈন্য পাহাড়ের প্রায় এক চতুর্থাংশ উঠে এসেছে। ওপরের শেষ সীমারেখা থেকে আমাদের সাথীরা সৈন্যেদের ওপরে উঠতে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। তাদের হাতে উদ্যত সঙ্গীন—মনে হচ্ছে তারা এক্ষুণি সবাইকে ক্ষত-বিক্ষত করবে, সকলের বক্ষ বিদীর্ণ করবে! লোকনাথ হুকুম দিল—"Get ready!"—প্রস্তুত হও! ফিস্ ফিস্ করে কানে কানে হুকুম প্রচার হ'ল—Get ready!

এই সময় নরেশ রায় দেখলো সৈন্যরা প্রায় অর্ধেক পাহাড় উঠে এসেছে। সময় খুব সংক্ষিপ্ত। নরেশ তক্ষুণি লোকনাথকে জানাল—"লোকনাথদা! সৈন্যরা বেয়নেট হাতে অর্ধেক পাহাড় উঠেছে!" বৃটিশ সৈন্যেরা তখনও ভেবেছে অতর্কিতে বিপ্লবীদের

লোকনাথ বল

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ও জালালাবাদ যুদ্ধের সেনাপতি।

শহীদ ভগৎ সিং।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা এবং লেজিসলেটিভ এসেম্বলীতে বোমা নিক্ষেপের অভিযোগে অভিযুক্ত হন মিঃ স্যাণ্ডার্সের হত্যাপরাধে ২৩.৩ ১৯৩১ তারিখে বোরষ্টাল জেলে ফাঁসী বরণ করেন।

শহীদ হরিগোপাল বল (টেগরা)।
এই দুর্দমনীয় বালক বীর জালালাবাদে ইংরেজ
সৈন্যদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে মৃত্যু বরণ করেন।

অম্বিক চক্রবর্ত্তী।
চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদা'র
সহকর্মী ও নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে অন্যতম।

[illegible] করতে পারবে। কিন্তু সে সুযোগ তারা পাবে না—তাদের সে আশা সুদূরপরাহত!

আর নয়, সৈন্যদের আর একপাও এগোতে দিতে লোকনাথ প্রস্তুত নয়। জালালাবাদ পাহাড় প্রকম্পিত করে বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল—Halt! পাহাড়ের কোণে কোণে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হ'ল—Halt! বৃটিশ সৈন্য মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। আর একটুও এগোনো তাদেব পক্ষে অসম্ভব। বাকি অর্ধেক খাড়া পাহাড় দৌড়ে উঠে বেয়নেট চার্জ কবা বাস্তবে আর সম্ভব নয়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় সৈন্যেরা কিছু ভেবে ওঠবার আগেই জেনারেল বলের আদেশ শোনা গেল—"Fire"!

বহু আকাঙ্ক্ষিত এই "fire" হুকুমেব অপেক্ষায় বহুক্ষণ বিপ্লবীরা অধীর হয়ে আছে। আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি মাস্কেট্রি একত্রে গর্জন করে উঠলো। পাহাড়েব শেষ সীমায় যারা ছিল, তাদের পক্ষেই বৃটিশ সৈন্যদের লক্ষ্য করে ফায়াব করার সুযোগ বেশি। বার বার Volley fire হতে লাগলো। শত্রুসৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে আমাদের পজিশন্ লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পাহাড়ের ওপর থেকে হঠাৎ Volley fire-এর সম্মুখীন হয়ে বেতনভোগী ইংরেজ সেপাই এক নিমেষে সমস্ত সাহস হাবালো। ওপরে উঠে তাদের বেয়নেট চার্জ কববার কথা মুহূর্তে স্বপ্নে মিলিয়ে গেল—তারা সবাই প্রাণ নিয়ে পালাতে লাগলো। কারও হাত ভেঙেছে, কারও পা গেছে, কেউ বা প্রাণ দিয়েছে—চীৎকার আর্তনাদ, কলরব শোনা যাচ্ছে; কারো কারো মৃতদেহ পড়ে আছে এবং কেউ খুঁড়িয়ে অথবা দৌড়ে প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে। অনেকে আবাব পাহাড় থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

শত্রুপক্ষ সেই অবস্থায় একটি গুলী ছুঁড়েও প্রত্যুত্তর দিতে সমর্থ হয় নি। অদূরে মেশিনগান নিয়ে শত্রুসৈন্যের একাংশ Rear guard action-এর জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। কিন্তু যতক্ষণ তাদেব advance guard কিছুটা নিচে পর্যন্ত পালিয়ে আসতে না পারছে, ততক্ষণ same side-এর আশঙ্কায় ফায়াব স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছে। প্রবল শত্রুপক্ষকে এইরূপ শোচনীয়ভাবে পালাতে দেখে আমাদের বিপ্লবী যুবকেরা আরো উৎসাহে গুলী ছুঁড়েছে। লোকনাথ আদেশের পর আদেশ দিয়ে চলেছে—'Fire! Volley fire! গুলী চালাও। অবিশ্রান্ত গুলী চালাও। ক্ষমা নেই—শত্রুকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেল!'

যতবার তারা Volley fire করেছে ততবারই জালালাবাদ পাহাড় কম্পিত করে সমস্বরে রণ-ধ্বনি দিয়েছে—'ইংরেজ নিপাত যাক্!' 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্!' 'বন্দেমাতরম!' Volley fire-এর শব্দ ডুবিয়ে বিপ্লবী তরুণদের বজ্রনির্ঘোষ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলেছে—'ইনকিলাব জিন্দাবাদ!' 'বন্দেমাতরম!'

শত্রুপক্ষ যত না Volley fire-এ বিধ্বস্ত হয়েছে তার চেয়ে [illegible] গুণেছে সেইসব রণ-রোলে। জাজ্‌মেণ্টে মিঃ ইউনী লিখছেন—

"Capt. Taitt made his disposition and as they went forward into the open, somebody shouted "HALT" from the hill and they were immediately fired upon...During the first hour the raiders from their hill maintained an almost continuous fusillade accompanied by shouts of Bandemataram..."

—ক্যাপ্‌টেন টেটের অগ্রগামী-বাহিনী খোলা জায়গায় গিয়ে পড়লে পাহাড়ের ওপর থেকে চীৎকার এলো—Halt! সেই সঙ্গে বিদ্রোহীরা গুলী চালাতে লাগলো। প্রথম ঘণ্টায় বিপ্লবীরা প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবেই ফায়ার করেছে ও 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে শত্রুপক্ষ বিধ্বস্ত হয়েছে—আমরা সম্পূর্ণরূপে জয়ী হয়েছি। প্রথম জয়ে আমাদের morale অনেক বেড়ে গেছে এবং সেই তুলনায় শত্রুপক্ষ তাদের সাহস হারিয়েছে। যুদ্ধের সূচনা আমাদের অনুকূলে ও শত্রুপক্ষের প্রতিকূলে। যুদ্ধের মূল নীতি—শত্রুকে বিধ্বস্ত কর, প্রথম আক্রমণে জয়ী হও! তরুণ বিপ্লবীরা সামান্য মাস্কেট্রির সাহায্যে তাদের প্রাধান্য প্রতিপন্ন করেছে।

বৃটিশ সৈন্যদলের প্রথম দফা প্রচণ্ড আক্রমণের পালা শেষ হ'ল। তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে লাগলো। পাহাড়ের ওপর থেকে বিপ্লবীদের অবিশ্রান্ত গুলীবর্ষণ তাদের বিধ্বস্ত করে তুলেছে। পাহাড়ের ঠিক পাদদেশে নালার গহ্বরে শক্ত ও সুদৃঢ় আড়ালের পেছনে আশ্রয় নিতে না পারা পর্যন্ত ভাগ্যদেবীর কৃপাই তাদের আত্মরক্ষার একমাত্র ভরসা!

পাহাড়ের ওপর থেকে বিপ্লবীদের ঘন ঘন বন্দুক গর্জন বৃটিশের পরাজয় ঘোষণা করছিল এবং সেই সঙ্গে বিপ্লবী রণহুঙ্কার বৃটিশবাহিনীর মনোবলও ভেঙে দিচ্ছিল। পলায়নরত বৃটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের পুঞ্জীভূত আক্রোশ ফেটে পড়লো। কেউ কেউ চীৎকার করে বলল—

"You coward! Why do you run away?" "You British dogs and curs! Why don't you fight?" "Shame, shame on you!" "You British brigands!" "You tyrants and traitors!" "Why are your British masters hiding?" "You British scoundrals and rascals!" "You murderers and blood-suckers!" "Down with you!" "Go to hell!"

—"ভীরু, কাপুরুষের দল পালাচ্ছ কেন?" চারিদিক থেকে বিপ্লবী নওজোয়ানেরা

[illegible] ভাষায় সম্ভাষণ জানাতে লাগলো—"বৃটিশ খেঁকি কুকুরের পাল, যুদ্ধ না করে পালাচ্ছিস্ কেন ?" "নির্লজ্জের দল, শত ধিক্কার তোদের !" "এই বৃটিশ দস্যু ! এই বিশ্বাসঘাতক ! তোদের বৃটিশ সেনাধ্যক্ষেরা ঘোমটার আড়ালে কেন ?—তাদের বাইরে আসতে বল্ !" "এই শয়তান ও বজ্জাতের দল !" "এই হত্যাকারী রক্তপিপাসুর দল !" "নিপাত যা !" "নরকে যা !"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইরূপ ইংরেজী সম্ভাষণের মাঝে মাঝে "ইংরেজ" শব্দটিকে অতি প্রিয় সম্বোধনে বিভূষিত করছিল। পরাজয়ের গ্লানি ও তীব্র ভর্ৎসনা ক্যাপ্টেন টেটের একেবারে অসহ্য মনে হচ্ছিল। "বাঙালী কুত্তা, চার্জ !"—বলে ক্যাপ্টেন টেট্ উপেক্ষাভরে যে ব্যঙ্গোক্তি A.F.I. আর্মারি প্রাঙ্গণে করেছিলেন, তার চেয়ে সহস্র গুণ তীক্ষ্ণ ও তীব্র ভর্ৎসনা এখন তাঁকে হজম করতে হচ্ছে ! বৃটিশ প্রেস্টিজ বুঝি রসাতলে গেল ! টেট্ সাহেব প্রতিশোধ নেবার জন্য একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন।

ছত্রভঙ্গ বৃটিশ সৈন্যদের নর্দমার আড়ালে একত্র করা হ'ল। ক্যাপ্টেন টেট্ সৈন্যদের প্রস্তুত হতে হুকুম জারি করলেন—বিদ্রোহীদের গুলী উপেক্ষা করে পাহাড়ের ওপরে বিপ্লবীদের বেয়নেট চার্জ করতে হবে। সামরিক নিয়ম অনুসারে বেয়নেট চার্জ করতে যাওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে সৈন্যদের উত্তেজিত করার অভিপ্রায়ে কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ বৃটিশ আর্মি ম্যানুয়েলে আছে। ক্যাপ্টেন Assault করার জন্য চূড়ান্ত আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিউগল্ বেজে উঠলো, ড্রাম বাজান হ'ল, "চলহ বঢ়হ মার"—এই বলে সৈন্যেরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো ; 'Rapid fire' করতে করতে নর্দমার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে প্রায় এক কম্পানি সৈন্য উদ্যত সঙ্গীন হস্তে বীরদর্পে সবেগে পাহাড়ে ওঠার জন্য ছুটে চললো। প্রথম পরাজয়ের পর পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই টেট্ সাহেব এইরূপ প্রচণ্ড আক্রমণের আদেশ দিলেন। বৃটিশ প্রেস্টিজ বাঁচাবার জন্য ভারতীয় সৈন্যদের ওপর ক্যাপ্টেন টেটের এই আদেশ অতি বর্বরোচিত ও নিষ্ঠুর ! ভারতবাসীর বিরুদ্ধে ভারতীয়দের যুদ্ধে নিয়োগ করবে, এই তো সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ কূটনীতি ! এক ব্যাটেলিয়ান অর্থাৎ চার কম্পানি সৈন্যকেও যদি পাহাড়ের ওপরে উঠে assault করার আদেশ দেওয়া হ'ত, তবু তাতে রণকৌশলের দূরদৃষ্টির অভাব ছাড়া অন্য কিছুই প্রমাণিত হ'ত না। সৈন্যদের গুলী পাহাড়ের নিচ থেকে ওপরের দিকে বিপ্লবীদের স্পর্শ করার কোন কারণ নেই। আর এই খাড়া জালালাবাদ পাহাড়ের ওপর দৌড়ে ওঠাও সহজসাধ্য নয়—সময় সাপেক্ষ তো বটেই। পাহাড়ের ওপর থেকে দৃঢ়চিত্ত বিপ্লবীদের অবিশ্রাম ধারায় মাস্কেট্রির গুলীবর্ষণ সৈন্যদের অগ্রগতি যে অসম্ভব করে তুলতে সক্ষম, এ তথ্য ক্যাপটেন টেটের অজানা থাকার কথা নয় ! সেইরূপ প্রতিকূল ক্ষেত্রেও

পাহাড়ের নিচ থেকে ওপরে উঠে বিপ্লবীদের [illegible]
কম্পানিকে তিনি মূর্খের মত আদেশ দিলেন কেন ?

ঐরূপ অসম্ভব ও প্রতিকূল অবস্থায় মাত্র একটি কম্পানিকে পাহাড়ের ওপর আমাদের বিপ্লবী সৈন্যদলকে assault করার আদেশের মধ্যে মূর্খতার পরিচয় পাওয়া গেলেও ক্যাপ্‌টেন টেট্ যে আশাবাদী ও desperate, তাতে কোন সন্দেহ নেই। টেটের পক্ষে যদিও এটা আশা করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়, তবু তিনি ভেবেছিলেন যে বিউগল্, ড্রাম, Battle-cry, Rapid fire, বন্দুকের মাথায় ঝক্‌ঝকে বেয়নেট এমন এক বিভীষিকার সৃষ্টি করবে যাতে বিপ্লবীরা অচিরেই সাদা নিশান উড়িয়ে নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণ করবে। ক্যাপ্‌টেনের জীবনে ভাড়াটে সৈন্য-দলের যুদ্ধের অভিজ্ঞতাই ছিল এবং সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই তিনি ভেবেছিলেন, স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বিপ্লবীরাও ভাড়াটে সেপাইদের মতই প্রথম সুযোগেই প্রবল শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করবে।

দ্বিতীয়বার হঠাৎ এই প্রচণ্ড আক্রমণের বিরুদ্ধে লোকনাথ বজ্রকণ্ঠে পাহাড় কাঁপিয়ে হুকুম দিল—"Friends ! Volley-fire ! Load-fire !" মুহুর্মুহুঃ মাস্কেট্রি গর্জন শোনা গেল। থেকে থেকে রণহুঙ্কার উঠলো এবং ঘন ঘন লোকনাথের বজ্র কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল —fire ! fire !

মাত্র পাঁচ-ছয় কদমের বেশি এগোনো ক্যাপ্‌টেন টেটের সৈন্যদের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব হ'ল না। সিংহবিক্রমে এসেছিল—কিন্তু শেয়ালের মত পালিয়ে গিয়ে আবার নর্দমার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে বাঁচল। আমাদের রণধ্বনি ও জয়োল্লাসে জালালাবাদ পাহাড় মুখরিত—শত্রুসৈন্য একেবারে নিস্তব্ধ—একটি ফায়ারিং-এর আওয়াজও শোনা যাচ্ছে না। আমাদের সৈনিকেরা কিন্তু শত্রুর নিস্তব্ধতা দেখে নিশ্চিন্ত হতে পারলো না—শত্রু যে প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করছে, সেই ধারণা তাদের ছিল। তাই শত্রুপক্ষ একেবারে চুপ করে থাকলেও লোকনাথ হুকুম দিয়ে রেখেছে, সকলেই যেন চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে এবং একটু সন্দেহ হলেই বা গাছপালা নড়তে দেখলেই যেন সেদিকে ফায়ার করা হয়।

শত্রুপক্ষ নিশ্চেষ্ট ছিল না। ক্যাপ্‌টেন টেট্ তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। এতক্ষণে উপলব্ধি করলেন যে, পাহাড়ের ওপর বিপ্লবীদের assault করা কোন সৈন্য-দলের পক্ষেই সম্ভব হবে না—বিপ্লবীরা জীবন থাকতে আত্মসমর্পণ করবে না। অগত্যা রণকৌশলের পরিবর্তন প্রয়োজন। অন্য কোন পাহাড়ের ওপর থেকে গুলী না চালালে নিচ থেকে সব ফায়ারই ব্যর্থ হবে—বিপ্লবীদের স্পর্শও করবে না। তাই ক্যাপ্‌টেন টেট্ একটি প্লেটুনকে প্রায় একশ' গজ দূরে, উত্তর-পূর্ব দিকে একটা পাহাড়ে পাঠালেন। অনুরূপ আর একটি প্লেটুনকে প্রায়

[illegible] পাহাড়ে পজিশন্ নিতে আদেশ দিলেন।

দ্বিতীয় দফা যুদ্ধের পর প্রায় পনেরো-বিশ মিনিট শত্রুপক্ষ চুপচাপ। বিপ্লবীরা আকস্মিক আক্রমণের জন্য তৈরি হয়েই ছিল। তবে কোন্ দিক থেকে বা কিভাবে আক্রমণ আসবে তার জন্য খুবই উৎকণ্ঠা বোধ করছিল।

সে যুগের বৃটিশ ফিল্ড-সার্ভিস রেগুলেশন অনুযায়ী প্রত্যেকটি প্লেটুন চারটি সেক্সান নিয়ে গঠিত এবং এরই মধ্যে একটি সেক্সান দু'টি লুইস্-গান নিয়ে সজ্জিত হ'ত। খুব সন্তর্পণে বিপ্লবীদের চোখের অন্তরালে পাহাড়ের ভেতরকার পথের সুযোগ নিয়ে সৈন্য পরিচালনা করবার পূর্ণ সুবিধে টেট্ সাহেব নিলেন। জালালাবাদে আমাদের পজিশন্ শত্রুর কাছে খুব "defined object"। শত্রু তার external line of operation-এর সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় পেয়েছে—অর্থাৎ, তাদের position গোপনে পরিবর্তন করে আমাদের defined target-এর উপর দূরপাল্লার রাইফেল ও মেশিনগানের আক্রমণ চালাবার পুরো সুবিধে পেয়েছে। শত্রুর এই tactical advantage আমাদের বিপ্লবী সমরনায়কদের খুব ভালভাবেই জানা ছিল। কিন্তু তাঁদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না যে, ইতিমধ্যেই শত্রুপক্ষ তাদের external line of operation-এর সুযোগ নিয়ে কিভাবে সৈন্য deploy করেছে।

আমাদের নওজোয়ানেরা প্রতি মুহূর্তে প্রতীক্ষা করছে—এই বুঝি মেশিনগান চললো। জালালাবাদ পাহাড়ের পাদদেশে, নালার মধ্যে, টেটের হেডকোয়ার্টার থেকে বিউগল্ ধ্বনি শোনা গেল। এই বিউগলের সঙ্কেত অনুযায়ী পাহাড়ের নিচ থেকে সৈন্যেরা কয়েক রাউণ্ড ফায়ার করে। সেই শব্দ লক্ষ্য করে মুহুর্মুহুঃ বিপ্লবীদের মাস্কেট্রি গর্জন করে উঠলো। আবার শত্রুপক্ষের তূর্যধ্বনি! কেন এই রণভেরী? মাস্কেট্রির মুখে আগুনের ছটা ও ধোঁয়া দেখে সেই দিক লক্ষ্য করে, জালালাবাদ পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্বে, একটা উঁচু টিলার ওপর থেকে বৃটিশ সৈন্য হঠাৎ তীব্রভাবে মেশিনগান ও রাইফেল ফায়ার সুরু করলো। লোকনাথ ডান দিকে অবস্থিত বিপ্লবী সৈনিকদের আদেশ দিল—"Friends! Enemy on the South-East hill—Aim—Ten rounds—Rapid fire!" প্রায় বিশ-পঁচিশটি মাস্কেট্রি গর্জন করে উঠলো। লক্ষ্য ভেদ করার জন্য গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দে অবিরতই মাস্কেট্রি গর্জন করে চললো। দু'তিন মিনিটের মধ্যে শত্রুসৈন্যের পজিশন্ লক্ষ্য করে তারা প্রায় আড়াই শ' গুলী চালালো।

আক্রমণ আরও তীব্র ও প্রচণ্ডতর করে টেটের রণবিষাণ বেজে উঠলো। টট্ টট্ টট্—জালালাবাদের উত্তর-পূর্বের পর্বতশিখর হতে অকস্মাৎ শত্রুসৈন্যের মেশিনগান অগ্নিবর্ষণ করতে লাগলো। দুই ফ্ল্যাঙ্ক থেকেই বিপ্লবীরা প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত হয়েছে।

অজস্র ধারায় জালালাবাদ পাহাড়ের [illegible]
ছোট ডালপালা গুলীর আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। চোখের নিমেষে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী ছুটছে। কোন কোন গাছ মনে হচ্ছে যেন দা দিয়ে কেউ চেঁছে সাদা করে দিয়েছে। মেশিনগানের গুলী একটি একটি করে আসে না—দুই-এক সেকেণ্ডে এক এক ঝাঁক গুলী এসে গাছের ছাল-বাকলা উড়িয়ে দিচ্ছে। যুবকদের কানের পাশ দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দে গুলী ছুটছে। তাদের আশেপাশে, সামনে পেছনে—চতুর্দিক থেকে গুলী এসে পাহাড়ের মাটিতে আত্মগোপন করছে। প্রায় পনেরো বিশ মিনিট ধরে তিন দিক থেকে—জালালাবাদ পাহাড়ের নিচ থেকে এবং দক্ষিণ-পূর্বের ও উত্তর-পূর্বের অন্য দুইটি পাহাড়ের ওপর থেকে, শত্রুসৈন্য ক্রমাগত অসংখ্য গুলী চালিয়েছে। কিন্তু যদিও অতি অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য মনে হবে, তবু বিশ্বাস করতে হবে যে, এখনো পর্যন্ত আমাদের কারও গায়ে একটু আঁচও লাগে নি। শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ বৃটিশ সৈন্যের শোচনীয় অক্ষমতার জন্য ম্যাগাজিন রাইফেল ও মেশিনগানের লক্ষ্যচ্যুত গুলীও লজ্জা পেয়েছে—জালালাবাদের মাটিতে তাদের নীরব সমাধি হয়েছে।

তৃতীয় দফায় তিন দিক থেকে এই প্রচণ্ড আক্রমণ। পনেরো বিশ মিনিট পরেই মেশিনগান ও রাইফেলের গুলী-বর্ষণ স্তব্ধ হ'ল। আমাদের সাথীরা এবারেও morale ও fire superiority—মনোবল ও অগ্নিবর্ষণে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখলো। শত্রুপক্ষ অধিকতর শক্তিশালী এবং দূরপাল্লার রাইফেল ও মেশিনগান দিয়ে অন্তত পাঁচগুণ বেশি গুলী ছুঁড়েছে। তবু আমাদের fire superiority-র দাবি করার একমাত্র কারণ শত্রুপক্ষের রাইফেল ও মেশিনগান সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দিয়ে বিপ্লবী সাথীরা ফায়ার অব্যাহত রেখেছে, শ্লোগানের পর শ্লোগান দিয়ে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে তুলেছে।

রণক্ষেত্র আবার শান্ত হ'ল। কোন পক্ষই আর গুলী ছুঁড়ছে না, বিউগল্ বাজছে না, রণরোলও শোনা যাচ্ছে না। এই ক্ষণিক শান্ত পরিবেশের মধ্যেও বিপ্লবী সমরনায়কেরা প্রবল শত্রুর সামরিক শক্তির প্রাধান্যের বিরুদ্ধে complacent বা তাচ্ছিল্যের মনোভাব পোষণ করেন নি। লোকনাথ খুব নিম্নস্বরে হুকুম জারি করলো—

"Comrades, stop fire unless I order you again. All eyes—focus on hills and below. Try to trace out the enemy-movement. Fire as soon as you trace any enemy!"

জেনারেল বলের আদেশ—"ফায়ার বন্ধ রেখে সজাগ থাক"—বিপ্লবী সৈনিকেরা ফিস্‌ফিস্ করে জালালাবাদের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে প্রচার করে দিল।

[illegible] হাতে সজাগ হয়ে আছে। জালালাবাদ পাহাড়ের ওপর থেকে কোন ফায়ার বা শ্লোগানের আওয়াজ না পেয়ে শত্রুপক্ষ খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত!

ঘণ্টাখানেক হ'ল যুদ্ধ সুরু হয়েছে। এখন প্রায় সাড়ে ছ'টা। বৃটিশ সমরাধ্যক্ষেরা বিপ্লবী বাহিনীর অবস্থান সন্ধানে ব্যস্ত—তারা এখন কোথায়? অত সহস্র ফায়ারের পর বিপ্লবীদের হতাহতের সংখ্যা কি? তারা কি রাতেব অন্ধকারে পালাবার ব্যবস্থা করছে, নাকি অন্য কোন সুবিধেজনক স্থানে আত্মরক্ষার ব্যূহ রচনার চেষ্টায় আছে? নাকি গোপনে গিরিপথে infiltrate করে বৃটিশ সৈন্যের flank বা সম্ভব হলে তাদের পেছন থেকে আক্রমণ করার আয়োজন করছে?—কোন পক্ষই অপর পক্ষেব অবস্থা বা মনোভাব সঠিক বুঝতে পারছে না। শত্রুরা যখন অনিশ্চয়তার মধ্যে বুঝতে পারছে না বিপ্লবীরা কি করবে, তখন আমাদের বাহিনীও শত্রুর অতর্কিত আক্রমণের বিভিন্ন সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন। লোকনাথ ভাবছিল আমাদের দুই flank আবার আক্রান্ত হতে পাবে। সে মাস্টারদাকে বলল—"মাস্টারদা, আপনি বরং উত্তর-পূর্ব দিকের ভার নিন। কমরেডরা যেন সতর্ক থাকে—অনেক বেশি সতর্ক থাকে।" লোকনাথ দক্ষিণ-পূর্ব দিকেব ভার দিল নির্মলদার ওপর। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তি মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে; অনেকে এইরূপ পরীক্ষাব সম্মুখীন হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে বা নিজের সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে যায়। তাই নেতারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেয়েছেন আমাদের সৈন্যদের morale যেন কোনমতেই নষ্ট না হয়।

সন্ধ্যা নেমে আসছে। এখনও আলো অন্ধকারের সংমিশ্রণ। দক্ষিণ-পূর্ব টিলার ওপর থেকে আবার শত্রুর মেশিনগানঅগ্ন্যুদ্‌গিরণ সুরু করলো। টট্ টট্ টট্—টেরের্ টেরর্ ট্যাট্ ট্যাট্—বৃটিশ সৈন্য বদ্ধপরিকর, মনে হচ্ছে, তারা যেন সমস্ত জালালাবাদ পাহাড়টিকেই উড়িয়ে দেবে—একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে! সমানে বীরদর্পে ফায়ার করে চলেছে! লুইস-গানের ম্যাগাজিন একের পর এক খালি করে ফেলছে। ঝাঁকে ঝাঁকে মেসিনগানের গুলী বিপ্লবীদের মাথার ওপর দিয়ে কানের পাশ দিয়ে সাঁই সাঁই করে ছুটেছে। পাহাড়ের ওপরে গাছপালা, ডালপাতা, গাছের ছাল-বাকলা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে চারদিকে উড়ছে। শত-সহস্র গুলীর আঘাতে ধুলো-বালির ঝড় বইছে। এইরূপ প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে বিপ্লবীদের হাতের বন্দুক বারে বারে গর্জন করে চলেছে—গুড়ুম্, গুড়ুম্ গুম্! বজ্রনির্ঘোষে লোকনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল—"Comrades! fire!" দ্বিগুণ উৎসাহে আমাদের যুবক সৈনিকদের মাস্কেট্ দুম্ দুম্ করে গর্জে উঠলো এবং অনবরত অগ্ন্যুদ্‌গিরণ করতে লাগলো।

আমাদের রিপাব্লিকান আর্মির ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল—কেন শত্রুর মেশিনগান এখনও স্তব্ধ হচ্ছে না? টিলার ওপর মেসিনগানের মুখে আগুনের ঝলক দেখা

যাচ্ছিল। টেগ্‌রা বল (লোকনাথের ছোট ভাই) আবেগের প্রবাহে ভুলে গেল আত্মরক্ষার কথা, ভুলে গেল সামরিক নীতি ও কৌশল, ভুলে গেল মৃত্যুর পরোয়ানা। মেশিনগানের মুখে আগুনের ঝলক লক্ষ্য করে টেগ্‌রা গুলী ছুঁড়বেই—শত্রুর মেশিনগান সে স্তব্ধ করে দেবে—বালক অভিমন্যু টেগ্‌রা বল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শোয়া পজিশনে গুলী করলে ঠিক নিশানা পাওয়া যাচ্ছিল না। রণকৌশলের কোন কায়দা না মেনে টেগ্‌রা মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে মেশিনগান লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়ছে। কত শত-সহস্র গুলী ইতিমধ্যে জালালাবাদে এসে পড়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত একজনও আহত হয় নি—একটি গুলীও কাউকে—স্পর্শ করে নি। তবে পরোয়া কি? টেগ্‌রা লাফিয়ে উঠে উঠে ফায়ার করছে। নির্মলদা চেঁচিয়ে উঠলেন—"এ কি করছিস্? দাঁড়িয়ে ফায়ার করছিস্ কেন?" টেগ্‌রা উত্তর দেয়—"বৃটিশের মেশিনগান স্তব্ধ করতে হবে। তাদের ঔদ্ধত্যের জবাব দেওয়া চাই।" টেগ্‌রার জেদ, দৃঢ়তা, মৃত্যুকে উপেক্ষা করবার সাহস, বিক্রম ও বালকসুলভ চপলতা শুধু নির্মলদা কেন অন্য সকলেই জানতো। কেবল টেগ্‌রার উৎসাহ উদ্দীপনার কথা নয়, সকল যুবক-সাথীরই অদম্য সাহস ও মৃত্যুপণ করে যুদ্ধ করবার একনিষ্ঠাই যে সেইদিন জালালাবাদ যুদ্ধে প্রচণ্ড ও প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে (কেবলমাত্র মাস্কেট্রি হাতে) একমাত্র শত্রুবিধ্বংসী ব্রহ্মাস্ত্র, নির্মলদা ও অন্যান্য নেতারা তা' উপলব্ধি করেছিলেন। তাই টেগ্‌রাকে কঠোর সামরিক নির্দেশ দেওয়া হয় নি; নির্মলদা নির্ভীক টেগ্‌রাকে তার নিজ বুদ্ধি, ইচ্ছা ও সাহসের ওপর নির্ভর করে যুদ্ধ করবার পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন, কেবল একটু সাবধান কবে দিলেন মাত্র।

বিপ্লবী যুবক-সৈনিকেরা যুদ্ধ করে চলেছে। ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই, উৎসাহ উদ্দীপনার অভাব নেই—বুকে অদম্য সাহস, মুখে 'বন্দেমাতরম', হাতে মাস্কেট্রি! পৃথিবীর কোন শক্তি নেই তাদের পরাজিত করে। শত্রুর রাইফেল ও মেশিনগান আছে প্রচুর। আমাদের মাত্র চুয়ান্নটি মাস্কেট্রি, কার্তুজ আছে, তাও সামান্য—পর্যাপ্ত কোনমতেই নয়। তা'ছাড়া বাস্তবক্ষেত্রে শত্রুপক্ষ মাস্কেট্রির পাল্লার বাইরে থেকে তাদের ম্যাগাজিন রাইফেল ও লুইস্ গান স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারে। বিপ্লবীদের সামনে আরো একটি প্রধান অন্তরায়—মাস্কেট্রি চালু অবস্থায় রাখা। এই সমস্যা যে এত গুরুতর আকারে দেখা দেবে, অভিজ্ঞতার অভাবে তা আমরা আগে জানতাম না। Smokeless Black Powder (ধোঁয়াবিহীন কালো বারুদ) যদিও কার্তুজে ব্যবহৃত হয়, তবু বন্দুক, রিভলভার, রাইফেল বা লুইস্ গানের 'চেম্বার' ও 'ব্যারেলে' ছাইয়ের সামান্যতম অংশ হলেও প্রতি ফায়ারের পর জমা হয়। সেই সব আগ্নেয়াস্ত্র চালু রাখার জন্য 'ব্যারেল' ও 'চেম্বার' নিয়মিত পরিষ্কার করতে হয়। পরিষ্কার করবার জন্য 'ক্লিনিং রড' ও 'স্টীল পাফ' (লৌহতন্তু নির্মিত ব্রাস ও গজ) সকল প্রকার

বন্দুক, রাইফেল বা মেশিনগানের সঙ্গেই থাকে। প্রত্যেকটি মাস্কেট্রির কুঁদোর ছোট গহ্বরের মধ্যে এইসব অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রাদি সংরক্ষিত থাকে। পুলিস মাস্কেট্রি একসঙ্গে বেশিবার ফায়ারের উপযুক্ত নয়। প্রথমত উপর্যুপরি পাঁচ-সাতবার ফায়ার করার পরই 'ব্যারেল' এমন উত্তপ্ত হয় যে 'এমিং পজিশনে' ধরে রাখা যায় না। এই অসুবিধে দূর করবার জন্য আর্মি রাইফেলের 'ব্যারেল'-এর নিচে বেশ মোটা কাঠ সংযুক্ত করা থাকে, যেটি বাঁ হাতে ধরে লক্ষ্য স্থির রাখা যায়। কিন্তু এই অত্যাবশ্যক 'ব্যারেল'-এর নিচের কাঠটি মাস্কেট্রিতে যা' ব্যবহার হয়, তা' অত্যন্ত পাতলা। আমাদের কমরেডরা 'ব্যারেল'-এর নিচটা অতি মাত্রায় গরম হওয়ায় যখন ধরে রাখতে পারছিল না, তখন তারা রুমাল, জামা, কাপড় অথবা গাছের অনেকগুলি বড় বড় পাতা একত্র করে উত্তপ্ত ব্যারেলের নিচে দিয়ে তার ওপর হাত রেখে ফায়ার করছিল।

আট-দশটি ফায়ার করার পর মাস্কেট্রি একেবারে অচল হ'য়ে পড়লো। চেম্বারে কার্তুজ ঢোকান বা বার করা একেবারেই সম্ভব হচ্ছিল না। মাস্কেট্রির নল ও চেম্বার (যে স্থানটিতে কার্তুজ ঢোকান হয়) কালিতে, ধোঁয়ায়, ছাইয়ে, ঘামে ও ময়েশ্চার'-এ (জলীয় বাষ্পে) আঠা আঠা হয়ে যাচ্ছে—একটার পর একটা মাস্কেট্রি এইরূপে সাময়িকভাবে অচল হয়ে পড়ছে। তাই কমরেডরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিল, দু'জনে একসঙ্গে ফায়ার করবে না—একটি মাস্কেট্রি কতকগুলি ফায়ার করার পর যখন পরিষ্কার করা হবে, তখন দ্বিতীয়জন প্রয়োজন অনুযায়ী 'ফায়ার' করবে। নল পরিষ্কার করার জন্য প্রত্যেকের কাছে যদিও কেরোসিন ও নারকেল তেল-মিশ্রিত তেল ছিল, তবু পাহাড়ের শেষ মাথায় 'ফায়ারিং লাইনে' যারা ছিল তাদের পক্ষে সেই পজিশনে থেকে বন্দুক পরিষ্কার করা সহজসাধ্য ছিল না। সামান্য নাড়াচাড়াতেও শত্রুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার সম্ভাবনা। ল্যায়িং পজিশন্' থেকে একটুকুও মাথা তুলতে লোকনাথ সকলকে নিষেধ করেছে। আমাদের কমরেডরা যতক্ষণ পর্যন্ত ভালভাবে শোয়া পজিশন রক্ষা করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত শত্রুর হাজার হাজার গুলী ব্যর্থ হয়েছে—কাউকে আহত করতে পারে নি। খুব সুষ্ঠুভাবে সকলে 'লায়িং পজিশন' রক্ষা করবে এবং আমাদের গুলী ছোঁড়াও অব্যাহত থাকবে—এটা হ'ল আমাদের সামরিক প্রয়োজন।

স্বয়ং মাস্টারদা ও নির্মলদা এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নিলেন। নির্মলদা পেছনের দিকে ঝোপের আড়ালে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান বেছে নিয়েছেন। তিনি সবার কাছ থেকে ছোট ছোট তেলের টিনগুলি তাঁর কাছে আনবার ব্যবস্থা করলেন। কাছাকাছি যারা ছিল তাদের বন্দুকগুলি আগে সংগ্রহ করলেন। মাস্টারদা হামাগুড়ি দিয়ে বুকে হেঁটে প্রত্যেকের কাছে গিয়ে পরিষ্কার করবার জন্য

মাস্কেট্রিগুলি নির্মলদার কাছে নিয়ে এলেন এবং আবার বুকে হেঁটে 'ফ্রণ্ট লাইনে'-কমরেডদের কাছে পৌঁছে দিলেন। এক একবারে তিন-চারটি মাস্কেট্রি পাহাড়ের বুকে মাটিতে ঘষে ঘষে নির্মলদার কাছে এনেছেন আবার সেগুলি 'ফ্রণ্ট লাইনে'-সরবরাহ করেছেন।

এই সেদিনও, জালালাবাদ যুদ্ধে যারা উপস্থিত ছিল তাদের কারও কারও কাছে এইসব বর্ণনা শুনেছি। তারা বলেছে—"আজও আমাদের চোখের সামনে ভাসছে মাস্টারদা কিভাবে সমগ্র পাহাড়ের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত বুকে হেঁটে বেড়িয়েছেন। অজস্রধারায় গুলী চলছে, মাস্টারদার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। যুদ্ধের দ্বিতীয় ঘণ্টায় দূর পাহাড়ের উচ্চ শিখর হতে 'ভাইকার মেশিনগান' গর্জন করে চলেছে। মিনিটে বোধ হয় তিনশ'পঞ্চাশটি ফায়ার হচ্ছে। কারও মাথা তোলার উপায় ছিল না। আমাদের কমরেড একজনের পর একজন গুলীবিদ্ধ হচ্ছে; তবু মাস্টারদা আমাদের 'ফায়ার পাওয়ার' বজায় রাখতে মাস্কেট্রি পরিষ্কার করবার জন্য ক্রমাগত মাস্কেটি আনা-নেওয়া করেছেন। মাস্টারদার সেই প্রশান্ত দৃঢ়ভাব চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না—মাস্টারদা বলেই সেদিন তা' সম্ভব হয়েছিল। মনে হচ্ছিল শেক্সপীয়রের কথা—

'Cowards die many a times before their death, but the valiant dies only for once' !"

—দুর্বলেরা মৃত্যুর পূর্বে বহুবার ভয়ে মরে; কিন্তু নির্ভীক জীবনে মাত্র একবারই মৃত্যুবরণ করে—জীবনে এই সত্যটি যিনি উপলব্ধি করেছেন, শুধুমাত্র তিনিই বুঝতে পারবেন যে, ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী ও কমরেডদের মৃত্যু—কোন কিছুতেই মাস্টারদা কেন বিচলিত হননি বা তাঁর মধ্যে কোন ভাববৈলক্ষণ্য দেখা যায় নি। মাস্টারদা তাঁর দুর্বল শরীরে কোথা থেকে এই দুর্জয় শক্তির অধিকারী হলেন? চারদিনের অনাহার, অর্ধাহার, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তি, কিছুতেই সঙ্কটমুহূর্তে মাস্টারদাকে কঠোর কর্তব্য থেকে নিরস্ত করতে পারে নি। বিপ্লবের মহানায়ক, জালালাবাদ যুদ্ধের প্রেরণা, যুব-বিদ্রোহের পরিচালক সূর্য সেন তাঁর বিশ্বাসে অটল—বিপ্লবী যুবক-সাথীরা আজকের যুদ্ধে আদর্শ স্থাপন করবে—পরাজয় মেনে নেবে না। মাস্টারদার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান কি করে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যায়—কি করে আমাদের 'ফায়ার পাওয়ার' রক্ষা করা যায়? শেষের দিকে বিপ্লবীদের কার্তুজ প্রায় ফুরিয়ে এলো। নিজেরাই তখন সাবধানে বুঝে বুঝে 'ফায়ার' করছে। বন্দুক যদি অচল হয়, আর শত্রুপক্ষ তা' একবার টের পায়, তাহলে বেয়নেট চার্জ করতে তারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবে না। তাই মাস্টারদা জানালেন আমরা যেন ক্রমাগত 'কণ্ট্রোল্ড ফায়ার' করে যাই। আজ মনে হয় শত অসুবিধে সত্ত্বেও আমাদের মাস্কেটি শেষ পর্যন্ত চালু

ছিল বলেই বোধ হয় বেয়নেট চার্জ করার কথা শত্রুপক্ষ ভাবতে পারেনি। তাই তারা যুদ্ধে ক্ষান্ত হয়েছে ও পরাস্ত হয়ে সেই রাত্রে শহরে ফিরে গেছে। বাস্তব সমরক্ষেত্রে মাস্টারদার এই পরিচয় পাওয়ার সুযোগ না পেলে আমরা মাস্টারদার পূর্ণতা সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে যেতাম।

দ্বিতীয় ঘণ্টায় দক্ষিণ-পূর্বের উচ্চ টিলা থেকে শত্রুর মেশিনগানের অগ্নিবর্ষণ প্রচণ্ডতর হয়ে উঠলো। টেগ্‌রা মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠে মেশিনগান লক্ষ্য করে ফায়ার করছে। মেশিনগান আরো অনেক দূরে বসিয়ে শত্রুসৈন্য অনায়াসে গুলী চালাতে পারতো। তবে তারা মাস্কেটির আওতার মধ্যে মেশিনগান বসাতে গেল কেন? যুদ্ধের নীতি অনুযায়ী সাধারণতঃ শত্রুর রেঞ্জের বাইরে থেকেই ফায়ার করা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে সামরিক নেতারা এর ব্যতিক্রম করার প্রয়োজনও অনুভব করেন। ১৮ই এপ্রিল রাত্রে ওয়াটার-ওয়ার্কসের দালানের বিশেষ স্থান অধিকার করে শত্রুপক্ষ পুলিস-লাইনের টিলার ওপর আমাদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করে মেশিনগান চালিয়েছিল। আমাদের মধ্যে ব্যবধান তখন খুব বেশি হলেও পঞ্চাশ-ষাট গজের বেশি ছিল না। আমাদের কমরেডরা যদিও সকলেই শোওয়া অবস্থায় ছিল, তবু ষাটজনের proper deployment-এর জন্য স্থান-সঙ্কুলান হয়নি বলে সামরিকনীতি অনুযায়ী পরস্পরের মধ্যে যতখানি ফাঁক রাখা উচিত ছিল তা সম্ভব হয় নি। শত্রুপক্ষ.এত কাছ থেকে গুলী করা সত্ত্বেও একটি গুলীও সেদিন আমাদের কাউকে স্পর্শ করে নি। যুদ্ধের এই নজীর অভিজ্ঞ সমরবিদেরা জানেন': তাই তাঁরা লক্ষ্যভেদ করার জন্য ভালো আড়াল ব্যবহারের সুযোগ পেলে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও খুব কাছ থেকে fire করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। জালালাবাদ পাহাড়ের ওপর কমরেডদের পজিশন্, শত্রুপক্ষ দু'বার assault করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের সৈনিকদের morale এতটুও নষ্ট হয় নি—তাদের রণহুঙ্কার একবারও বন্ধ হয় নি—হাতের আগ্নেয়াস্ত্র একবারও বিশ্রাম নেয় নি। তাই শত্রুর চেষ্টা—যত দূর সম্ভব কাছ থেকে অতর্কিতে অজস্র ধারায় মেশিনগানের গুলীবর্ষণ করে সবাইকে একযোগে হত্যা করা—পারলে জালালাবাদ পাহাড়টিই উড়িয়ে দেওয়া! ক্যাপ্‌টেনের হুকুম—"তীব্র ও প্রচণ্ডভাবে গুলী চালাও।"

এই সেইদিন একটি বাড়িতে দেখি মনীষা নামে আমার কন্যা স্থানীয়া একটি মেয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে বসুমতী (সাপ্তাহিক বসুমতী-যেখানে আমার এই লেখাটিই ধারাবাহিকভাবে বেরোচ্ছিল) পড়ছে। মনে হ'ল জালালাবাদ যুদ্ধের বর্ণনাটি দেখছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"আচ্ছা মনীষা বলত—ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী পাহাড়ের গাছপালা বিধ্বস্ত করছে, সাঁই সাঁই করে শত শত গুলী কানের পাশ ও মাথার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, তবু কেউই আহত হ'ল না—এটা পড়ে তোমার কি

মনে হচ্ছে না যে, এই সমস্ত কেবল ভাষার বিন্যাস ও গাঁজাখুরি কথা? ইতস্তত কোরো না—ঠিক যা তোমার মনে হয়েছে তাই বল।" মনীষা বলল, "আমার অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে—মনে হয়েছে যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে ভাবাবেগে আপনি অবাস্তব কল্পনায় ডুবে গেছেন।"

আমি জানতাম মনীষা ঠিক এই-ই বলবে। আমি জানি অভিজ্ঞতার অভাবে পাঠকবৃন্দেরও অনেকের মনীষার মত ধারণা হবে। এই কারণে এই প্রসঙ্গটি উত্থাপিত করলাম। বিশ্বযুদ্ধে কোটি কোটি গুলী চলেছে, স্ট্যালিনগ্রাদে তিন মাস ধরে হাজার হাজার জার্মান বোমারু বিমান প্রতিদিন হাজার হাজার বোমাবর্ষণ করেছে; সেই দিন পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ গুলী বিনিময় হয়েছে—কিন্তু হতাহতের সংখ্যা কত? এই বাস্তব চিত্র মনে থাকলে তবেই জালালাবাদ যুদ্ধের বর্ণনার মধ্যে বাস্তব সত্য বুঝতে পারা যাবে। আমি বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে ভাবপ্রবণতাকে কোথাও প্রশ্রয় দিই নি। জালালাবাদ যুদ্ধের বাস্তব চিত্র সাধ্যমত পরিবেশন করতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমার পক্ষে, শুধু আমার পক্ষে কেন, কারো পক্ষেই যে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হবে না সে উপলব্ধি আমার আছে। কোন শিল্পী বা লেখক, যতই নিপুণভাবে চেষ্টা করুন না কেন, জালালাবাদের যুদ্ধকে বাস্তব রূপ দিতে সক্ষম হবেন না। আবার একথাও সত্য যে, বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে কোন বর্ণনাই সঠিক চিত্রকে রূপায়িত করতে পারে না। কাজেই আজগুবি, অপ্রয়োজনীয় ও কাল্পনিক বিষয়ের অবতারণা করে আমার লেখাকে আরো দুর্বল ও অবাস্তব করে দেওয়ার ইচ্ছে আমার নেই।

সত্যই তখন ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী আসছে, কিন্তু টেগ্‌রা বেপরোয়া। যুদ্ধজয়ের জন্য রণনীতি ও কৌশল যেমন প্রয়োজন—সাহস, বিক্রম ও সৈনিকের morale-ও তার চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নয়। জালালাবাদ যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য—Patriotic army-র অসম সাহস ও বিক্রম, ইংরেজের ভাড়াটে সৈন্যের প্রবল ও প্রচুর অস্ত্রবলকে পরাভূত করেছে।

"জীবন তুচ্ছ—সবাই দিতে পারে। আর কি আছে—আর কি দিতে পারি? উত্তর হইল ভক্তি!"—দেশমাতৃকার প্রতি ভক্তি। "বিদেশী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর কবল হতে আমার দেশকে মুক্ত করতে হবে—" টেগ্‌রার হাতের বন্দুক গর্জে গর্জে উঠছে। টেগ্‌রা লাফিয়ে উঠে গুলী ছুঁড়লো। এবার টেগ্‌রা আর রক্ষা পেল না—লুইস্‌গানের এক ঝাঁক গুলী টেগ্‌রাকে ক্ষত-বিক্ষত করে বেরিয়ে গেল। লুইস্‌ গান থেকে দু'সেকেণ্ড শেষ হওয়ার আগে সাতচল্লিশটি গুলী ছোটে। তাই প্রায় ক্ষেত্রেই কয়েকটি গুলী এক সঙ্গেই টারগেট বা নিশানাকে আঘাত করে। লুইস্‌ গানের গুলী টেগ্‌রার গলায় যেন মালা পরিয়ে শহীদ মন্দিরে অভ্যর্থনা জানালো।

রক্তাপ্লুত দেহে টেগ্‌রা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। হাতে তখনও বন্দুক ধরা আছে—চোখ দু'টি তখনও খোলা—ঠোঁট দু'টি কেবল একটু একটু কাঁপছে—মনে হ'ল সে যেন কিছু বলতে চায়! বহু কষ্টে সে আস্তে আস্তে বলল—"সোনাভাই (লোকনাথ বল) আমি চললাম—মাস্টারদা বিদায়! ভাই সব শত্রুকে……।" টেগ্‌রার কণ্ঠরোধ হ'ল আর বলতে পারলো না। বোধ হয় বলতে চেয়েছিল, "শত্রুকে ক্ষমা নাই, তাদের প্রতি কোন দয়া নাই মায়া নাই!" টেগ্‌রা এখন শান্ত সমাহিত, তবু তার বাণীহীন কণ্ঠের ধ্বনি জালালাবাদ পর্বত শিখরে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে—"দয়া নাই, মায়া নাই—ইংরেজ শত্রুকে ক্ষমা নাই।"

টেগ্‌রার ক্ষীণকণ্ঠের ডাক—"সোনাভাই চললাম"—লোকনাথের কানে পৌঁছেছিল। যারা পাশে ছিল সেই সময় তাদের মুখে আমার শোনা—লোকনাথ জবাব দিল—"যুদ্ধক্ষেত্রে সোনাভাই কেউ নেই। আমরা সৈনিক, আমাদের কর্তব্য 'do or die'! বীরের মত প্রাণ দাও!" লোকনাথ নিজ position থেকে একটুও নড়ে নি—একটুও বিচলিত হয় নি—সে যেন আগে থেকেই subjectively প্রস্তুত ছিল—চাই প্রতিশোধ—লোকনাথের বন্দুক ঘন ঘন গর্জন করতে লাগলো!

চারিদিক থেকে সাথীরা বলে উঠলো—"টেগ্‌রার গুলী লেগেছে—টেগ্‌রা পড়ে গেছে—টেগ্‌রা আমাদের ছেড়ে চলে গেল!" এক সঙ্গে সকলে শ্লোগান দিতে লাগলো—"Long Live Tegra! Long Live Revolution! Long Live Revolutionary Tegra! বন্দে মাতরম্‌!" আকাশ-বাতাস মুখরিত করে বিপ্লবী মহারোল উঠলো। ঘন ঘন শ্লোগান—ঘন ঘন বন্দুক গর্জন—ঘন ঘন লোকনাথের command—'Fire! Volley Fire'—জালালাবাদ পাহাড় প্রকম্পিত করে তুললো! পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হ'ল—'Long Live Revolution; Long Live Tegra—বন্দে মাতরম্‌।' চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের প্রথম শহীদ টেগ্‌রা ডাক দিয়ে গেল—শত্রুকে ক্ষমা নেই! বিপ্লবী সৈনিকদের বন্দুক অগ্নি উদ্‌গিরণ করে চলেছে—আর থামে না। দক্ষিণ-পূর্ব পাহাড়ের মেশিনগান আবার স্তব্ধ হয়ে গেল। নতুনভাবে আক্রমণ আসবে এবং আবার যে প্রচণ্ড গুলীবর্ষণ সুরু হবে, তাতে কারো সন্দেহ ছিল না। শত্রুপক্ষের গুলীবর্ষণ বন্ধ হওয়ার পরেও আমাদের সাথীরা firing একেবারে বন্ধ করে নি। মাঝে মাঝেই তারা fire করে চলেছে।

পনেরো-বিশ মিনিট কেটে গেছে—শত্রুপক্ষ একেবারে চুপ—কোথাও যেন কিছু নেই। হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে পাহাড়ের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে উত্তর-পূর্বের একটি উঁচু পর্বত শিখর হতে শত্রুপক্ষ আবার মেশিনগান চালাতে লাগলো। এবারে বৃটিশ সৈনিকদের গুলীবর্ষণ আরো প্রচণ্ড আকার ধারণ করলো। তারা এবার যেন আরো নিকট থেকে ফায়ার করছে। এই পঞ্চমবার ফায়ারিং আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

আমাদের যুবকদেব হাতেব বন্দুকও ক্রোধে, ক্ষোভে ভীমনাদে গর্জন করে উঠলো। বিপ্লবীরা প্রতিশোধ নেবে—মৃত্যুর আগে ইংবেজ সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের মেরে তবে মরবে। টেগ্‌রা মৃত্যুবরণ করেছে—তাবাও করবে। তাদেব হাতের বন্দুক ক্ষান্ত হবে না—ক্ষান্ত হবে তখনই যখন বাহুতে আব শক্তি থাকবে না—দেহে প্রাণ থাকবে না—টেগ্‌রাব মত ক্ষত বিক্ষত দেহখানি জালালাবাদ পাহাড়েব ওপর চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়বে!

টেগ্‌রার মৃত্যুব প্রতিশোধ চাই—বন্ধু টেগ্‌বাব প্রাণদানে উদ্বুদ্ধ ত্রিপুরা সেন ইংরেজের বুকের রক্ত চায়! ত্রিপুরা বিরামহীনভাবে গুলী ছুঁড়ছে—হঠাৎ একি হ'ল! এই তার শেষ গুলী ছোড়া। শত্রুব মেশিনগানেব গুলী ত্রিপুরাব বক্ষ ভেদ করে চলে গেল। ত্রিপুরা দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল। একটু ঘুরে খাড়া অবস্থা থেকেই গোড়া কাটা গাছের মত মাটিতে পড়ে গেল। প্রত্যক্ষদর্শীর কথা—গুলী লাগাব সঙ্গে সঙ্গেই তাব মুখ একেবারে সাদা হয়ে গেল—যেন একবিন্দু রক্তও নেই। একটি কথাও সে বলতে পাবলো না—কিন্তু আশ্চয। বন্দুকটি তাব হাতে ধরাই ছিল।

ত্রিপুরা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে। আবার জয়ধ্বনি—'Long Live Tripura! Long Live Revolution! Long Live Revolutionary Tripura। বন্দে মাতরম্‌। বন্ধুদেব রণ-নিনাদে মেশিনগানের গর্জনও যেন ডুবে গেল।

ত্রিপুরা—ব্রিগেডিয়ার ত্রিপুরা। আইরিশ বিদ্রোহেব নেতা—ড্যানব্রিন-এব প্রতিকৃতির সঙ্গে ত্রিপুরাব অনেকখানি সাদৃশ ছিল। বয়সেব তুলনায় ত্রিপুরাব যা শারীরিক গঠন ও স্বাস্থ্য ছিল—বাঙালীর ঘরে সচরাচর তা দেখা যায় না। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা, সবল বাহু, স্ফীত বক্ষ, বলিষ্ঠ দেহ—সোজা হয়ে দাঁড়াতো, মাটি কাঁপিয়ে হাঁটতো, সব সময় সাহসী সৈনিকেব ভাব বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুকে যেন চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। ত্রিপুরা আমাদেব সকলেবই অতি প্রিয়পাত্র ছিল। আমার যত দূব মনে পড়ে, বিপ্লবী নেতা Danbrin ছিলেন আইরিশ রিপাব্‌লিকান আর্মির একজন ব্রিগেডিয়াব জেনারেল। আমরাও ত্রিপুরাকে ব্রিগেডিয়াব বলে সম্বোধন করতাম। চট্টগ্রাম ভলাণ্টিয়াব বাহিনীর G. O. C. গণেশ ঘোষ, আমি Second-in-Command আর ত্রিপুরা ছিল আমারই পরের সামরিক পদে। নরেশ ও বিধু বয়সে এবং সংগঠক হিসাবেও ত্রিপুরাব চাইতে অনেক বড়—তবুও তারা ত্রিপুরাকে 3rd-in Command পদে নিযুক্ত দেখে খুব খুশিই ছিল। ১৯২৯ সালে সুভাষচন্দ্র যখন চট্টগ্রাম রাজনৈতিক জেলা-কন্‌ফারেন্সে সভাপতিত্ব করতে আসেন, তখন তিনি আমাদের ভলাণ্টিয়াব বাহিনী পরিদর্শন করেন। তিনি ত্রিপুরাকে দেখে বিশেষ আকৃষ্ট হন-- বাঙালীর মধ্যে কে এই সুদর্শন বলিষ্ঠ তরুণ? সুভাষচন্দ্র ত্বপুরে মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কে গণেশ ও আমার সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করতে চেয়েছিলেন এবং আমাদের

সঙ্গে যেন ত্রিপুরাকেও নিয়ে যাই, সেইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আমাদের সঙ্গে ত্রিপুরাও গিয়েছিল।

ত্রিপুরাকে uniform পরা অবস্থায় ইংরেজ সামরিক অফিসার বলে ভুল হ'ত। খুব ফর্সা সুন্দর চেহারা—আর তেমনি সুন্দর স্বভাব! সাহস ও বীরত্বের কোন বহিঃপ্রকাশ ত্রিপুরার মধ্যে ছিল না। বন্ধুরা সকলে তার অন্তরের বৈপ্লবিক গভীরতার অনেক পরিচয় পেয়েছে। তাই ত্রিপুরা সবার আদর্শ ও অতি প্রিয় ছিল। তখন কিইবা তার বয়স—সবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। সতেরো বৎসরের 'বালক' ত্রিপুরা কতখানি রাশভারী ও উপযুক্ত ছিল যার জন্য 3rd-in-Command পদে নিযুক্ত হয়! কতখানি সার্বিক গুণ থাকলে পরে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়!

ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির ব্রিগেডিয়ার জালালাবাদ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে—বিপ্লবী সৈনিকেরা প্রস্তুত, তারাও প্রাণ দেবে—টেগ্রাকে—ত্রিপুরাকে অনুসরণ করবে! কে আগে বা কে পরে, তা তারা জানে না—তবে প্রত্যেকেই জানে যে, মৃত্যু তার জন্য অপেক্ষমাণ! আজকের যুদ্ধে তাদের বুকের রক্তে জালালাবাদের মাটি সিক্ত হবে—রাঙা হয়ে উঠবে!

যুদ্ধ এমন পর্যায়ে চলছিল যে, কারোই lying position ছেড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। মাথা তুললে বা kneeling বা sitting position নিলে শত্রুর গুলী যে তাকে ক্ষমা করবে না, সে বিষয়ে সকলে সচেতন; তবু কেউ কেউ গুলী উপেক্ষা করেও sitting বা knceling position নিয়েও fire করছিল। এমন কি সময় সময় Standing position নিয়েও তাদের মধ্যে কেউ কেউ ফায়ার করতে পিছপাও হয় নি। জালালাবাদ যুদ্ধের পরেও যারা জীবিত ছিল, তাদের প্রায় সবার মুখেই আমি শুনেছি—যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রথমটা যেন কিছুটা চিন্তা ভাবনা ছিল, involuntarily স্বাভাবিকভাবেই বুক কাঁপছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যখন ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী আসতে লাগলো ও গুলীর শব্দে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠলো, তখন আর যুদ্ধক্ষেত্রকে বিভীষিকাময় মনে হয় নি।

সমষ্টিগত morale সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবু ব্যক্তিগত অসাধারণ সাহসের যা বর্ণনা শুনেছি, তাতে আমি স্তম্ভিত না হয়ে পারি নি। ত্রিপুরা রক্তাপ্লুত দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে দেবুর (দেবপ্রসাদ গুপ্ত) দৃষ্টি সে দিকে আকৃষ্ট হয়। দেবু ও ত্রিপুরা পরস্পর অন্তরঙ্গ বন্ধু, বন্ধু-বিয়োগে দেবু দারুণ মর্মাহত। তার অন্তরে প্রচণ্ড ঝড়, দৃষ্টি বাষ্পাচ্ছন্ন। বন্ধুর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা দেবুকে মুহূর্তের জন্য সবকিছু ভুলিয়ে দিল। দেবু তার রাইফেল রেখে ধীরে ধীরে ত্রিপুরার কাছে গেল। চতুর্দিকে সাঁই সাঁই শব্দে গুলী চলছে—গুলীবৃষ্টির প্রতি দেবুর কোন

ভ্রূক্ষেপ নেই। ত্রিপুরার রক্তাক্ত দেহের কাছে এসে হাঁটু পেতে সে ত্রিপুরার মৃতদেহের পাশে বসলো। দুই চোখে তার জলের ধারা নেমেছে। যাদের দয়া নেই, মায়া নেই, ঘর-বাড়ি মা বাবা কিছুই নেই, দেবু তাদের মধ্যেই একজন—দেবুর চোখে জল কেন? ত্রিপুরার বক্ষে ঘন রক্ত জমাট বেঁধে আছে। দেবু ত্রিপুরার সামরিক খাকী কোটের বোতাম খুলে বুকের ক্ষতস্থানটি খুব ভাল করে দেখলো। তারপর আবার সযত্নে বোতাম এঁটে দিল। বন্ধু ত্রিপুরা—ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ত্রিপুরার কাছে সোজা attention position-এ দাঁড়িয়ে অতি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে দেবপ্রসাদ গুপ্ত—ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির সৈনিক, ব্রিগেডিয়ার ত্রিপুরাকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানালো।

দেবু আবার নিজের পজিশনে ফিরে এলো। বজ্রকঠিন মুষ্টিতে নিজের মাস্কেট্রি তুলে নিল। এখন চোখে আর জল নেই, প্রজ্বলিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তার চোখ দিয়ে যেন ঠিক্‌রে বেরোচ্ছে। তার হাতে অনবরত মাস্কেট্রি গর্জন করে চলেছে।

যে বর্ণনা আমি দেবপ্রসাদ সম্বন্ধে দিলাম তার প্রতিটি অক্ষর সত্যি। আমি মুগ্ধ হয়ে এই বর্ণনা শুনে, দেবুর সাহস ও বীরত্বকে মনে মনে প্রণাম জানিয়েছি। বন্ধুর প্রতি তার ভালবাসা কত গভীর, তা ভেবে অবাক হয়েছি, নিজেকে প্রশ্ন করেছি—"আমি কি শত্রুর অজস্র গুলী বর্ষণ উপেক্ষা করে দেবুর মত পনেরো কদম হেঁটে গিয়ে মৃত ব্রিগেডিয়ারকে Salute দিয়ে ফিরে আসতে পারতাম?" উত্তর পেয়েছি—"না, আমি তা পারতাম না।"

যদি কারও মনে হয় বন্ধুর প্রতি গভীর অকপট ভালোবাসাই দেবুকে আত্মহারা করেছিল—এতে সাহস বা বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না, তবে আমি তাঁর সঙ্গে একমত নই। আমার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে এবং বন্ধুত্বের বাস্তব প্রত্যক্ষ ইতিহাস যা আমার জানা আছে, তার ভিত্তিতে বলতে পারি দেবুর মত নির্ভীক ও স্নায়বিক দুর্বলতামুক্ত আর একজনও আমার চোখে পড়ে নি এবং এমন কারও সম্বন্ধে আমার জানাও নেই।

জালালাবাদ যুদ্ধক্ষেত্রের বিভীষিকাময় চিত্র আমার এই বর্ণনা পড়ে কতখানিই বা বোঝা যাবে? সিনেমা দেখে, বই পড়ে অথবা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের কথা চিন্তা করে যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তবতাকে পুরোপুরি অনুধাবন করা যায় না—সম্ভবও নয়। যখন শত্রুর অবিরত রাইফেল ও মেশিনগানের প্রত্যুত্তরে বিপ্লবী সৈনিকদের বন্দুক সমানে গর্জন করে চলেছে, যখন গুলীর আঘাতে গাছের ডালপালা ভাঙছে—পাতা উড়ছে, ধূলোবালিতে যুবকদের শরীর আচ্ছন্ন, শত্রুর গুলীতে যখন আমাদের সাথীরা রক্তাক্ত দেহে একের পর এক মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, তখনও দেখতে পেলাম দেবুর সাহস এবং স্নায়বিক দুর্বলতাকে বশীভূত করবার আশ্চর্য ক্ষমতা।

আয়ত্বের নিদর্শন জানা আমাদের যেমন প্রয়োজন, তেমনি আবার ভাবীকালের পথ-প্রদর্শক বিপ্লবী যুবকদের আরও বেশি জেনে রাখা উচিত যে, খুব সাহসী বিপ্লবী সৈনিকও যুদ্ধক্ষেত্রেব ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নিজের অস্তিত্বের উপলব্ধিও অনেক সময় হারিয়ে ফেলে। আমি আরো একজন যুবকসাথীর কথা বলবো। সবল সুস্থ সুগঠিত তার দেহ। বাঙালীর ঘরে সাধারণতঃ এইরূপ যুবকের সংখ্যা বিরল। গৌরবর্ণ, সুন্দর মুখাকৃতি, সদা প্রফুল্ল, দুর্জয় তার সাহস এবং গুণ্ডা দমনে সিদ্ধহস্ত—ভীরুতা কাপুরুষতায় তাকে কখনও প্রভাবিত হতে দেখিনি। এই তরুণ বন্ধুটি লোকনাথের ঠিক পাশে ছিল। টেগ্‌রা গুলীবিদ্ধ হয়ে ভূ-লুণ্ঠিত; ত্রিপুরা রক্তাক্তদেহে গড়িয়ে পড়েছে—শ্লোগানের পর শ্লোগানে পাহাড় কম্পিত। শত্রুর গুলী ও বিপ্লবীদের প্রত্যুত্তর, বন্ধুদের রক্তাক্ত মৃতদেহ—জালালাবাদে বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে। এক ঝাঁক গুলী লোকনাথের আশেপাশের গাছপালায় এসে লাগলো। গাছের এক টুকরো ছাল লোকনাথের পাশে সেই তরুণ বন্ধুকে সামান্য আঘাত করলো—না, আঘাত নয়—গায়ে এসে পড়েছে মাত্র। সামান্য এক টুক্‌রো গাছের ছালের স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই তরুণ বন্ধুটির মনে হ'ল তার গুলী লেগেছে। তার চোখ বন্ধ হয়ে গেল। ক্ষীণকণ্ঠে লোকনাথকে ডেকে সে বললো—"লোকনাথদা, আমার গায়ে গুলী লেগেছে—বিদায়! বন্ধুরা বিদায়!"

এই হ'ল যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তব বিভীষিকাময় চিত্র। কতখানি ভয়াবহ আবহাওয়া সৃষ্টি হলে অতি সাহসী যুবকেরও বাস্তব উপলব্ধিশক্তি লোপ পেতে পারে—গাছের ছালের সামান্য স্পর্শকে মেশিনগানের গুলী বলে মনে হতে পারে। এই ঘটনার বর্ণনা বিন্দুমাত্রও আমার কল্পনাপ্রসূত নয়। আমি লোকনাথের মুখে শুনেছি এবং আরো কয়েকজন, যারা সেই স্থানে ছিল, তারাও এই একই কথা বলেছে।

লোকনাথ তরুণ বন্ধুটির ভুল ভাঙাবার জন্য বলে—"ওরে, তোর হ'ল কি? গুলী কোথায়? দেখছিস্ না এটা সামান্য এক টুক্‌রো গাছের ছাল? তোর এত ভয়? Fire up your revolutionary spirit!"

লোকনাথের দৃপ্তকণ্ঠের বাণী তরুণ বন্ধুর ক্ষণিক দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করলো। সে যেন জ্ঞান ফিরে পেল। লোকনাথ তাকে সম্মোহিত করেছে। লোকনাথ আদেশ করলো—"উঠে দাঁড়াও, বন্দুক তোল; নির্ভীক সৈন্যের মত গুলী ছোঁড়—Do or Die!"

তরুণ বন্ধুটি নিজের লজ্জা ঢাকবার জন্য বেপরোয়া হয়ে গুলী চালাতে লাগলো। নিজেকে উত্তেজিত করে তোলার জন্য শ্লোগান দিল—'Long Live Revolution!' মৃত্যুকে আর ভয় নেই তার—'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন'! তার হাতের বন্দুক গর্জে উঠে মেশিনগানকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জানালো—প্রাণ বিসর্জনের

আগে সে যেন হার মানবে না! প্রাণত্যাগ করা সব সময় নিজ ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। যুদ্ধ সময়মত শেষ হ'ল—তরুণ বন্ধুটি শত শত গুলীবৃষ্টির মধ্যেও অক্ষত রয়ে গেল।

প্রায় দু' ঘণ্টা অতিবাহিত হ'ল—চতুর্দিকে অন্ধকার ঘনিয়েছে। শত্রুপক্ষ এতক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্টই বুঝেছে, বিপ্লবীরা খাড়াই পাহাড়ের দুর্ভেদ্য পজিশন্ ছাড়বে না এবং তাদের পজিশন্ assault করাও বৃটিশ সৈন্যের পক্ষে সম্ভব হবে না। তারা পাঁচবার বিভিন্ন স্থান হতে বিপ্লবী যুবকদের বিরুদ্ধে নতুন উদ্যমে আক্রমণ চালিয়েছে। প্রতিবারেই তারা fire তীব্রতর করেছে; কিন্তু হাজার হাজার রাউণ্ড fire করবার পরেও বিপ্লবীদেব বন্দুক নিস্তব্ধ হয় নি। শত্রুপক্ষকে এখন স্থির করতে হচ্ছে—তারা উপস্থিত কি করবে বা আর কিভাবে আক্রমণ চালাবে। ডি, আই, জি, কর্নেল টেট্‌ ও লুইস্ পরামর্শ করে স্থির করলেন—

(১) রাত্রির অন্ধকারে অচেনা জায়গায় যুদ্ধ চালান সমীচীন হবে না। Raider-রা তাদের অতর্কিতে আক্রমণ করতে পারে।

(২) Raider-রা সরু পথে প্রবেশ করলে পেছন থেকেও তাঁরা আক্রান্ত হতে পারেন। তাই তাঁরা বেশিক্ষণ এক পজিশনে থাকবেন না—পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যেই স্থান পরিবর্তন করে নতুন জায়গা বা নতুন কোন টিলা থেকে fire চালাবেন।

(৩) পাহাড়ের ওপর উঠে assault করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয় এবং রাত্রে অতর্কিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় কিছুক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধ বন্ধ করে তাঁরা শহরে ফিরে যাবেন।

(৪) জেলা-শাসক খবর পাঠিয়েছেন, রাত্রে হতাহতের সংখ্যা আর বেশি না বাড়িয়ে তাঁরা যেন শহরে ফিরে যান। রাত্রে শহরের নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে, তাই তার সুব্যবস্থার জন্য তাঁরা ট্রেনযোগে শহর অভিমুখে রওনা হওয়াই সাব্যস্ত করলেন।

(৫) কিন্তু কর্নেল সাহেব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন—তাঁরা উত্তর-পূর্বের সর্বোচ্চ পর্বত শিখরের ওপর থেকে Vicker's Machinegun ব্যবহার করবেন। যখন Vicker's Machinegun fire সুরু হবে, তখন এই fire-এর cover বা সুযোগ নিয়ে তাঁদের সৈন্যবাহিনী শহরের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করবে।

এই প্রস্তাব ডি, আই, জি-ও অনুমোদন করলেন। সঙ্কেতমতই তাঁরা উত্তর-পূর্বের পাহাড় থেকে fire করা বন্ধ করলেন। রণক্ষেত্র আবার নিস্তব্ধ। আমাদের বিপ্লবী সমরনায়কেরা ভাবছিলেন, শত্রুপক্ষ কি তাঁদের পেছন থেকে আক্রমণ করবার কোন প্ল্যান আঁটছে? লোকনাথ সামরিক প্রয়োজনে উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব ও সম্মুখের

পাহাড় লক্ষ্য করে আন্দাজে fire করবার আদেশ দিল। আমাদের যুবক সৈনিকেরা দক্ষিণ-পূর্ব পাহাড় লক্ষ্য করে তিন রাউণ্ড "Short burst" fire করে। তারপর উত্তর-পূর্ব ও সম্মুখেও সেইরূপ fire করেছে। এইভাবে আন্দাজে fire করে তারা শত্রুসৈন্যকে fire করার জন্য প্ররোচিত করছিল। যদি তাবা প্রত্যুত্তর দেয় তবে বিপ্লবী সৈনিকদের পক্ষে শত্রুর অবস্থান অনুমান করা সহজ হবে। সুশিক্ষিত বৃটিশ সমরনায়কেরা এতখানি ভুল করতে প্রস্তুত ছিলেন না—"বিদ্রোহীদের" fire তাঁরা অবজ্ঞা করলেন, কোন উত্তর দিলেন না। সঙ্কেতের সাহায্যে তাঁরা দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্বের নিজ সৈন্যদের জালালাবাদ পাহাড়ের নিচে শুকনো নালার গহ্বরে এসে হাজির হতে আদেশ দিলেন। তারপর ক্যাপ্‌টেন টেটের বাহিনী চুপি চুপি ট্রেনে এসে উঠলো। ডালাস্ স্মিথ্ ও ফারমার সাহেবের সৈন্যেরাও পাহাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ধীরে ধীরে ট্রেনে চাপলো।

বৃটিশসৈন্য সেই রাত্রে যখন রণে ভঙ্গ দিবে 'চোবের মত' চুপি চুপি সামরিক নিয়ম অনুসারে পশ্চাদপসরণের ব্যবস্থা করছে, তখন Vicker's gun-এর একটি দলকে উত্তর-পূর্বের সর্বোচ্চ শিখরে লুইস্ সাহেবের অধীনে পাঠানো হ'ল। তারা পজিশন্ নেবার পর ঠিক সময়ে বিউগল্ বাজিয়ে সঙ্কেত দেওয়া হবে, ইঙ্গিত পেয়ে Vicker's gun জালালাবাদ পাহাড় একেবারে চষে ফেলবে—কর্নেল ডালাস্ স্মিথ এইরূপ চূড়ান্ত আদেশ দিলেন।

আদেশ অনুযায়ী হঠাৎ বিউগল্ বাজলো। পাহাড়ের ওপর বিপ্লবীরা অনুমান করলো বৃটিশ সৈন্য পশ্চাদপসরণ করছে। ভীমনাদে বিপ্লবীসৈন্য গর্জে উঠলো—'Long Live Revolution! Up with Revolution! Down—Down with the British! Down with British Imperialism!'—সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীরা মুহুর্মুহুঃ বন্দুক ছুঁড়তে লাগলো।

আবার—আবার সেই মেশিনগানের গুলী। "কাঁপাইয়া বনস্থল, কাঁপাইয়া রণাঙ্গন"—আবার সেই গর্জন। উত্তর-পূর্ব দিকের টিলা থেকে আগুনের হল্‌কা ছুটছে। Vicker's gun দিয়ে আক্রমণ সুরু হয়েছে। মিনিটে তিনশ' পঞ্চাশটি ফায়ার হচ্ছে। শত শত গুলী জালালাবাদ পাহাড়কে এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলছে। ষষ্ঠবারে শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণের তুলনা হয়না। এইবারই তাদের শেষ চেষ্টা। তীব্রতম ফায়ারের মুখে বিপ্লবীদের পঞ্চাশ-পঞ্চান্নটি মাস্কেট্রি কিইবা করতে পারবে? শত্রুর fire power-এর বিরুদ্ধে কমরেডরা লড়ছে উচ্চতর morale-এর সাহায্যে—বৈপ্লবিক প্রেরণার দুর্জয় শক্তি নিয়ে। কিন্তু Vicker's gun সমর-শিক্ষায় সুশিক্ষিত ইংরেজদের আজ্ঞা পালন করে সুষ্ঠুভাবে তার কর্তব্য করে যাচ্ছে। বিপ্লবীদের অনেকেই হতাহত।

'একটি গুলী নির্মল লালার বক্ষ ভেদ করে চলে গেল। "বালক" নির্মল গড়িয়ে পড়লো। তারই পাশে সরোজকান্তি গুহ এবং খুব নিকটেই তাদের গ্রুপ কম্যাণ্ডার দেবপ্রসাদ গুপ্ত। নির্মলের ক্ষতস্থান হতে অঝোরে রক্ত ঝরছে। মুখে সে কিছুই বলতে পারছে না। তবু যেন সে বন্দুকে ভর দিয়ে উঠবার চেষ্টা করছে। অজ্ঞান অবস্থায় বোধ হয় শারীরিক involuntary প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল। সরোজ নিজে আমাকে বর্ণনা দিয়েছে—"দেবুদা (দেবপ্রসাদ গুপ্ত) যে কত স্নেহপ্রবণ, তা' তো আপনি জানতেন। আমাদের চেয়ে দেবুদা বয়সে কতই বা আর বড়? খুব বেশি হলেও দু'তিন বছরেব বেশি হবেন না। নির্মল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট—টেগ্‌রাব মতই হবে। দেবুদা দেখতে পেয়েছেন নির্মল গুলীর আঘাতে লুটিয়ে পডেছে। নির্মলের জ্ঞান ছিল না, আঘাত অত্যন্ত গুরুতর, মৃত্যু অনিবার্য। আমাদের তখন কিছুই করার ছিল না। কিন্তু দেবুদার কোমল অন্তর নির্মলের শেষমুহূর্তের যন্ত্রণা দেখে আর স্থির থাকতে পারলো না। দেবুদা বিপদ তুচ্ছ করে, শত্রুর এই প্রচণ্ড গুলী বর্ষণ ভ্রূক্ষেপ না করে, কমরেডদের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই ছুটে নির্মলের কাছে গেলেন। সযত্নে নির্মলের মাথাটি কোলে তুলে নিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে নির্মলের স্নেহময়ী মা কোথায়? মৃত্যুর আগে মায়ের বা ভগ্নীর স্নিগ্ধ-শীতল হস্তের স্নেহস্পর্শ নির্মল পায় নি। কিন্তু দেবুদা পরম স্নেহভবে নির্মলের মাথায় বুকে হাত বোলাতে লাগলেন। অপূর্ব সে দৃশ্য! যুদ্ধক্ষেত্রের বিভীষিকাকে ম্লান করে দেবুদার স্থির ধীব মূর্তি আমাদের মুগ্ধ করলো। নির্মল অজ্ঞান অবস্থায় এই স্নেহ-কোমল পরশ অনুভব করে হয়ত তার মায়ের কথাই ভেবেছে! কিছুক্ষণের মধ্যেই দেবুদার কোলে মাথা রেখে নির্মল চিরকালেব জন্য বিদায় নিল। একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে দেবুদার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো!"

"বন্দে মাতরম্!" "Long Live Revolution!" বৈপ্লবিক রণহুঙ্কার আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করছে। একটু দূরে কালী দে, তার পাশেই বিনোদ দত্ত শোয়া পজিশন্ নিয়ে বন্দুক ফায়ার করছিল। কালী দে'র মুখে ও স্বয়ং লোকনাথের কাছ থেকে আমি এইসব বর্ণনা শুনেছি। নির্মলের মৃত্যুর পর কমরেডরা একেবারে যেন-পাগল হয়ে উঠলো—মরণ-পাগলের দল এখন ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত। বিনোদ দত্ত তার মাস্কেট্রি ছেড়ে রিভলভারটি নিয়ে লাফিয়ে উঠলো। সে কমরেডদের সামনে পায়চারী করছে আর সবাইকে ডেকে বলছে—"ক্ষমা নেই—শত্রুকে ক্ষমা নেই! রক্তের বদলে রক্ত চাই—রক্ত চাই—শত্রুর রক্ত চাই!"

কালী দে'র কাছে আমি এই ঘটনার বাস্তব বর্ণনা পেয়েছি। বিনোদের তখন কোন ভয়-ভাবনা ছিল না। ঝাঁকে ঝাঁকে Vicker's gun-এর গুলী সে ভ্রূক্ষেপই করছে না। রাগে দুঃখে প্রতিশোধ নেওয়ার সঙ্কল্পে সে সাথীদের উত্তেজিত করবার

অস্ত্র চাৎকার করে বলছিল—'শত্রুকে ক্ষমা নেই!' লোকনাথ কালীর খুব কাছেই ছিল। সে ভাবলো বিনোদকে সংযত করা প্রয়োজন, নইলে vicker's gun-এর গুলী এক্ষুণি তার বক্ষ ভেদ করবে আর শত্রুপক্ষ তার অস্তিত্বের সন্ধান পেয়ে আমাদের অবস্থানের নিশানা খুঁজে পাবে। সেই কারণে লোকনাথ বিনোদকে খুব কঠিনস্বরে আদেশ দেয়—"এক্ষুণি শুয়ে পড়ে পজিশন্ নে! আর একটুও দেরি নয়—যুদ্ধক্ষেত্র পাগলামীর স্থান নয়!"

আমি যেদিন বিনোদের এইরূপ Death defiant ভাবের কথা শুনি, সেদিন ভেবেছিলাম রাইফেল কত তুচ্ছ, কত নগণ্য! ক্ষ্যাপার দলের এইরূপ পাগলামী না থাকলে মাত্র পঞ্চাশটি মাস্কেট্ দিয়ে বৃটিশ-বাহিনীকে জালালাবাদে পরাস্ত করা সম্ভব ছিল না। এইরূপভাবে মৃত্যুকে তুচ্ছ করতে না জানলে জালালাবাদ যুদ্ধে আমাদের বিপ্লবীবাহিনী জয়ী হ'ত না। বিনোদ দত্ত নাই বা জানলো সামরিক কায়দা, দেবু নাই বা মানলো কঠিন শৃঙ্খলা, তবু এ রকম Death defiance-এর প্রয়োজন ছিল বলেই মনে হয়। সামরিক নিয়ম-কানুন নিশ্চয়ই মানতে হবে—কিন্তু সর্বোপরি সাহস ও বিক্রমের প্রয়োজন—

"Marx has summarised the lessons of all revolutions or armed insurrections with the words of the greatest master of revolutionary actions known to the history, Danton : 'Be daring, be still more daring, be daring always."

—Preparing for Revolt—
Lenin.

—পৃথিবীর সমস্ত বিপ্লবের শিক্ষাকে মার্ক্স বৈপ্লবিক কার্যক্রমের সর্বপ্রধান সুদক্ষ শিক্ষক ডানটনের ভাষায় সংক্ষেপে বলেছেন—'সাহসী হও, আরো—আরো বেশি নির্ভীক হও, সর্ব সময় দুর্জয় সাহসের অধিকারী হও।'

বালক যোদ্ধা নির্মল লালা জালালাবাদ পাহাড়ে শত্রুর অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে দেবপ্রসাদ গুপ্তের কোলে মাথা রেখে মাতৃভূমির কাছে চির বিদায় নিয়ে চলে গেল; ভারতবাসী, বাংলার জনসাধারণ বা চট্টগ্রামবাসী নির্মলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার কোন সুযোগই পেলো না। গোপন বিপ্লবীদলে সবাইকে সবার জানবার নিয়ম ছিল না, তাই নির্মলের পরিচয় সকলে জানতো না। সে এসেছিল আমাদের গ্রামের সংগঠনের এক অংশ থেকে। তাই শহীদ নির্মল লালা সবার কাছে unwept, unhonoured, and unsung রয়ে গেল!

টেগ্রা ও ত্রিপুরার আত্মদানের পর অম্বিকাদা সবাইকে বলেছিলেন—কারো মৃত্যু ঘটলে তার নাম ধরে যেন শ্লোগান দেওয়া না হয়—তাতে শত্রুপক্ষ বুঝতে

পারবে আমাদের কাউকে তারা হত্যা করতে সমর্থ হয়েছে। "আমরা Revolutionary slogan দেবো—শত্রুকে বুঝতে দেবো না আমাদের মধ্যে কেউ হত বা আহত হয়েছে।" অম্বিকাদার এই নির্দেশ পালন করা হয়েছিল বলেই নির্মলের নামে কোন শ্লোগান দেওয়া হয়নি। পুলিসের কাছে যারা স্বীকারোক্তি করেছে, তাদের মধ্যে কেউ নির্মলকে চিনতো না বলে পুলিস তাদের কাছ থেকেও মৃতদেহ সনাক্ত করতে পারে নি। নির্মলের চেহারা ও আকৃতির বিশেষ সাদৃশ্য ছিল আমাদের আর একজন সাথী, সুধাংশু বোসের সঙ্গে। সুধাংশু বোস সদরঘাট শরীরচর্চা ক্লাবের সদস্য—নবম শ্রেণীর ছাত্র—নির্মলের চাইতে বয়সে বছর খানেকের বড় হতে পারে। বলিষ্ঠ দেহ ও বয়সের তুলনায় অনেক বেশি শারীরিক শক্তির অধিকারী। মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা সমান করবার প্রায় আশি মণ ওজনের রোলারটি যখন সুধাংশু অনায়াসে তার বুকের উপর দিয়ে চালিয়ে নিত, দর্শকবৃন্দ তখন অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকতো। সুধাংশু জালালাবাদ পাহাড়ে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। সরকারপক্ষ নির্মলের মৃতদেহকে ভুলে সুধাংশু বলে সাব্যস্ত করলে আমরা তাদের সেই ভুলের সুযোগ নিলাম—সুধাংশু আত্মগোপন করলো। তার বাবা ও কাকাকে সংবাদ পাঠালাম, নির্মলের মৃতদেহের ফটোকে যেন তারা সুধাংশুর ফটো বলে স্বীকার করেন।

আমাদের মামলার জাজ্‌মেণ্টে লিপিবদ্ধ আছে :

"No VII in the photograph has been identified by Sarada Bose as his son Sudhangshu Bose. He was a student of the Pahartali H. E. School (class IX). His uncle Baroda also states that the photograph fully agrees with the appearance of Sudhangshu except that he looks a little swollen. Sudhangshu attended school on the 17th April but was absent thereafter. His uncle says that he left his house in Chittagong saying he was going home to Paraikora one or two days before the raids and never returned"—সারদা বোস ৭নং ফটোটি তাঁর পুত্র সুধাংশুর বলে সনাক্ত করেছেন। সে পাহাড়তলী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র। তার কাকা বরদাও বলেছেন ফটোটিতে সুধাংশুকে একটু স্ফীত মনে হচ্ছে, নইলে হুবহু যেন তারই ফটো। সুধাংশু ১৭ই এপ্রিল স্কুল করার পর থেকেই অনুপস্থিত। তার কাকা বলেছেন, রেইডের এক বা দু'দিন আগে সুধাংশু পরৈকোড়া গ্রামের বাড়িতে যাবে বলে বাড়ি থেকে চলে যায় এবং আর ফিরে আসে নি।

সুধাংশু খুব সফলতার সঙ্গেই আত্মগোপন করেছিল। প্রায় সাড়ে ষোল বছর

পরে আমরা যখন জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে এলাম, তখনও সে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আত্মগোপন করেই ছিল! আর নির্মল! সেও দেশবাসীর কাছে "আত্মগোপন" করেই রইল! মান, সম্মান, নাম—কোন কিছুর লোভেই স্বদেশ-প্রেমীরা আত্মদান করে না। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের কষ্টিপাথরে তাদের এই নিঃস্বার্থ আত্মদানের, এই গভীর মহান স্বদেশপ্রেমের প্রকৃত মূল্যায়ন কি হবে না?

জালালাবাদের যুদ্ধ শেষের শেষপর্বের পনেরো বিশ মিনিট অতি প্রচণ্ড আকার ধারণ করলো। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অজস্র গুলী বিনিময় হয়েছে। অনায়াসে ধরে নেওয়া যায় শত্রুপক্ষ শক্তিতে অন্তত পাঁচগুণ বেশি ছিল—তা নাহলে চারদিন পরেও তারা বিপ্লবীদের আক্রমণ করতে সাহস করতো না।

এই বাস্তব সত্য থেকে অনুমান করা যায়, শত্রুপক্ষ আমাদের বাহিনী অপেক্ষা পাঁচগুণ বেশি গুলী ছুঁড়েছে। সরকারী রিপোর্ট থেকেও আমরা জানতে পারছি, আমাদের সাথীরা জালালাবাদ পাহাড়ের উপর থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে কত গুলী ছুঁড়েছে। মিঃ জে, ইউনী Judgement-এ উদ্ধৃত করেছেন:

"The number of fired empty cartridges—police musket, shot gun, and revolver collected by Hem Gupta and Fazlar Rahaman on Jalalabad Hill reveals the determined nature of the resistance offered by the raiders to Capt. Taitt's force and shows that during the two hours engagement they fired at least 1068 rounds".

—দারোগাদ্বয়,—হেম গুপ্ত ও ফজলর রহমান, জালালাবাদ পাহাড়ের উপর থেকে অনুসন্ধান করে যতগুলি পুলিস-মাস্কেট্, বন্দুক এবং রিভলভারের কার্তুজের খালি খোল সংগ্রহ করেছিল, তা' থেকেই বোঝা যায় বিদ্রোহীরা ক্যাপ্টেন টেটের বাহিনীর বিরুদ্ধে কিরূপ দুর্দমনীয় প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিল এবং বাস্তবেও দেখা যায়—দু'টি ঘণ্টা সংঘর্ষের মধ্যে তারা খুব কমপক্ষে অন্তত ১০৬৮টি গুলী ছুঁড়েছে।

সরকারীপক্ষ স্বীকার করেছে আমাদের বিপ্লবী বন্ধুরা এক হাজার আটষট্টিটি গুলী ছুঁড়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ধরে নেওয়া যায় ইংরেজ-বাহিনী—ম্যাগাজিন রাইফেল, লুইস্ গান ও ভিকার্স গান দিয়ে অন্তত পাঁচ হাজার রাউণ্ড ফায়ার করেছে। শেষ পর্বে রণে ভঙ্গ দিয়ে শহরে পালিয়ে যাওয়ার আগে Vickers-gun দিয়ে পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যে তারা অন্তত দু' হাজার রাউণ্ড ফায়ার করেছে। খুব আশ্চর্য মনে হয়, আমাদের সাথীদের প্রত্যেককে তারা একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলতে পারেন নি কেন? এই শেষ পর্বে—কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের দশজন প্রাণ হারিয়েছে এবং পাঁচজন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে দু'জন পরে মারা যায় আর তিনজন সুস্থ হয়ে ওঠে।

নির্মল হত হওয়ার পর বিধুর (বিধু ভট্টাচার্য) গায়ে তিন-চারটি গুলী একসঙ্গে এসে লাগে। শরীরের নানাস্থানে আঘাত লেগেছে। লোকনাথ আমাকে বলেছে—"সদা হাস্যরসিক আমাদের বিধু গুলীবিদ্ধ হয়েও কৌতুকভরে বলতে লাগলো—'লোকাদা! লোকাদা! এতক্ষণে হাঁদাইছে'।'—(লোকাদা, এতক্ষণ পরে গুলী লেগেছে)। আশ্চর্য! এতক্ষণ সে একটি গুলী লাগার জন্যইযেন আকুল প্রতীক্ষায় ছিল—আর আহত হয়েই যেন লোকাদাকে আনন্দে সুসংবাদটি জানাচ্ছে! আবার ক'টি গুলী এসে তাকে আঘাত করলো—তবে, বিধু ডাক্তার তো, তাই মেশিনগানের গুলী ডাক্তারের বক্ষ ভেদ করতে যেন ইতস্তত করছে! একটার পর একটা গুলীর আঘাতে বিধু নিজের মনে বলে উঠলো—'আরে! কত আর হাঁদাবি? হাঁদাস যখন আশে পাশে হাঁদাস কিয়েব লাগি? বুকে হাঁদাস না কেন্?'—(কত আর ঢুকবি? ঢুকছিস্ই যখন, তখন আর আশে পাশে কেন? বুকে ঢুকছিস্ না কেন)।

সময় পেলে সে হয়ত আরো অনেক কিছু বলতো। বৃটিশ মেশিনগান সে সুযোগ আর দিল না—বিধুর বিদ্রুপ, উপেক্ষা আর কত সহ্য করা যায়! একটি গুলী তার দেহের মর্মস্থল ভেদ করলো—বিধুর হাত থেকে বন্দুক ছিটকে পড়ে গেল-শরীরটা একবার মোচড় দিয়ে চিৎ হয়ে স্থির হয়ে গেল। তার শরীরে শেষ প্রতিক্রিয়া হবার সময় নরেশকে উদ্দেশ্য করে বলে—'নরেশ চললাম···তুমিও আইও···তোমারে receive করুম!'—(নবেশ চলি—তুমিও এসো—তোমাকে স্বাগত জানাবো)।"

লোকনাথ আমাকে এই বিবরণ দিলে শুনতে শুনতে আমার মনে হয়েছে, কতখানি subjective preparation (মানসিক প্রস্তুতি) থাকলে পরে মৃত্যুর সঙ্গে এইভাবে কৌতুক করা সম্ভব! লোকনাথ বলেছে গুলীবিদ্ধ বিধুব মুখে স্বাভাবিক কাতরোক্তি সে একবারও শুনতে পায় নি। শেষ নিঃশ্বাস ফেলবাব সময়ও লোকনাথ শুনতে পায় বিধু বলছে—"নরেশ এসো—তোমাকে receive কববো"—এতে লোকনাথ অভিভূত হয়ে পড়েছিল। রণাঙ্গনে বিধুর সাহস ও মৃত্যুর প্রতি ভ্রূকুটি এবং এত উদাসীনতা ও তাচ্ছিল্যের ভাব জালালাবাদে বিপ্লবীদের কাছে এক অপরূপ সঞ্চয় ও আদর্শ হয়ে রইল।

নরেশ ও বিধু দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু—একই সঙ্গে ডাক্তারী পাশ করেছে। একই মেসে থাকতো। ১৯২৬ ২৭ সালে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তাদের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয়ের সুযোগ হয়। ১৯২৩ সালে পরইকোড়া রাজনৈতিক ডাকাতি সংঘঠিত হওয়ার পর আমার বিপ্লবী বন্ধু সুধাংশু দল ত্যাগ করে। কিন্তু তার সঙ্গে বরাবর আমার সম্পর্ক ছিল। ফাঁসি বা গুলীর ভয়ে সুধাংশু যদিও বৈপ্লবিক দল পরিত্যাগ করেছিল—কিন্তু মৃত্যুকে সে এড়াতে পারে নি—স্বল্প-পক্সে সে মারা যায়। তার মৃতদেহ শ্মশানে বয়ে নিতে ভয়ে কেউ এগোলো না, পাছে

ছোঁয়াচ লাগে। আমাকেই উদ্যোগী হয়ে মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যেতে হয়। সেই সময়ে বিধু, নরেশ ও তাদের মেডিক্যাল-স্কুল হোস্টেলের বন্ধুরা সুধাংশুর শবদেহ বহন করতে আমার সঙ্গে যোগ দেয়। সেই রাত্রে প্রায় দুটোর সময় শবদেহের সামনে শ্মশানে বসে আমি বিধু ও নরেশকে চূড়ান্তভাবে বিপ্লবী দলে গ্রহণ করি। জালালাবাদ পাহাড়ে বিধু নরেশের কাছে চির বিদায় নিয়ে চলে গেল—বলে গেল, নরেশকে অভ্যর্থনা করবার জন্য সে অপেক্ষা করবে। বন্ধুর আকুল প্রতীক্ষা নরেশ যেন উপেক্ষা করতে পারলো না। নরেশের হাতের বন্দুক প্রতিশোধ স্পৃহায় ক্ষিপ্ত হয়ে তীব্র অনল উদ্‌গিরণ করতে লাগলো—বিধুর রক্তের বদলে শত্রুর রক্ত চাই! বৃষ্টির ধারার মত মেশিনগানের গুলী আসছে—আত্মরক্ষায় একেবারে উদাসীন নরেশের ভ্রূক্ষেপ নেই—বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ সে নেবেই। মাঝে মাঝে মাথা তুলে মেশিনগানের আগুন লক্ষ্য করে ফায়ার করছে। হঠাৎ গুলী এসে নরেশের বক্ষ ভেদ করলো—নিমেষে উদ্যত বন্দুক হাতে নরেশ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো—এবং সঙ্গে সঙ্গেই সব ছেড়ে মুহূর্তে চলে গেল—তার যেন খুব তাড়া ছিল—বিধুর আমন্ত্রণ রক্ষা না করলেই নয়।

মেশিনগানের গুলীবর্ষণ তীব্রতর হ'ল! লোকনাথ স্থির করলো শত্রুর মেশিনগানকে স্তব্ধ করতেই হবে। হুকুম দিল—"Comrades keep on firing unless ordered to stop! Fire! Fire! Fire until the enemy machinegun is completely silenced!"—(কমরেডরা, ফায়ারিং বন্ধ করতে যতক্ষণ না বলছি—ততক্ষণ চালিয়ে যাও! ফায়ার! ফায়ার! যে পর্যন্ত শত্রুর মেশিনগান সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ না হচ্ছে, সে পর্যন্ত ফায়ারিং চালাও)। যুবক সাথীদের বন্দুক জালালাবাদ পাহাড় কাঁপিয়ে মুহুর্মুহুঃ গর্জন করতে লাগলো। লোকনাথ তার ডানদিকের সৈনিকদের এক অংশকে আদেশ দিল জালালাবাদ পাহাড়ের উত্তর-পূর্বে দিকের শেষ সীমায় বুকে গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে যেন পজিশন্ নেয়। সেখান থেকে শত্রুর মেশিনগান লক্ষ্য করে Volley Fire চালাতে হবে। শত্রুর মেশিনগানকে নিষ্ক্রিয় করা চাই-ই। চললো ফায়ারিং—উঠলো রণধ্বনি। দু'পক্ষেই অবিরাম গুলীবর্ষণ চলেছে। শত্রুর ক্ষতির পরিমাণ আমাদের জানার সুযোগ ছিল না। এদিকে আমাদের ক্ষতির পরিমাণ বেড়েই চলেছে। তবু চাই শত্রুর কামান নিস্তব্ধ হোক্—তার জন্য নিজেদের ক্ষতির পরিমাণ ভেবে বিপ্লবী যুবকেরা নিরস্ত হবে না। কমাণ্ডারের হুকুম—"অবিরাম গুলী চালাও!"

এতক্ষণ পর্যন্ত শত্রুর গুলী যাদের গায়ে লেগেছে প্রত্যেকেই মারা গেছে—একজনও জীবিত নেই। অনেক গুলী তাদের কাউকে কাউকে একসঙ্গে আঘাত করেছে—কারো বা একেবারে বক্ষভেদ করে চলে গেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে এ যেন একটা

একঘেঁয়েমি—একটু ব্যতিক্রম তো চাই! বিনোদ দত্তের হৃৎপিণ্ডের ইঞ্চি দুই উর্ধ্বে একটি গুলী তার scapular এফোঁড় ওফোঁড় করে চলে গেল! বিনোদের ক্ষেত্রে ইংরেজের গুলীর এই পার্থক্য কেন? আর একটু হলেই তো তারও হৃদয় বিদীর্ণ করে দিতে পারতো! তার বুকের দিক থেকে scapular (স্কন্ধাস্থি) ভেদ করে পিঠ চিরে গুলী বেরিয়ে গেছে। অজস্র রক্তপাতে বুক পিঠ ভেসে যাচ্ছে—মনে হচ্ছে কেউ যেন দোলের রঙে তাকে রাঙিয়ে দিয়েছে! আশেপাশে যারা ছিল তারা কেউই ভাবে নি বিনোদ বাঁচবে। যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকে কত আশ্চর্য বিষয় যে জানা যায় তার কোন ইয়ত্তা নাই! অনেকের ধারণা গুলী লাগলেই হ'ল—আর সে বাঁচবে না—এ যে রাইফেল বা মেশিনগানের গুলী! আমি অনেকেরই এইরূপ ভুল ধাবণা দেখেছি—একটু বুঝিয়ে দেওয়ার পর তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, Vital জায়গায় গুলী না লাগলে মৃত্যুর কোন কারণ থাকে না, ভয়ে অবশ্য যদি হার্ট ফেল না করে বা ডাক্তারী মতে septic না হয়। তবে বাস্তবে এরও সাক্ষী আছে যে, এক টুক্‌রো গাছের ছালের স্পর্শে তক্ষুণি চোখ দু'টি বন্ধ হয়ে গেছে ও কণ্ঠের কাতর উক্তি শোনা গেছে—"লোকাদা গুলী লেগেছে—বিদায়!" বিনোদের কিন্তু একটুও ভ্রূক্ষেপ নেই। একটুও বাড়িয়ে বলছি না—যারা তার পাশে ছিল সেই সব প্রত্যক্ষদর্শী বিপ্লবী বন্ধুদের কাছ থেকে শোনা—বিনোদের ব্যথা যন্ত্রণার কোন অনুভূতিই যেন ছিল না। জেনারেল বলের হুকুম তামিল করতেই সে ব্যস্ত—তার post-এ থেকে সে অনবরত গুলী ছুঁড়ে চলেছে!

পিতা অ্যাডমিরালের আদেশে ক্যাসাবিয়াঙ্কা জাহাজের ডেকে দাড়িয়ে প্রাণত্যাগ করেছিল—নিজের position ছাড়েনি। ক্যাসাবিয়াঙ্কার মত বিনোদও লোকাদার আদেশ পেয়েছে—"গুলী চালাও—শত্রুর মেশিনগান স্তব্ধ না হওয়া পযন্ত থামবে না!" বিনোদ তার গুরুতর ক্ষতকে উপেক্ষা করে—ঝাঁকে ঝাঁকে মেশিনগানের অগ্নিবৃষ্টিকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ করে বীরত্বের সঙ্গে সেইদিন জালালাবাদ রণক্ষেত্রে যে যুদ্ধ করেছিল, তার উপমা ইতিহাসে বিরল। বিনোদ সুস্থ দেহে আজও বেঁচে আছে।

জালালাবাদের উত্তর-পূর্বে কোণে পজিশন্ নিয়ে আমাদের কমরেডরা একটি মাত্র উদ্দেশ্যে volley fire করছিল—যায় যাক্ প্রাণ তবু শত্রুর কামানকে নিষ্ক্রিয় করা চাই-ই! এইরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্যিই যে কতখানি উচিত হয়েছিল, তা কেউ তখন বোঝে নি। আজ বুঝতে পারছি ঐরূপ অপরাজেয় মনোভাব নিয়ে যদি মাস্কেট্রি হাত তারা মেশিনগানের position বিধ্বস্ত করতে বদ্ধপরিকর না হ'ত, তবে জালালাবাদ যুদ্ধে বৃটিশসৈন্য পরাস্ত হ'ত না। উত্তর-পূর্ব কোণে আমাদের এই পজিশন্ খুব দুর্বল ছিল। মেশিনগানের কয়েকটি গুলী তলপেটে প্রবেশ করে এবার অর্ধেন্দু দস্তিদারকে মারাত্মকভাবে আহত করলো। বিনোদের দারুণ ক্ষতের তুলনায়

অর্ধেন্দুর আঘাত আরও বেশি গুরুতর। কিন্তু তলপেটে তিন-চারটি গুলী লাগার পরও সে দৃঢ়তা হারায় নি। এই অর্ধেন্দুই যুব-বিদ্রোহের কিছুদিন পূর্বে বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণে ভীষণভাবে আহত হয়েছিল। মরতে মরতে সেদিন সে প্রাণে বাঁচে। ১৮ই এপ্রিল, বিদ্রোহের দিন, সে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণের জন্য চলে এলো। তখনও সে পুরো সুস্থ হয় নি। পোড়া জায়গায় তখনও মলম লাগান হচ্ছে—ক্ষতস্থান sticking plaster দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করেই সে এসেছে যুব-বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে। ওয়াটার-ওয়ার্কস থেকে শত্রুপক্ষ মেশিনগান চালালে অর্ধেন্দুও সবার সঙ্গে একত্রে মাস্কেট্রি দিয়ে সমানে পাল্টা জবাব দিয়েছে। মেশিগানের গুলী তার কানের পাশ দিয়ে অবিরত চলেছে। মৃত্যুর মুখ থেকে বারে বারে বেঁচে সে এখন খুব শক্ত। ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ রণাঙ্গনে অর্ধেন্দু বীরবিক্রমে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধে সে গুরুতর আহত—বাঁচার সম্ভবনা খুবই কম। তবু আশ্চর্য! এর মধ্যেও সে মাঝে মাঝে রাইফেল তুলে ফায়ার করেছে। যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত অর্ধেন্দু গুলী ছোঁড়া অব্যাহত রেখেছিল।

যুদ্ধ এখন এমন পর্যাযে এসে পৌছেছে যে, কে হার মানবে, কার কত ধৈর্য, সাহস ও মৃত্যু উপেক্ষা করবার শক্তি বা ইচ্ছে আছে, তা' দিয়েই এই শেষ পর্যায়ের চূড়ান্ত পরিণতি নির্ণীত হবে। মেশিনগানের পজিশন্ আমাদের বাছাই করা সৈনিকদের ভালভাবেই জানা হয়েছে। শত্রুপক্ষকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়ে ছুঁড়ে আমাদের সাহসী Crack Division-এর সৈনিকেরা তাদের পজিশন্ দুর্বল করে দিযেছে। সামান্য মাস্কেট্রি মেশিনগানের বিরুদ্ধে প্রাধান্য স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিল বললে ঔপন্যাসিক কল্পনা বলেই মনে হবে; কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। মেশিনগানের প্রাধান্য ভাড়াটে সেপাইদের বিরুদ্ধে যেভাবে প্রয়োগ করা যায় স্বদেশপ্রেমিক সৈন্যদের বিরুদ্ধে সেরূপ কার্যকরী হতে পারে না। মেশিনগানের গুলী চলেছিল কিন্তু বৃটিশ সৈন্যের মুখে শ্লোগান তো শোনা যায় নি! তাদের অন্তরে স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা কোথায়? কাজেই বিপ্লবীদের হাতের মাস্কেট্রি শত্রুর মেশিসগানের চাইতে বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে, বৈপ্লবিক রণহুঙ্কার শত্রুর নৈতিক বল ভেঙে দিয়েছে।

পরাজয় মেনে নেবার আগে মেশিনগান অভাবনীয়ভাবে অগ্নি উদ্‌গিরণ করছিল। অজস্র গুলী ছুটছে। শশাঙ্ক দত্ত ও মধুসূদন দত্ত অসংখ্য গুলীবিদ্ধ হয়ে পাহাড়ে লুটিয়ে পড়লো। তাদের শরীর গুলীর আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বিভীষিকা, মৃত্যুভয়, রণক্ষেত্রের ভয়ঙ্কররূপ—এ সব বিপ্লবী সাথীদের কাছে অতি তুচ্ছ—উপেক্ষার বস্তু। ক্যাপ্টেন টেট্ বা কর্নেল ডালাস্ স্মিথ্ তখনও অনুমান করতে পারেন নি

বিপ্লবীরা কতখানি শক্তি ধরে– বুঝতে পারেন নি শেষ পর্যন্ত তাঁদের নিজেদেরই চূড়ান্ত হার হবে।

মধুসূদনের প্রকৃত পরিচয় আমি আমাদের মামলার জাজ্‌মেণ্ট থেকে উদ্ধৃত করছি—

"No. X in the photograph is said by Hemendu Rakshit to be like Madhusudan Dutta but he is not sure. Manindra Dutta whose D. B. B. L. gun was found at Ganesh Ghosh's house, says that Madhusudan was his second son (aged 22 or 23) but he cannot make out whether No. X in the photograph is his son or not."

—গোয়েন্দা পুলিস হেমেন্দু রক্ষিত ১০ নম্বর ফটো দেখে সন্দেহাতীতভাবে বলতে পারলেন না সে'টি মধুসূদন দত্তের কিনা। মণীন্দ্র দত্তের D. B. B. L. (Double Barrel Breech Loader Gun) অর্থাৎ, দোনলা বন্দুকটি গণেশ ঘোষের বাড়িতে পাওয়া যায়। মধুসূদন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র, বয়স বাইশ অথবা তেইশ হবে। কিন্তু তিনিও ফটো দেখে চিনতে পারলেন না সেটা মধুসূদনের কিনা।

সত্যি, মধু ও শশাঙ্কের মৃতদেহ চেনবার উপায় ছিল না। মেশিনগানের গুলীতে তাদের শরীর ছিন্নভিন্ন। সেইরূপ বিকৃত অবস্থায় ফটো নেওয়া ছাড়া পুলিসের আর কোন গত্যন্তর ছিল না। বিপ্লবীদের জীবিত ধরবার জন্য তারা প্রাণপাত করেছে; কিন্তু বৃটিশ সৈন্যদের উপহাস করে তারা যখন চলে গেল, তখন বিপ্লবীদের কয়েকটা ফটো নিয়ে হলেও সরকারপক্ষকে পরাজয়ের লজ্জা ঢাকতে হয়েছে।

জাজ্‌মেণ্ট কপিতে মধুর পরিচয় পাওয়া যায়—

"About $1\frac{1}{2}$ years previously Madhusudan had gone to Jamshedpur where he carried on business as a coal contractor but had returned to Chittagong about the 1st April 1930 and was living at the house of his father's brother-in-law Dwarika Sen in Dewanbazar. He was suffering from fever for which he was receiving injections from Dr. P. C. Chowdhury. Dr. Chowdhury says that No. X photograph looks like him",

—দেড় বছর আগে মধুসূদন কয়লার কণ্ট্রাক্টরী ব্যবসার জন্য জামসেদপুর যায়। কিন্তু ১৯৩০ সালের ১লা এপ্রিল, সে চট্টগ্রামে ফিরে আসে। মধুসূদন দেওয়ানবাজারে মামার বাড়িতে থাকতো। সে জ্বরে ভুগছিল। ডাক্তার পি, সি, চৌধুরী তাকে ইন্‌জেকশন দিতেন। ডাক্তার চৌধুরী ফটোটি মধুসূদনের বলেই মনে করেছেন।

বন্ধুরা একের পর এক গুলীবিদ্ধ হয়ে পাহাড়ের ওপর লুটিয়ে পড়ছে সাথীরা—যতনা গুলী ছুঁড়ছে তার চেয়েও বেশি, রণধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ করছে। একটি গুলী এসে অম্বিকাদার দুই ভ্রূর মাঝে তিলক কেটে গেল। মেশিনগানের গুলীটি যেন মন্ত্রপূত—আর কোথাও আঘাত করলো না, মাথার খুলিও চুরমার করে দিল না, শুধুমাত্র কপালের হাড় পর্যন্ত এসেই ক্ষান্ত হ'ল। হাড়ের ওপরের মাংসে ক্ষত হয়েছিল, হাড়েও হয়ত একটু আঘাত লেগে থাকবে। তাঁর মুখেই শুনেছিলাম, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অন্যদের মুখে শুনেছি, ক্ষতস্থান হতে খুব রক্ত ছুটেছিল, দেখতে দেখতে চোখ-মুখ রক্তে ঢেকে গেল; মাথাটা মনে হচ্ছিল যেন একটি জমাট রক্তপিণ্ড।

'অম্বিকাদার গুলী লেগেছে', 'অম্বিকাদা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছেন'—শোনা মাত্রই বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল—'প্রতিশোধ চাই,' 'প্রতিশোধ চাই!' বিদ্রোহীদের হাতের বন্দুক আরো বেশি সক্রিয় হয়ে উঠলো। অনবরত গুলী চলছে—কারোই ভ্রূক্ষেপ নেই, পরোয়া নেই—শত্রুর ধ্বংস চাই। মেশিনগানে পাল্টা জবাব আসছে। কয়েকটি গুলী এসে মতিকানুনগোকে স্পর্শ করলে মতি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সে কোন কথাই বলতে পারছিল না। কেবল তার গোঁঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। মতির ঠোঁট দু'টি কেঁপে উঠলো, মনে হ'ল যেন জল চাইছে। অদূরে ছিল সুবোধ রায়। মতির দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে—মতি জল চাইছে। কিন্তু উঠে তাকে জল দিতে যাওয়ার চেষ্টা বৃথা। ওর কাছে পৌঁছবার আগেই মেশিনগানের গুলী তাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলবে। কিন্তু মতিকে জল যে দিতেই হবে! সুবোধ কেঁচোর মত মাটিতে বুক ঘষে ঘষে ওয়াটার ক্যারিয়ার নিয়ে মতির কাছে গিয়ে তাকে জল দিল। জলপাত্র প্রায় খালি—অবশিষ্ট কয়েক ফোঁটা মাত্র জল মতির শুষ্ক জিহ্বার চাহিদা মেটাতে পারলো না। সে চিনতে পারেনি কে তাকে জল দিল, বলতেও পারলো না কিছু। জল খাইয়ে নীরবে বিদায় নিয়ে সুবোধ আবার গড়িয়ে গড়িয়ে স্বস্থানে ফিরে গেল।

পুলিন ছোট্ট একটি ছেলে; আমরা কিন্তু তাকে ডাকতাম 'Quick-Silver'—পারার মত তড়িৎগতি ছিল তার। লোকনাথের পাশে ছিল পুলিন। আমি রুদ্ধনিঃশ্বাসে লোকনাথের কাছে এই বর্ণনাটি শুনেছি। লোকনাথ বলেছে—এমন একটা সময় গেছে যখন তৃষ্ণায় তার বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে—কোথায় একটু জল পাবে? সব জলের পাত্রই খালি। তার পাশে পুলিন লোকনাথের অবস্থা বুঝে বলে—"লোকাদা, আমার কাছে একটা কাঁচা আম আছে। আমটি নিন্—খান, তৃষ্ণা মিটবে।" লোকনাথ বলল—"এখন তুই রাখ, পরে দেখা যাবে। ভাগ করে দু'জনেই খাব নাহয়।"

অবিরত গুলী চলছে। একটু অসাবধানতা, সামান্য নড়াচড়াও বিপজ্জনক কার কোন্ মুহূর্তে গুলী লাগবে কে জানে! মেশিনগানের কার্তুজের বেল্ট একটা শেষ হলে আর একটা বদলাতে সামান্য সময় লাগে। সেই সময়টুকুর মধ্যে লোকনাথ ভাবলো কাঁচা আমটির সদ্ব্যবহার করবে। লোকনাথ যেমনি পুলিনের দিকে মুখ ঘুরিয়েছে তাকে ডাকতে, ঠিক তক্ষুণি মেশিনগানের গুলী এসে পুলিনের সমস্ত শরীর ঝাঁজরা করে দিল। পুলিন মাটিতে লুটিয়ে পড়লো—হাতের বন্দুক পাশে পড়ে রইল। লোকনাথ আমাকে বলেছে, তখনও পুলিনের হাতের মুঠোতে কাঁচা আমটি ধরা ছিল। আম সমেত হাতখানা লোকনাথের দিকেই যেন সে ছুঁড়ে দিয়েছে! লোকনাথ বলেছিল দু'জনে ভাগ করে খাবে—এখন আর কার সঙ্গে ভাগ করে খাবে? লোকনাথের চোখে জল এলো। ত্রিশ বছর পরেও আমাকে এই করুণ কাহিনীর বর্ণনা দিতে লোকনাথের চোখ ছল ছল করে উঠেছিল।

বালক বন্ধু পুলিনের কতখানি দরদ—তাদের প্রিয় লোকাদার প্রতি তার কতখানি আন্তরিকতা! নিজের জন্য সযত্নে রাখা কাঁচা আমটি সে "লোকাদাকে দেবে—লোকাদা যদি খায় তাহলেই সে খুসি। যুদ্ধের অধিনায়কের দৈহিক শক্তি অটুট রাখবার প্রয়োজনীয়তা একজন সৈনিক অপেক্ষা বেশি—এই উপলব্ধি থেকেই পুলিন লোকনাথকে কাঁচা আমটি খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করতে বলেছিল।

লোকনাথ আমাকে আরো বলেছে—পুলিনের হাতে আমটি রক্তে একেবারে ভিজে গিয়েছিল। শেষ বিদায়ের সময় পুলিন হাত বাড়িয়ে "লোকাদাকে" আমটি খেতে দিচ্ছে—কি করে লোকনাথ পুলিনের এই শেষ মহৎ ইচ্ছের অবমাননা করবে?

অতি সযত্নে, পুলিন যেন ব্যথা না পায়, লোকনাথ তার হাতের মুঠো খুলে আমটি নিল। লোকনাথের দু'টি চোখ জলে ভরে গেল। লোকনাথ আমাকে নিজমুখে বলেছে—"আমি কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে রক্তমাখা সেই আমটি খেয়েছি।" জালালাবাদে লোকনাথের জীবনের এই একটি বাস্তব নাটক ঘটে গেল। কেউ জানতেও পারে নি যুদ্ধক্ষেত্রের এই করুণ নাটকের কথা। উপন্যাসে এরকম কল্পনা করা যায়, কিন্তু এই ঘটনা অতি বাস্তব সত্য।

'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই!'—একের পর এক নির্ভীক সৈনিকেরা প্রাণ দিচ্ছে। কারও কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। টক্ টক্ টক্—মেশিনগানের গুলী জ্যোতিন্দ্রের (জ্যোতিন্দ্র দাশগুপ্ত) শিরদাঁড়া সমেত ঘাড়ের অর্ধেকের মাংস উড়িয়ে নিল। জ্যোতিন্দ্রের পাশে বিনোদ চৌধুরী এই আকস্মিক ঘটনাটি দেখতে মাথা সামান্য একটু উঁচু করা মাত্রই বোঁ করে একটা গুলী তার গলার ডান পাশে ঢুকে বাঁ দিকে বেরিয়ে গেল। আঘাত অত্যন্ত গুরুতর। সমস্ত শরীর

রক্তে ভিজে গেছে। তবু ভয়ে সে heartfail করে নি। গুলী vital জায়গায়, অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড, মাথা বা ফুসফুস বিদীর্ণ করে নি, কাজেই মরে যাওয়ার কথাই ওঠে না। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের দরুণ এই আঘাত সহ্য করতে পারবে কিনা সেটাই সন্দেহ ছিল। কিন্তু দেখা গেল বিনোদ চৌধুরী একেবারে অবিচলিত চিত্তে হুকুম তামিল করছে—তার মাস্কেট্রি অবিরাম অগ্নি উদ্‌গিরণ করে চলেছে। আমার লেখা পড়ে অনেকের হয়ত মনে হবে বাড়িয়ে লেখা। কিন্তু এর একটি বর্ণও অতিরঞ্জিত নয়। বিনোদ চৌধুরী জালালাবাদ যুদ্ধের সেই গৌরবের চিহ্ন বহন করে আজও বেঁচে আছে।

যুদ্ধ থামবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ইংরেজ সমরনায়কেরা বিরাট সৈন্য-বাহিনী নিয়ে ছোট্ট পাহাড়টির ওপর বিপ্লবীদের well defined target হিসেবে পেয়েছে। সুতরাং তাদের পক্ষে হার মানা বা যুদ্ধ বন্ধ করার কোন কথাই ওঠে না। একবার যখন বিপ্লবীদের অবস্থান সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছে, তখন ইংরেজ ফৌজের একান্ত চেষ্টা হবে প্রচণ্ড অগ্নিবৃষ্টি করে এমন বিভীষিকাপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করা যাতে বিপ্লবীরা সাদা নিশান তুলে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়, নয়ত যুদ্ধে প্রত্যেকে নিহত হয়।

অজস্র মেশিনগানের গুলী, কিন্তু এখনও গুটিকতক বিপ্লবীর মাস্কেট্রিকে স্তব্ধ করতে পারে নি। তাদের কণ্ঠে এখনও নিরবচ্ছিন্নভাবে বৈপ্লবিক শ্লোগান ধ্বনিত হচ্ছে। এরা কি তবে মৃত্যুঞ্জয়! মরেও কি এরা মরে না? বৃটিশ-সৈন্যের মনে ভাবনা ঢুকেছে—তারা এখন কি করবে?

ক্যাপ্‌টেন টেট্‌ একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাইলেন—আরও তৎপরতার সঙ্গে মেশিনগান চালাতে হুকুম দিলেন। আমাদের ক'জন কমরেড enfilade fire (কোণাকুণি ফায়ার করা) করার জন্য পাহাড়ের শেষ সীমায় পজিশান্ নিল। সেখান থেকে মেশিনগানের আগুন লক্ষ্য করে তারা সমানে পাল্টা গুলী চালাচ্ছিল। প্রভাসের প্রশস্ত বুকে মেশিনগানের অনেকগুলি নিকেলের গুলী মৃত্যুর স্বাক্ষর এঁকে দিল। তার রক্তাক্ত মৃতদেহ জালালাবাদ পাহাড় রাঙিয়ে সেখানেই পড়ে রইল। আরও অনেকের ক্ষতস্থানের রক্তে তার আশেপাশের মাটি ভেসে গেল।

প্রভাস, লোকনাথের আপন খুড়তুতো ভাই। গ্রামের বাড়িতে একই পরিবারে তারা একত্রে বাস করতো। শহরে বৃন্দাবন আখড়ায় (শরীর-চর্চা ক্লাব) সে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিষ্ঠ যুবক বলে খ্যাতি লাভ করেছিল। শারীরিক শক্তির প্রদর্শনীতে চলন্ত মোটর গাড়ির গতিরোধ করে সকলের কাছে সে অজস্র প্রশংসা পেয়েছে। লোকনাথের মত না হলেও আমাদের মধ্যে সে যে একজন খুবই বলিষ্ঠ কর্মী, এ বিষয়ে কারো দ্বিমত ছিল না।

বনবিহারী দত্ত, পাহাড়ের সেই কোণে, প্রভাসদের গ্রুপে ছিল। প্রভাস আজ

আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু বনবিহারীর থেকেই এই ঘটনাটি জানবার সুযোগ পেয়েছি। সে বলেছে—"আমি আমার পজিশন্ থেকে ফায়ার করছি। শেষ দিকে আমাদের পক্ষে ফায়ার করা খুবই দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। মাস্কেট্ এত গরম হয়েছে যে, আর ধরা যাচ্ছে না। তা'ছাড়া চেম্বারে টোটা ভর্তি করা বা লিভারের চাপে খালি টোটার খোল বার করা এক এক সময় অসাধ্য মনে হয়েছে। আমি আমার মাস্কেট্রের লিভারটি চাপ দিয়ে খুলতে চেষ্টা করছি, কিন্তু ধোঁয়া ও কালিতে সেটা এত শক্তভাবে এঁটে গেছে যে, কোনমতে নাড়তেই পারছি না। এই সময় মাস্টারদা গুড়ি মেরে ঠিক আমার পেছনে এসে উপস্থিত। তিনি আমার ব্যর্থ চেষ্টা দেখলেন—লিভারটি নড়ছেই না, আর আমি না পারছি খালি খোল বার করতে, না পারছি টোটা ঢোকাতে। আমার এরকম অসহায় অবস্থা লক্ষ্য করে মাস্টারদা প্রভাসের রক্তমাখা শীতল মৃতদেহের পাশে ছুটে গেলেন! শত্রুপক্ষের গুলীবর্ষণ যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে—প্রদীপ নেভার আগে যেন উজ্জ্বলতর দীপ্তিতে জ্বলে উঠেছে! মাস্টারদা যুদ্ধ সুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর থেকেই ঘুরেঘুরে সকলের কাছে যাচ্ছিলেন। কখনও হামাগুড়ি দিয়ে কখনও বুকে হেঁটে, কখনও বা কোন গাছের আড়ালে একটু দৌড়ে কমরেডদের অচল বন্দুক নিয়ে নির্মলদাকে দিয়েছেন, আবার নির্মলদার পরিষ্কার করা বন্দুক তাদের সরবরাহ করেছেন। এখন আমার ভাবতে অবাক লাগে, মাস্টারদা এত শক্তি কোথা থেকে পেয়েছিলেন? কি করে অত সহস্র গুলীবৃষ্টির মধ্যেও তিনি অক্ষত ছিলেন? প্রভাসের মৃতদেহের পাশে গিয়ে মাস্টারদা ভাবপ্রবণতায় ভেসে যান নি—তাঁর কোনরূপ মানসিক ব্যতিক্রমও আমি দেখতে পাইনি। কর্তব্য পালনে তাঁর কোন বাহ্যাড়ম্বরের প্রকাশ ছিলনা। তিনি প্রভাসের রক্তমাখা বন্দুকটি এনে আমাকে বললেন—'তোর বন্দুকটা আমাকে দে; তুই প্রভাসের বন্দুকটির সদ্ব্যবহার কর্!' আমার মনে হয়েছিল শেষ ক'টি কথা বলার সময় মাস্টারদার গলা ধরে গেছে। আমার এত সৌভাগ্য! মাস্টারদা স্বয়ং এনে দিয়েছেন আমার মৃত সৈনিক-বন্ধু প্রভাসের রক্ত-সিঞ্চিত বন্দুক! আমাকে মাস্টারদা নিজে বলছেন বন্দুকটির সদ্ব্যবহার করতে! প্রভাসের বন্দুক আমি সগর্বে তুলে নিলাম। কিন্তু দেখি সেটির লিভারও নড়ানো যাচ্ছে না। প্রভাসের বুকের রক্ত চুইয়ে এসে বন্দুকটিতে লেগেছিল, তাই আমি তেলের পরিবর্তে ব্যবহার করলাম। লিভার চালু হ'ল, মৃত্যুর পরেও কমরেড প্রভাস তার বুকের রক্ত দিয়ে আমাদের সাহায্য করলো! আমি প্রভাসের বন্দুকের সদ্ব্যবহার কতখানি করতে পেরেছি জানি না, তবে কর্তব্যে অটল থাকবার প্রেরণা পেয়েছি অন্তরে……।"

বনবিহারী দত্ত নিজমুখে যে জ্বলন্ত বিবরণ আমাকে দিয়েছে তার সত্যতা

সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই। কারণ, অন্যান্য বন্ধুদের কাছেও সামান্য সামান্য যা শুনেছি, তাতেও জালালাবাদ যুদ্ধক্ষেত্রের এই ঘটনার নির্ভুল সমর্থনই পেয়েছি।

যুদ্ধ প্রায় তিন ঘণ্টা চলেছে। সরকারপক্ষ অবশ্য তিন ঘণ্টা যুদ্ধ চলেছে স্বীকার করতে লজ্জা পেয়েছেন। তাঁদের পরাজয়ের গ্লানি ঢাকবার বহু চেষ্টা তাঁরা করেছেন; ক্রমে ক্রমে তা জানাচ্ছি। এই তিন ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধে আমরা এগারোজন বিপ্লবী সৈনিক-বন্ধুকে জালালাবাদ পর্বতশিখরে চিরকালের মত হারিয়েছি। আর একজন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে মারা যায়। মোট এই বারোজন্ হচ্ছে—

১। হরিগোপাল বল (টেগ্‌রা)।

২। ত্রিপুরা সেন।

৩। নির্মল লালা।

৪। পুলিনবিকাশ ঘোষ।

৫। শশাঙ্ক দত্ত।

৬। মধুসূদন দত্ত।

৭। প্রভাস বল।

৮। নরেশ রায়।

৯। বিধু ভট্টাচার্য।

১০। যতীন্দ্র লালা।

১১। মতি কানুনগো।

১২। অর্ধেন্দু দস্তিদার।

এদের মধ্যে অর্ধেন্দু দস্তিদার আহত অবস্থায় বেঁচেছিল। পরের দিন, ২৩শে তারিখে পুলিস ও মিলিটারীরা আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে আনে; দু'এক দিনের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। যুদ্ধে আরো তিনজন আহত হয়—

১। অম্বিকাদা।

২। বিনোদ চৌধুরী।

৩। বিনোদ দত্ত।

তিন ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধে এই হ'ল আমাদের পক্ষের হতাহতের মোট সংখ্যা। সরকারীপক্ষে বলা হয়েছে যে, তাদের একজনও হত বা আহত হয় নি। কিন্তু তবু—তবু হঠাৎ তিনবার হুইসেল্ ধ্বনি শোনা গেল। শত্রুসৈন্য মেশিনগান ও রাইফেল ফায়ার বন্ধ করলো। এখন রাত আটটা। কেন এই হুইসেল্—কেন ফায়ার বন্ধ হ'ল? আমাদের সাথীরা এখনও বুঝতে পারছে না কি জন্যে বাঁশী বাজল? পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট অতিবাহিত হ'ল। শত্রুপক্ষের কোন সাড়াশব্দ নেই। ভাবে মনে হ'ল শত্রুসৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়েছে। কিছুক্ষণের

মধ্যেই ট্রেনটি ধোঁয়া ছেড়ে শহর অভিমুখে রওনা হ'ল। এখন পরিষ্কার বোঝা গেল যে, ইংরেজ সৈন্য পরাজিত—তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে। ভারতের ইতিহাসে অনেক ক্ষেত্রে হয়ত ইংরেজ সৈন্যের পরাজয়ের কাহিনীর উল্লেখ আছে, কিন্তু তাদের এত বড় পরাভবের নজীর বোধহয় আর নেই। পঞ্চান্নজন মাস্কেট্রি-সজ্জিত বিপ্লবীর বিরুদ্ধে অর্ধ ব্যাটালিয়ান সৈন্য ম্যাগাজিন রাইফেল, লুইস্ গান ও ভিকার্স গান নিয়ে আক্রমণ চালাবার পরও পৃষ্ঠপ্রদর্শনের এই বুঝি একটিমাত্রই নজীর ভারতের বুকে বৃটিশ শাসনের ইতিহাসে লেখা আছে।

জালালাবাদ যুদ্ধে বৃটিশ সৈন্যের পরাজযেব বিষয় তারা যতই ঢাকতে চেষ্টা করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত এইটুকু অন্তত স্বীকার না কবে পারে নি—

"The engagement lasted for about two hours. During the first hour the raiders from their hill maintained an almost continuous fusillade accompanied by shouts of Bande Mataram to which Capt. Taitt's force replied with heavy fire. During the second hour the raiders fire slackened and diwindled to occasional shots, and as darkness was imminent, and the District Magistrate had given orders that the force must return before nightfall to garrison the town, Capt. Taitt withdrew his men and sent them back to Chittagong about 7 p.m. While the fire was going on Mr. Farmer's party with their Lewis gun had taken cover behind a hill to the south of that occupied by the raiders but they did not open fire as they could see nobody on account of the intervening jungle. On his way back Capt. Taitt met Col. Dallas Smith who on hearing the firing had come on from Chowdhuryhat by train with the main body of the Eastern Frontier Rifles. Capt. Taitt explained the position to him and the necessity for his withdrawal to the town and Col. Dallas Smith sent Mr. Lewis with a small party and a Lewis gun to the top of the hill on the left of the defile leading to Jalalabad hill. It was then almost dark but as occasional flashes of gun-fire could be seen coming from the raiders position, Mr. Lewis ordered the Lewisgunner and the Riflemen to open fire at them. They then advanced to another hill further on and fired again until the raider's fire had completely died away. They then

returned to the train and Col. Dallas Smith and the whole force went back to Chittagong, which they reached about 11 p.m. Only Sub-Inspectors, Abdul Gaffur and Siddik Dewan, remained overnight at Jarjaria Battali."

(Judgement of Chittagong Armoury Raid Case No. I).

যেটুকু সরকারপক্ষ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, সেটুকুও যদি সামান্য বিশ্লেষণ করি, তবে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, সরকারপক্ষে কেউ হতাহত হয় নি একথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা; খুব ক্ষতিগ্রস্ত না হলে সে রাত্রে তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যেত না। সরকারপক্ষ বলেছে, বিদ্রোহীরা প্রথম ঘণ্টায় ক্রমাগত ফায়ার করেছে ও সেই সঙ্গে অনবরত বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়েছে। আর বাহাদুর টেটও বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ফায়ার করেছেন। দ্বিতীয় ঘণ্টায়, বিদ্রোহীদের ফায়ার করার ক্ষমতা কমে গেল। তাদের মতে বিপ্লবীদের ফায়ার করার শক্তি ছিল না, তবু বেচারা ক্যাপ্‌টেন টেট্ কি আর করবেন, জেলা-শাসক যে হুকুম করেছেন অন্ধকার হওয়ার পূর্বেই শহর রক্ষার্থে তাদের চট্টগ্রামে ফিরে যেতে হবে! অগত্যা, যদিও সরকারী মতে বিপ্লবীদের ফায়ার করার ক্ষমতা দ্বিতীয় ঘণ্টায় বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে, তবু টেট্ সাহেবকে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম তামিল করতে হয়েছে—যুদ্ধ পরিহার করে সৈন্যদের সন্ধ্যে সাতটার সময় বাড়ি ফিরিয়ে নিতে হযেছে! ক্যাপ্‌টেন টেটের পৃষ্ঠ প্রদর্শনেব এই হ'ল আত্মপ্রবঞ্চনামূলক সাফাই।

ডি, আই, জি, মিঃ ফারমারের রণাঙ্গন পরিত্যাগপূর্বক পলায়নেব বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করারও একটি অতি দুর্বল প্রয়াস দেখা যায়। ফারমার সাহেব লিখেছেন —তখনও যুদ্ধ চলছিল; ফারমার সাহেব লুইস্‌গান সহ তাঁর সৈন্যদের নিয়ে জালালাবাদ পাহাড়ের দক্ষিণে একটি টিলায় পজিশন্ নিয়েছেন। পজিশন্ তো নিলেন, কিন্তু গুলী ছুঁড়বেন কি করে? আহা! আলালের ঘরের দুলাল ফারমার সাহেব! কি করে গুলী চালাবার নির্দেশ দেবেন?

"...but they did not open fire as they could see nobody on account of intervening jungle."

—সামনের জঙ্গল তাদের দৃষ্টি অবরোধ করেছে, কাউকে যে দেখা যাচ্ছে না—তাই তো তারা ফায়ার সুরু করতে পারলো না! কি সুন্দর অজুহাত! অক্ষমতা ঢাকবার জন্য আত্মপক্ষ সমর্থনের কি দুর্বল প্রয়াস! দৃষ্টি অবরোধ করেছিল সামনের জঙ্গল! তাহলে পাহাড়ের সেই জঙ্গলের আড়ালে ফারমার সাহেব লুইস্ গান সহ পজিশন্ নিতে গেলেন কেন! আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দৃষ্টি অবরুদ্ধ

হওয়ার সম্ভাবনা নেই, এমন স্থান বেছে নিলেন না কেন—কেন ঘোমটার আড়ালে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাই বাঞ্ছনীয় মনে করলেন ?

শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টা ! জাজ্‌মেণ্টে মিঃ জে, ইউনী লিখেছেন—ক্যাপ্‌টেন টেট্‌, কর্নেল ডালাস্‌ স্মিথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ডালাস স্মিথ্‌ গুলী-গোলার আওয়াজ শুনে Eastern Frontier Rifles-এর প্রধান অংশকে নিয়ে চৌধুরীহাটের ছাউনি থেকে ট্রেনযোগে জালালাবাদের নিকট এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। বিশেষ লক্ষ্য করার আছে এই অর্থপূর্ণ লাইনটির প্রতি—

"Capt. Taitt explained the position to him and the necessity for his withdrawal to the town...."

ক্যাপ্‌টেন টেট্‌ তাঁদের পজিশন্‌ সম্বন্ধে কর্নেল সাহেবকে কি এমন ওয়াকিবহাল করলেন এবং কি সে বিশেষ অবস্থা যার দরুণ তাঁর শহরে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়লো ? সৈন্যদের সঙ্গীন উঁচিয়ে খাড়া পাহাড়ের ওপর বিদ্রোহীদের আক্রমণ করার হুকুম ক্যাপ্‌টেন টেট্‌ই দিয়েছিলেন। টেটের সৈন্যদের দু'-দু'বার এইরূপ অর্থহীন চেষ্টার শোচনীয় ফল বহুল পরিমানে ভোগ করতে হয়েছে। তাদের পক্ষে হতাহতের সংখ্যাও প্রচুর। তাই ক্যাপ্‌টেন টেটকে তাঁর সৈন্যদল নিয়ে ট্রেনযোগে সন্ধ্যে সাতটায় শহরে পৌছতে হয়েছে এবং আহতদের রেল-হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

ডালাস্‌ স্মিথ্‌—স্বয়ং কর্নেল সাহেব এই যুদ্ধের নায়ক, তাঁকেও Eastern Frontier Rifles-এর প্রধান অংশের সঙ্গে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে হয়েছে। কর্নেল সাহেবের prestige—বৃটিশ prestige। এই prestige বাঁচাতে মিঃ জে, ইউনী লিখেছেন—"কর্নেল সাহেব লুইস্‌ গান সহ 'ছোট্ট' একটি সৈন্যদল নিয়ে জালালা-বাদের বাঁ দিকের একটি পাহাড় থেকে বিদ্রোহীদের লক্ষ্য করে গুলী চালাতে লুইস্‌ সাহেবকে নির্দেশ দিলেন। তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। বিপ্লবীদের বন্দুকের মুখে তখনও মাঝে মাঝে আগুনের ঝলক দেখা যাচ্ছিল। মিঃ লুইস্‌ বন্দুকের মুখের আগুন লক্ষ্য করে মেশিনগান ও রাইফেল চালাতে হুকুম দিলেন।" তারপর জজসাহেব লিখছেন—

"They then advanced to another hill further on...".

জজসাহেব যেভাবে বৃটিশ prestige বাঁচিয়ে লিখতে চেষ্টা করেছেন তাতে উপরে উদ্ধৃত লাইনটির সোজা অর্থ করা যাচ্ছে না। যদি লিখতেন— "...advanced to another hill nearer to them...", তাহলে সোজা অর্থ করতাম। কিন্তু "advanced...further on" লেখা দেখেও মনে হচ্ছে লুইস্‌ সাহেব প্রথম পাহাড়টি ছেড়ে অন্য পাহাড়ে যেতে বাধ্য হন। দূরে গেছে বা সামনে গেছে এই তর্ক যদি

ছেড়েও দিই, তবু এইটি আমরা জানতে পারছি যে, লুইস্ সাহেব অপর একটি পাহাড়ে পজিশন্ নিতে বাধ্য হন। তারপর জজসাহেব লিখেছেন—

"...and fired again until the raiders' fire had completely died away !"

অপূর্ব! মিঃ লুইস্ মেশিনগান পার্টি নিয়ে কর্নেল সাহেবের আদেশ পালন করতে গেছেন। যুদ্ধজয় না করে তো আর ফিরতে পারেন না! তাই এমন জোর ফায়ার চালালেন যে, বিদ্রোহীদেব গুলী ছোঁড়া completely died away—সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে গেল। অর্থাৎ, ইংরেজবাই যেন যুদ্ধজয় করেছে মনে হ'ল। ইংরেজ কি কখনও পরাজিত হতে পারে? তাদের prestige নেই? বাহাদুর টেট্ স্বয়ং যুদ্ধ করেছেন; Tactical retreat Master, D.I.G. স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন; অপরাজেয় কর্নেল সাহেব E.F.R.R.-এব প্রধান অংশের সঙ্গে উপস্থিত থেকে মিঃ লুইস্‌কে মেশিনগান চালিয়ে বিদ্রোহীদেব নির্মূল কবতে আদেশ দিয়েছেন—তাইতেই তো লুইস্ সাহেব এমন জোর ফায়ার চালালেন যে বিপ্লবীদের হাতের বন্দুক একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল!

ইংবেজের যুদ্ধজয় তো হ'ল, কিন্তু সর্বশেষে—Mountain has produced a mole hill!—বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া! ঘাটে গিয়ে তাদেব নৌকো যে অতলে ডুবলো—"They then returned to the train and Col. Dallas Smith and THE WHOLE FORCE went back to Chittagong, which they reached about 11 p.m."

যুদ্ধে যদি জয়ই হ'ল তবে আর সমস্ত সৈন্য নিয়ে চট্টগ্রামে পালিয়ে যেতে হ'ল কেন?

লুইস্ সাহেবের পার্টিও ট্রেনে উঠলো এবং কর্নেল ডালাস্ স্মিথ্ সদলবলে তাঁর সব ফৌজ নিয়ে ট্রেনযোগে চোদ্দ মাইল পথ অতিক্রম করে রাত এগারোটার সময় ফিরে এলেন। প্রথম ট্রেন টেট্ সাহেবের অধীনস্থ সৈন্য নিয়ে চট্টগ্রামে ফিরেছে সন্ধ্যে সাতটায়। তারপর কর্নেলের সঙ্গে সমস্ত ফৌজ ফিরে গেল রাত এগারোটায়। আমাদের সাথীরা জানে কর্নেলের ফৌজ নিয়ে শেষবার ট্রেন রওনা হয়েছে রাত প্রায় আটটায়। ট্রেনে চোদ্দ মাইল পথ অতিক্রম কবতে তাদের তিন ঘণ্টা সময় লাগবার কি কারণ? মৃত ও আহত সৈন্যদের ব্যবস্থা না করে তারা ফিরতে পারে-নি বলেই এই সময়টুকু তাদের লাগা খুবই স্বাভাবিক।

জালালাবাদ যুদ্ধে বৃটিশের এই শোচনীয় পরাজয়ের ইতিহাস মুছবে না—মুছতে পারে না। বারোজন শহীদের তাজা রক্তের অক্ষরে লেখা এই সত্য ইতিহাস বৃটিশের মুখে যে পরাজয়ের কালিমা লেপন করে দিয়েছে, তা বৃটিশ লেখকেরা

যতরকমেই মিথ্যা প্রমাণিত করতে চেষ্টা করুন না কেন, সেই রাত্রেই যে—THE WHOLE FORCE WENT BACK TO CHITTAGONG—এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করার কোন উপায়ই তাঁদের নেই।

তাঁদের নিজেদের লেখা ডকুমেণ্টই তাঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তাঁরা বিদ্রোহীদের গুলীর চোটে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। সৈন্যদল পশ্চাদপসরণ করছে তা' আর বুঝতে বাকি রইল না। ধোঁয়া ছেড়ে দ্বিতীয় ট্রেনটিও রওনা হ'ল। "বন্দেমাতরম্" "Long Live Revolution," "Down with Imperialism, Up with Revolution"—প্রভৃতি বিভিন্ন রণহুঙ্কার ও জয়োল্লাস পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুললো। অন্ধকারের নীরবতা ভঙ্গ করে ঘন ঘন উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হতে শোনা গেল—"Down—down with the British tyrants!" "বৃটিশ দস্যু নিপাত যাও—ভারত ছাড়—দূর হও!" "Cowards are running away!" "Down—down with British dogs!" অগণিত ভারতবাসীর রক্তের ঋণ পরিশোধ না করে রাতের অন্ধকারে বৃটিশ দস্যু অন্তঃপুরে পলায়ন করছে—তাই প্রতিহিংসার আগুন, পুঞ্জীভূত ঘৃণা ও সাথী হারানো ক্রুদ্ধ অন্তরের গর্জন বৃটিশ সৈন্যদের ধিক্কার জানালো!

পনেরো মিনিট কাটলো। কোলাহল থেমে গেছে। মেশিনগান আর অগ্নিবৃষ্টি করছে না। বিপ্লবীদের বন্দুকও নিস্তব্ধ। জয়ধ্বনিতে জালালাবাদ পাহাড় কেঁপে উঠছে না—চতুর্দিক একেবারে শান্ত নীবব। সাথীদের রক্তে পাহাড়ের মাটি কাদা কাদা হয়েছে। চারিদিকে বন্ধুদের মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে। পাঁচজন আহত বিপ্লবী সৈনিক ক্লান্ত দেহে ও মুমূর্ষু অবস্থায় প্রহর গুণছে। চারিদিকে রক্ত, আহতদের যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ, মৃত বন্ধুদের বিক্ষিপ্ত শবদেহ, গাছের ছোট ছোট ডাল পাতা ও ছাল টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। রণভূমির সে এক বিভীষিকাময় ভয়ানক দৃশ্য।

যুদ্ধ শেষ হয়েছে। বৃটিশের সুনিশ্চিত পরাজয় সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই। মাস্টারদা পাহাড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সকলকে সম্বোধন করে বললেন—"আমাদের অনুমান বৃটিশ সৈন্য পরাস্ত হয়েছে—তারা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেছে। এই অবস্থায় আমরাও জালালাবাদ পাহাড়ে আর অধিক সময় বসে থাকব না। আমাদের এখন এই স্থান পরিত্যাগ করা চাই।

"লোকনাথ, তোমার সঙ্গে ক'জন সাথীকে নাও। মৃত বন্ধুদের প্রত্যেকের কাছ থেকে রিভলভার ও কার্তুজ সংগ্রহ কর"—মনে হ'ল মাস্টারদা একটু থেমে কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর ধীর শান্ত কণ্ঠে আবার বললেন—"প্রত্যেক আহত বন্ধুকে খুব ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবে তাদের বাঁচার আশা আছে কিনা। যদি সঠিক ও

নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হও যে, দারুণ কষ্ট পাচ্ছে বাঁচার কোন আশাই নেই, তবে তাকে চিরশান্তি দিতে হবে; ভাবপ্রবণতা যেন বাধা না দেয়—তার বুকে গুলী করবে। কিন্তু তার আগে Doubly sure হবে যে, তার বাঁচবার আর বিন্দুমাত্র আশাও নেই।"

লোকনাথের সঙ্গে মাস্টারদা ও নির্মলদা প্রত্যেক মৃত কমরেডের কাছে গেলেন। তাদের সঙ্গের রিভলভার ও কার্তুজ সংগ্রহ করা হ'ল। আহত কমরেড মতি কানুনগোর অবস্থা খুবই খারাপ ছিল—ততোধিক আশঙ্কাজনক অবস্থা ছিল অর্ধেন্দু দস্তিদারের। তবু তারা তখনও বেঁচে ছিল—তাদের জ্ঞান ছিল, কাজেই রিভলভার নেওয়া হ'ল না—যদি শেষপর্যন্ত কাজে লাগায়! মাস্টারদার পার্টি অম্বিকাদার কাছে গেল। অম্বিকাদার কপালে হাড়ের ওপর ক্ষত খুব গুরুতর না হলেও রক্তক্ষরণ হয়েছে প্রচুর। আর মাথার ওপরের ক্ষত কতখানি আভ্যন্তরীণ ক্ষতি সাধন করেছে তা বোঝবারও উপায় ছিল না। অম্বিকাদা খুবই দুর্বল অবস্থায় পড়েছিলেন। রক্তে তাঁর চোখমুখ ঢাকা ছিল, সবাইকে ভাল করে দেখতেও পাচ্ছিলেন না।

মাস্টারদা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ডাকলেন—"অম্বিকাবাবু, অম্বিকাবাবু!" কোন সাড়াশব্দ নেই। বনবিহারী অম্বিকাদার শরীর স্পর্শ করে বলল—"অম্বিকাদা! আপনি আমাদের দেখতে পাচ্ছেন? আমাদের কথা শুনছেন? কথা বলুন অম্বিকাদা!" অম্বিকাদা তাকাতে চেষ্টা করছিলেন কিন্তু তাঁর শক্তিতে পেরে উঠছিলেন না। সুবোধ রায় নিচু হয়ে অম্বিকাদা শুনতে পান এমনভাবে জোরে জোরে বলল—"অম্বিকাদা, শত্রুর পরাজয় হয়েছে, তারা পালিয়েছে। জয় হয়েছে আমাদের! উঠতে চেষ্টা করুন। আমাদের কাঁধে ভর দিয়ে চলুন—আমরা আপনাকে নিয়ে যাব।"

অম্বিকাদা উত্তরে কিছু বললেন না। একটু মাথা নেড়ে জানালেন—পারছেন না। মাথাটা একটু নড়ে আবার স্থির হয়ে গেল। তিনি খুব ক্ষীণকণ্ঠে ডাকলেন—"মাস্টারবাবু! মাস্টারবাবু!" এই ক্ষীণকণ্ঠের ডাক মাস্টারদা শুনলেন—তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। মাস্টারদা হাঁটু ভেঙে অম্বিকাদার মুখের কাছে কান এগিয়ে দিয়ে বললেন—"অম্বিকাবাবু, এই তো আমি আছি! বলুন, কি বলতে চাইছেন?"

অম্বিকাদার সঙ্গে নোট ও খুচরো সব মিলিয়ে প্রায় একশ' দেড়শ' টাকা ছিল। মাস্টারদার হাতে এই টাকার প্যাকেটটি তিনি দিলেন। তাঁর হাতটি পড়ে যাচ্ছিল, মাস্টারদা চট করে হাতটি ধরে আস্তে মাটিতে শুইয়ে রাখলেন। অম্বিকাদা তারপর মাস্টারদাকে বললেন সময় নষ্ট না করে সবাইকে নিয়ে রওনা হতে। কোন্ পথে গেলে সুবিধে হবে তাও বলতে চেষ্টা করছিলেন, মাস্টারদা বাধা দিয়ে বললেন—

"আপনি আর ব্যস্ত হবেন না, বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন।" তাঁরা সকলে অম্বিকাদার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। অম্বিকাদা সেখানেই স্থির হয়ে পড়ে রইলেন।

সবার প্রাণে সাহস এবং মনে যুদ্ধ জয়ের গৌরব। আবার এতদিনের বিপ্লবী সাথীদের হারিয়ে সকলেরই অন্তর বেদনা বিহ্বল! এখন বিদায়ের পালা। সাথীরা ছেড়ে গেছে বহুক্ষণ। মৃতদেহের কাছ থেকে বিদায় নেবে—প্রাণহীন দেহগুলি কোন সাড়া দেবে না, কিছু বুঝবে না, অনুভবও করবে না; তবু এরাই তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেও তাদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে—হৃদয়ের স্পন্দন দিয়ে অনুভূতি দিয়ে সব বুঝেছে, সব দেখেছে! এই মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধান —এদের প্রাণহীন দেহ অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে এখন আর মার্চ করবে না—সেখানেই পড়ে থাকবে, মাটির শরীর মাটিতেই মিশে যাবে! তবু সাথীদের প্রাণহীন দেহ-গুলিও ফেলে যেতে যেন মন চাইছিল না—তারও যেন একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ!

মৃতপ্রায় অম্বিকাদা, মতি কানুনগো ও অর্ধেন্দু দস্তিদার কোনমতেই তাদের সঙ্গে আর মার্চ করতে পারবে না। বিনোদ দত্ত ও বিনোদ চৌধুরী যদিও প্রচুর রক্তপাতে শ্রান্ত ও অতি দুর্বল হয়ে পড়েছে, তবু তারা সাথীদের সঙ্গেই কোনমতে মার্চ করবে। সাথীদের কাঁধে ভর দিয়ে তারা পৃথিবীর শেষ সীমায় যেতেও প্রস্তুত। মা-বাপ, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সব পরিত্যাগ করে স্বদেশের মুক্তির জন্য যারা এক বৈপ্লবিক পরিবার গঠন করেছিল, আজ সেই পরিবারের একান্তই আপন বারোজনকে তারা চিরকালের মত ছেড়ে যাবে—বাকি তিনজনের ভাগ্যেই বা কি আছে তা তারা এখনও জানে না! যতই করুণ, যতই বেদনাদায়ক হোক্ না কেন, বিদায় তাদের নিতেই হবে!

লোকনাথ আদেশ দেবার ভঙ্গীতে দাঁড়ালো। পাহাড়ের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নাতি উচ্চকণ্ঠে আদেশ দিল—"Comrades, in close column of groups, in single rank, fall in!"

সবাইকে নিজ নিজ গ্রুপে গায়ে গায়ে এক পঙক্তিতে দাঁড়াতে বলা হ'ল। তারা সকলেই নির্দেশ অনুযায়ী পজিশন্ নিল। সবাই তাদের বন্দুকের মুখ নিচের দিকে করে সামরিক কায়দায় মৃত ও আহত সাথীদের বিদায় অভিবাদন জানাল। তারপর সমস্বরে গগন বিদারী শ্লোগান দিল—"Long Live the heroes for the fight for Freedom! Long Live the martyrs! Long Live Revolution!"

নত মস্তকে শেষ বিদায় নিয়ে বন্ধুরা পাহাড়ের নিচে নামতে সুরু করলো। শহীদদের নীরব কণ্ঠের উৎসাহ বাণী তাদের অন্তরে ধ্বনিত হ'ল—এই তো আমাদের জয়ের সূচনা। এগিয়ে যাও—আপোষ নয়—রক্তাক্ত সংগ্রাম! জয় আমাদের সুনিশ্চিত।"

শেষ হ'ল জালালাবাদ যুদ্ধের গৌরবোজ্জল অধ্যায়, রক্তের অক্ষরে লেখা রইল মুষ্টিমেয় ক'জন স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সৈনিকের অবিস্মরণীয় মরণজয়ী কাহিনী আর শক্তিমত্ত সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারী বৃটিশের শোচনীয় পরাজয়ের ইতিহাস। এই জালালাবাদ পাহাড়ের রক্তাক্ত সংগ্রামে যাঁরা নিঃশেষে প্রাণ দান করে শহীদ হলেন তাঁদের ক্ষয় নেই, ব্যর্থ হবে না তাঁদের এই জীবন বিসর্জন। আমাদের এগিয়ে চলার সংগ্রামে চিরদিনই প্রেরণা জোগাবের এই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরেরা, যতদিন না উৎপীড়ন ও শোষণের খড়্গ সমূলে ধ্বংস হয়। অবিস্মরণীয় জালালাবাদ, বিপ্লবী জালালাবাদ তোমাকে নমস্কার!

রাত এখন প্রায় ন'টা। জালালাবাদ যুদ্ধ শেষ। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর, বিনিদ্র রজনীর কঠোর শ্রমে শ্রান্ত শরীর, ক্ষত-বিক্ষত চরণযুগল, অঙ্গে শতচ্ছিন্ন বসন— বিয়াল্লিশজন স্বাধীনতা যুদ্ধের রণক্লান্ত সৈনিক পাহাড়ের নিচে নামতে সুরু করলো। পাহাড়ের ওপরে তাদের দশজন সাথী চিরনিদ্রায় নিদ্রিত—আরও তিনজন গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে রইল। শক্ত জমিতে পা রেখে খাড়া পাহাড় বেয়ে নিচে নেমে আসা এদের পক্ষে খুব কষ্টকর হয়ে পড়েছে—ক্লান্তিভরা শরীর কেবলই টলে পড়ছে—শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে কেউ কেউ পিছলে কয়েক হাত গড়িয়েও পড়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকের সঙ্গে তাদের প্রিয় সাথী মাস্কেট্রি ও রিভলভার আছে। ক্লান্তিতে অবসন্ন শরীরে সাধারণ জামা-কাপড়ও দুঃসহ বোঝা মনে হয়—তাও পরিত্যাগ করতে ইচ্ছা হয়! মাস্কেট্রি রিভলভার যদি ফেলে আসতো তাহলেও হয়ত তাদের শ্রমের খানিকটা লাঘব হ'ত।

সঙ্গে দু'জন আহত কমরেড—বিনোদ দত্ত ও বিনোদ চৌধুরী। দু'জনেরই আঘাত বেশ গুরুতর বলা চলে। মেশিনগানের গুলী একজনের বুকের দিক থেকে পিঠের দিক ও অন্য জনের গলার ডান পাশ থেকে বাঁ পাশ ভেদ করে চলে গেছে। অনবরত রক্তক্ষরণে শরীর খুবই দুর্বল। তবু তারা সবার সঙ্গে অনেক কষ্টে পাহাড় থেকে নিচে নেমে এলো। বিনোদ দত্ত আহত অবস্থায়ও অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে মার্চ করে এগোতে সক্ষম হয়। কিন্তু বিনোদ চৌধুরী অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়ায় তাকে সঙ্গে নিয়ে মার্চ করা সম্ভব হয় নি। কাজেই পাহাড়ের পাদদেশে কোন একটা নির্জন স্থানে তাকে ছেড়ে যেতে হয়। জালালাবাদ পাহাড়ে পরিত্যক্ত এই কয়েকজন সাথী—বিনোদ চৌধুরী, মতি কানুনগো, অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার এবং অম্বিকাদা —এঁদের কথা যথাস্থানে বলবো।

পাহাড়ের ঠিক নিচেই সামনে একটি অগভীর সঙ্কীর্ণ জলস্রোত বয়ে চলেছে। জলের সন্ধান পেয়ে রণক্লান্ত বন্ধুদের তৃষ্ণা যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠলো—তারা ছুটে গিয়ে এই স্রোতে নেমে পড়ে অঞ্জলি ভরে আকণ্ঠ জলপান করতে লাগলো। "Marching

Order", "Marching Discipline" তখন আর ছিল না। আপন আপন গ্রুপ ঠিক রাখাও সম্ভব হ'ল না। পরস্পরের মধ্যে অদল-বদল হয়ে গেল। জল খেয়ে এক-এক জন এক-এক সময় উঠেছে এবং সামনের জনকে অনুসরণ করে এগিয়েছে। পাহাড়ের রাস্তা বড়ই বিভ্রান্তিকর। যদি একবার কেউ ভিন্ন পথে গিয়ে পড়ে তবে সে হারিয়ে যায়—সাথীদের সঙ্গে আর যোগাযোগ ঘটে ওঠে না। এরাও Marching Discipline হারিয়ে গোলেমালে দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়লো। দল থেকে যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তা' এরা আগে বুঝতে পারে নি। প্রায় মিনিট পনেরো হাঁটবার পর একটু খোলা জায়গায় এসে খেয়াল হ'ল যে, তাদের মধ্যে সবাই নেই। মাস্টারদা ও নির্মলদার নেতৃত্বে সেখানে দেখা গেল মাত্র বিশ-একুশজন সাথী আছে। আর দলের বাকি অর্ধেক লোকনাথ, কালী চক্রবর্তী, রজত সেন প্রভৃতির সঙ্গে অন্যত্র চলে গেছে। আমাদের প্রধান দলটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন দু'টি স্থানে প্রায় আধ ঘণ্টা বসে কাটালো—যদি দলের বিচ্ছিন্ন অংশের দেখা পায়!

এই সময় বনবিহারী দত্তের হঠাৎ মনে হ'ল কেউ যেন একটি ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করছে! কোন কমরেডের এইরূপ অস্বাভাবিক আচরণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া গ্রুপ কমাণ্ডার বনবিহারী দত্তের বৈপ্লবিক দায়িত্ব! কে সে? কেন ঝোপের আড়ালে চুপি চুপি আত্মগোপন করছে? বনবিহারী চকিতে ঝোপের পেছন দিকে ছুটে গিয়ে তার পথ রোধ করে দাঁড়ালো। দেখতে পেল—ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অবসন্ন ক্লান্ত একজন সাথীকে। বনবিহারী বুঝতে পারলো —দল ছেড়ে সে সেই ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে পরে সবার অগোচরে অন্যত্র পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করেছে। বনবিহারীকে আকস্মিক ভাবে সেখানে দেখতে পেয়ে বিপ্লবী বন্ধুটি ভয়ে একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে বনবিহারীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইল। কাতরকণ্ঠে বলল—"ভাই আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি—সাহস হারিয়েছি, আমাকে ক্ষমা কর!" তোমার কাছে আমার একান্ত প্রার্থনা—আমার এই ক্ষণিক দুর্বলতার কথা তুমি সাথীদের কাউকে বোলো না। আমি কথা দিচ্ছি—তোমার সঙ্গে থাকতে পারলে আমি আর ভয় পাবো না। বল তুমি—কথা দাও—কারো কাছে আমার এই দুর্বলতার কথা প্রকাশ করবে না!"

বনবিহারী কথা দিয়েছিল। সে মাস্টারদাকে ছাড়া এই কথা আর কাউকে বলে নি।

একটি ভয়াবহ মরণপণ যুদ্ধের পর যদি কারো এইরূপ পালিয়ে বাঁচার সাধ হয় তবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই—বরং এইরূপ বাস্তবতার উপলব্ধির অভাব

[illegible] চিন্তিত হওয়ার কথা। স্বাধীনতা-যুদ্ধের সৈনিকের পক্ষে এইরূপ পালিয়ে বাঁচার ইচ্ছে হতে পারে—এই বাস্তব সত্য ভবিষ্যতের বিপ্লবের ইতিহাস রচয়িতাদের অনুধাবনের বিষয়!

বনবিহারীর সান্তনাবাক্যে ও উৎসাহে সাথীটি যেন নিজেকে ফিরে পেল—মুহূর্তের দুর্বলতার জন্য লজ্জিতবোধ করে বার বার বলতে লাগলো—"ভাই তোমাদের ছেড়ে যেতে কোনদিনই আমার মন চায় নি—তবু কি যে হয়ে গেল হঠাৎ—কি লজ্জা—মুহূর্তের দুর্বলতা আমাকে কি করে ফেললো! জানি না আমার জীবনের ক্ষণিকের এই কলঙ্ক কখনও ধুয়ে মুছে যাবে কিনা!"

আজ গর্বের সঙ্গে বলা যায়, সেই সাথীটি কখনও পুলিস বা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে শত প্রলোভনেও কোন স্বীকারোক্তি করে নি। দুর্বলতা আসা অস্বাভাবিক নয়—দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টাই বিপ্লবী সততার পরিচয় দেয়।

বনবিহারী ক্লান্ত সাথীটিকে সঙ্গে নিয়ে মাস্টারদার বিচ্ছিন্ন দলটির সঙ্গে যোগ দিল। অন্য দলটি লোকনাথের সঙ্গে কোন্ দিকে গেছে, তা' তাঁদের জানা সম্ভব হ'ল না।

এদিকে জালালাবাদ পাহাড়ের উপরে আহত মৃতকল্প অবস্থায় অম্বিকাদারা তিনজন পড়ে আছেন। রাত প্রায় তিনটা। অন্ধকার রাত্রি—ঝোপ-জঙ্গল পরিবেষ্টিত পাহাড় আরো নিবিড় অন্ধকারে ঢাকা। অম্বিকাদার মুখে শোনা—চারিদিকে মৃত সাথীদের হিমশীতল দেহগুলি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে—নিঝুম রাত্রি! ভয়াবহ দৃশ্য। ধীরে ধীরে অম্বিকাদার জ্ঞান ফিরে এলো। প্রথমটায়—তিনি কোথায় আছেন—কেন সেখানে পড়ে --কিছুই তাঁর মনে পড়লো না। আস্তে আস্তে সব তাঁর মনে হতে লাগলো! যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে—কমরেডরা মারা গেছে এবং তিনি আহত হয়ে সেখানে পড়ে আছেন। যারা বেঁচে আছে মাস্টারদা তাদের সবাইকে নিয়ে চলে গেছেন। জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই তিনি অন্ধকারে হাতড়াতে লাগলেন—তাঁর রিভলভারটি কোথায়? মাস্কেট্রিটি হাতে অনুভব করলেন কিন্তু হাতে তুলতে পারলেন না—দুর্বলতা অত্যন্ত বেশি। রিভলভারটিরই এখন অতি প্রয়োজন। অম্বিকাদার দু'টি চোখ ঘন রক্তে ঢেকে আছে। জমানো রক্তের পুলটিশ দিয়ে কেউ যেন তাঁর চোখ দু'টি ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছে। এই রক্তের প্রলেপ পরিস্কার করবার জন্য—হাত তুলতে চাইলেন পারলেন না। অনেকক্ষণ একভাবে পড়ে থাকার জন্য বাহু দু'টি একেবারে অবশ! তবু—তবু তাঁকে চেষ্টা করতেই হবে— শক্তি সঞ্চয় করতে হবে—তিনি এখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—ধরা তিনি কিছুতেই দেবেন না। খানিকক্ষণ চেষ্টা করার পর অম্বিকাদা চোখ দু'টি কোনমতে পরিষ্কার করলেন। রিভলভারটিও কাছেই খুঁজে পেলেন।

এবারে ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। তখনও মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে। মাথায় একটু হাত বুলাতে চেষ্টা করলেন। কপালের উপর হাত পড়তে গুলীটি অনুভব করলেন এবং একটু টিপে দিতেই টুক্ করে গুলীটি বেরিয়ে এলো। আবার কিছু রক্ত ঝরলো—তবে তেমন বেশি নয়।

সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে অম্বিকাদা উঠে দাঁড়ালেন—হাত-পা থর থর করে কাঁপছে—মাথা ঘুরছে—তবু প্রাণপণে স্থির থাকার চেষ্টা করলেন। বহুক্ষণ অবসন্ন অবস্থায় একভাবে পড়ে থাকার প্রথম ধাক্কাটা সামলে ধীরে ধীরে এক পা এক পা করে এগোতে লাগলেন। রিভলভারটি টোটা ভর্তি আছে কিনা দেখবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু লিভারটি (lever) টিপে চেম্বার খুলে পরীক্ষা করে দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ল না। তবু রিভলভারটি পরিত্যাগ করলেন না, সে'টি তাঁর সঙ্গেই রইল।

অম্বিকাদার ধারণা—মৃত কমরেডরা ছাড়া আর সবাই মাস্টারদার সঙ্গে চলে গেছে। হঠাৎ কার এই কণ্ঠস্বর! তবে কি এখনও কেউ বেঁচে আছে? অম্বিকাদা বুঝতে পারছিলেন না কোন্ দিক থেকে শব্দটি আসছে। খুব নিকটেই অর্ধেন্দু ছিল। অম্বিকাদা চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না—কানে শুনছিলেন অর্ধেন্দু বল্ছে—"অম্বিকাদা, আপনি বেঁচে আছেন?"

অম্বিকাদা—"হাঁ, হাঁ, আমি বেঁচে আছি। তুমি কোথায়? কেমন আছ? কোনমতে উঠতে পারবে? চেষ্টা কর—ধীরে ধীরে চল পাহাড় থেকে নিচে নামি।"

অম্বিকাদাকে সামনে দেখে অর্ধেন্দু যেন শক্তি ফিরে পেল। সে প্রাণপণে চেষ্টা করে উঠে দাঁড়ালো—রিভলভারটি কোথায় পড়ে আছে খুঁজে পেল না, হাতের সামনে মাস্কেট্রিটি ছিল—সেটিকে সম্বল করে যাত্রা সুরু করলো। অর্ধেন্দুর তলপেটে গুলী লেগেছে—সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না। বন্দুকের নলের উপর ভার দিয়ে কোনমতে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরনে তার কিছুই নেই। তারা দু'জনে তখন পাহাড়ের উত্তর-পূর্ব দিকে আস্তে আস্তে অগ্রসর হ'ল। মাত্র দশ-বারো গজ এগোতেই তাদের প্রায় পনেরো মিনিট কেটে গেল। পাহাড়ের উত্তর প্রান্তে এসে অর্ধেন্দু আর চলতে পারছিল না—তার শরীরে আর এতটুকু শক্তি অবশিষ্ট নেই। হাঁটু ভেঙে সেখানেই সে পড়ে গেল। অম্বিকাদাকে বলল—"অম্বিকাদা আমি আর পারছি না—আমার শরীরে আর একটুও শক্তি নেই। আপনাকে বাঁচতেই হবে। আপনি এগোতে থাকুন। Sentiment-কে এখন বড় করে দেখলে চলবে না। আমার জন্ম ভাববেন না। আপনি আর দেরি করবেন না। মাস্টারদাকে বলবেন আমি তাঁর কথা মনে রেখেছি—"Liberty or Death!—স্বাধীনতা নাহয় মৃত্যু!"

পারছিলেন না এই খাড়া পাহাড় থেকে কি করে নামবেন? অম্বিকাদা অর্ধেন্দুকে সস্নেহে বললেন—"ভাই, তোমার কথা মাস্টারদাকে নিশ্চয়ই বলবো। তুমি দীর্ঘজীবী হও—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্!" এই কথা বলে অম্বিকাদা নিচে নামার জন্য পা বাড়ালেন। কিন্তু শরীরের ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারলেন না—পা পিছলে পড়ে গেলেন। অম্বিকাদার শরীর পাহাড়ের ঢালুতে দ্রুত নিচের দিকে গড়িয়ে পড়তে লাগলো—মনে হ'ল এখুনি বুঝি পাহাড়ের তলায় আছড়ে পড়ে শরীবটি চুরমার হয়ে যাবে! এতজন বিপ্লবী যুবক জালালাবাদের বুকে স্থান পেয়েছে—জালালাবাদের মাতৃস্নেহ থেকে অম্বিকাদাও বঞ্চিত হলেন না! তাঁর পতনশীল দেহটি যেন মায়ের স্নেহময় বাহুপাশে আশ্রয় পেল—ছোট একটি গাছে সামান্য ধাক্কা লেগে থেমে গেল; নিচে আর গড়িয়ে পড়লো না!

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ভোর হয়ে যাবে—কোন্‌দিক থেকে লোকজন হয়ত কেউ এসে পড়বে—তার আগেই সে স্থান ত্যাগ করে আরও দূরে চলে যাওয়াই অম্বিকাদা সমীচীন মনে করলেন। খাড়া পাহাড় দিয়ে এখনও তাঁকে অনেকটা নিচে নামতে হবে—প্রতি পদক্ষেপেই পা পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনা, তবু পিছিয়ে থাকলে চলবে না। দুর্বল ক্লান্ত শরীর টেনে টেনে তিনি কোনমতে নিচে নামলেন—তারপর বন-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে প্রায় সোয়া মাইল পথ আরও এগিয়ে গেলেন এবং সেখানেই একটি ঝোপের আড়ালে বিশ্রাম নেওয়া সাব্যস্ত করলেন।

সকালবেলা—সূর্যের আলোতে চারিদিক উজ্জ্বল। লোকজন কাউকে দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু মানুষের কথাবার্তা বা হাঁক-ডাক মাঝে মাঝে কানে আসছে। অম্বিকাদা প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করেই বসে রইলেন। বেলা সাতটা-আটটার সময় তাঁর মনে হ'ল যেন একটি ট্রেন এসে কাছেই কোথাও থামলো—তার পরেই সৈন্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে বহু উচ্চকণ্ঠের নির্দেশ শুনতে পেলেন। বুঝতে বাকি রইল না সকালবেলা বৃটিশ বীরপুঙ্গবেরা জালালাবাদ পাহাড় ঘিরে ফেলেছেন। গতকাল—২২শে তারিখে সন্ধ্যায়, রণে ভঙ্গ দিয়ে সারা রাত "শহর রক্ষা" করতে গিয়েছিলেন—এবং ২৩শে তারিখ সকালবেলা, প্রায় ১২ ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর, এখন বীর-পুরুষেরা এসেছেন পাহাড় ঘিরে ফেলে সবাইকে বন্দী করবেন!

বৃটিশ সমরনায়কদের অজানা থাকার কথা নয় যে, বিপ্লবীরা তাদের অপেক্ষায় সারা রাত সেখানে বসে থাকবে না। অধিক শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রাথমিক নিয়ম অনুসারে অল্প সংখ্যক সৈন্য কখনও সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয় না। শত্রুর অপেক্ষাকৃত দুর্বল ঘাঁটিকে অধিক শক্তি নিয়ে শিবাজীর মত ঝটিকাবেগে ঘায়েল করার নির্ভুল পদ্ধতি আমরা যে অবলম্বন করবই, তা না বোঝার মত

বেলা তাঁরা জেনেশুনেই শূন্য মাঠে ফুটবল খেলতে এসেছিলেন।

তবু কে জানে—যদি বিপ্লবীদের মধ্যে কেউ বেঁচে থাকে! যদি হঠাৎ অন্য কোন দিক দিয়ে বিপ্লবীরা আক্রমণ সুরু করে? সামরিক রীতি অনুযায়ী সৈন্য সমাবেশ ও লক্ষ্য বস্তুর বিরুদ্ধে যদি সৈন্য deploy করতে হয়, তবে কতকগুলি পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। তাই তাঁরা প্রচুর সৈন্য নিয়ে সমস্ত পাহাড়টি ঘিরে ভারতীয় সৈন্যদের একটি দলকে প্রথমে পাহাড়ের উপরে উঠে চতুর্দিকে ভালো করে অনুসন্ধান করে দেখতে নির্দেশ দিলেন। যদি মরে তবে ভারতীয়েরাই আগে মরুক।

তারপর "কোন আশঙ্কা নেই" সংকেত পেয়ে বৃটিশ প্রভুরা বেলা প্রায় ১১টার সময় সকলে সদর্পে পাহাড়ের উপরে উঠলেন—ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জোয়ানদের হিমশীতল মৃতদেহগুলি তাঁদের মন নিরাশায় ভরে দিল। তাঁরা ভেবেছিলেন অনেককেই তাঁরা আহত অবস্থায় পাবেন। সাধারণতঃ যুদ্ধে মৃতের চেয়ে আহতের সংখ্যাই অনেক বেশি থাকে—কিন্তু জালালাবাদ যুদ্ধ তার ব্যতিক্রম! এদিকে বৃটিশ নায়কেরা এত আশা করে এসেছেন, আহত কাউকে না পেলে তাঁদের চলবে কেন? তাঁরা মতি কানুনগোকে পেলেন—তখনও তার মৃদু নিঃশ্বাস বইছে। রেলের বড় ডাক্তার Weldon সাহেব সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরীক্ষা করে দেখে বুঝলেন মতির বাঁচবার কোন আশাই নেই। সরকারীপক্ষের কথা থেকে জানতে পারছি—সেই অবস্থায় তাকে শহরের হাসপাতালে পাঠানো নিষ্প্রয়োজন মনে করে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে Weldon সাহেব মতিকে মরফিয়া ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে সেখানেই রেখে দেন।

সেখানে যে সমস্ত ভারতীয় সৈন্য, অফিসার, ডাক্তার, ফটোগ্রাফার প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকের কাছ থেকেই জানতে পেরেছি—মতির হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হবার আগেই তাকে টেনে নিয়ে চিতায় তুলে দেওয়া হয়েছিল। মতির ক্ষেত্রে যে এইরূপ অমানুষিক ব্যাপার ঘটেছে, সে বিষয়ে আমরা একেবারে নিঃসন্দেহ। Judgement-এ যেটুকু লিপিবদ্ধ হয়েছে তা' থেকে জানতে পারছি—

"There they found Ardhendu Dastidar and Motilal Kanungoe mortally wounded but still alive, · Dr. Weldon dressed the wounds of the two wounded men and as he considered Motilal Kanungoe to be too badly injured to be moved he gave him Morphia and let him remain there……."

জালালাবাদ যুদ্ধের মৃত্যুঞ্জয়ী সৈনিক।

প্রভাস বল। শশাঙ্ক দত্ত। নির্ম্মল লালা।

পুলিশ কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো হইতে।

জালালাবাদ যুদ্ধের মৃত্যুঞ্জয় সৈনিক

নরেশ চন্দ্র রায় — ত্রিপুর সেন — বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য।

পুলিশ কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো হইতে।

—মতিলাল কানুনগো ও অর্ধেন্দুকে তারা আহত অবস্থায় পায়। তাদের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর। ডাক্তার ওয়েলডন সাহেব দু'জনের ক্ষতস্থানেই ব্যাণ্ডেজ করেন। মতি কানুনগোর বাঁচবার আশা নেই বলে তাকে মরফিয়া ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে সেখানেই শুইয়ে রাখেন।

ডাক্তার সাহেব ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে মতিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখবার পর, মধ্যাহ্নের পূর্বে, পুলিস সাহেব, S. D. O. প্রমুখের কাছে গেলেন। তাঁদের উক্তি থেকে পাওয়া যাচ্ছে, S. D. O. মতির জবানবন্দি নিয়েছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ঘুম পাড়িয়ে রাখবার পরেও মতির প্রাণ ছিল, জ্ঞান ছিল এবং "Statement" দিয়েছে। জাজ্‌মেণ্টে লেখা আছে—

"Later in the afternoon the Civil Surgeon, the S. D. O., the Superintendent of Police, a photographer, and finger print expert arrived. Motilal Kanungoe made a statement to the S. D. O., who took it down. He expired a few minutes later…"

—মতি বেঁচে ছিল। S. D. O. তার মৃত্যুকালীন জবানবন্দি নিয়েছেন এবং জবানবন্দি দেওয়ার পরেই সে মারা যায়…ইত্যাদি।

এই বিবৃতি থেকেই জানতে পারছি মরফিয়া দেওয়ার পরেও মতি বেঁচে ছিল। তথাকথিত 'Statement' দেবার পরই মতি মারা যায়—এটা কি সত্যি? না, তা' সত্যি নয়। মতি শেষনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করবার আগেই তাকে চিতায় তোলা হয়েছে—এটাই বাস্তব ও সত্য ঘটনা। কোন জবানবন্দিই সে দেয় নি। প্রত্যক্ষদর্শী বাঙ্গালী পুলিস ও অফিসারদের কাছে আমি এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য জানতে পেরেছি।

সরকারপক্ষ মতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করেছেন। সরকার সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন এই যুব-বিদ্রোহকে "অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" নামে অভিহিত করতে; জালালাবাদ যুদ্ধে তাঁদের পরাজয় অভ্রান্ত সত্য, ইতিহাসের পাতা থেকে তা মুছে ফেলার জন্য মিথ্যে প্রচার করে আসছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরা মাত্র ৫৬ জন সৈন্য পাঠিয়েছিলেন এবং জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম পেয়ে সেই সৈন্যদল সে রাত্রেই বাড়ি ফিরে আসে, তারপর একজনও রাজসাক্ষী না পেয়ে নিজেদের মুখ রক্ষার্থে বহু স্বীকারোক্তি পেয়েছে বলে মিথ্যা সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করেছেন এবং সেই হেতুই, জীবিতদের মুখ থেকে স্বীকারোক্তি না পেলেও, আহত বিপ্লবীদের মুখ থেকে statement পেয়েছেন বলে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। মতি সম্বন্ধে সরকারীপক্ষ বলেছে, সে S. D. O. সাহেবের কাছে বিবৃতি দিয়েছে—এই মিথ্যার আমরা ঘোর প্রতিবাদ করছি। সরকারীপক্ষের বহু পুলিস কর্ম-

চারীর (যারা মতির কাছে S. D. O.-কে নিজ পদমর্যাদা ভুলে পুলিসের মত স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য প্রশ্ন করতে দেখেছ) কাছ থেকে আমরা সন্দেহাতীত ভাবে নির্ভুল সত্য জেনেছি। মতি কানুনগো S. D. O. সাহেবের কোন কথারই জবাব দেয় নি। প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে মাথা নেড়ে বা হাতের ইশারায় জানিয়েছে যে, কোন উত্তর সে দেবে না। এই প্রখ্যাত S. D. O. মহাশয় কন্‌ফেশন গ্রহণের ব্যাপারে যে বহু মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছেন, তা' আমরা ও আমাদের পক্ষের উকিল-ব্যারিস্টারেরাও জানতে পেরেছিলেন।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে S. D. O. মিথ্যা বললেন। তিনি বলেন, মতিও তাঁর কাছে statement দিয়েছে, যার অর্থ, সরকারীপক্ষের মামলা সাজাতে সাহায্য করেছে। তিনি বললেন যে, মতি সহায়রামের নাম এবং S.D.O. সাহেবের বন্ধু, মিহির বোসের বাবার বন্দুক তাঁর অজান্তে নিয়ে এসেছে বলেছে। S.D.O. সাহেবকে এইটুকু বলবার জন্যই মতি বেঁচে ছিল! বিপ্লবীদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য কতখানি মিথ্যা ও জঘন্য ষড়যন্ত্র! তাই আমাদের ব্যারিস্টার ৺শ্রীশ বোস S.D.O. মহাশয়ের মুখের ওপর ঠিক এই প্রশ্নটি করেছিলেন—

"Well, Mr. Roy, are you an expert in extracting confessions and statements from the accused ?"

—আচ্ছা, মিঃ রায়, বলুন তো, আপনি কি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের স্বীকারোক্তি ও জবানবন্দি আদায়ের ব্যাপারে একজন সুদক্ষ ব্যাক্তি ?

S.D.O. মহাশয় কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ঐরূপ রূঢ় প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে লজ্জা অনুভব করেছিলেন কিনা জানিনা—তবে তাঁর মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল এবং নিজেকে সামলাবার জন্য মস্ত একটি ঢোঁক গিলেছিলেন!

মতি কানুনগোকে অন্তিম অবস্থায় পেয়েও তার confession নেবার জন্য পুলিস নির্দয়ের মত তাকে জ্বালাতন করেছে। আরো কাউকে তেমনি মুমূর্ষ বা আহত অবস্থায় পাওয়া যায় কিনা দেখতে তারা তন্ন তন্ন করে গোটা পাহাড়টা খুঁজতে লাগলো। পাহাড়ের উত্তর-পূর্ব কোণে ঝোপের আড়ালে অর্ধেন্দু দস্তিদারকে প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায় দেখতে পেল। তাকে ডাক্তার ওয়েলডন্ first-aid দিলে শহরের হাসপাতালের কেবিনে পুলিসের কড়া পাহাড়ায় রাখা হয়েছিল। তার সেবার জন্য প্রয়োজন মত সব সময় দু'জন নার্স নিযুক্ত করা হয়। S.D.O. মহাশয় আদালতে আবার মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন এই বলে যে, অর্ধেন্দুও তাঁর কাছে statement দিয়েছে। S.D.O. সাহেবের এই জবানবন্দিও প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত সব মিথ্যা। আমাদের ব্যারিস্টার ৺শ্রীশ বোস একবার অসুস্থ হয়ে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন। সেই

জালালাবাদ যুদ্ধের মৃত্যুঞ্জয়ী সৈনিক।

শহীদ হরিগোপাল বল।

শহীদ মতিলাল কানুনগোয
পুলিশ কর্তৃক গৃহীত ফটো হইতে।

জালালাবাদ যুদ্ধের মৃত্যুঞ্জয়ী সৈনিক

মধুসূদন দত্ত। পুলিন ঘোষ। জীতেন দাশগুপ্ত।

পুলিশ কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো ৩২'৩।

সময় অর্ধেন্দুর নার্সদের মুখে তিনি নিখুঁত বর্ণনা শুনেছেন। অর্ধেন্দু এক মুহূর্তের জন্যও বিন্দুমাত্র দুর্বলতা দেখায় নি। নার্সরা বলেছিলেন, S.D.O. সাহেবেরা অর্ধেন্দুকে যদি ঐভাবে বিরক্ত না করতেন, তবে হয়ত সে মারা যেত না, আর মারা গেলেও এত তাড়াতাড়ি মৃত্যুর কোন কারণ ছিল না। অর্ধেন্দু ও মতির দৃঢ় বৈপ্লবিক চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে খুব জোরের সঙ্গে বলতে পারি—S.D O. অর্ধেন্দুদের সম্বন্ধে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়েই মিথ্যা বলেছিলেন।

অর্ধেন্দু বিপ্লবী ভারতের এক আদর্শ চরিত্র। বোমা তৈরি করবার সময় বিস্ফোরণে সে গুরুতর আহত হয়। তার জীবনের বিন্দুমাত্র আশা ছিল না। ১৮ই এপ্রিল বুকে পেটে sticking plaster দিয়ে পোড়া ঘা ব্যাণ্ডেজ করে যুব বিদ্রোহে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করতে সে চলে এসেছিল। ১৯শে এপ্রিল পুলিস-লাইনের ওপর শত্রুর মেশিনগানের সম্মুখীন হয়েছে। বিপ্লবী অর্ধেন্দু অচল, অটল ও দৃঢ়ভাবে যুদ্ধ করে ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ রণাঙ্গনে শহীদের গৌরব অর্জন করেছে। অর্ধেন্দুর বৈপ্লবিক নিষ্ঠা সম্বন্ধে আমাদের কারও মনে কোন প্রশ্ন নেই। যারা অর্ধেন্দুকে অপবাদ দেওয়ার মিথ্যা প্রয়াস পেয়েছে তারা জেনে রাখুক, তাদের সেই চেষ্টা সফল হয়নি। নির্ভীক অর্ধেন্দু! তোমার শিক্ষা বিপ্লবী ভারতকে উদ্বুদ্ধ করুক। তুমি দীর্ঘজীবী হও! বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্।

পুলিস ও মিলিটারীর এখন প্রচুর কাজ। পাহাড়ের চতুর্দিক ঘিরে রাখা, আহতদের first aid দেওয়া, অর্ধেন্দুকে শহরের হাসপাতালে পাঠানো, মৃত ব্যক্তিদের ফটো নেওয়া—টিপ সই গ্রহণ করা, বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রাদির লিস্ট করা ইত্যাদি ইত্যাদি—অনেক কাজ! যুদ্ধ না চললেও সৈন্যবাহিনী ও পুলিসকে এই সব কাজ করতে হয়েছে। তাতেই তাদের আনন্দ।

এই সমস্ত কাজ শেষ হতে বেলা প্রায় দুটো বাজলো। তারপর তাদের সমস্যা—দশজনের মৃত দেহ এবং মতির মৃতপ্রায় দেহ নিয়ে তারা কি করবে? শহরে নিয়ে শ্মশানে দাহ করার ব্যবস্থা করবে নাকি সেই পাহাড়ের ওপরেই দাহকার্য সমাধা করা হবে? শহরে আনলে জনসাধারণের বিপুল সমর্থনকে হয়ত উপেক্ষা করা যাবে না, তা'ছাড়া মৃতব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজনের হাতে মৃতদেহ সংকারের জন্য দেবে কিনা, ইত্যাদি প্রশ্ন আলোচনা করে শেষপর্যন্ত ঠিক করা হ'ল জালালাবাদ পর্বতচূড়াতেই দাহকার্য সম্পন্ন করা হবে।

পুলিসসাহেব হেম দারোগা প্রমুখকে এগারোটি চিতা তৈরি করতে হুকুম দিলেন। চৌকিদার দফাদার নিয়ে হেম দারোগা প্রচুর জ্বালানী কাঠ যোগাড় করলেন। একের পর এক এগারোটি চিতা সাজানো হ'ল। চিতা আলো করে

এগারোজন শহীদ অন্তিম শয্যায় শয়ান। প্রতিটি মুখ অনাবিল হাসিতে উজ্জল —দুঃসহ যন্ত্রণার কালো ছায়া সেই ঔজ্জল্যকে এতটুকু মলিন করতে পারেনি। মৃত্যুও যেন সেখানে পরাজিত—ম্লান মুখে দূরে দাঁড়িয়ে!

বাংলার এই মরণজয়ী বীর সৈনিকদের নিঃস্বার্থ নিঃশব্দ আত্মত্যাগ বাংলার বিপ্লবকে সাফল্যের পথে বহুদূর এগিয়ে দিল সন্দেহ নাই!

ধীরে ধীরে সূর্য অস্ত গেল। "অস্তাচলের ধারে আসি পূর্বাচলের পানে তাকাই"— বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুব-বিদ্রোহের একটি প্রচেষ্টা অস্ত গেল; কিন্তু রেখে গেল পূব-আকাশে বিপ্লবের নব অরুণোদয়!

মৃতদেহগুলি স্তরে স্তরে জ্বালানী কাঠ দিয়ে ঢেকে তাতে পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন দেওয়া হ'ল। দেখতে দেখতে এগারোটি চিতা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো—আকাশ লাল হয়ে গেল। গুর্খা সৈন্য অ্যাটেন্‌শানে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ইংরেজ সমর-অধিনায়কেরা তাঁদের টুপি খুলে হাত নিলেন। ভারতীয় অফিসারেরা নত মস্তকে বিপ্লবীদের অভিবাদন জানালেন! কারও কারও চোখ জলে ভরে গেল। দেখতে দেখতে আগুনের তীব্র লেলিহান শিখা তাদের নশ্বর দেহগুলি পুড়িয়ে ছাই করে দিল।

ইংরেজের বিরুদ্ধে জালালাবাদ যুদ্ধ ভারত ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়— ভারতবাসী কোনদিনও তা ভুলবে না।

জালালাবাদ পাহাড়ের বিষণ্ণ কাহিনী আসন্ন সন্ধ্যার মুখে সমস্ত শহরে ছড়িয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর স্তব্ধতা নেমে এলো শহরের বুকে—সন্ধ্যাদীপ জ্বললো না কোনও ঘরে—সন্ধ্যা শাঁখের মঙ্গলধ্বনি শোনা গেল না বারেকের তরে। বাংলার ঘরে ঘরে নিঃশব্দ বুকফাটা হাহাকারে লুটিয়ে পড়লো কত মা—কত বোন—দীর্ঘদিনের সুখ দুঃখের কত সাথী!! রাজরোষের রক্তচোখের নীরব হুমকি যদিও সেদিন তাদের কণ্ঠরোধ করে রেখেছিল—কিন্তু কেড়ে নিতে পারেনি মায়ের 'পুত্রগর্ব' ভ্রাতৃহীনা ভগ্নীর 'ভ্রাতৃগৌরব!' সেদিনকার সেই অতলান্ত বেদনার মধ্যেও একমাত্র সান্ত্বনা ছিল—শৌর্যে বীর্যে তাঁদেরই সন্তানেরা, তাঁদেরই ভাইয়েরা—অগণিত ভাইবোনের কল্যাণ কামনায় হাসিমুখে নিঃশব্দে নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে গেল!

২২শে এপ্রিল, ১৯৩০ সাল, শহীদদের চিতার অগ্নিশিখা চট্টগ্রামের আকাশে লাল অক্ষরে লিখে দিল—সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক্। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্!

তথ্যপঞ্জী

পৃষ্ঠা ১৬, ১০২ ॥ জালিয়ানওয়ালাবাগ

রাউলাট অ্যাক্ট আইনের প্রতিবাদে দিল্লীতে ৩০ই মার্চ এক হরতাল আহ্বান করা হয়। এই হরতালে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে গান্ধীজীকে দিল্লীর পথে গ্রেফতার করা হয়। ১৯১৯ সালের ১০ই এপ্রিল পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ নেতা ডাক্তার সত্যপাল ও ডাক্তার কিচ্‌লুকে পাঞ্জাব থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয়। এই আদেশের বিরুদ্ধে জনসাধারণ সভা আহ্বান করে, পুলিস বাধা দেয় এবং বিনা প্ররোচনায় অবাধে গুলী চালাবার ফলে বহু লোক হতাহত হয়। বিক্ষুব্ধ জনতা এই সব মৃতদেহ নিয়ে মিছিল করে এবং তাদের ক্রোধানলে কয়েকজন ইংরেজকে প্রাণ দিতে হয়। জেনারেল ডায়ার স্বয়ং সেই এলাকাকে আয়ত্তে আনবার জন্য "রণে" অবতীর্ণ হয়ে নিরীহ লোকদের ওপর চরম অত্যাচার ও নিপীড়ন চালান। তারই প্রতিবাদে ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে সভা আহুত হয়। জেঃ ডায়ার এই সভা বানচাল করার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। বিক্ষুব্ধ জনতা তবু সভা বর্জন করলো না। জেনারেল ডায়ার উন্মত্ত পশুর মত প্রচুর সৈন্য নিয়ে নিরস্ত্র জনসাধারণের সেই সভা আক্রমণ করে প্রাচীর বেষ্টিত প্রাঙ্গনে বেপরোয়া গুলী চালাতে হুকুম দিলেন। মেশিনগানের অজস্র গুলীতে রক্তগঙ্গা বয়ে গেল। ৩৭০ জন প্রাণ হারালো এবং ১১৩৭ জন আহত হ'ল। অমৃতসরে ও আরো কয়েকটি স্থানে সামরিক আইন জারি হ'ল। জনসাধারণের ওপর অত্যাচার ও নিষ্পেষণের সীমা অতিক্রম করলো। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সারা ভারতে ঘোর প্রতিবাদ উঠলো। কিন্তু ইংলণ্ডে জেনারেল ডায়ারকে এই "বীরত্বের" জন্য সম্বর্ধনা জানানো হয়। রবীন্দ্রনাথ এই নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে তাঁর 'নাইট' উপাধি ঘৃণাভরে বর্জন করেন এবং স্যার শঙ্করণ নায়ার বড় লাটের Executive Council থেকে পদত্যাগ করেন। ভারত সরকার নিজেদের দুর্নাম ঢাকার জন্য ছয় মাস পরে ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে Hunter Committee নিযুক্ত করেন। এই কমিটি জেনারেল ডায়ারকে অপরাধের দায় থেকে মুক্তি দিলেন। তাঁরা লিখলেন—"an error of judgement"—জেনারেল ডায়ারের সিদ্ধান্তে ভুল হয়েছে—এই যা। জাতীয় কংগ্রেস ঘটনা অনুসন্ধানের জন্য কমিটি নিযুক্ত করে এবং তাদের সিদ্ধান্ত—জেনারেল ডায়ারই সর্বতোভাবে দায়ী—for a cold blooded, calculated massacre of innocent, unoffending, unarmed men, women and children

unparalled for its heartlessness and cowardly brutality in modern times.

পৃষ্ঠা ৩০, ১৪৯ ॥ লেনিন (Lenin, Vladimir Ilyich Ulianoff)

রাশিয়ায় 'অক্টোবর বিপ্লবের' মহানায়ক লেনিন। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় সুনিশ্চিত করাই 'অক্টোবর বিপ্লবের' বৈশিষ্ট্য। মহানায়ক লেনিন সাম্রাজ্যবাদী যুগে মার্কসীয় শাস্ত্রের নির্ভুল প্রয়োগ করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী যুগে সকল দেশে একই সঙ্গে ধনিকতন্ত্রের অবসান ঘটানো বাস্তবে সম্ভব নয়। কারণ, ধনিকশ্রেণী শাসিত সব দেশগুলির অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামরিক শক্তিও এক নয়। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে লেনিন নির্ভুলভাবে প্রমাণ করেছিলেন, ধনিকতন্ত্র শাসিত সর্বাপেক্ষা দুর্বল দেশটি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রভাবে সাম্রাজ্যবাদী চক্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং রুশদেশই সেই সময় সর্বাপেক্ষা দুর্বল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। তিনি আরও অভ্রান্ত মার্কসীয় যৌক্তিকতার সঙ্গে বিশ্ব-কম্যুনিষ্ট সংস্থার সামনে উপস্থিত করেছিলেন যে, একটি মাত্র দেশেও সমাজতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা সম্ভব। একটি মাত্র দেশে এইরূপ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সফল প্রয়োগের জন্য যেরূপ Party Principle ও আদর্শ বিপ্লবী সংগঠনের প্রয়োজন, লেনিন তদনুরূপ Principles of Organisation রচনা করে বিপ্লবী কম্যুনিষ্ট পার্টি (বলশেভিক পার্টি) সংগঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মার্কসীয় শাস্ত্রের বাস্তব প্রয়োগই সাম্রাজ্যবাদী যুগে লেনিনের প্রকৃত অবদান।

পৃষ্ঠা ৩৫ ॥ অসহযোগ আন্দোলন

১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় ও পরে নাগপুর অধিবেশনে চূড়ান্তভাবে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী গৃহীত হয়। আট দফা কর্মসূচীতে প্রধানতঃ এই কয়টি বিষয় ছিল :—

(১) খেতাব বর্জন, (২) কাউন্সিলের মনোনীত পদে ইস্তফা দান, (৩) সরকারী উৎসব পরিহার, (৪) সরকারী শিক্ষায়তন ত্যাগ, (৫) বৃটিশ আইন-আদালতের সাহায্য না নেওয়া, (৬) যুদ্ধে সৈনিকের কাজে যোগদানে অস্বীকার করা, (৭) ভাইসরয় ও গভর্নরের কাউন্সিলে যোগ না দেওয়া ও নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করা, (৮) বিদেশী পণ্য বর্জন।

এই সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস খদ্দর ও স্বদেশী দ্রব্যের প্রচলন, হিন্দু-মুসলমানে একতা ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে সচেষ্ট হ'ল। সত্য ও অহিংসা মন্ত্র গ্রহণে গান্ধীজী দেশবাসীকে ডাক দিলেন। জনসাধারণ যদি এক কোটি টাকা ও কারাবরণে প্রস্তুত এক কোটি ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করতে পারেন তবে তিনি এক বছরের

মধ্যেই স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করতে প্রতিশ্রুত হলেন। ১৯২০-২১ সালে গান্ধীজীর এই অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেশের সর্বত্র সাড়া জাগালো—দলে দলে ছাত্র-ছাত্রী স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে বেরিয়ে এলো—রাস্তায় রাস্তায় বিদেশী পণ্যের বহ্নুৎসব আরম্ভ হ'ল।

১৯২১ সালে কংগ্রেসের জারবেদা অধিবেশনের পর দেখা গেল, কংগ্রেস তহবিলে এক কোটি টাকা ও কংগ্রেস পতাকাতলে চল্লিশ লক্ষ ভলান্টিয়ার ও কুড়ি হাজার চরকা সংগৃহীত হয়েছে।

১৯২১ সালে প্রিন্স অফ্ ওয়েল্স (Duke of Cannaught) ভারত সফরে এলেন। কংগ্রেসের ভারতব্যাপী আন্দোলনে প্রিন্সের সম্বর্দ্ধনা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্জিত হ'ল।

এই আন্দোলন নিবারণে সরকার কঠোর দমননীতির অনুসরণে মিটিং ও কংগ্রেস অফিস বেআইনী ঘোষণা করে এবং ১৯২১ সালে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ও পঁচিশ হাজার কর্মীকে কারারুদ্ধ করে।

আমেদাবাদ, ফেব্রুয়ারী, ১৯২২-২৩ সালে গান্ধীজী এই অত্যাচার বন্ধ করার জন্য ভাইসরয় লর্ড রিডিং-কে সাতদিনের নোটিশ দিলেন। কিন্তু এই সাতদিন অতিবাহিত হওয়ার আগেই চৌরীচৌরাতে ক্ষিপ্ত জনসাধারণ একুশজন পুলিস কর্মচারীকে হত্যা করলো। এই ঘটনার প্রভাবে কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলন পাছে বিপ্লবের পথে গতি নেয়, এই আশঙ্কায় গান্ধীজী সভয়ে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন।

পৃষ্ঠা ৯১ ॥ লবণ আইন ভঙ্গ

১৯৩০ সালের লবণ আইন ভঙ্গের অব্যবহিত-পূর্ব দেশের পরিস্থিতি এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর সারা দেশ জুড়ে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিল—ভারতবর্ষকেও তার সম্মুখীন হতে হ'ল। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারাতে নানা দেশে সমাজতান্ত্রিক পার্টি গড়ে উঠলো—ভারতের উপকূলেও তার ঢেউ এসে লাগলো। অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাবে ভারতে কম্যুনিষ্ট পার্টির গোড়াপত্তন হয় ও ভারতের কোন কোন স্থানে কৃষকদের কর মকুবের আন্দোলন সুরু হয়। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে বরদৌলির কৃষকেরা জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। কিন্তু কম্যুনিষ্ট নিয়ন্ত্রিত কৃষক আন্দোলনের বিস্তারেই সরকার বিশেষ চিন্তাকুল হয়ে পড়েন এবং কম্যুনিজমের বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট করবার উদ্দেশ্যে এই সময় মীরাটে বহু কম্যুনিষ্ট নেতাকে অভিযুক্ত ও কারারুদ্ধ করে চার বছর ধরে মামলা চালায়।

নভেম্বর—১৯২৯ সালে জওহরলাল নেহরু All India Trade Union Congress meeting-এ সভাপতিত্ব করেন। সেই সভায়—'ভারতবর্ষকে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে'—এই প্রস্তাব পাশ হয়।

জনসাধারণের এইরূপ ক্রমসঞ্চিত বিক্ষোভে ও দাবিতে গান্ধীজী বিচলিত হলেন—আন্দোলন আরম্ভ হলেই যে তা বিপ্লবীদের প্রভাবে পরিচালিত হবে, এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করলেন। এই অবস্থার অবসানকল্পে ভাইসরয়ের নিকট গান্ধীজী তাঁর এগারো দফা দাবি সম্বলিত প্রস্তাব পেশ করেন—ভাইসরয় তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করতে গান্ধীজীকে পূর্ণ অধিকার দান করলো। ২রা মার্চ, ১৯৩০ সালে গান্ধীজী ভাইসরয়কে শেষ মুহূর্তে আবার ওয়ার্নিং দিলেন—তাও ব্যর্থ হ'ল। তারপরই গান্ধীজীর লবণ আইন ভঙ্গের সেই ঐতিহাসিক ডাণ্ডী অভিযান! এই অভিযানের ব্যাপকতা ও বিস্তৃতিতে বিচলিত সরকারপক্ষ গান্ধীজীর সহিত রফা করলেন এবং গান্ধীজী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রিত হয়ে ইংলণ্ডে গেলেন। কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হয়ে ভারতে ফিরে এসে দেখলেন গান্ধী-আরউইন্ প্যাক্টের সমস্ত সর্ত লর্ড ওয়েলিংডন উপেক্ষা করেছেন।

১৯৩২—৩৩ সালে কংগ্রেসের পূর্ণ সমর্থনে গান্ধীজী এবার আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করলেন এবং সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত আইন ভঙ্গের কৌশল অবলম্বন করলেন।

১৯৩৫ সালে এই আইন-অমান্য আন্দোলনের পরিণতি হিসাবে বৃটিশ সরকার ভারতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন ঘোষণা করেন।

পৃষ্ঠা ১৫২ ॥ জারতন্ত্র

রুশ দেশে রাজাকে জার বলা হ'ত। জারতন্ত্র মানে—রাজার স্বৈরাচারী তন্ত্র, অর্থাৎ, autocratic Rule, যাতে জনসাধারণের কোন গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃত হয় না।

জারতন্ত্রের আমলে রাজারা তো বটেই—এমন কি জমিদারেরাও ক্রীতদাস পোষণ করতেন। পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, লিউথোনিয়া, ল্যাটভিয়ার অধিবাসীরা জাতীয়তাবোধ হারিয়ে যাতে রুশ জাতিতে পরিণত হয়, সেই উদ্দেশ্যে তাদের উপর সর্বদা অত্যাচার নিপীড়ন চলতো।

১৯০৪ সালে দ্বিতীয় জার নিকোলাসের রাজত্বকালে কোরিয়া যুদ্ধে জাপানী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে রুশ সমর-শক্তির অতি শোচনীয় পরাজয় ঘটে। সেই

পরাজয়ের ফলে রাশিয়ার উচ্চশিক্ষিত ধনিক সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে গণতন্ত্র প্রবর্তনের মনোভাব প্রকাশ পায়। তাঁদের ধারণা গণতন্ত্রের অধিকারী জাপানবাসীরা রাশিয়ানদের চেয়ে স্বদেশপ্রেমে অধিকতর উদ্বুদ্ধ এবং এটাই তাদের যুদ্ধজয়ের কারণ।

জার দ্বিতীয় নিকোলাস এই যুক্তিতে প্রভাবান্বিত হয়ে ১৯০৫ সালে "অক্টোবর ম্যানিফেষ্টো" নামে খ্যাত একটি ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় তিনি প্রতিশ্রুতি দেন—(১) ব্যক্তি স্বাধীনতা স্বীকৃত হবে, (২) ডুমা (Parliament) গঠিত হবে এবং ডুমার অনুমোদন ব্যতীত কোন আইন পাশ হবে না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বুলিগান এমনভাবে নির্বাচন-আইন ও পার্লামেণ্ট পরিচালনার বিধি রচনা করলেন, যাতে ধনিকশ্রেণী ভিন্ন শ্রমিক কৃষক ও জাতীয়তাবাদী দেশগুলির এতে কোন সমর্থন থাকা সম্ভব ছিল না। সেই সময়ে মস্কো ইন্‌সারেক্‌শান্ সংঘঠিত হয়। এই বিদ্রোহের প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়ে বুলিগান-ডুমা আহুত হওয়ার পরেও তা বাতিল করে দেওয়া হয়। তারপর আরো সীমিত গণ্ডিতে গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে প্রধানমন্ত্রী ষ্টলিপিনের নির্দেশে নির্বাচন আইন প্রণীত হয় এবং নির্বাচন শেষে ডুমা আহুত হয়। কিন্তু তখনও জাবেব হস্তেই চূড়ান্ত ক্ষমতা রক্ষিত ছিল। কাজেই এই ডুমাও জারের স্বৈরাচারেব বিরোধিতা করে এবং তার ফলে এই ডুমাও শেষপর্যন্ত বাতিল করা হয়। ১৯১৭ সালে জারের পতনের পর অস্থায়ী কেরেন্সকি সরকার গঠনের পূর্ব পর্যন্ত রুশ দেশে জারতন্ত্র প্রচলিত ছিল।

পৃষ্ঠা ১৫২॥ শোধনবাদী দল

মার্ক্সবাদকে বিকৃত কবে যে সব দল বা উপদল বিপ্লবের পথ হতে বিচ্যুত হয়ে শ্রমিক পার্টি বা জনসাধারণকে আপোষ মীমাংসার পথে পরিচালিত করতে প্রয়াসী—লেলিন তাদের মিথ্যা বৈপ্লবিক আবরণ উন্মোচন করে 'শোধনবাদী' আখ্যা দিয়েছেন।

ষ্ট্রুভ প্রভৃতি তথাকথিত মার্কসিষ্টরা কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বিপ্লবী ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠনে পরিণত করার বিরোধিতা করেন, তাই তাঁদের শোধনবাদী বলা হয়। শোধনবাদীদের বিরুদ্ধে লেনিন নিবরচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। পার্টির প্রতি লক্ষ্য রেখে—বিপ্লবের জয় সুনিশ্চিত করার জন্য তিনি সন্ত্রাসবাদীদের ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠনের চাইতেও অনেক গুণ বেশী শক্তিশালী বিপ্লবী ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠনের কার্যকারিতা উপলব্ধি করেছেন এবং আইনসঙ্গত কাজের সঙ্গে সঙ্গে বেআইনী সংগঠন গড়ে তোলার জন্যও সুচিন্তিত নির্দেশ দিয়েছেন। যে সমস্ত দলের ও উপদলের নেতৃস্থানীয়েরা কম্যুনিজমের নামে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে পরোক্ষ

ও প্রত্যক্ষভাবে ধনিক তন্ত্রের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করতে চেয়েছেন—লেনিন তাঁদেরই 'শোধনবাদী দল' নামে অভিহিত করেছেন।

পৃষ্ঠা ১৫২ ॥ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন

"What is there Common between Economism and Terrorism"—এই শিরোনামায় লেনিন তাঁর "What is to be done" পুস্তকে সন্ত্রাসবাদী পন্থার ত্রুটি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, শ্রেণী সংগ্রামের অবিসম্বাদী গতি ও ধারার সম্যক্ উপলব্ধি সন্ত্রাসবাদীদের ছিলনা বলেই স্বতঃস্ফূর্ত বৈপ্লবিক অ্যাক্‌শনে অজান্তেই তাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে। আর অন্যদিকে Economist-রা স্বতঃস্ফূর্ত অর্থনৈতিক ষ্ট্রাইক সংগ্রামে গা ভাসিয়ে চলেছে। তাই টেররিষ্টরা ও ইকনমিষ্টরা—উভয় দলই স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামের উপর নির্ভর করে চলেছে বলে—শ্রেণী সংগ্রামের বাস্তব বিপ্লবী পথ হতে উভয়েই ভ্রষ্ট। তবু মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন—কম্যুনিষ্ট পার্টিতে সন্ত্রাসবাদীদের বিপ্লবী ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠনের অপরিহার্য ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা কেবল যে দ্ব্যর্থহীন ভাবে স্বীকার করেছেন তা নয়—তাঁরা আরও অজেয় শক্তিশালী গোপন সশস্ত্র সংগঠনের কার্যকারিতা সম্বন্ধেও ছত্রে ছত্রে লিখেছেন। 'সন্ত্রাসবাদী দল' বলে একতরফা সমালোচনা করে তাদের বৈপ্লবিক সংগঠনের কৃতিত্বকে তাঁরা কখনও অস্বীকার করেন নি। শোধনবাদী দল বিপ্লবের সফলতার জন্য in terms of armed Insurrection" ভাবতে পারেন না—মার্ক্সের নামে বুলি কপ্‌চিয়ে কম্যুনিষ্ট সেজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতেও লজ্জিতবোধ করেন না। তাঁরা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠনকে বিষবৎ বর্জন করেন।

পৃষ্ঠা ১৬৫ ॥ গদর পার্টি

১৯০৮ সালে বিপ্লবী শিখ নেতা হরদয়ালের চেষ্টায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রানসিস্‌কো শহরে "গদর" নামে একটি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয় ও স্থানীয় শিখদের নিয়ে 'গদর পার্টি' স্থাপিত হয়।

শিখদের উপর আমেরিকান সরকারের বহুবিধ বাধা নিষেধ আরোপিত ছিল। গদর পার্টি ও তাদের মুখপাত্র সেই সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে—শিখদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ও উত্তেজিত করে তুলতে লাগলো। ১৬ই মার্চ, ১৯১৪ সালে মার্কিন সরকার হরদয়ালকে গ্রেফতার করে। জামিনে মুক্তিলাভ করে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে চলে যান এবং তাঁর অবর্তমানে রামচন্দ্রের উপর পার্টি ও গদর পত্রিকার পরিচালনার ভার ন্যস্ত হ'ল।

ইতিমধ্যে ১৯১৩ সালে কেনাডা সরকার ভারতীয় শ্রমিকদের কেনাডায় প্রবেশাধিকার ক্ষুণ্ণ করে আইন পাশ করে (Immigration Law)।

বিক্ষুব্ধ শিখ সম্প্রদায় তাঁদের দাবির অনুকূলে যা'তে কেনাডা সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই জঘন্য আইনের প্রতিবাদ-কল্পে আন্দোলন চালাবার জন্য ভারতে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন।

এইদিকে গুরুদিৎ সিং হংকং থেকে "কামাগাটামারু" নামে একটি সমুদ্রগামী জাহাজ ভাড়া করে ৪ঠা এপ্রিল, ১৯১৪ সালে ৩৫১ জন শিখ ও ২১ জন মুসলমান যাত্রীসহ কানাডা অভিমুখে যাত্রা করে ১৯১৪ সালে ২৩শে মে ভাঙ্কুভার বন্দরে পৌছলেন। কিন্তু Immigration Law-এর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে জাহাজ থেকে অবতরণ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। পুলিসের সঙ্গে তাঁদের একটি সংঘর্ষ হয়। তারপর আরো ক'একটি স্থানেও অবতরনের চেষ্টা করে বিফল মনোরথ হয়ে তাঁরা ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯১৪ সালে "কামাগাটামারু" জাহাজটি বজবজের জেটিতে ভিড়লো। বৃটিশ সরকার পূর্বাহ্ণে সংবাদ পেয়ে তাদের সবাইকে পাঞ্জাবে নিয়ে যাবার জন্য একটি ট্রেন প্রস্তুত রেখেছিল। বৃটিশের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে তারা ট্রেনে উঠতে অস্বীকার করে। এইরূপ পরিস্থিতির জন্য বৃটিশ সৈন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। গদর পার্টির শিখেদের সঙ্গে গুলীভরা রিভলভার ও রাইফেল ছিল—বৃটিশ সৈন্যদলের সঙ্গে তাদের এক খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল। এই যুদ্ধে আঠারোজন শিখ প্রাণ হারান এবং গুরুদিৎ সিং আটাশজন শিখ বন্ধুর সঙ্গে পলায়নে সমর্থ হন। একত্রিশজনকে আন্দামানে পাঠানো হয়। যাঁরা মোকর্দমায় মুক্তি পেয়েছিলেন, তাঁরা পাঞ্জাবে গিয়ে পার্টি স্থাপন করেন ও আমেরিকার গদর পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এঁরা বাঙ্গলা দেশের বিপ্লবীদলের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ১৯২৪ সালে বিষ্ণুগণেশ পিঙ্‌লে আমেরিকা হতে ভারতে আসেন। তিনি রাসবিহারী বসুর সঙ্গে মিলিত হয়ে গভর্ণমেণ্ট ট্রেজারী ও সৈন্যঘাঁটি প্রভৃতি আক্রমণ করার এক বৈপ্লবিক প্ল্যান করেন। গদর পার্টির এই অবদান ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রেরণার বিষয়।

পৃষ্ঠা ১৬৫ ॥ ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্র

১৯১৫ সালে জিতেন্দ্র লাহিড়ীর মাধ্যমে জার্মান সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে গোপন আলাপ আলোচনায় স্থির হয় যে—ভারতে বিপ্লবী অভ্যুত্থানে জার্মানী বিপ্লবীদের অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবে। জিতেন্দ্র নাথের সঙ্গে পরামর্শ করে নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্র নাথ রায় বা M. N. Roy) ব্যাটাভিয়ায় গেলেন ও নিজের আসল পরিচিতি সযত্নে গোপন রেখে—C. Martin, এই ছদ্মনামে পরিচিত হলেন। এই সময় বিদেশ থেকে অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য পাওয়ার আশায় জিতেন লাহিড়ীর মত অবণী মুখার্জীও জার্মানীতে গিয়ে চেষ্টা করেছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ ব্যাটাভিয়াতে একজন জার্মান অফিসার—Theodore Hallerick-এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ইনি ৩০,০০০ রাইফেল—প্রত্যেক রাইফেলের সঙ্গে চারশ' করে কার্তুজ ও দু'লক্ষ টাকা মেভারিক জাহাজে করে শীঘ্রই করাচী বন্দরে এসে পৌছবে বলে নরেন্দ্র নাথকে অবহিত করেন। এই সংবাদে নরেন্দ্র নাথ করাচীতে অস্ত্রশস্ত্র নামানো অসুবিধাজনক মনে করে সুন্দরবনের রায়মঙ্গল নদীতীরে জাহাজটিকে পাঠাবার জন্য Theodore Helferik-কে অনুরোধ জানান। জার্মান অফিসারের নির্দেশে সুন্দরবন অভিমুখে মেভারিক জাহাজের গতিপথ নির্ধারিত হ'ল। জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে নেবার ব্যবস্থার জন্য জানুয়ারী, ১৯১৫ সালে নরেন্দ্রনাথ ব্যাটাভিয়া হতে বাঙ্গলায় ফিরে এলেন।

নরেন্দ্রনাথ যতীন মুখার্জীর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন—কয়েকজন বাছাই করা বিপ্লবী যুবককে সঙ্গে নিয়ে জাহাজ থেকে অস্ত্রাদি নামাবার ব্যবস্থার জন্য যতীন মুখার্জী স্বয়ং রায়মঙ্গলে যাবেন এবং সুন্দরবনের কণ্টকাকীর্ণ গভীর জঙ্গলের মধ্যে এই সব অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখবেন। তারপর প্ল্যান অনুযায়ী এই অস্ত্রের একভাগ হাতিয়া দ্বীপে পাঠানো হবে এবং সময় ও সুযোগমত সেই সব বরিশালে নেওয়া হবে। বাকি অংশ পশ্চিম বাঙ্গলায় ব্যবহারের জন্য বালেশ্বরে পাঠানো হবে। ১লা জুলাই, ১৯১৫ সালে জাহাজটি এসে পৌছবার কথা। সদলবলে যতীন মুখার্জী দশ দিন জাহাজটির জন্য আকুল প্রতীক্ষায় কাটালেন—মেভারিক আর এসে পৌছলো না—তার পরিবর্তে স্যার চার্লস টেগার্টের নেতৃত্বে পুলিস ও মিলিটারী বাহিনী এসে উপস্থিত হ'ল !!

বাঘা যতীন ও তার সহবিপ্লবীদের রক্তে বুড়িবালামের তীর সিক্ত হয়ে গেল। সরকারী মালখানায় কখনও কি আমরা মেভারিক জাহাজের অস্ত্রসম্ভার দেখতে পেয়েছি? মেভারিক জাহাজের অস্তিত্ব কি সত্যিই ছিল? আজ পযন্ত আমরা জানতে পারিনি যে, 'মেভারিক' জাহাজটি কি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের হাতে ধরা পড়েছিল, নাকি আবার জার্মানীতে ফিরে গিয়েছিল? অত অস্ত্রশস্ত্র সমেত জাহাজটিকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলেও কোন খবর পাওয়া যায় নি। এ সম্বন্ধে আলোকপাত করতে পারেন একমাত্র বৃটিশ সরকার, জার্মান সরকার আর সেই সব বিপ্লবী নেতারা, যাঁরা ছিলেন "মূল ষড়যন্ত্রের" কর্ণধার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটির যে শোচনীয় পরিণতি ঘটে এবং কুখ্যাত টেগার্ট সাহেবের হাতে যেভাবে প্রকৃত দেশপ্রেমিক বিপ্লবীরা প্রাণ হারান, তাতে মনে স্বতঃই সন্দেহ জাগে আসলে এটি "পুলিস ও বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্র ছিল কিনা।

১৯০৪ সালে জাপানের বিরুদ্ধে কোরিয়া যুদ্ধে রুশ সমর-শক্তি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এই পরাভবের পরিপ্রেক্ষিতে রুশ দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থ-নৈতিক চাপে জর্জরিত শোষিত জনগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। শিক্ষিত সমাজ ও ধনিক শ্রেণী স্বৈরাচারী জারতন্ত্রেব পরিবর্তন দাবী করে। শিক্ষিত ও ধনিক শ্রেণীর বিশ্বাস যে, জনগণ পার্লামেণ্টারী শাসনে অংশগ্রহণের সুযোগ পেলে জাপানের কাছে তাদের ঐরূপ শোচনীয় পরাজয় ঘটতো না।

ইতিমধ্যে খাদ্য সমস্যা দারুণ হয়ে দেখা দিল। বুভুক্ষু জনগণের সঙ্গে পাদ্রি ফাদার গ্যাপন রবিবার ২২শে জানুয়ারী, ১৯০৫ সালে জারের কাছে রুটি ভিক্ষা করতে ও পার্লামেণ্ট শাসনের প্রার্থনা জানাতে গেলে জার এই বিশাল জনতার উপর গুলী চালাবার আদেশ দিলেন। জাবের উইণ্টার প্যালেসের সামনে পাঁচশ'জন নিহত ও বহু সহস্র লোক আহত হ'ল।

এই নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে মস্কো শহর ও গ্রামাঞ্চলে শ্রমিক ও দরিদ্র কৃষকেবা সাধারণ হরতাল ঘোষণা করলো। শ্রমিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি গঠিত হ'ল। সেই সব কমিটিকে সোভিয়েট বলা হ'ত। এই সব সোভিয়েটের নেতৃত্বে স্থানে স্থানে ব্যারিকেড স্থাপন করে শ্রমিকেরা সশস্ত্র আক্রমণ চালায়। প্রায় তিন সপ্তাহকাল পরে মস্কো শ্রমিকদের এই অভ্যুত্থান শান্ত হয়ে আসে। মস্কো ইন্‌সারেক্‌শানে ব্যারিকেড যুদ্ধের এক নতুন উন্নততর অধ্যায় রচিত হয়েছে। লেনিন তারপর Lesson of Moscow Insurrection লিখলেন। তিনি তৃতীয় শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে লিখছেন:—"The lessons to be learnt from Moscow concerns the tactics of the organisation of forces for insurrection. Military tactics are determined by the level of military technique—this truism was repeated over and over again for the benifit of Marxist by Engles. Modern military technique is not as it was in th first half of this nineteenth century, It would be stupid for crowds to attempt to contend against artillary and to defend barricades with revolvers. Kautsky was right when he said that after Moscow it is necessary to revise Engle's conclusions on this subject, and that Moscow has advanced new barricade tactics. Their tactics were the tactics of Guerrilla warfare."

—*Lenin*

পৃষ্ঠা ১৬৬ ॥ থারওয়াডি বিদ্রোহ

ভারতবর্ষ যখন দুইশত বৎসরেরও অধিককাল পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তখন ব্রহ্মদেশও প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের রথচক্রে নিষ্পেষিত হচ্ছিল। তাদের পরাধীনতার জ্বালা স্বভাবতই অনেক তীব্র। ভিক্ষু উত্তম প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকেই ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতালাভের জন্য আন্দোলন চালান। বৃটিশ সরকার তাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করে বাঙ্গলা জেলে নির্বাসিত করে। ভিক্ষু উত্তমের স্বদেশ প্রেমের বাণী তিনজন তরুণ বিপ্লবীকে উদ্বুদ্ধ করে। এই তিন ফুঙ্গি দৃঢ়তার সঙ্গে বিপ্লবীদল গঠন করেন। তাঁদের অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাঁদের সংগঠন সরকার অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেন।

তারপর বৈপ্লবিক আন্দোলনে অবতীর্ণ হলেন মায়া সেন। গরীব শিক্ষক মায়া সেন সরকারের ক্রোধানল হতে রেহাই পেলেন না—তাঁর জেল হ'ল। জেলে বসেই তিনি বিপ্লবী পরিকল্পনা স্থির করলেন।

ব্রহ্মদেশের লোক সাধারণতঃ তন্ত্র-মন্ত্র ঠিকুজী-কোষ্ঠি ইত্যাদিতে বিশ্বাসী। মায়া সেন সাধারণ বর্মীদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিলেন। তিনি প্রচার করলেন যে, তিনি সুস্পষ্ট দেখেছেন ইংরেজদের রাশিচক্রে সর্প আছে। বর্মীরা যদি গরুড় পক্ষীর মত শক্তি ধরে তবে সাপের নিধন অনিবার্য। এই প্রচারের পর দলে যোগ দেবার জন্য যুবকদের ডাক দিলেন। যারাই দলে যোগ দেবে তাদের হাতে উল্কি দিয়ে গরুড় পাখীর ছাপ এঁকে দেওয়া হবে। বাহুতে যদি সেইরূপ ছাপ আঁকা থাকে তবে শত্রুর গুলীও তাদের স্পর্শ করবে না। দেখতে দেখতে ব্রহ্মদেশের থারওয়াডি নামক অঞ্চলে মায়া সেন কয়েক সহস্র যুবক নিয়ে এক সৈন্যদল গঠন করলেন। ততদিনে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঢেউ গিয়ে সেখানেও পৌঁছেছে। অর্থনৈতিক দুরবস্থায় জর্জরিত থারওয়াডিবাসী স্বাধীনতালাভের জন্য ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলো এবং সম্মুখ সমরে অজস্র প্রাণ বলিদান হ'ল। ১৯৩১-৩২ সাল পর্যন্ত ইংরেজ সরকার এই থারওয়াডি বিদ্রোহ দমনের জন্য বর্বরোচিত অত্যাচার চালিয়েছে। থারওয়াডি জেলে একসঙ্গে বাহাত্তরজনকে ফাঁসি দিয়েছে। অনেকের মাথা কেটে জনসাধারণের মনে বিভীষিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রাজপথে সাজিয়ে রেখেছে—তবু বিপ্লবী শক্তিকে খর্ব করা সম্ভব হয়নি। ৭ই জানুয়ারী, ১৯৩১ সালে মায়া সেন আবার নতুন করে ইংরেজ সৈন্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালালেন। এই প্রচণ্ড সংগ্রামে উভয় পক্ষেরই অনেক ক্ষতি হ'ল। ধরা পড়লেন বিপ্লবী নেতা অংহ্লা। তাঁকে নিয়ে আঠারোজনের ফাঁসি হ'ল আর ছাপ্পান্নজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হ'ল। মায়া সেন তখনো নির্ভীকভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। তারপর অস্ত্র ও

দলের অভাবে মায়া সেনও ধরা পড়লেন—অনেকের সঙ্গে তাঁরও ফাঁসি হ'ল। ১৯৩২ সালের শেষে ইংরেজ সরকার থারওয়ার্ডি বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হয়।

পৃষ্ঠা ১৬৮ ॥ লালোর (Lalor, James Fintan—1807—1849)

ইনি ইয়ং আয়ারল্যাণ্ড গ্রুপের সদস্য ছিলেন। ১৮৪৭-৪৮ সালে Irish Felon (আইরিশ ফেলন) ও Nation পত্রিকায় তাঁর লেখার মাধ্যমে আমরা তাঁর চিন্তাধারার পরিচয় পাই। তিনি আয়ারল্যাণ্ডের পৃথক সত্তা রক্ষার দাবি তোলেন। ভূমি জাতীয়করণও তাঁর কর্মসূচীর মধ্যে বিশেষ স্থান লাভ করে; তিনিই শ্লোগান তোলেন—"The land ef Ireland for the People of Ireland!"—(আয়ারল্যাণ্ডের ভূমির একমাত্র উত্তরাধিকারী আয়ারল্যাণ্ডের জনসাধারণ)। জমিদারের খাজনা বন্ধ করবার জন্য তিনি প্রজাদের সংঘবদ্ধ করেন এবং প্রজার স্বার্থে জমি পরিত্যাগ করার জন্য জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালান। পরবর্তীকালে আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবী নেতা মাইকেল ডেভিড্ লালোরের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে লালোরের বিভিন্ন কর্মসূচী আযাবল্যাণ্ডেব স্বাধীনতা সংগ্রামে সময়োপযোগী করে প্রয়োগ করেন।

পৃষ্ঠা ১৭৮ ॥ গ্যারিবল্ডী (Guiseppe Garibaldi—1807-82)

ইতালী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ইতালীর একতার জন্য গ্যারিবল্ডী ও ম্যাৎসিনির অবদানেব তুলনা হয় না। এই দুই নেতার নামই ইতালীর বিপ্লবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ম্যাৎসিনি ইতালীর বিপ্লবের "Soul" বা প্রাণকেন্দ্র, আর গ্যারিবল্ডী ছিলেন কর্মকেন্দ্রের প্রাণ। ১৮৩৪ সালে নীস্ শহরে বিপ্লবের এক বিফল চেষ্টার পর গ্যারিবল্ডীকে সেখান থেকে পলাতক হতে হয়। ১৮৩৫–৪৬ সালে গ্যারিবল্ডী ব্রেজিল ও উরুগুয়ের গৃহযুদ্ধে বিপ্লবীদের পক্ষে সক্রিয় অংশ গ্রহণ কবে যুদ্ধ করেছেন। তারপর আবার ইতালীতে ফিরে আসেন। ১৮৪৮–৪৯ সালে সার্দিনিয়ার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ১৮৪৯ সালে তিনি ম্যাৎসিনি পরিচালিত রোম গণতন্ত্রবাহিনীতে যোগ দিলেন ও ইতালীর স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেন। এক হাজার "Red Shirts" ভলান্টিয়ার নিয়ে গ্যারিবল্ডী সিসিল ও সার্দিনিয়া অধিকার করেন। তারপর স্বেচ্ছায় সেই বিজিত প্রদেশ দু'টির তত্ত্বাবধানের ভার ভিক্টর এমানুয়েলকে দিয়ে তিনি আবার কেপেরেরা দ্বীপে পর্বতশ্রেণীবেষ্টিত নিজ বাসভবনে ফিরে যান।

পৃষ্ঠা ২২১ ॥ ব্ল্যাক হোল ট্রাজেডি

১৭৫৬—৬০ খৃষ্টাব্দ নবাব সিরাজউদ্দোল্লার রাজত্ব কাল। ২৪ বৎসর বয়সে তিনি বাঙ্গলার মসনদে আরোহণ করেন। অতি দক্ষতার সঙ্গে তিনি প্রাসাদ-

বাধে। তিনি ইংরেজদের কাসিমবাজারের কুঠি অধিকার করে কলকাতা আক্রমণ করেন। ড্রেক সাহেব সিরাজের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কথিত আছে, ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দীকে সিরাজের আদেশে এক ক্ষুদ্র কক্ষে রাত্রে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। পরদিন প্রাতে নাকি দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে ১২৩ জন শ্বাস বন্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছে। এই ঘটনাই 'অন্ধকুপ হত্যা' বা 'ব্ল্যাক হোল ট্রাজেডি' নামে খ্যাত। 'অন্ধকুপ হত্যা' ঘটনাটি সত্য কিনা এ বিষয়ে অনেক বিদগ্ধ ঐতিহাসিকই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অনেকেরই বিশ্বাস—এইটি ইংরেজ সরকারের অপপ্রচার। এই মিথ্যা ঘটনার স্মারক হিসেবে ইংবেজ সরকার ডালহৌসী স্কোয়ারে একটি স্তম্ভ স্থাপন করে। এই স্তম্ভটির নাম ছিল 'হলওয়েল মনুমেণ্ট'। সুভাষচন্দ্র এই মিথ্যা প্রচারের স্মারকচিহ্নটির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে কলকাতার বুক থেকে একে অপসারিত করতে ইংরেজ সরকারকে বাধ্য করেন।

পৃষ্ঠা ২৮২ ॥ হল্‌দিঘাট যুদ্ধ

মেবারের রাজধানী চিতোর সম্রাট আকবরের হস্তগত। কিন্তু রাণা প্রতাপ কোনমতেই সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার তো করলেনই না, উপরন্তু চিতোর উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। প্রতাপসিংহকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্ম আকবর তাঁর অনুগত রাজা মানসিংহকে প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করলেন। আরাবল্লী পর্বতমালার হল্‌দিঘাট নামক গিরিসঙ্কটে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনীর এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। প্রতাপসিংহ যুদ্ধে আহত ও পরাজিত হন। এই যুদ্ধই হল্‌দিঘাট যুদ্ধ নামে খ্যাত।

নির্ঘণ্ট

অভিমত

"১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাঙ্গলাকে এক নতুন মর্যাদা দিয়াছে। সেই ইতিহাস ভুলিবার নয়। সূর্য সেন বাঙ্গলা দেশে নতুন সূর্যের মত উদিত হইয়াছিলেন এবং তাঁরই বীর সঙ্গী ও উৎসর্গীকৃত তরুণের দল জীবন-মৃত্যুর নতুন কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁদেরই সঙ্গী এবং অন্যতম বীর যোদ্ধা শ্রীঅনন্ত সিংহ সেই অদ্ভুত কাহিনী রচনা করিয়া এই যুগের বাঙ্গালীকে উপহার দিয়াছেন। এই আশ্চর্য প্রাণবন্ত ইতিহাস পড়িলে মনে হইবে বাঙ্গলা দেশের যুবকদের চিত্তে আজ যত নৈরাশ্যই আসুক না কেন, সূর্য সেনের দেশে সূর্য চিরদিন মেঘে ঢাকা থাকিবে না, তার নবীন দীপ্তি আবার আমরা দেখিতে পাইব। চট্টগ্রামে ইংরেজদের বিরুদ্ধে একদা যিনি বন্দুক ধরিয়াছিলেন, সেই অনন্ত সিংহ আজ কলম ধরিয়াছেন এবং অগ্নি-অক্ষরে বিদ্রোহের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। এই অভূতপূর্ব দুঃসাহসিক অভিযান কাহিনীর রচয়িতাকে আজ বিপ্লবী বাঙ্গলার অভিবাদন জানাই!"

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

● ● ●

"হাতিয়ারে যে হাত পাকা তাতে গুণীর কলম স্বচ্ছন্দে চলার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সাহিত্যেই বিরল। বাংলা ভাষা সেই বিরল গৌরবের অধিকারী হয়েছে, শ্রীঅনন্ত সিংহের দৌলতে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে জীবনকালেই যিনি কিংবদন্তী হয়ে আছেন, তাঁর পিস্তল বন্দুক ধরা হাতে কলমের মুন্সিয়ানা সত্যই বিস্ময়কর।

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড স্বাধীনতার অগ্নিযজ্ঞের যথার্থ অন্যতম পুরোহিতের নিজের হাতে রচিত জলন্ত প্রামাণ্য ইতিহাস শুধু নয়, জীবন্ত বর্ণনায় ভাষার ব্যঞ্জনায় ও লিখন নৈপুণ্যে অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টির মর্যাদা পাবার যোগ্য।"

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ইলিসিয়ামরো-এ তাঁর নাটকীয় আত্মপ্রকাশ দেশময় কী আলোড়ন ও উদ্দীপনা জাগিয়েছিল, আজও স্মরণ করতে পারি। ফাঁসির দড়ি পিছলে বেরুলেন, দ্বীপান্তরে প্রাণশক্তি খর্ব করতে পারেনি। আজ তিনি লেখনী হাতে আত্মকথা ও চট্টগ্রাম-বিদ্রোহের ইতিহাস বলছেন। আগ্নেয়াস্ত্র যেমন সহজে হাতে খেলত—কী আশ্চর্য, লেখনীও তেমনি। তরুণচিত্তকে বীর্য ও আত্মপ্রত্যয়ে উদ্বেলিত করবে এ বই, প্রবীণেরা অতীত সেই মহাগৌরবের সঙ্গে দুর্গত বর্তমানের তুলনা করে ক্ষুব্ধ নিশ্বাস ফেলবেন।”

মনোজ বসু

● ● ●

“চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কাহিনী আজ ইতিহাসের স্মৃতিকথায় দাঁড়িয়েছে। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে বিদেশী শাসনের ভিত্তি ধরে নাড়া দেবার চেষ্টা করেছিল এই শৌর্য কাহিনী বাঙালীর প্রাণে রোমাঞ্চ জাগিয়েছিল সেদিন, বিদেশীদের মনেও আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল—বিপুল।

আজ প্রায় চল্লিশ বছর যেতে বসেছে। সে নাটকের পাত্রপাত্রীরা আজ অনেকেই জীবন যবনিকার আড়ালে লুকিয়ে পড়েছেন—সেদিনের অভ্যুত্থানে যাঁরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে আজ শ্রীমান অনন্ত সিংহ কলম ধরেছেন—পুরানো কথা যথাযথ লিখে যাবার চেষ্টা করছেন।

এ দেশের স্বাধীন মাটিতে আজ যাঁরা মানুষ হচ্ছেন, তাঁরা হয়ত মানেন না—এই স্বাধীনতা ফিরিয়ে পেতে কি বিপুল স্বার্থত্যাগ ও আত্মবলিদান দিয়েছিল অতীত কালের মানুষ।

চট্টগ্রামের বীরকাহিনীর বিপুল প্রচারে হয়ত জাতির আত্মাভিমান আবার জেগে উঠবে বাঙালীর মনে। রাজনীতির ধোঁয়া ভেদ করে আমাদের অনেকের নজর ভবিষ্যতের অন্ধকার বেশীদূর ভেদ করিতে পারে না। নানা মুনির নানা মতে আমরা বিহ্বল হয়ে পড়েছি। এই সময় অতীতের কাহিনী হয়ত আমাদের সম্বিৎ ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে।

আজ শ্রীমান অনন্ত সিংহের এই বিপুল প্রয়াসকে আবাহন ও অভিনন্দন জানাই। আশা করছি এ গ্রন্থমালার পাঠকের অভাব হবে না।”

[illegible] ঘোষ